কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রবর্তিত ত্রিবর্ষ স্নাতক স্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ের (Part II) শিক্ষাতত্ত্বের (Education) পাঠক্রম অনুসরণে লিখিত

ভারতীয়
শিক্ষা-সমস্যার গতি-প্রকৃতি

ডঃ হরগোবিন্দ সাহা

এম. এ. (বাংলা), এম. এ. (শিক্ষাতত্ত্ব),
বি. কম., বি. টি. (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়),
শ্রমিক কল্যাণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত—পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
অধ্যাপক, চিত্তরঞ্জন টিচার্স ট্রেইনিং ইন্‌ষ্টিটিউট্ (কলেজ),
জাতীয় উৎপাদকতা পরিষদ, কলিকাতা।
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক—শিবপুর জনকল্যাণ সঙ্ঘ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়,
সর্ব্বাঙ্গপুর জনকল্যাণ সঙ্ঘ মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ।

বাণী প্রকাশনী

৪৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড্

কলিকাতা-২৬

বাণী প্রকাশনীর পক্ষ থেকে
অধ্যাপিকা বাণী সাহা কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ :
ফেব্রুয়ারী— ১৩৬৪

মূল্য : বার টাকা

বিক্রয়কেন্দ্র :

(১) ইণ্ডিয়ান বুক এজেন্সী
[ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের পেছনে]
১২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

(২) ফরোয়ার্ড পাবলিশার্স
[হাজরা পার্কের সন্নিকটে]
৪৫-বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড্
কলিকাতা-২৬

মুদ্রাকর
এস. রায়
বিদ্যুৎ প্রিন্টিং প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬ ।

বাংলার

অন্যতম শিক্ষাবিদ্

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

এম. এ., বি. টি., ডি. এস্. ই., জে. পি.

ডীন্, ফ্যাকাল্‌টি অফ্ এডুকেশন,

অধ্যক্ষ, শিক্ষাতত্ত্ব এবং শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মহোদয়ের করকমলে

শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হইল।

শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

1. A Golden Guide to Education
   for B. A. Students (Education Paper I, II & III)
2. A Golden Guide to Teaching
   for B. T. Students (Paper I, II, III & IV)
3. বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা প্রসঙ্গে
   for Basic Training Trainees
4. মানসিক স্বাস্থ্যের কথা (যন্ত্রস্থ)
   for B. T. Students.
5. শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) পর্যালোচনা
   for B. T. Students
6. প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার কথা
   for Nursery, Kindergarten
   & Pre-Basic Teachers
7. A Golden Guide to Education Method.

FOREWORD

It is a matter of gratification that College attendance in our country is increasing at a fast rate. But it is a patent fact that we do not have enough books, particularly on subjects having a direct bearing on Indian conditions. The dearth is felt all the more acutely when we are in search of books written in our own languages. Happily, however, some enterprising authors have come forward to fill this gap to some extent, Prof. Haragobinda Saha, whose book in Bengali entitled 'Bharatiya Siksha Samasyar Gati-Prakiti' (Current Problems in Indian Education) has just been published is one of them.

I have looked through Prof Saha's book. It is written in accordance with Calcutta University's Revised Syllabus for 'Education' for the B. A. Part II Examination of the Three-Year-Degree Course. It also covers portions of the B. A. (Hons.) & B. T. Syllabuses of the same university. As such it will be of immense help to students preparing for both the Undergraduate and Post graduate Examinations of our University.

The author has dealt satisfactorily with various problems of education in our country. Where necessary, he has made comparisons between our system of education and the systems obtaining in foreign countries. This comparative Study is an important feature of the book which might enable a student to have a clear conception of the problems of education that are presented by the author. The topics have been treated analytically and in a simple and lucid style. The author has included one chapter on Technical and Vocational education which is required by the students of B. A. and M. A. Classes who want to make a special study of the subject.

I am glad to testify that the book is admirably fitted to serve the purpose for which it has been written, In fact it seems to be an essential book for B. A., B. T., and M. A. candidates as it contains helpful materials for answers to possible questions on relevant topics.

P. K. BOSE
Principal
Bangabasi College, Calcutta

SYLLABUS (Revised) B. A. (Education) Part II
(Pass Course)
Please see at Page XVI.

This book contains B. A. (Education Honours course)

Paper II

Concept of Guidance—educational & vocational—Education of Gifted, backward & problem children—Maladjustment and deliquent children.

Paper III

(i) India : (a) A brief historical survery of the growth & Development of Brahmanical and Buddistic system of education—education in ancient universities.

(ii) State of indigenous education (different types of Hindu and Muhammadan Institutions)—Reports of william Adam—begining of Western Education in India. Recommendations of charles wood and the Indian education commission (Hunter commission 1882—88)

(iii) Influence of National movement in India—growth and development of Primary, Secondary and University education in India.

(iv) Wardha scheme—Report of the Basic National Education committee —plan of Basic education.

(v) Five year plans of educational developments, Secondary Education commission (1952), Education commission (1964—66).

Paper IV

A General study of how the ideas of some great educators are being worked out at present, e.g. Kindergarten, Montesori Schools, Wardha scheme,

Paper V

Problems of Finance, Teaching Personnel, accommodation, equipment, programme, curriculum and Training of Teachers.

It also covers some portions of B. T. syllabus

Paper III

Progressive methods of teaching—Technique of instruction, Teaching aids & appliances—correlation and integration of studies, Modern methods of evaluation, Examinations & tests organisation of co-curricular activities. General organisation and administration.

Paper IV

A brief review of ancient and medieaval Indian education. Growth and development of Primary, secondary and University education in India, Influence of national education movements. Influences that have mainly determined the present system of education in India.

Educational reconstruction in post-independent India—Report of Educational plans of developments.

Current problems in Indian Education—Basic education, Universal Primary education, reorganisation of Secondary education—Technical education—Vocational education—University education, language problems and medium of instruction.

It may help Post Graduate Students preparing for—

M. A. (Education) & M. Sc. (Education) Topics required to be studied for Paper V.

আমার কথা

বহুদিন ধরেই বি. এ. পরীক্ষার্থীদের (যারা শিক্ষাতত্ত্ব নিয়েছেন) অনেকে ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করে আমাদের পত্র দিয়েছেন। অনেক অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা ভারতীয় শিক্ষাসমস্যার উপর বাংলায় নির্ভরযোগ্য বই নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। A Golden Guide to Education এবং A Golden Guide to Teaching বই দু' খানিতে প্রশ্নোত্তরে মাত্র কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু উক্ত পুস্তক দু'টিতে আলোচনার ক্ষেত্র ছিল সীমিত। তাছাড়া প্রশ্নোত্তরে ধারাবাহিক আলোচনার তেমন অবকাশ থাকে না, তাই ভারতীয় শিক্ষাসমস্যার উপর মৌলিক চিন্তাধারা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছি। এই পুস্তকে এদেশের সমস্যাসঙ্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলির কারণ বিশ্লেষণ, ঐগুলির পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রভাব, সমস্যা সমাধানের উপায়, সমস্যা সমাধান করবার প্রতিষ্ঠান সমুহের সীমিত ক্ষমতার এবং সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে শিক্ষা সমস্যার প্রকৃত-স্বরূপটিকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। শিক্ষা সম্পর্কীত নানাবিধ সমস্যার সঙ্গে দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাগুলি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে বিষয়টির উপর আলোক সম্পাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্পর্কীত আলোচনাকে প্রামানিক ও ও সারগর্ভ করবার জন্য এই পুস্তকের শেষাংশে উল্লিখিত পুস্তকাবলী ও রিপোর্ট সমুহ থেকে প্রয়োজন অনুরূপ তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে আলোচনায় যুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছি।

প্রত্যেকটি সমস্যার একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে; আবার শিক্ষার যে কোন সমস্যা কতকগুলি মুল সমস্যার সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই পুস্তকে শিক্ষার মুল সমস্যাসমুহ ও বিশেষ বিশেষ শিক্ষার বিশেষ সমস্যাগুলি আলোচনা করে প্রয়োজন অনুরূপ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা সমস্যা আজ নূতন নয় কারণ মানুষের জীবন সমস্যাসঙ্কুল। শিক্ষা যেখানে জীবনের সাথে সমার্থক সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা থাকবেই। আজ যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা সমাধান করবার পর ভবিষ্যতে নূতন পরিপ্রেক্ষিতে আবার সমস্যা দেখা দিতে পারে, তখন সেদিনকার পরিস্থিতি বিচার করে শিক্ষা সমস্যা সমাধানের বিধান দিতে হবে। সেই মহতী প্রচেষ্টার দায়িত্ব রইল ভবিষ্যতের শিক্ষাবিদ্‌দের হাতে।

পুস্তকটি তাড়াতাড়ি ছাপার জন্য যে সমস্ত ভুলত্রুটি রয়ে গেল তার জন্য বিশেষ দুঃখিত। এই পুস্তকের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সমস্ত প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে। নিবেদন ইতি—

নিবেদক

হরগোবিন্দ সাহা

Current Problems of Indian Education

Scope of the subject—The area of this subject is very wide but B. A. (pass) students have the limitation of understanding and solving educational problems. Many of the problems have sociological, psychological, economic, poletical and philosophical bases. While ascertaing the solutions of some of the problems students are to follow the critical path. Both analytical and synthetical view of the topics are to be studied by collecting up-to-date information.

It covers thoughts and practices of good old days as well as of recent developments in the field of education. History of Indian education is a long tale and it has direct bearing on the current problems of Indian education. During British rule education system of India was based on the requirements of the Govt. of India and that of British merchants. That system was also accepted by the privileged classes in India. Later on, the spirit of Nationalism developed and it was followed by National movements. Demands came from Indian leaders to introduce right type of education to cater the needs of the people. By the pressure of Indian citizens Primary Education Acts were passed in different provinces since 1921 but unfortunately, no effect could be given to the expansion and modernisation of Primary education either in rural or in unban areas with some exceptions. Recently, secondary education has gone through a thorough change by upgrading some High Schools to Higher secondary schools and also establishing a good number of Multipurpose schools. University education is also undergoing rapid changes to cope with the national demands. Women education as well as social education has got a wider perspective. Technical and vocational education along with industrial and commercial training have undergone various changes to meet the requirements of expanding trade and industry.

Education was not very problematic when it was confined to privileged classes and also when it was bokish & traditional in nature. The scientific approach of New-Education and popular demand for free and compulsory education for the masses and Higher and technical education for intelligentsia have created so many problems. Paucity of funds is the root all educational problems. This follows the dearth of qualified teachers and trainers in all types of education.

For want of real co-operation between the governments, municipal bodies and private organisations to organise, co-ordinate and control all types of educational activities many educational problems have cropped up. For want of reseach and reorientation on educational topics problems do arise. A national system of education could not yet been established for want of sound educational planning which itself is responsible for a number of critical problems in education.

Current problems of Indian education is the burning question of the day. An analytical approach of the problems and their various short-term and long-term solutions fall within the scope of the subject. Discussions on educatinal matters in this paper should be problem oriented.

In this book some of the problems have been discussed thoroughly keeping in view the standard and scope for B. A. (pass) students in particular and B. A. (Hons) and B. T. students in general.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়—ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমিকা— ১—২২
ভারতীয় জীবনাদর্শ ও শিক্ষা—হিন্দুশিক্ষা বিধি—বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা—হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য—ইসলামীয় শিক্ষা—ধ্বংসপ্রায় হিন্দু ও বৌদ্ধশিক্ষা—ইষ্টইণ্ডিয়া আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা—বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি—উডের ডেসপ্যাচ্—১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা কমিশন—কার্জনের শিক্ষানীতি-জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার কাঠামো—প্রাথমিক ২৩—৫৪
শিক্ষার গোড়ার কথা—বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—শিক্ষা পরিশাসন সমস্যা—স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা—তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা—মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়ার কথা—মাধ্যমিক শিক্ষার স্বরূপ—স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষা—স্ত্রীশিক্ষার গোড়ার কথা—কারিগরী শিক্ষার গোড়ার কথা—উচ্চশিক্ষার গোড়ার কথা—ভারতীয় উচ্চশিক্ষার সমস্যা।

তৃতীয় অধ্যায়—স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের পথে— ৫৫—১০৪
শিক্ষার কাঠামো গড়ে তোলে যারা—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাদপ্তর—রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাদপ্তর—পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ—কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ—জাতীয় স্ত্রীশিক্ষা কমিটি—বিশ্ব বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন—নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ—নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সংসদ—স্কুলবোর্ড ও পৌরসভা—শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা—রাধা কিষণ কমিশন—মুদালিয়র কমিশন—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও প্রসার, প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন—স্কুল এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট—শিক্ষাপরিকল্পনা—১ম, ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশেষ কয়েকটি দিক—শিক্ষা পরিকল্পনার ফলশ্রুতি—শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) পর্যালোচনা—চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা—অনুশীলনী—University Questions.

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার গোড়ার কথা— ১০৭—১২৫
শিক্ষা সমস্যার স্বরূপ—শিক্ষা সমস্যার উদ্ভব হয় কিরূপে—ভাববাদী, জড়বাদী, প্রকৃতি বাদী মতবাদের সংঘাত—গণতন্ত্রী ও ধনতন্ত্রী শিক্ষাদর্শের সংঘাত—পাঠক্রম নির্ণয়ে সংঘাত—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে ভাষা শিক্ষা—পরিশাসন মুলক সংঘাত—অভাবজাত সমস্যা—শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুতের সমস্যা—শিক্ষা পুণর্গঠন মুলক সমস্যা—শিক্ষা সমস্যার জন্য দায়ী কে?—জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা সমস্যার গুরুত্ব কতটুকু—এ দেশীয় শিক্ষা সমস্যার বিশেষ বিশেষ দিক—বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সমস্যার বিশেষ দিক—ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ দিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়—শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১২৬—১৪৪
সংগঠন—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা—স্থান সঙ্কুলান সমস্যা—শিক্ষা উপকরণ সমস্যা—শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত সমস্যা—শারীর শিক্ষা সমস্যা—ছাত্রকল্যাণমুলক সমস্যা।

তৃতীয় অধ্যায়—পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী ও শিক্ষা ১৪৫—১৬৮
প্রক্রিয়া—পাঠক্রমের মৌলিক নীতি—বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম—পাঠক্রম সংস্কারের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধান—সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা—পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক বিষয়ের সীমারেখা—সামুদায়িক-জীবন—পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি—আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের সমস্যা—অনুবন্ধ প্রণালী—অনুশীলনী।

চতুর্থ অধ্যায়—শিক্ষাদান ও শিক্ষা পরিমাপন—ভাষা শিক্ষা ১৬৯—১৯৮
দেবার সমস্যা—মাধ্যমিক পাঠক্রমে বিভিন্ন ভাষার স্থান—উচ্চশিক্ষার মাধ্যম—বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা—শিক্ষা নির্দেশনা ও পরামর্শদান—নির্দেশনাচক্র—শিক্ষা নির্দেশনায় ধারাবাহিক প্রগতিপত্রের ব্যবহার—শিক্ষাপরিমাপন।

রচনাধর্মী পরীক্ষার ত্রুটি—উন্নত শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় শিক্ষণের মূল্যায়ন—অসামঞ্জস্য তার কারণ ও তার প্রতিকার—শিশুশিক্ষায় নির্দেশনা—এদেশের শিশুশিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা—অন্যান্য দেশের শিশুশিক্ষার সাথে এ দেশের শিশু শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা—শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিমাপ—শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয়ের মাত্রা—অপচয় ও পরীক্ষা ব্যবস্থা—পরীক্ষার সাথে অনুন্নয়নের সম্পর্ক—প্রগতিপত্র—আধুনিক মাননির্নীত অভীক্ষা প্রস্তুত প্রণালী—আধুনিক অভীক্ষার গুণাবলী—University Questions.

পঞ্চম অধ্যায়—শিক্ষক শিক্ষণ—শিক্ষক শিক্ষণের ঐতিহাসিক দিক—শিক্ষক শিক্ষণের নবরূপায়ণ—শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা—শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সহজে মেলে না কেন ?—প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অনগ্রসরতা—মাধ্যমিক শিক্ষক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা—সর্বস্তরে শিক্ষক শিক্ষণ—কারু ও চারু শিল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ—বুনিয়াদী শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ—অনুশীলনী। ১৯৯—২১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়—শিক্ষা ব্যবস্থার আর্থিক দিক—অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিক্ষা ব্যবস্থার আর্থিক দিকের গুরুত্ব—গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার ব্যয়ভার ও তার অগ্রাধিকার নিরূপণ—শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আর্থিক সমস্যা—জাতীয় শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের যোগান—শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য ব্যয়ের তালিকা—শিক্ষা পরিকল্পনার আর্থিক দিক—শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধির অর্থ জাতীয় লক্ষ্মীবৃদ্ধি—অনুশীলনী—University Questions. ২১৪—২২৮

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক— ২৩১—২৫৬

শৈশবের গুরুত্ব—প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—শৈশবে খেলার মূল্যায়ণ—সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা—প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান—মণ্টেসরী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা—নার্শারীস্কুলের জনপ্রিয়তা—প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটি—নব-শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধাবণের ভুল ধারণা—শিক্ষিকার অভাব—সহরে ও শিল্পঞ্চলে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—শৈশবের অসামঞ্জস্যতার কারণ ও তার প্রতিকার—শিশুশিক্ষায় নির্দেশনা—এদেশের শিশুশিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা—অন্যান্য দেশের শিশু শিক্ষার সাথে এদেশের শিশু শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা—অনুশীলনী—University Questions.

দ্বিতীয় অধ্যায় (ক গুচ্ছ)—প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার— ২৫৭—২৮৫

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম—প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশে শিক্ষকের স্থান—প্রাথমিক শিক্ষা পরিশাসন—অপচয় ও অনুন্নয়ন—শিক্ষানির্দেশনা অপসঙ্গতি ও তার প্রতিকার—বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক—প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও তার প্রয়োগ—সার্বজনীন, অবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অসুবিধা—বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য—বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল সমস্যা ও তার প্রতিকার—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা—অনুশীলনী—University Questions.

(খ গুচ্ছ)—বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যাও তার প্রতিকার— ২৮৬—৩০৯

গান্ধিজীর দৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ—জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট—বুনিয়াদী শিক্ষাকে

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষারূপে স্বীকৃতিদান—বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক—শিক্ষায় স্বাবলম্বন—খের-কমিটি—খেরাকমিশন—বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন সমিতি—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা—গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শ বিপ্লবাত্মক—বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি—বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি—পশ্চিমবাংলায় বুনিয়াদীশিক্ষার অগ্রগতির অভাব—বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি—বুনিয়াদী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা—বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—অনুশীলনী—University Questions.

তৃতীয় অধ্যায়—মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার—৩১০—৩৩৬

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারনার দ্রুত পরিবর্তন—মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য—মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম—মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতি—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—প্রশাসনিক দিক—পশ্চিম বাংলার সবার্থসাধক বিদ্যালয়ের অবস্থা—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আথিক সমস্যা—মাধ্যমিক শিক্ষায় সাথে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্ক—মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে উচ্চশিক্ষার সংযোগ—মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার সম্পর্ক—মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে পেশাশিক্ষার সম্পর্ক—মাধ্যমিক শিক্ষার মূল সমস্যা—মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ—এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বিদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা—অনুশীলনী—University Questions.

চতুর্থ অধ্যায়—কারিগরী বৃত্তিমুখী ও পেশাশিক্ষার সমস্যা এবং ৩৩৭—৩৭০

তার প্রতিকার—কারিগরী শিক্ষার লক্ষ্য—কারিগরী শিক্ষার পর্যায় ও সেগুলির উদ্দেশ্য—সাধারণ শিক্ষার সাথে কারিগরী শিক্ষার সম্পর্ক—কারিগরী শিক্ষার প্রশাসনিক দিক—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং কারিগরী, বৃত্তিমুখী ও পেশাশিক্ষা ব্যবস্থা—মানবশক্তি সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা—

পেশাশিক্ষার ব্যাপকতা—কারিগরীশিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা —বৃত্তিশিক্ষা—বৃত্তিশিক্ষায় মহিলাদের ঝোঁক—বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা—কারুশিল্পের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা—শ্রমিক শিক্ষা ও শিল্পের উন্নয়ন —পরিচালক প্রশিক্ষণ—কারিগরীশিক্ষার পাঠক্রম—কারিগরী শিক্ষার পদ্ধতি—কারিগরী শিক্ষার প্রসারে বাধা—প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সমস্যা—কারিগরী শিক্ষার উন্নয়নে বাধা—কারিগরী শিক্ষার আথিক দিক—বাস্তু-বিজ্ঞান শিক্ষা—চিকিৎসা বিজ্ঞান বৃত্তিশিক্ষা—আইন বৃত্তিশিক্ষা—শিক্ষকতা পেশাশিক্ষা—চারু ও কারুকলা বৃত্তি-শিক্ষা—পশুপক্ষীপালন শিক্ষা—অনুশীলনী—University Questions

পঞ্চম অধ্যায়—প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষাসমস্যা ও ৩৭১—৩৮২
তার প্রতিকার—প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গশিশু—প্রতিবন্ধের কারণ—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রতিবন্ধীশিশুর শিক্ষা—সরকারের দায়িত্ব—পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা—স্বল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সমস্যা—অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক দিক—অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থা—আংশিক অন্ধশিশুদের শিক্ষা—বধির এবং বোবাদের শিক্ষা ব্যবস্থা—প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক সমস্যা—কর্মসংস্থান সমস্যা—শিক্ষা ও পুনর্বাসন—অনুশীলনী—University Questions.

বি. দ্র. ৩৮৩ পৃষ্ঠায় শিক্ষাবিষয়ে মূল গ্রন্থগুলির (Source Books) তালিকা দেখুন।

ভারতীয়

শিক্ষা-সমস্যার গতি প্রকৃতি

প্রথম খণ্ড

[ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষার কাঠামো এবং স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এই খণ্ডে]

Calcutta University

SYLLABUS (Revised)

B. A. Education Part II

(Paper III)

Current problems in Indian Education

Group A

An out line system of education in India—Primary, Secondary and University. [এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচিত]

Problems of (1) Finance, (2) Accommodation, (3) Control & management, (4) Curricular & Co-curricular activities, (5) Teaching personnel (6) Tests & Examinations. [এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত]

Group B

Problems relating to Primary education :—

Problems of Free & Compulsory Primary education.

Basic education.

English in Primary curriculum.

Teaching Personnel, tests and examinatisons in Primary education.

Aims, methods, contents, of nursery and infant education. Necessity of infant education—importance of early years. Problems of nursery & infant education—properly trained teachers—social consciousness, attitude of parents etc. Special problems of big cities—industrial areas etc. Maladjustment and guidance. Historical development in our country and comparison with other countries, present day position, future plans.

Problems relating Secondary Education :—

Aims of Secondary Education—its nature, methods, contents—Needs of adolescence—individual difference—requirements of the country—employment opportunities. Guidance in secondary school, plan of secondary education—secondary and primary education—secondary and vocational education—secondary and higher education—upgading and diversification of higher secondary education—history—back ground—needs—comparison with other countries. Present day position—special difficulties and problems, Five year plans, future plans.

Problems relating to Technical, Vocation and professional education :—

Aims—relation with general education, individual aptitude—requirement of the country, planned economy. Co-ordination between education and employment, short history, present day position. Special problems and future plans of the following :—

(a) Technical education (b) Legal education (c) Medical education (d) Engineering education (e) Educations (f) Agriculture (g) Art and craft (h) Other vocations & professions.

Problems relating to education for handicapped :—

State responsibility. Present day position and future plans. Education and rehabititation, comparison with some other countries, special problems, methods, present position and future needs of each of the following :

(a) Mentally handicapped—deficient and retarded children (b) Blind children (c) deaf & mute children (d) cripled children (e) Other forms of handicap. [এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত]

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

এক : প্রাচীনযুগের শিক্ষা

ভারতীয় জীবনাদর্শ ও শিক্ষা—জীবনের সাথে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা তার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক বিবর্তনের সাথে। পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের চাহিদা, উপভোগ ও তার প্রতিক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষাধারার লক্ষ্য ইতিহাসের ক্রম বিবর্তনের ধারাকে লক্ষ্য করে চলেছে। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তন থেকে। দেশের সমাজ সংস্কারে দার্শনিক মতবাদের বিরাট প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর খ্যাতনামা শিক্ষাবিদেরা বড় বড় দার্শনিক। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে মানব সমাজ ও মানব জীবনের কথা বিশেষ ভাবে শিক্ষাবিদ্‌দের ভাবিয়ে তোলে। কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মধ্যে সেই দেশের দার্শনিক চিন্তাধারার বিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাবিজ্ঞানের বিবর্তন মানুষের প্রগতি ও সভ্যতার অগ্রগতির সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিজ্ঞান এদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা বহন করে এসেছে গত দু' হাজার বছর ধরে।

সামাজিক বিবর্তন ও শিক্ষা

ভারতীয় দর্শনের জীবন জিজ্ঞাসা স্বরূপে ব্যক্ত হয়েছে প্রাচীন হিন্দু-শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে। এই সময় ভারতবর্ষের ধর্ম জীবন ও সমাজ জীবনের প্রয়োজনে এক বিশিষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনতম সভ্য জাতিগুলির সমগোত্রীয় হওয়ায় ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বৈসাদৃশ্যের মাত্রাও কম নয়। তবে একথা খুবই সত্য যে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা তার নিজস্ব। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল 'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জান; আর এর পদ্ধতি ছিল 'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ও শ্রদ্ধার

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি

সাথে জীবন জিজ্ঞাসা জানবার জন্য সর্বপ্রকার সেবার দ্বারা সত্যকার শিক্ষা লাভ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে আশ্রয় করে হিন্দুযুগে এক উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এর কারণ দু'টি ; (১) আচার্যেরা ছিলেন ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ধর্মীয় কার্যাদি তাঁরাই পরিচালনা করতেন। (২) তৎকালীন শিক্ষা ছিল ধর্মাশ্রয়ী এবং রাজনীতি-নিরপেক্ষ। প্রাচীন ভারতে ভাববাদী দার্শনিকগণ জীবনের লক্ষ্য হিসেবে মোক্ষ বা মুক্তিকে সকলের উপরে স্থান দিতেন। তখন এদেশে পরা ও অপরা দু'প্রকার বিদ্যা প্রচলিত ছিল। পরা বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ হোত উন্মুক্ত ; আর অপরা বিদ্যার সাহায্যে পার্থিব ও বৈষয়িক বিষয়ের জ্ঞান হোত বলবতী। সে যুগে পার্থিব ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মুক্তি বেশী কাম্য ছিল। বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার ও টেকনিশিয়ানদের যেমন কৌলিন্য, সে যুগে ঋষি ও দার্শনিকদের তেমন সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। সেইজন্য ভারতীয় জীবনাদর্শ এদেশের শিক্ষাদর্শন তথা সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

ভারতীয় জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শন

শিক্ষাদান উন্নত ও পবিত্র বৃত্তি হিসেবে বিবেচিত হোত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতের মধ্যে শূদ্রের শিক্ষালাভের কোন অধিকার ছিল না। যদিও কর্মবিভাগ থেকে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্ভব হয়, তবুও মনুর যুগে উহা এমন কঠোর হয় যে কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা অপেক্ষা জন্মের দ্বারাই জাতকের বর্ণ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি এই শূদ্রদের দ্বারা গঠিত ছিল তাই ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ যতই উদার ও ভারতীয় জীবনের আদর্শ যতই উন্নত হোক্ না কেন, উহা গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না। এ দেশের শিক্ষাধারা আরও প্রগতিশীল হওয়া উচিত ছিল।

ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নত কিন্তু প্রগতিশীল ছিল না

হিন্দু শিক্ষাবিধি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাকে বহুদিন ধরে বহন করে চলেছেন এক উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে। হিন্দু শিক্ষাবিধি যেমন কঠোর তেমনি শ্রম ও আয়াসসাধ্য ছিল। শহর থেকে বহু দূরে আড়ম্বরশূন্য তপোবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছিল আচার্যদের আশ্রম। সেই শান্ত ও উদার পরিবেশে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সুদীর্ঘকাল ধরে বিলাস বিহীন জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। উন্নত চরিত্রগঠন ও জ্ঞান-তপস্যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য প্রস্তুত হতেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির উপনয়নের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশেষ যোগ রয়েছে। ৮ বৎসর থেকে ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে দশকর্মের দ্বিতীয় কর্ম হিসেবে

সে যুগের কর্মভিত্তিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা

হোত উপনয়ন। উপনয়নের পুর্বে শিশুর শিক্ষা প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতীয় আচার্যেরা রুশোর জন্মের বহু পুর্বেই বলে গেছেন যে শিশুশিক্ষা প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হবে। কর্মভিত্তিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা সে যুগে শিশুরা লাভ করত গৃহপরিবেশে।

সে যুগে ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন আচার্য। তাঁরা দর্শন, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র সব কিছুতেই পারদর্শিতা লাভ করতেন। দর্শন ও স্মৃতি ছাড়া অন্যান্য বিদ্যা আচার্যেরা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বৃত্তি হিসেবে আচার্যের কাজ ছাড়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করতেন না। এরা একাধারে ছিলেন শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক বড়ই মধুর ছিল। শূদ্রদের জন্যে বেদপাঠ নিষিদ্ধ ছিল, তাই শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদের আশ্রমে অধিবাসী হয়ে কোন প্রকার বিদ্যা অর্জন করতে পারত না।

আচার্য

বেদই ছিল মূল পাঠক্রম। পরে অবশ্য অনেক বিদ্যা পাঠক্রমে যুক্ত হয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষার পরিবেশ জাতি হিসাবে বিভিন্ন ছিল। পরবর্তী যুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের অনেকে সজাতির বৃত্তি শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে আচার্যের পদে অভিষিক্ত হন। পাঠক্রমে পরা ও অপরা দুই প্রকার বিদ্যারই স্থান ছিল। অপরা বিদ্যার শিক্ষা-ব্যবস্থায় হাতেকলমে শিক্ষার বিশেষ মূল্য ছিল। আর পরা বিদ্যার উৎকর্ষ বিচার হোত শিক্ষার্থীর পাণ্ডিত্য ও বিচার ক্ষমতার দ্বারা।

পাঠক্রম

তৎকালে গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১২ বৎসর ধরে বিদ্যা অর্জন করতে হোত। তখন কোন রূপ সাধারণ পরীক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল না। আচার্য প্রত্যেকটি শিষ্যের প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন নিতেন। শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সমাপ্তির পর অধীত বিষয়ের প্রয়োগেও শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি তাকে সংসারে প্রবেশ করবার অনুমতি দিতেন। সে যুগে পরিষদ বা সভার সম্মুখে তর্কযুদ্ধে পারদর্শিতা দেখানো বা কোন কৌশলের কৃতিত্ব-প্রদর্শন শিক্ষা-সমাপ্তির প্রথা রূপে প্রচলিত ছিল।

পরীক্ষা-ব্যবস্থা

শিক্ষক-শিক্ষণের পৃথক কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না; কারণ গুরুগৃহে শিক্ষালাভের সময় বয়স্ক শিষ্যেরা অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। এ কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবার জন্য অনেক সময় তাকে আচার্যের নিকট শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করতে হোত।

শিক্ষক-শিক্ষণ

হিন্দুযুগে সাধারণ [illegible] জন্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু ছিল। লেখার প্রচলন হবার পরই এই সমস্ত পাঠশালার জন্ম হয়। গ্রামের দেব-

মন্দিরে বা গ্রাম্য মোড়লের চণ্ডীমণ্ডপেই পাঠশালা বসত। গ্রাম্য পণ্ডিত ছিলেন পাঠশালার গুরুমহাশয়। আচণ্ডাল সমস্ত গ্রামবাসীর ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া ও গণিত-শিক্ষার সুযোগ পেত।

প্রাথমিক শিক্ষা

সে যুগে মাধ্যমিক শিক্ষার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, কারণ পল্লীকেন্দ্রিক সভ্যতায় গ্রামের বৃত্তি অবলম্বনের জন্য পাঠশালার বিদ্যাই যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া তখন মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয় নি। টোলে, পরিষদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রচলন ছিল। দর্শন, স্মৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা ও প্রয়োগবিদ্যা অতি উচ্চস্তরের ছিল। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা বিশেষ উন্নত ছিল। পরবর্তী যুগে ধাতুবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা (শল্যচিকিৎসাসহ) বিশেষ উন্নত হয়। পাঠক্রম, পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও ডিগ্রীর প্রভাব শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তখনও পুঁথিগত করে তুলতে পারেনি। জীবনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষাই সে যুগের শিক্ষাদর্শকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল।

উচ্চশিক্ষা

তৎকালে শিক্ষা-ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপের তেমন কোন নজির পাওয়া যায় না। অনেক সময় পরিষদের সভায় পণ্ডিতমণ্ডলী উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম নির্ণয় করতেন। বিস্তৃত পাঠ্যসূচী প্রণয়ণ ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় উহার সুষ্ঠু প্রয়োগের দায়িত্বও ছিল আচার্যের উপর।

পাঠক্রম নির্ণয়

এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় অন্তর্জাত ও বহির্জাত শৃঙ্খলার সুষ্ঠু সমন্বয় দেখা যায়। জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়। শিক্ষার্থীরা স্বীয় শ্রমের দ্বারা আশ্রমের বহু কর্ম সম্পাদন করতেন। তবে আশ্রমের ব্যয়ভার বহন করতেন রাজন্যবর্গ ও শাসকসম্প্রদায়। সমাজের প্রয়োজনকেই বড় করে দেখা হয়েছিল এই শিক্ষা-ব্যবস্থায়; তাই প্রজাদের শিক্ষার দায়িত্ব পরোক্ষভাবে রাজন্যবর্গ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে ছিলেন। দাবী জানিয়ে আচার্যদের উহা আদায় করতে হয়নি। পাপপুণ্যের ধারণা তখন খুবই প্রবল ছিল। সে যুগে অন্নদান বা বস্ত্রদান অপেক্ষা জ্ঞানদান অনেক উন্নত পর্যায়ের সমাজসেবা বলে বিবেচিত হোত। শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব খুব বেশী ছিল না। শিক্ষাদানের জন্য গুরু কোন দক্ষিণা গ্রহণ করতেন না। তবে শিক্ষা-সমাপ্তির পর সাধ্যমত গুরুদক্ষিণা দেওয়ার প্রথা চালু ছিল।

শিক্ষার ব্যয়ভার

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গুণ ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের টিউটোরিয়াল ব্যবস্থার যে গুণগান করা হয় সেরূপ ব্যবস্থা তপোবনের যুগে গুরুগৃহেও ছিল। তৎকালে

কর্মযোগের মধ্য দিয়েই জ্ঞানযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হোত। আদর্শ পণ্ডিত হিসেবে যারা গুরুগৃহ থেকে বেরিয়ে আসতেন তাঁরা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করার যোগ্যতা নিয়ে আসতেন। অধ্যাপনায় বা রাজকার্যে তাঁরা বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহুমুখী পাঠক্রমের প্রচলন ছিল। শিক্ষার্থী স্বীয় প্রয়োজন ও রুচিমত পাঠ্য বিষয় বেছে নিতে পারতেন। বৈদিকযুগে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

হিন্দুশিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

প্রথমে বেদ শুধু ব্রাহ্মণদের পাঠ্য ছিল। পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানদের জন্য বেদের শিক্ষা সংক্ষিপ্ত করে নানাবিধ বৃত্তির উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এই বিদ্যাগুলির মধ্যে আয়ুর্বেদ, ধাতুবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাচীন হিন্দু শিক্ষার পাঠক্রমে যুক্ত হয়ে হিন্দু-শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপটি ব্যক্ত হয়েছে।

বৌদ্ধ-যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা—ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অবনতির সুযোগ নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হোতে থাকে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা থেকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে নানা দুর্নীতি দেখা দেয়। জীবনের গভীর আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন ত্যাগী ও যোগী ঋষিদের জন্যে রেখে সাধারণ নিয়ম-নীতির গণ্ডির মধ্যে ধর্মকর্মকে সীমিত করে রাখতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম জনমতের সমর্থন হারায়। ক্ষত্রিয় সন্তান বুদ্ধদেব ও তাঁর অনুগামী শ্রমণগণ বৌদ্ধ-ধর্মের মূলতত্ত্ব ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম থেকে গ্রহণ করলেও আত্মার কল্যাণের জন্য তাঁরা অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সাধনমার্গের যে পথ তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তা অভিনব। শ্রমণদের ধর্মাচরণ বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজন থেকে বৌদ্ধ-শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ ছিলেন বিহার বা মঠবাসী।

বৌদ্ধ-শিক্ষার আদর্শ

গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁরা শ্রমণ পর্যায়ভুক্ত হোতে পারতেন। এঁরা চির কৌমার্যব্রত মঠেই পালন করতেন। শ্রমণীদের বেলাতেও সন্ন্যাসগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। শ্রমণদের ধর্মাচরণ, শিক্ষাপদ্ধতি ও মঠবাসের নিয়মকানুন শিক্ষা এবং ঐগুলি পালনের রীতিকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে হীনযান ও মহাযান দু'টি মতবাদের সৃষ্টি হয়। যারা হীনযানপন্থী তারা বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার সঙ্গে লৌকিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার ইতিহাস থেকে বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা ও ন্যায়শাস্ত্রের খুব উন্নতি এ যুগে হয়েছিল। লৌকিক শিক্ষাদানের জন্য শ্রমণগণ পল্লীতে উপনীত হোতেন। ভিক্ষুগণ গ্রাম্য বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। অনেক

সময় মঠের নিকটবর্তী অঞ্চলের গৃহীরা মঠে এসে নানা শাস্ত্রজ্ঞান ও লৌকিক বিদ্যা শিক্ষা করে পুনরায় গৃহাশ্রমে ফিরে যেতেন। বিক্রমশিলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধ-শিক্ষা-ব্যবস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন। মঠে বসবাসকারী শ্রমণদের মধ্যে এই যে মিশনারী (Missionary) মনোভাবের সৃষ্টি, তা সে যুগের ভিক্ষুদের মধ্যে সমাজ-সেবার প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিল। জনসাধারণ ও রাজা-মহারাজাদের দানের উপর ভিত্তি করেই এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হোত। তবে মঠবাসী শ্রমণদের জীবনও ছিল নিরলস, কর্তব্যনিষ্ঠ ও বিলাসিতা বিহীন।

বৌদ্ধ-শিক্ষা-ব্যবস্থার নিদর্শন

নাবালকেরা সাধারণতঃ মঠে ভর্তি হোতে পারত না। মাতাপিতার অনুমতিক্রমে তাদের মঠে স্থান দেওয়া হোত। গৃহীদের জন্যে বুদ্ধদেব অনেকগুলি নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অষ্টাঙ্গিক মার্গে আরোহণ করবার জন্য মঠে শ্রমণ জীবনই ছিল প্রশস্ত। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ভারতবর্ষে হাজার হাজার বিহার ও মঠ গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে এদের মধ্যে অনেকগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্ররূপে কাজ করে। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য পৃথক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। আর শূদ্রদের জন্য কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার বর্ণ বিভাগ তুলে দেওয়া হয়। বৌদ্ধ সংঘারামে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই শ্রমণ হিসেবে প্রবেশ করতে পারত। অবশ্য দ্বারপণ্ডিতদের কাছে পরীক্ষা দিয়ে শ্রমণ হবার যোগ্যতা লাভ করতে হোত। সংঘারামে প্রবেশ করবার সময় কেশ ও শ্মশ্রু-গুম্ফ মুণ্ডন বাধ্যতামুলক ছিল। তারপর পীতবর্ণের উত্তরীয় পরিধান করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর শ্রমণ পর্যায়ভুক্ত হওয়া যেত। সংক্রামক রোগীকে সংঘারামে গ্রহণ করা হোত না। ৮ বৎসর বয়সের পুর্বে কোন শিক্ষার্থী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারত না। শ্রমণ জীবনের পুর্ণতা লাভের পর শিক্ষার্থী ভিক্ষু হোতে পারতেন। তখন তাদের উপসম্পদা বলা হোত। সাধারণত ২০ বৎসর বয়সের পুর্বে কেহ উপসম্পদা হোতে পারতেন না। দশবৎসর উপসম্পদা হিসেবে থাকবার পর শিক্ষার্থী উপাধ্যায় হোতে পারতেন। মঠাশ্রয়ী শ্রমণদের নিম্নলিখিত পাঁচটি শীলের অনুসরণ করতে হোত।

বৌদ্ধ মঠের শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রা

(১) অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ বর্জনীয়।
(২) প্রাণাতিপাত করা অধর্ম আচরণ।
(৩) মিথ্যাকথা বলা অপরাধ।
(৪) মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ।
(৫) ব্রহ্মচর্য আজীবন পালনীয়।

ভিক্ষুদের বেলাতে আরও অতিরিক্ত পাঁচটি শীলের আচরণ অবশ্য করণীয়

ছিল। এগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিরলস, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সরল জীবন যাপন। উপাধ্যায়গণ আরও ১২টি অনুজ্ঞা পালন করতেন। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রুতি ও লিখন দু'প্রকার ব্যবস্থা চালু থাকলেও প্রকৃত পক্ষে নিজের জীবনসাধনা দিয়ে পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করতে হোত।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক বড়ই মধুর ছিল। শিক্ষার্থী গুরুর আজ্ঞাধীন ছিলেন কিন্তু গুরু কোন অন্যায় করলে মঠাধ্যক্ষকে শিষ্য জানাতে পারতেন এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করতে পারতেন। শ্রমণেরা শাস্তি হ্রাসের জন্য আবেদন করতে পারতেন। অসুখের সময় উভয়ে উভয়ের শুশ্রূষা করতেন। তাছাড়া সাধারণভাবে শিক্ষার্থী গুরুর সেবাযত্ন করতেন।

গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক

হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষার বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য—বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক কতকগুলি পার্থক্য রয়ে গেছে। হিন্দুদের চতুরাশ্রম ধর্ম পালনের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাধনা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের মধ্য দিয়ে যে সুসংবদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শ ও পদ্ধতি তার চাইতে অনেকটা আলাদা। মঠে বসবাস করে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনাই বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার আদর্শ। বৌদ্ধ-দর্শনের সাথে হিন্দু-দর্শন পাঠও মঠের পাঠক্রমে স্থানলাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য পৃথক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। শূদ্রদের জন্য কোন প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। লোকশিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে তাদের মধ্যে জীবনবোধ আসত। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার বর্ণবিভাগ তুলে দেওয়া হয়। বৌদ্ধ সংঘারামে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই শ্রমণ হিসেবে মঠে প্রবেশ করতে পারতেন। অবশ্য দ্বারপণ্ডিতের কাছে পরীক্ষা দিয়ে শ্রমণ হবার যোগ্যতা লাভ বাধ্যতামূলক ছিল। এখানে আধুনিক যুগে বুদ্ধিপরীক্ষা ও অধীত বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষার পর বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির যে ব্যবস্থা আছে তার সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষালয়ে ভর্তি-ব্যবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বৈসাদৃশ্য

হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। সে যুগে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের মধ্যে পরাবিদ্যার প্রতি আগ্রহ বেশী ছিল। হিন্দু যুগে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে পরকালের জন্য জীবনের প্রস্তুতিকেই শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষা বলে মনে করতেন। জাগতিক জীবন যাপনের জন্য নানাবিধ বৃত্তি-শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হলেও মঠের ভিক্ষু ও আশ্রমের ঋষিগণ ধর্মজ্ঞান লাভ ও ধর্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করার দিকে বেশী আগ্রহী

সাদৃশ্য

ছিলেন। শিক্ষালাভের পর উন্নত ভিক্ষু-জীবন বা আশ্রম-জীবন আশ্রয় করা অনেকেরই কাম্য ছিল। অবশ্য অনেকে ব্যবহারিক বিদ্যালাভ করে নানাপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন করতেন। বৌদ্ধযুগে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা যে অনেক উন্নত হয়েছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মিশনারী শিক্ষার যে আদর্শ পাশ্চাত্য মিশনারীরা এদেশে স্থাপন করেছে তার চেয়ে অনেকাংশে উন্নত মিশনারী শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৌদ্ধযুগে। আবাসিক বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা বৌদ্ধ বিহারগুলি শিক্ষার্থীদের দিত, কিন্তু এই সমস্ত বিহার থেকে উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, অবশ্য কিছু-সংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে রাজকার্য গ্রহণ করতেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে লোকশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। সেজন্য দেশের অধিকাংশ লোকের আক্ষরিক জ্ঞান না থাকলেও সর্বস্তরের অধিবাসীদের মধ্যে উন্নত নৈতিকচরিত্র, মানবতাবোধ ও ধর্মভাব বিদ্যমান ছিল। যাঁরা বলেন, ইংরেজ আমলের পুর্বে এ দেশ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তাঁরা এদেশের খাঁটি খবর রাখেন না। বৌদ্ধযুগে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন এ দেশে হয়ত ইংল্যাণ্ড বা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মত আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বেশী ছিল না, তাই বলে শিক্ষার প্রসার বেশী ছিল না, একথা বলা চলে না।

লোকশিক্ষা

সার্বজনীন শিক্ষার ধারণা এ যুগেই মূর্ত হয়ে ওঠে বৌদ্ধ শ্রমণদের কর্তব্য-নিষ্ঠ ধর্মপ্রচারের মধ্যে। নৈতিক চরিত্র গঠনে ধর্মবোধ জাগরিত করাই সার্বজনীন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সে যুগে ব্রহ্মচর্যব্রত-পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নৈতিক জীবন বিশেষ উন্নত হোত। বৌদ্ধযুগে যে সমস্ত গৃহবাসী বিহারে এসে শিক্ষালাভ করে আবার গৃহে ফিরে যেতেন তাঁরাও শ্রমণদের উন্নত চরিত্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হতেন। ধর্মকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হোত বলে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থা ধর্মাশ্রয়ী হলেও জীবনের বৃহত্তর ও মহত্তর রূপটি শিক্ষার মধ্যে পরিগ্রহ করেছিল।

সার্বজনীন শিক্ষার ধারণা

প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে নালন্দা, বিক্রমশিলা ও তক্ষশীলার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কাশী, নবদ্বীপ ইত্যাদি শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং এই উচ্চশিক্ষা মূলতঃ দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি শাস্ত্রকে আশ্রয় করে জ্ঞানমার্গের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। এই শিক্ষা ছিল ধর্মাশ্রিত। ধর্মের সংজ্ঞা ছিল ব্যাপক। ধৃ+মন্=ধর্ম অর্থাৎ যা আমাদের জীবনকে ধারণ করে আছে তাহাই ধর্ম। ধর্মের এই ব্যাপক ধারণা থেকেই সত্যকার জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছিল এই সার্বজনীন শিক্ষার মধ্যে।

দুই : মধ্যযুগের শিক্ষা

ইসলামীয় শিক্ষা—ইসলামীয় শিক্ষা ভারতবর্ষে বেশী প্রসার লাভ করতে পারেনি। মুসলমান সম্রাট্‌ ও শাসকগণ ইসলামীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু উন্নত হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে অসমর্থ হওয়াতে ইসলামীয় শিক্ষা ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে উদার মানবতার ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারেনি। মুসলিম জনসাধারণের বেশীর ভাগ গরীব। চাষকার্য তাদের উপজীবিকা; আবার এদের অনেকেই ধর্মান্তরিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। মক্তবের শিক্ষাই বেশীর ভাগ মুসলমান সন্তানদের পক্ষে সম্ভব ছিল। অল্প কিছুসংখ্যক উচ্চবর্ণের মুসলমান ও কিছুসংখ্যক হিন্দু মাদ্রাসায় ভর্তি হোত। আরবী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করে রাজকার্যে যোগদান করাই ছিল হিন্দু শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসায় ভর্তি হবার মূল কারণ।

মুসলিম শিক্ষার তাগিদ

মক্তবের মূল পাঠ্য বিষয় ছিল কোরান মুখস্থ করা। মাতৃভাষা শিক্ষা ও সামান্য অঙ্কের জ্ঞান এর সাথে যুক্ত ছিল। মাদ্রাসাতে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কোরানের ও নানা ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা ছিল মূল পাঠ্যবিষয়। কালক্রমে দর্শনের সূক্ষ্মবিচার ও ব্যাকরণের কচকচি মাদ্রাসার পাঠক্রমে বিশেষ স্থান লাভ করে। এখানে হিন্দুপণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত টোলের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাব দেখা যায় মাদ্রাসার উপর।

মক্তব ও মাদ্রাসা

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে অনেকগুলি মিল দেখা যায়। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো এদেশেই গড়ে উঠে; তাই হিন্দুশিক্ষার অনুকরণে সাধারণের শিক্ষার জন্য মক্তব এবং মেধাবী ছাত্র ও মোল্লামৌলভীদের জন্য মাদ্রাসার শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষা দেওয়া হোত। হিন্দুদেরও ঠিক এই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। সাধারণের জন্য পাঠশালা আর উচ্চশিক্ষার জন্য টোল। উভয় শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই মাধ্যমিক শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। শিক্ষাপ্রক্রিয়া ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রায় একই প্রকার ছিল। মুসলিম শিক্ষায় গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হিন্দু-শিক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষার সাদৃশ্য

ইসলামীয় শিক্ষার বিশেষ কোন ক্রমবিবর্তন নেই। অত্যন্ত ধর্মকেন্দ্রিক ও অনুদার দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়াতে বিরাট ভারতবর্ষের জনসাধারণ বা পণ্ডিতদের কাছে এর আবেদন তেমনভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে নি। সম্রাট্‌ ও শাসকগণের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার উপর দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর করত। কাজেই সম্রাট ও শাসকবর্গের উত্থানপতনের সাথে শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এক কথায় বলা যায় মুসলমান আমলে শিক্ষার ক্রমোন্নতির কোন স্থিরতা ছিল না।

ইসলামীয় শিক্ষার বিবর্তনের অভাব

তবে অধিকাংশ মুসলমান সম্রাটের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি আগ্রহ ছিল।

ইসলামীয় শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ছিল মসজিদ সংলগ্ন। হিন্দুপণ্ডিতদের মত মুসলমান মৌলভীরা মক্তব ও মাদ্রাসা নিজেরাই পরিচালনা করতেন। কোথাও ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। সম্রাট্ ও বদান্য ধনী ব্যক্তিদের নিকট মৌলবীরা সাহায্যের জন্য আবেদন করতেন। অনেক নাম-করা মাদ্রাসার জন্য রাজকোষ থেকে অর্থসাহায্য করা হোত। দীর্ঘ ১০০০ বৎসরের মুসলিম রাজত্বে ভারতবর্ষে অনেকগুলি মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে দিল্লী, আগ্রা, জৌনপুর, আলিগড় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইসলামীয় শিক্ষার কেন্দ্র

মুসলমান সম্রাট্গণ শিল্পচাতুর্য, চারুকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিশেষ সমাদর করতেন। এই সময় ভারতবর্ষে মুসলিম কৃষ্টি, শিল্প-কলা ও সঙ্গীত সাধনা বিশেষ-ভাবে মূর্ত হয়ে উঠে। এ যুগে হিন্দু সঙ্গীত, শিল্প-সাহিত্য ও চারুকলারও বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাসমূহের সৃষ্টি ও উহাদের উন্নয়ন। মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্পকলা, নৃত্য বা সঙ্গীতের তেমন কোন স্থান না থাকলেও মুসলমান আমলে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মূল্যবান অঙ্গ হিসেবে মুসলিম শিল্পকলা ও সঙ্গীতের চরম উন্নতি হয়েছিল এই সময়। এছাড়া মুসলমান সম্রাট্ ও শাসনকর্তাগণ সাহিত্যের খুবই অনুরাগী ছিলেন। বাংলা, উর্দু, গুজরাটী, হিন্দী, ফারসী ইত্যাদি সাহিত্যের বিশেষ প্রসার ও উন্নতি এ যুগের শিক্ষার ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য।

মুসলিম শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

ধ্বংস প্রায় হিন্দু ও বৌদ্ধশিক্ষা—(মুসলিম যুগের শেষদিকে ইংরেজ আমলের প্রাক্কালে) ইসলামীয় শিক্ষার পাশাপাশি হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমান সুলতানদের রাজত্বকালে হিন্দু-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থা বৌদ্ধ-ধর্মের দ্রুত পতনের ফলে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। হিন্দু পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ শিক্ষার উন্নত দিকগুলিকে হিন্দু-শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করে নেন। পালি ভাষার পর দেশের সর্বত্র প্রাকৃত ভাষা গড়ে উঠে। এই প্রাকৃতের জননী সংস্কৃতভাষা। তবে পালি ভাষার প্রভাব প্রাকৃত ভাষাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা ক্রমেই মূল প্রাকৃত থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হতে থাকে। তারপর এক এক অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষাকে অবলম্বন করে আঞ্চলিক ভাষা যেমন বাংলা, হিন্দী, আসামী, উড়িয়া ইত্যাদি ভাষা গড়ে ওঠে। মুসলমান আমলে আরবী ও ফারসীভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ আদৃত হয়। রাষ্ট্রীয় ভাষা বলে হিন্দু পণ্ডিতেরা অনেকে আরবী ও ফারসীভাষা শিক্ষা করে পাণ্ডিত্য

লাভ করেন। আবার জ্ঞানান্বেষণের প্রত্যাশায় অনেক মৌলভী সংস্কৃত পাঠ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দিল্লী অঞ্চলে আরবী ও হিন্দী ভাষার মিলনে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। মুসলিম শিক্ষা হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও মুসলিম যুগে হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নত রূপটি নষ্ট হয়ে যায়। হিন্দু-ধর্মের মধ্যে গোঁড়ামি দেখা দেয় এবং হিন্দুদের উচ্চশিক্ষা দর্শন ও তর্কবিদ্যার তর্কজালে আবদ্ধ হয়। তবে গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে একইভাবে চলে এসেছে। হিন্দুদের পাঠশালা ও মুসলমানদের মক্তবের শিক্ষার মধ্যে বেশ মিল ছিল। কিন্তু কোরান পাঠ মক্তবে যেমন অবশ্য-পাঠ্য ছিল, হিন্দুদের পাঠশালায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ আবশ্যিক ছিল না; তবে পণ্ডিতেরা গল্পচ্ছলে কথক ঠাকুরদের মত ধর্ম-জীবনের সাধারণ শিক্ষা পাঠশালায় দিয়ে দিতেন।

আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছুটা সংস্কার সাধন করা হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থায় হিন্দুরা শিক্ষার্থীর স্থান দিয়েছিলেন শুধু গ্রাহকের মত, কিন্তু আকবরের রাজত্বে ছাত্রেরা যাতে নিজেরা পড়ে তাদের পাঠ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সেদিকে পণ্ডিত ও মৌলভীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষার ধারণা যে সে যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের না ছিল তা নয়।

মুসলিম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি কখনও উন্নত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেনি। আবার ঐগুলির স্থায়িত্বেরও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। তাই ক্ষয়িষ্ণু হলেও হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থা মুসলমান আমলেও বেশ চালু ছিল।

দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা—এই উভয় শিক্ষার স্থান ছিল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই দুই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোন রকম সম্বন্ধ ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল মধ্যবিত্ত ও কর্মচারী সম্প্রদায়ের জন্য। আর উচ্চশিক্ষা ছিল ব্রাহ্মণ, মৌলভী প্রভৃতি উচ্চকোটির লোকদের জন্য। এঁদের বৃত্তি ছিল টোলের পণ্ডিতি বা মাদ্রাসার মৌলভীগিরি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারী চাকুরি করতেন। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েরা গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখত। তারা প্রায়ই সাধারণের বিদ্যালয়ে যেত না। চাষী ও মজুর শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় বা মক্তবে ভর্তি হত না। অপর সকল জাতির ছেলেমেয়েরা পাঠশালায় অধ্যয়ন করত। দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারও ছিল খুব বেশী, তবে শিক্ষার মান ছিল নিম্নগামী।

এডাম সাহেবের স্বীকারোক্তি

কোম্পানী আমলের গোড়ার দিকে এডাম সাহেব তাঁর রিপোর্টে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি করবার জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর মতে এ দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই আছে এ দেশের অধিবাসীদের উন্নতির উপায়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেখানে যেখানে গলদ, সেখানে সংশোধন করে নিলে দেশীয়

শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারাই দেশের কল্যাণ সাধন সম্ভব। আমার মনে হয় এডাম সাহেবের মন্তব্য ও সুপারিশগুলি কাল-উপযোগী ছিল। ঐ সুপারিশগুলির মধ্যে দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের কথা ছিল। গ্রামে ভরা ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এডামের এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা উচিত ছিল, কিন্তু মেকলে সাহেব পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে একদেশদর্শীর মত পোষণ করতেন। এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিষয় কিছু ভাল করে না জেনেই দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করলেন। এর পর এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পাশ্চাত্য আদর্শে গড়ে উঠলো।

তিন : আধুনিক শিক্ষার গোড়ার কথা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থা—পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতেই দেশের শাসনভার চলে যায়।

কোম্পানি আমলের গোড়ার দিকে শিক্ষা-ব্যবস্থা

ইংরেজ বণিকেরা শাসন কার্যে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তার কারণ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নির্দেশ ও উপদেশ এ বিষয়ে বেশ কার্যকরী ছিল। বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজের নিজের দেশেই শিক্ষা বিষয়টি সরকারের কার্যাবলীর আওতায় ছিল না। তাই এ দেশেও বিদেশী প্রজাদের শিক্ষার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করতে চায় নি। দেশবাসীর হাতেই শিক্ষার দায়িত্ব ছিল। অবশ্য কোম্পানি তার কর্মচারীদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করতে ত্রুটি করেন নি।

এই সময় ইউরোপীয় বণিকদের সাথে ইউরোপীয় মিশনারীদের এদেশে আগমন হয়েছিল। মিশনারীরা এদের বিভিন্ন কলোনীতে চ্যারিটি স্কুল স্থাপন

মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা

করে শিক্ষা প্রসারের নামে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। মিশনারীদের এই প্রচেষ্টা কোম্পানির রাজত্বের মূলে কুঠারাঘাত করবে বলে কোম্পানি মিশনারীদের এই শিক্ষা তথা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকার্যের বিরোধিতা করেন।

১৭৭৩ খ্রীঃ নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে এদেশে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত

বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা

হয়। এখানে ইংলণ্ডের আইন অনুসারে বিচার হোতে থাকে। এতে ভারতবাসীদের মধ্যে বেশ অসন্তোষ দেখা দেয়। ইংরেজ বিচারকগণ এদেশের আইন সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। হিন্দু আইন ও মুসলমান আইন সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্য যথাক্রমে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।

অপর পক্ষে মিশনারীরা প্রাথমিক ও কোন কোন স্থলে নিম্নমাধ্যমিক

বিদ্যালয় স্থাপন করে এ দেশের নিম্নবর্ণের মধ্যে শিক্ষা প্রসার ও ধর্ম প্রচার—এই দুই কাজ একসঙ্গেই করতে লাগলো। মিশনারীরা শিক্ষার সাথে অনেক সমাজ কল্যাণকর কার্যেও হাত দিলেন। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ও মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হোল। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হোল সুদূরপ্রসারী। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিশনারীদের এই সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। কোম্পানি এতে প্রমাদ গণলো। কোম্পানি পরোক্ষভাবে মিশনারীদের কার্যকলাপের বিরোধিতা করতে লাগলো। ধর্ম সম্বন্ধে কোম্পানিকে খুবই নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করতে হোল। ঐতিহাসিকদের বিচারে এদেশে ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে মিশনারীদের চেষ্টা অগ্রগামী হলেও উহার মুল্যমান খুবই নগণ্য।

মিশনারীদের চেষ্টায় শিক্ষার প্রসার

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারা ইংলণ্ডের শিক্ষাধারার পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষার আন্দোলন দেখা দেয় এবং সরকারকে বাধ্য হয়ে ঐ শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ভারতবর্ষে। মিশনারীগণ ও পার্লামেণ্টের সদস্যগণ কোম্পানিকে ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করে। মিশনারীদের কার্যকলাপকে উৎসাহিত করা হয়। ইংরেজ সন্তানদের শিক্ষার জন্য যে সময় পার্লামেণ্টে গ্র্যাণ্ট স্বীকৃত হয়, সে সময় কোম্পানির নূতন চার্টার (১৮১৩ খৃঃ) এ্যাক্ট পাস হয়। যাঁরা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে বাক্‌বিতণ্ডা করেছিলেন, চার্লস গ্রাণ্টের নাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে ইংরেজ সরকারের উচিত ভারতবাসীদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে ভারতবাসীকে জ্ঞানের পথে নিয়ে আসা।

ভারতবর্ষের শিক্ষা-ধারায় ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাব

১৮১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কোম্পানি এদেশে শিক্ষা বিস্তার বা শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কিছুই করেন নাই। কোম্পানির কতিপয় প্রধান ব্যক্তি এদেশে প্রাচ্য বিদ্যা প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। এঁরা প্রাচ্য বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এঁদের মতে কোম্পানি যদি দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষাখাতে কিছু খরচ করতে চায়, তবে এ দেশের শাস্ত্র ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য উহা বরাদ্দ করা উচিত।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষ

বেণ্টিঙ্কের শিক্ষানীতি—সরকারপক্ষ যখন তাঁদের শিক্ষানীতি ঠিক করতে পারছিলেন না, তখন লর্ড মেকলে ভারত সরকারের আইন-উপদেষ্টা হয়ে এলেন। এ দেশের শিক্ষা সম্পর্কে মেকলের কোন ধারণা ছিল না।

তিনি তদানীন্তন বড়লাট বেণ্টিঙ্কের কাছে শিক্ষানীতি বিষয়ে দীর্ঘ মন্তব্য পাঠালেন। বেণ্টিঙ্ক সাহেব উহাকেই এ দেশের শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণ করলেন। ভারতবাসীর ভাগ্য কয়েক শতাব্দীর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। আজ আমরা ভারতবর্ষে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-নীতি দেখতে পাচ্ছি তা লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলের শিক্ষা-নীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল।

শিক্ষানীতি প্রবর্তনে মেকলের মন্তব্য

এ দেশে শিক্ষাবিষয়ে পরিস্রুতি নীতি (Filtration theory) দৃঢ়ভাবে বহাল থেকে গেল। ইংরেজী সরকারী ভাষা এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হোল। সরকারী অর্থে এ দেশে ইউরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রসার হতে লাগলো। প্রাচ্য ভাষা ও শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা হোল।

পরিস্রুতি নীতি

এর পর অব্যাহত গতিতে এই নব-নীতির শিক্ষাধারা চলতে থাকে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৮৩৫ থেকে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারী তহবিল থেকে যে পরিমাণ অর্থ শিক্ষা খাতে খরচ করবার কথা ছিল, তার বেশীর ভাগ অর্থ খরচ হয়েছে জেলা স্কুল পরিচালনা বা কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায়। প্রাচ্য শিক্ষার জন্য অতি সামান্য অর্থ ব্যয় হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার অর্থকরী দিকটা দেশবাসীর কাছে সহজেই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও কলেজে শিক্ষালাভের জন্য প্রচুর আগ্রহ দেখা দিল। সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্রদের স্থানের সংকুলান না হওয়াতে দেশের জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের অর্থসাহায্যে বহু বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হোল। এই সময় স্ত্রী-শিক্ষারও দ্রুত প্রসার হোতে লাগল।

কোম্পানির পৃষ্ঠ-পোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থা

তখন কোন শিক্ষা-দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কোম্পানির ডিরেক্টরগণের নির্দেশে নব্য শিক্ষাধারা চলতে লাগল।

বৃটিশ আমলের শিক্ষা পরিকল্পনা—উডের ডেসপ্যাচ্‌— ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাসে উডের ডেস্‌প্যাচ এক যুগান্তরকারী দলিল। ইতিপূর্বে শিক্ষার আদর্শ, শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষার মাধ্যম ও শিক্ষার পাঠক্রম নিয়ে নানা বিতর্ক ও মতামত সৃষ্টি হয়েছিল। একশত বৎসর কোম্পানির রাজত্বে এ দেশে শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি বা প্রসার হয়নি বরং সরকারী অবহেলা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের অর্থ সাহায্যের অক্ষমতার জন্য দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার খুবই অভাব ছিল। এদেশে প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এ দেশে চালু ছিল না। তাছাড়া

কোম্পানি আমলে শিক্ষা-ব্যবস্থার অনগ্রসরতা

বহুদিন মুসলমানগণ শাসনে থাকবার ফলে এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং হিন্দুর সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনা শ্লথ হয়ে পড়ে। দেশ অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে যায় এবং এই সুযোগে নানা প্রকার কুসংস্কার সমাজদেহে দুষ্ট ক্ষতের মত বিষক্রিয়ার সঞ্চার করে।

১৮৫৩ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে সনদ পুনরায় অনুমোদন করবার জন্য আবেদন করে। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয় এবং সেই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড এক সুদীর্ঘ শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ভারতে পাঠিয়ে দেন কোম্পানির মুল শাসনকর্তা গভর্ণর জেনারেলের কাছে। উডের ডেসপ্যাচকে অনেকে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ম্যাগ্না কার্টা (Magna Charta) বলে থাকেন। এটা অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই তবে এই ডেসপ্যাচে সর্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীণ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য যুগের পরিবর্তনে বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার যে বিস্তৃত ও সর্বাত্মক রূপের পরিকল্পনা প্ল্যানিং কমিশন করেছেন, তার সবকিছু এতে নেই এবং থাকাও সম্ভব নয়, তবে শিক্ষা-পরিকল্পনার মুল কাঠামো হিসেবে উডের ডেসপ্যাচের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশী।

উড ডেসপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার ম্যাগ্না কার্টা

আধুনিক শিক্ষাপরিকল্পনার **সাতটি দিকই** উড্ সাহেব বিবেচনা করেছেন।

(১) শিক্ষা পরিশাসন—ডেস্প্যাচে বলা হয়েছে যে কোম্পানি-শাসিত প্রত্যেক প্রদেশে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্র্যাকশনের নেতৃত্বে একটি করে শিক্ষাদপ্তর খোলা হবে। পরিদর্শন কর্মচারী ও সহকারী কর্মচারীবৃন্দের সহায়তায় ডিরেক্টর শিক্ষা-দপ্তরের কার্য পরিচালনা করবেন এবং প্রতি বৎসর শিক্ষার অগ্রগতির উপর রিপোর্ট দাখিল করবেন।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা—ডেস্প্যাচের মতে দরিদ্র ও অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে বেসরকারী প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী গণ-শিক্ষা প্রবর্তন অসম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষা তথা বিরাট গণ-শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। দেশীয় বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিধান করে ও যোগ্য ছাত্রদের সরকারী বৃত্তি দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা—দেশব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের সুযোগ দিয়ে সরকার গ্রাণ্ট-ইন-এড্ (Grant-in-aid) ব্যবস্থার মারফত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। গ্রাণ্ট পাবার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়কে কয়েকটি সর্ত পালন করতে হবে। সর্তগুলির মধ্যে

(ক) শিক্ষা-ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষতা, (খ) উপযুক্ত পরিচালনা ও (গ) সরকারী পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা ও বোম্বাইতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। কলেজগুলির অনুমোদন দান, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম কার্য। অবশ্য এই ডেস্‌প্যাচে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করার বিষয়ও সুপারিশ করা হয়েছে।

(৫) ভাষা ও সংস্কৃতি—পাশ্চাত্য ভাষার বিশেষ করে ইংরেজী ভাষার পঠনপাঠনের উপর ডেসপ্যাচ যেমন জোর দিয়েছে, তেমনি আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন এবং সংস্কৃত, উর্দু ইত্যাদি সংস্কৃতি সম্পন্ন ভাষাগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরও সরকারের কল্যাণহস্ত প্রসারিত করবার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে সরকারী দায়িত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

(৬) কারিগরী-শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা—ডেস্‌প্যাচে বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধু দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কারিগরী-শিক্ষা, চিকিৎসা, আইন, ফলিত বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নত পর্যায় পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাবে। শিক্ষা-ব্যবস্থা হবে ধর্মনিরপেক্ষ।

(৭) শিক্ষক-শিক্ষণ—এই ডেস্‌প্যাচে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকের শিক্ষাদান-কার্যের মান উন্নত করবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শিক্ষণ-শিক্ষাকালে শিক্ষকদের বৃত্তি (Stipend) দেওয়ার কথাও ডেস্‌প্যাচে উল্লেখ আছে।

এখন দেখা গেল এই ডেস্‌প্যাচে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বেশ সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। অপর দিকে

উডের ডেসপ্যাচের বৈশিষ্ট্য

স্ত্রী-শিক্ষা, প্রাচীন-ভাষা-শিক্ষা, গণ-শিক্ষা, কারিগরী-শিক্ষা—ইত্যাদি শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকও শিক্ষা-পরিকল্পনা-রচয়িতাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। এই ডেসপ্যাচে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সমপর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে এই শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল অল্প বেতনভুক্ বুদ্ধিমান দেশী কেরানী-সৃষ্টি। ইংলণ্ডে কাঁচামাল সরবরাহ ও ইংরেজের কারখানায় প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য এদেশে আমদানি করবার মনোভাব সৃষ্টি এ জাতীয় শিক্ষার পরোক্ষফল। ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ আমলে সাফল্য-লাভ করেছে কিন্তু এ দেশে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির কোন ব্যবস্থা এই ডেস্‌প্যাচে ছিল না এবং থাকাও সম্ভব নয়।

১৮৮২-৮৩ সালের শিক্ষা কমিশন—উডের ডেচপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় এক যুগান্তর আনয়ন করেছিল। এরপর ৩০ বৎসর শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। উডের ডেচ্‌প্যাচ অনুসারে শিক্ষানীতি কতটুকু কার্যকরী হয়েছে তার অনুসন্ধান করবার জন্য ১৮৮২ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশন নিয়োগ করা হয়।

হাণ্টার কমিশন নিয়োগ

ভারতের এই শিক্ষা কমিশনকে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় অনুসন্ধান করে শিক্ষা সম্পর্কে নীতি-নির্ধারণের স্থপারিশ করতে বলা হয়।

(১) প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণ ও দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতি ও গ্রাণ্ট-ইন এড্ প্রথার কার্যকারিতা বিচার।

(৩) শিক্ষার বিভিন্নস্তরে পাঠক্রমের নির্দেশনা।

হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য স্থপারিশ করেন। এই ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্কুলবোর্ড স্থাপন করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ দেওয়ার যে স্থপারিশ এই কমিশন করেছিল তার ফলেই শিক্ষক যন্ত্রচালিতের মত পড়াশুনা অপেক্ষা পরীক্ষার উপর বেশী জোর দিতেন। ইহাই পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রণকারী শিক্ষা-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। সরকারী ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছিল। কারণ সমগ্র ব্যয়ের সমগ্র অংশ দূরের কথা, সামান্য কিছু অর্থও বৃটিশ সরকার খরচ করতে চাননি। শুধু জন সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহিত করতেন। কমিশন দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে স্থপারিশ করেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির প্রবর্তন, শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করা এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ ইত্যাদি কমিশনের স্থপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম।

হাণ্টার কমিশনের স্থপারিশের পরিধি

প্রাথমিক শিক্ষার পর্যালোচনা

মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহদান, সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের ব্যয়ভার না বাড়িয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করা ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন অনেকগুলি মূল্যবান স্থপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে একমুখীতা দূর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভেচ্ছুদের জন্য 'এ' কোর্স ও বাণিজ্য কারিগরী,

ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভেচ্ছুদের জন্য 'বি' কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কমিশন ইংরেজী ভাষাকে রাখবার প্রস্তাব মেনে নেন। এর ফলে এদেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে আচারগত ও সমাজগত এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। 'এ' কোর্স ও 'বি' কোর্স মাধ্যমিক শিক্ষার একমুখিতা কিছুটা দূর করতে সমর্থ হলেও বয়ঃসন্ধি কালের বহুমুখী চাহিদাকে মেটাতে সমর্থ হয়নি। তাছাড়া সরকারী চাকুরির মোহে 'এ' কোর্সের প্রতি শিক্ষার্থীদের একটি বিরাট মোহ দেখা দেয়। এর ভয়াবহ পরিণতি আজ উচ্চশিক্ষিত বেকার জীবনের গ্লানিতে পর্যবসিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্যালোচনা

উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের বিশেষ কোন বক্তব্য না থাকলেও শিক্ষার সুসংবদ্ধ রূপের আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চ শিক্ষায় কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়।

উচ্চশিক্ষা পর্যালোচনা

কার্জনের শিক্ষানীতি—কার্জনের শিক্ষানীতি ভারতের শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের এক বিস্তৃত দলিল। এই শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এতে ১৮৫৭ সালের উডের ডেস্‌প্যাচ ও ১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশনের সুপারিশগুলি শিক্ষার যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত হয়েছিল, শিক্ষার সেই মূলনীতিগুলিকে স্বীকার করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে কার্জন এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, গ্রাণ্ট-ইন-এড্‌ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠনের সুযোগ দেওয়ায় গত ২০ বৎসরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার বেশ খানিকটা হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান হয়েছে নিম্নগামী। সরকারী আওতায় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ে এসে একে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে শিক্ষার মান নিম্নগামী না হয়। প্রকৃত-পক্ষে এই সময় দেশে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ জাতীয় শিক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন। কার্জন সাহেব ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌দের প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখাননি। তিনি তাঁদের বিশ্বাস পর্যন্ত করেন নি। তাই সিমলার শিক্ষা-সম্মেলনে ভারতীয় কোন শিক্ষাবিদ্‌কে আমন্ত্রণ করা হয়নি। তাঁর শিক্ষা-নীতিতে যে সমস্ত কথা উল্লিখিত হয়েছিল সেগুলির রূপ-দানের সময় তিনি অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন। কার্জনের শিক্ষা-নীতিতে ভারতবর্ষে পুরোপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবর্তনের কথা উল্লেখ আছে। দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তিনি কোন নজর দেননি, বরং এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর অবজ্ঞাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কার্জনের শিক্ষা-নীতিতে

লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতি

শিক্ষা বিস্তারের স্থান খুবই সীমাবদ্ধ। মূলতঃ শিক্ষা সংস্কারের অছিলায় তিনি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারের কুক্ষিগত করতে চেয়েছিলেন।

কার্জনের শিক্ষা-নীতির সমালোচনা

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণের উপর তিনি জোর দেন। এইস্তরে পাঠক্রমকে সরল করে প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোগ করার দিকে তিনি নজর দিয়েছিলেন। তিনি শিশুশ্রেণীতে কিণ্ডারগার্টেন প্রথা প্রবর্তন করে শরীরচর্চা, হাতের কাজ ইত্যাদি সংযুক্ত করে দেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করেন। এ বিষয়ে পথপ্রদর্শকের সম্মান তিনিই পেতে পারেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার উপর কঠোর নিয়ম প্রযুক্ত হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিকে সরকার থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন লাভ করতে হোত। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার রোধ করে জাতীয় জাগরণের মূলে কুঠার আঘাত করবার জন্য কার্জন শিক্ষার মান উন্নয়নের নামে মাধ্যমিক শিক্ষা সংকোচের নীতিকেই গ্রহণ করেন। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষায় পর্যবসিত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা

কার্জনের আমলে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিশন কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেন। কলেজগুলির অনুমোদন ব্যবস্থা কড়াকড়ি করে উচ্চ-শিক্ষার মান উন্নয়নের কথা বিবেচিত হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাদান-কারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে (Teaching University) গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থারও সংস্কার করা হয়। সেনেটে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, কলেজ শিক্ষক ও গুণীদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা হয়। ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। এই আইনের বলে উচ্চ-শিক্ষার প্রসার না হয়ে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হোল।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা

লর্ড কার্জন শিক্ষাবিদ্ ছিলেন না, ছিলেন একজন জাঁদরেল শাসক। তাই তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে কতকগুলি বিষয়ে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশে কারিগরী শিক্ষা-ব্যবস্থা মোটেই উন্নত ছিল না, তাই কার্জন সাহেব কারিগরী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য কৃষি বিভাগ স্থাপন, কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিশেষ নজর দেন। চারুকলা সম্পর্কিত বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন ও

শিক্ষাসংস্কারে কার্জনের কৃতিত্ব

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা তাঁর শিক্ষা বিষয়ক কার্যগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা এই যে শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব তিনিই সর্বপ্রথম স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন। দেশের প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে, স্কুল-কলেজে ভারতীয় ভাষার চর্চা, সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ স্থাপন, শিক্ষার বিভিন্ন দিকের প্রসারের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ যে অপরিহার্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ঐতিহাসিক তথ্য কার্জনের শিক্ষানীতির মধ্যে পাওয়া যায়।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

কোম্পানী আমলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা রামমোহন, মেকলে ইত্যাদি মনীষীদের প্রচেষ্টায় ও সরকারী ব্যবস্থায় এ দেশে বিশেষ প্রসার লাভ করে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিদেশী শিক্ষার কুফল দেখা দেয়। লক্ষ্য করা যায় যে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীদের অধিকাংশেরই দৃষ্টিভঙ্গী খুব সংকীর্ণ; সওদাগরী বা সরকারী আপিসে চাকুরী গ্রহণ ছাড়া এদের অন্য কোন লক্ষ্যই থাকে না। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় না; নৈতিক চরিত্রগঠন ও সংগঠনী মনোভাব সৃষ্টিতে ইহা মোটেই সাহায্য করে না। দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা জাগরিত হয় না বরং দেশের উচ্চ শিক্ষিত ইঙ্গবঙ্গ সমাজ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশবাসীকে অবজ্ঞা করে। দেশের যুব সমাজের এই অধঃপতন বিদেশীর চোখেও ধরা পড়ে।

ইংরেজী শিক্ষার কুফল

দেশের নেতৃবৃন্দ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার দোষত্রুটি দূর করিতে বদ্ধপরিকর হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার্থীদের জীবন-যাত্রার সাথে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেন। স্বদেশের চিন্তাধারার সাথে এই শিক্ষার বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভারতীয় ভাবধারা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার লক্ষ্য ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও পার্থিব সুখলাভ আর ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশই হচ্ছে প্রধানতম কাম্য। তাছাড়া শুধু পুঁথিগত শিক্ষা চালু থাকায় শিক্ষার্থীরা শিল্পবাণিজ্য, কৃষি, যানবাহন ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয় না। শিক্ষার বাহন ইংরেজী হওয়াতে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর অপচয় হয়। কাজেই সকলেই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজবার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন।

শিক্ষাব্যবস্থায় নূতন ভারতীয় ভাবধারার প্রবর্তন

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশে গণ-জাগরণ দেখা দেয়। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ঢেউ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ইতিপূর্বে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যুবকগণের উচ্চশিক্ষা পর্যৎ গঠিত হয়েছিল। ভবানীপুরে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার জন্য ভাগবৎ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। বয়কট আন্দোলন ও কার্লাইল সার্কুলারের ফল স্বরূপ ১৯০৫ সালে রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয় এবং শ্রীঅরবিন্দ ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতার সংগঠকদের মতদ্বৈততার জন্য বঙ্গীয় জাতীয় কলেজ ও বঙ্গীয় কারিগরী প্রতিষ্ঠান নামে দু'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। পরে দু'টিই জাতীয় পরিষদের অধীনে আসে।

জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের ধারা সমগ্র ভারতে জাতীয় শিক্ষাধারা প্রবর্তনের তাগিদ এনে দেয় এবং অনেক প্রদেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ডন পত্রিকা জাতীয় চিন্তাধারা তথা জাতীয় শিক্ষাধারা সম্পর্কে মুল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক মুল্যবান অংশ।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য আশ্রম, আর্যপ্রতিনিধি সভাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল, রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাঃ জাকীর হোসেনের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং গান্ধিজীর বুনিয়াদী শিক্ষার পীঠস্থান সবরমতি আশ্রম বিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয় আদর্শে প্রাতষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুল আদর্শ ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে এদেশে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষাধারা বহুদিন ধরে পাশাপাশি চলেছিল। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তনের উত্তেজনা ছাড়া উভয় প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলনের পর এই বিষয়টি গান্ধিজীকে বিশেষ করে ভাবিয়ে তুললো। জাতীয় শিক্ষার মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যেমন স্থান থাকবে তেমনি জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হবে আধুনিক নবশিক্ষা আর তার পদ্ধতি হবে বৈজ্ঞানিক। প্রকৃতপক্ষে সমাজই শিক্ষার সত্যকার পরিবেশ। হরিজন পত্রিকায় জাতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে গান্ধিজী আলোচনা করতে থাকেন। তারপর ওয়ার্দ্ধায় সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধিজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করবার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাবিদদের কাছে পেশ করেন। ডাঃ জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা করে ইহাকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করবার জন্য সুপারিশ করেন। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে এক বিরাট বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বীজ রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করতে সমর্থ। সর্বোদয় সমাজ প্রবর্তনের জন্য গান্ধিজী যে নূতন জীবনের পরিকল্পনা করেছেন তার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন এবং এর সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ বিপ্লবের এক অভিনব দিক।

জাতীয় শিক্ষার রূপায়ণ

গান্ধিজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার পরিবেশ ভারতের পল্লী-সমাজ, শিক্ষার মাধ্যম কোন উৎপাদকাত্মক শিল্পকার্য, শিক্ষার লক্ষ্য শোষণ ও শাসনমুক্ত সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার ফলশ্রুতি ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। তাই ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে এ দেশের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। দেশ, কাল ও পরিবেশের প্রয়োজনে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটু পরিবর্তিত করে নিতে হলেও বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার যে কাঠামো পরিকল্পিত হয়েছে তারই ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার কাঠামো

এক : প্রাথমিক শিক্ষার গোড়ার কথা

এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে সামান্য কিছু লেখাপড়া এবং পাটীগণিতের জ্ঞানকে বুঝান হোত। ইংরেজ যখন এ দেশে আসে তখন দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পাঠশালার শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীযুগে প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যায়ে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা বলে পরিচিত। গান্ধিজী শিল্পকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষাকে ৬ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের শিক্ষা বলে স্থির করেছেন। যুগের বিবর্তনের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার রূপ ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র

তবে এ কথা আজ নূতন করে বিচার করে দেখতে হবে যে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা দেশের যে টুকু প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়েছিল এবং দেশের সার্বজনীন শিক্ষার সম্প্রসারণে যতটা সক্ষম হয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো পাশ্চাত্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে গড়ে তুলে বিশেষ কোন সুফল পাওয়া গিয়েছে কিনা। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অনেক ত্রুটি ছিল কিন্তু সেই ত্রুটি অন্যান্য উন্নত দেশসমূহে তৎকালে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটির চেয়ে বেশী ছিল না। বরং ভারতীয় পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতির 'সর্দার পড়ো' ব্যবস্থার অনুকরণ করতে দেখা যায় ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রবর্তিত Monitorial Systemএর মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে নিয়ে আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাধারা প্রবর্তন করলে এ দেশের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হোত। গ্রামের পণ্ডিত ছিলেন পল্লীবাসীর একান্ত আপনার জন। পল্লীর সেই অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক পরিবেশে কর্মকেন্দ্রিক জীবনধর্মী প্রাথমিক শিক্ষাকেই গান্ধিজী নূতন করে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপ দিয়েছেন। আমরা পাঠশালার শাস্তির কথাই শুনে থাকি কিন্তু সেখানে যে দরদ ও মমত্ববোধের স্পর্শ শিশুরা পেত তার খোঁজ রাখেন কয়জন? প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষার নূতন ঠাট বজায় থাকলেও ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্তঃসারশূন্য, উহা ঠিক শিশুকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কারণ জীবনের সাথে শিক্ষা এখানে বিশেষভাবে যুক্ত হতে পারেনি। এ দেশের

জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়টিকে বিচার করতে হবে।

আমরা শিক্ষার ইতিহাস পাঠের সময় লক্ষ্য করেছি যে ইংরেজেরা এদেশে এসেছিল বণিকরূপে। শাসনভার গ্রহণ করবার পরও কোম্পানি দেশের শিক্ষার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেনি কারণ কোম্পানির নিজের দেশের পার্লামেণ্ট জনসাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব যে সরকারের একথা তখনও স্বীকার করেনি।

মিশনারী প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল মূলতঃ পাশ্চাত্য মিশনারী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ ও পল্লীগ্রামের পাঠশালা ও মক্তবের পরিচালনার মধ্যে। এ্যাডামের রিপোর্টে গ্রাম্য পাঠশালার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মীয় প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন ছিল এখানে মুখ্য, শিক্ষাদান বা শিক্ষার প্রচার ছিল গৌণ। কোম্পানি আমল থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত অবহেলিত হয়ে আসছিল। ১৮৫৪ খ্রীঃ শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেন। গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ ব্যবস্থা চালু করে

কোম্পানি আমলে প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করা হতে থাকে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্যের পরিমাণ খুবই কম ছিল। ১৮৫৯ সালে ষ্ট্যানলী ডেসপ্যাচে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাকর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশ ছাড়া অনেকগুলি প্রদেশে স্থানীয় কর ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীঃ প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকারী হাত থেকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিভাগের হাতে যায়। পাঠ্যপুস্তক নির্ণয়, শিক্ষক-শিক্ষণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শন সরকারের হাতে থাকে।

পর পর কয়েকটি শিক্ষা কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয় এবং সেগুলি দূর করবার বিষয় বিশেষ ভাবে বিচার করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শুধু ইংরেজ সরকারকে দোষ দিলে হবে না, কারণ দেশের লোক তখন প্রাথমিক শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেয়নি যতটা দিয়েছে উচ্চ শিক্ষার দিকে। ফলে মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার বেশ প্রসার হলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি একেবারেই হয়নি।

প্রথম শিক্ষা কমিশন (১৮৮২-৮৩) প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকগুলি সুপারিশ করেন। এমন কি কমিশন একথাও জোর দিয়ে

হাণ্টার কমিশন

বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারই সরকারের মূল শিক্ষা-নীতি হওয়া উচিত। কমিশনের কোন সুপারিশই কার্যকরী হয়নি। ১৯০৪ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন সাহেবও শিক্ষা-পত্রের মাধ্যমে

উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেন। অবশ্য লর্ড কার্জনের চেষ্টার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু উন্নতি হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—এরপর ১৯১১-১২ সালে মহামতি গোখেল ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করেন। এই ঐতিহাসিক বিলটি কাউন্সিলে গ্রাহ্য হয় না। তবে ১৯১২ সালে ইংরেজ সরকার তার শিক্ষানীতিতে ঘোষণা করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সরকারের অন্যতম কর্তব্য। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকার জড়িয়ে পড়েন এবং সমস্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। যুদ্ধশেষে ১৯১৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল সরকারের সহযোগিতায় প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। শিক্ষা বিভাগটি আসে হস্তান্তরিত অংশে। ফলে দেশীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এসে পড়ে শিক্ষা বিভাগ।

গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা বিল

প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও তার প্রয়োগ—দেশীয় মন্ত্রীগণ দেশ গড়ার আদর্শ নিয়ে শিক্ষা বিভাগের কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। জনগণের মধ্যে মুক্তি সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে এই আদর্শ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির জন্য মন্ত্রিগণ বদ্ধপরিকর হন। প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রবর্তিত হয় বিভিন্ন প্রদেশে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই। বাংলাদেশে ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষার আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলেও যাহাতে এই আইন চালু হতে পারে তার জন্য বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন সংশোধন করা হয়।

দেশীয় মন্ত্রীগণের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা

খুবই দুঃখের বিষয় আমলাতান্ত্রিক সরকারী আওতায় ১৯১৯এর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইনটি কার্যকরী হতে পারে নি। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষের যে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি ও আদর্শনিষ্ঠা থাকা দরকার তার কিছুই ছিল না।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বৃটিশ আমলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ছিল খুবই অল্প। ১৮৮১ সালে গড় শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৬.৫ আর ১৯৩১ সালে অর্থাৎ ৫০ বৎসর পরে উহা দাঁড়ায় শতকরা ৮ জন। বাস্তব পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাবই এর মূল কারণ। Hartog Committee সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারতার চেয়ে শিক্ষার মানের দিকে বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মত নিরক্ষর (শতকরা ৯২ জন) দেশে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের চাইতে উহার প্রসারতার মূল্য অনেক বেশী।

দ্বৈত শাসনের সময় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি বিরাট বাধা ছিল ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের কর্মচারিবৃন্দের খামখেয়ালী ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাব। এঁরা মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন না আবার মন্ত্রীদেরও এদের কাজের প্রতি কোন আস্থা ছিল না। অথচ শিক্ষা দপ্তরের বড় বড় পদে বহাল থেকে এঁরা শিক্ষার অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখতেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সমাজে যে একটা প্রয়োজনবোধ ও স্বার্থত্যাগের ভাব ছিল প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তা ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষা সর্বস্তরের দয়া ভিক্ষা করে চলত।

প্রাথমিক শিক্ষায় আমলাতান্ত্রিক বাধা

প্রাথমিক শিক্ষা পরিশাসন সমস্যা—১৯৩৫ খ্রীঃ প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর অনেকে আশা করেছিলেন যে শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বেশ দ্রুত হবে কিন্তু বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে তেমন কোন উন্নতি দেখা গেল না। লীগমন্ত্রী সরকারী পুরাতন শিক্ষানীতিকে আকড়িয়ে রইল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ছিল। বোর্ডগুলির পরিচালকমণ্ডলী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতেন। শিক্ষা বিভাগের বহু ত্রুটি ছিল; বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার কোন মূলনীতি এখন পর্যন্ত এদেশে অনুসৃত হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও পূর্ণ অরাজকতা বিদ্যমান।

স্বায়ত্ত শাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা

তারপর আসে বিশ্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাসমর, বিদেশী সরকারের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবার জন্য শিক্ষাখাত থেকে অর্থ যুদ্ধখাতে চলে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আবার অর্থাভাবে অনেকটা পিছিয়ে যায়। যুদ্ধোত্তর ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য সার্জেণ্ট পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার তিনটি স্তর, যথা—(১) নার্সারী বা পূর্ব বুনিয়াদী (২) নিম্ন বুনিয়াদী ও (৩) উচ্চ বুনিয়াদী বা নিম্নমাধ্যমিক স্তর। প্রথম স্তরের শিক্ষা গৃহ পরিবেশে সম্ভব। এর জন্য সরকারী দায়িত্ব নেই। নিম্ন বুনিয়াদী স্তর গতানুগতিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার সম গোত্রীয় উচ্চ বুনিয়াদী স্তর নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সমপর্যায়ভুক্ত। বুনিয়াদী শিক্ষাকে সরকার মনে প্রাণে গ্রহণ করেন নি। জনসাধারণের কাছে বুনিয়াদী শিক্ষা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সমপর্যায়ভুক্ত বুনিয়াদী শিক্ষাকে এখনও অনেকটা ব্যাখ্যার বস্তু। বুনিয়াদী শিক্ষার নামে প্রচুর খরচ হচ্ছে, কিন্তু জনসাধারণের কাছে এর আবেদন এখনও পৌছে দেওয়া হয় নি।

স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা—স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার জাতীয়শিক্ষা পরিকল্পনার রূপদানে বিশেষ সচেষ্ট হয়ে উঠেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয় এবং সর্বভারতে ইহার আশু প্রবর্তনের জন্য রাজ্য-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা

করতে থাকেন। তবে সমস্ত রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো এক নয় এবং শিক্ষার মান ও প্রসারও একরূপ নয়। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলির মতৈক্য নেই এবং সমস্ত রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে সমানভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেনি। অনেক রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকা শিক্ষাখাতে আদায় করবার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে ব্রতী হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার উপর আস্থা সে সব রাজ্যের খুব বেশী নেই। আবার অনেক রাজ্য উপযুক্ত শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষকের অভাবে সদিচ্ছা সত্বেও সুষ্ঠুভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে বা বুনিয়াদী শিক্ষাকে আশ্রয় করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বিশেষ কৃতকার্য হতে পারে নি। কিছুদিন পরেই রাজ্য সরকারগুলি বুঝতে পারেন যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সুদূর পরাহত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষকের উপযুক্ত বেতনই এই শিক্ষা প্রবর্তনে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ভারতের শহরাঞ্চলে ও পৌরসভা অঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাগরিকদের সমর্থন লাভে সমর্থ হয়নি। গ্রামবাসীদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও নাগরিক চেতনার অভাব হেতু এদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার, বিশেষ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার, প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল দায়িত্ব সরকারের হলেও উহা আইনতঃ স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সামর্থ্য কম, বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষাবিদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, প্রসার, নিয়ন্ত্রণ আশাপ্রদ হচ্ছে না।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো

প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু আছে নিম্নলিখিত **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে**।

বিদ্যালয়	পরিচালক
(১) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	জনসাধারণের প্রতিনিধি সমিতি
(২) একক শিক্ষক বিদ্যালয়	রাজ্য সরকার
(৩) কর্পোরেশন স্কুল	কর্পোরেশন
(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম-৫ম শ্রেণী)	জেলাবোর্ড
(৫) গ্রাম্য পাঠশালা	গ্রাম-পঞ্চায়েৎ
(৬) প্রাথমিক বিভাগ (মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন)	মিশনারী প্রতিষ্ঠান অথবা স্কুল পরিচালক সমিতি
(৭) প্রাথমিক বিভাগ (সরকারী উচ্চতর বিদ্যালয়)	রাজ্য সরকার
(৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়	শ্রমিক কল্যাণ সংঘ
(৯) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়	রাজ্য সরকার বা জেলাবোর্ড
(১০) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুবিভাগ	রাজ্য সরকার

উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম ও পরিবেশ বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম, পরিচালন ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষকের যোগ্যতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে এবং এই কারণে প্রাথমিক শিক্ষার মানের তারতম্য এত বেশী। কোথাও প্রাথমিক শিক্ষক শুধু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন আবার কোথাও ডবল এম, এ, বি-টি শিক্ষিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত আছেন। সর্বনিম্ন বেতন মাসিক ৩০ টাকা আর সর্বোচ্চ বেতন মাসিক ২০০ টাকা। পাঠক্রম প্রায় একই প্রকার। দু'চারটি বিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা। ছাত্র বেতনের হার কোথাও ১৲ টাকা কোথাও ৫০৲ টাকা; অবশ্য অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিকে এদের মধ্যে ধরা হয়নি। কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষিকারা গড়ে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতন পান কিন্তু সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান খুবই নিম্নগামী। সরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগে ছাত্রভর্তি করাও কঠিন ব্যাপার কারণ ৩০টি আসনের জন্য ৩০০০ দরখাস্ত জমা পড়ে। আবার সমাজের উচ্চকোটির সন্তান সন্ততিদের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মত চাহিদা হিসেব করে ছাত্র বেতন প্রতি বৎসরই বাড়িয়ে চলেছেন। শিক্ষার মান সেখানে একটু উন্নত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষা অন্তঃসার শূন্য।

প্রাথমিক শিক্ষার মানের পার্থক্য

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিশাসন খুবই ত্রুটিপূর্ণ। স্কুলবোর্ডের সম্পাদক হিসেবে জেলা পরিদর্শক জেলার প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ামক। সরকারী অর্থ তার হাত দিয়েই বিলি হয় তারই অধস্তন কর্মচারী সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকদের অনুমোদন ক্রমে। একজন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের এক্তিয়ারে ১০০টির বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে। পল্লীঅঞ্চলে গমনাগমনের অসুবিধার দরুণ পরিদর্শন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। তা ছাড়া এদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন। এদের বেতন এত কম যে শিক্ষকতাকে (বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষান্তরে) কেহই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে শিক্ষক তার প্রাথমিক পেশার প্রয়োজন মিটিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য করে থাকেন। একক শিক্ষক সম্বলিত বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই শোচনীয় অথচ গত ১৫।১৬ বৎসরে ঐ জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা এখনও আক্ষরিক জ্ঞান লাভ ও সামান্য পাটীগণিতের জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান পাঠ্যতালিকাভুক্ত হলেও এগুলির বাস্তব

প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটি

পরিচিতি শিশুদের খুব কমই হয়। তোতা পাখির মত পাঠ্য পুস্তকের কয়েক পাতা মুখস্থ করাই যেন শিশু-শিক্ষার লক্ষ্য। বাস্তব জীবনের সাথে এই শিক্ষার সংযোগ স্থাপন (শতকরা ৯৫%টি ক্ষেত্রে) এখনও সম্ভব হয়নি। তবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা গতানুগতিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার চাইতে অনেকটা উন্নত। শিক্ষার সাথে জীবনের সংযোগ না থাকাতে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও অনুন্নয়নের মাত্রা খুব বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে অপচয় শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ আর অনুন্নয় শতকরা ২০ থেকে ৪০ ভাগ। এভাবে জাতীয় অর্থ, শক্তি ও সম্ভাবনা এ তিনেরই বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে।

এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থের যোগান শিক্ষা বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ, কিন্তু পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে উহার পরিমাণ শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। শিক্ষার পরিবেশও মোটেই সন্তোষজনক নয়, কারণ শতকরা ৮০টি বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন গৃহ নেই; কোথাও চণ্ডীমণ্ডপে, কোথাও মন্দিরে, কোথাও চতরাম বা চাবাদী আবার কোথাও বা গাছতলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বসে। শিক্ষা-উপকরণ প্রায় কিছুই নেই। এই পরিবেশ শিশুদের পক্ষে মোটেই আকর্ষণীয় নয়; তা ছাড়া অভিভাবকদের অজ্ঞতা, সামাজিক কুপ্রথা, জাতিভেদ প্রথা, দারিদ্র্য ও শিশু-শ্রমিক ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, প্রসার ও অগ্রগতিতে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করছে। উপরন্তু পল্লী অঞ্চলে সহশিক্ষা বিশেষ সমর্থন লাভ না করায় এবং উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকা না পাওয়ায় বালিকাদের সংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও বালকদের তুলনায় খুবই অল্প।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এখন **মূল সমস্যা পাঁচটি**—

(১) প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন,

(২) গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করণ,

(৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত মান ও সামাজিক মান উন্নয়ন, চাকুরীর সর্ত আকর্ষণীয় ও পেশা আনন্দদায়ক করে তোলা,

(৪) সরকারী তত্ত্বাবধানে অথবা নিয়ন্ত্রণে এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় ৭ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং (৫) এই খাতে প্রয়োজন অনুরূপ অর্থসংগ্রহ ও অর্থবরাদ্দ করা অবশ্য করণীয়।

(৪) এবং ৫নং বিষয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখন দেখা যাক গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তার কতদূর সম্ভব হয়েছে।

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী **ভর্তির হিসাব** [একলক্ষ=জনকে ১ ধরা হয়েছে]

	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা			*শতকরা হিসাব		
বৎসর	বালক	বালিকা	মোটসংখ্যা	বালক	বালিকা	মোটসংখ্যা
১৯৫০-৫১	১৩৭.৭	৫৩.৮	১৯১.৫	৫৯.৪%	২৪.৬%	৪২.৬%
১৯৫৫-৫৬	১৮৫.৩	৭৬.৪	২৫১.৭	৭০.৩%	৩২.৪%	৫২.৯%
১৯৬০-৬১	২৩৩.৮	১০৯.৬	৩৪৩.৩	৮০.৫%	৪০.৪%	৬১.১%
১৯৬৫-৬৬	৩০১.২	১৯৫.২	৪৯৬.৪	৯০.৪%	৬১.৬%	৭৬.৪%

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ১৯৬০-৬১ সালের এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায় **প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের** পরিমাণ মর্মান্তিক—

	বালক	বালিকা	মোট
১৯৫০-৫১	১২%	২০%	৩২%
১৯৫৫-৫৬	১০%	১৫%	২৫%
১৯৬০-৬১	৮%	১০%	১৮%

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হিসাব থেকে অপচয়ের পরিমাণ বাদ দিলে শিক্ষা-লাভের দ্বারা উপকৃত শিশুদের সংখ্যা বেশ কমে যাবে। তবে আশার কথা এই যে ধীরে ধীরে এই অপচয়ের পরিমাণ কমে আসছে।

এবার আমরা তিনটি পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক বিচার করলে দেখতে পাব এবিষয়ে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি।

তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও তার ক্রমোন্নতি—

সময়	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
ছাত্রভর্তির সংখ্যা (১ = ১ লক্ষ)	১৯১.৫	২৫১.৭	৩৪৩.৩	৪৯৬.৪
বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২০৯৬৭১	২৭৮১৩৫	৩৪২০০০	৪১৫০০০
শিক্ষণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৮২	৯৩০	১৩০৭	১৪৪২
শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক	৫৩৭৯১৮	৬৯১২৪৯	৯১০০০০	১২৬৬০০০
শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হিসাব (শতকরা)	৫৮.৮%	৬১.২%	৬৫%	৭৫%

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্যের বহু পশ্চাতে পড়ে আছি।

সমগ্র	১ম পঃ বাঃ পঃ	২য় পঃ বাঃ পঃ	৩য় পঃ বাঃ পঃ
শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ	৮৫ কোটি	৮৭ কোটি	২০৯ কোটি

প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর শক্তি ও অর্থ ব্যয় না করলে এবং সুষ্ঠু পরিচালনা গ্রহণ না করলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব না।

* ৬ বৎসর থেকে ১১+ বয়স্ক বালক বালিকা বিদ্যালয় গমন উপযোগী

দুই : ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়ার কথা

বর্তমানে ভারতবর্ষে যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল ইংরেজ আমলে। মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের প্রধান উপায় হিসেবে এরূপ শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হন। পরে মেকলে সাহেবের সুপারিশক্রমে ইংরেজীর মাধ্যমে দেশে উচ্চশিক্ষার যে কঠোমো তৈয়ারী হয় মাধ্যমিক শিক্ষা তার কেন্দ্রীয় শক্তি যোগায়। প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বলে উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষালাভের জন্য এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পাশের যোগ্যতা অর্জন করা।

বিগত এক শতাব্দী ধরে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল নীতি অব্যাহত

কোম্পানী আমলে শিক্ষার সরকারী উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প বেতনে সরকারী আপিসে বা বিদেশী সওদাগরী আপিসে ইংরেজি জানা কেরাণী যোগান দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে আজও শতকরা ১০% জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা পাশ করে কেরাণীগিরি বা ঐরূপ কোন বৃত্তিকেই শুধু অবলম্বন করতে পারে। এ ছাড়া কোন নূতন ও বহুমুখী বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য শিশুকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হোত না। ভাষাশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্যতম বিষয় ছিল। কোম্পানী আমলে সরকারী প্রচেষ্টায় এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পবেতনভুক্ সরকারী ও সদাগরী আপিসের কেরাণী তৈরী করা।

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশে এ দেশে প্রচুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেল। ইংরেজী ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম, ফলে এ দেশীয় আধুনিক ভাষাগুলির উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ

হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য বেসরকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও থাকে। সরকার বৃত্তিশিক্ষার ও কারিগরী শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা না করাতে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে দেশের আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। মহিলাদের জন্যও বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। হাণ্টার কমিশনের নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় এ কোর্স ও বি কোর্স প্রবর্তিত হয়। কিন্তু দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সন্তানদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ কোর্স পড়াতে লাগলেন। বৃত্তিমূলক কারিগরী-শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, তাই মাধ্যমিক শিক্ষার একমুখী ভাব থেকেই গেল। সরকারী বিদ্যালয় ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল। এগুলির শিক্ষা বিশেষ নিম্নগামী ছিল না, কিন্তু বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সমস্ত

হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ

বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, সেগুলির বেশীর ভাগ সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেনি বলে ঐ বিদ্যালয়গুলি বিদ্যালয়-পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। ফলে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান নিম্নগামী হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা যত দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল ততই এর মান নিম্নগামী হচ্ছিল। কার্জন সাহেবের আমলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য স্কুল অনুমোদনের সর্তাদি রচিত হোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে হোত। কারণ পরীক্ষা পরিচালনা ও ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের ভার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। যে বিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করেনি তাকে গ্র্যান্ট-ইন্-এড্ দেওয়া হোত না। এই ভাবে কড়াকড়ি করবার ফলে শিক্ষার মান কিছুটা উন্নত হয়, কিন্তু শিক্ষা বিস্তার বেশ ব্যাহত হোল। এর পর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়া হয়। ছাত্রাবাস নির্মাণ, গ্রন্থাগার স্থাপন, শারীরিক শিক্ষার প্রচলন ও সহপাঠ্য বিষয়ের (Co-curricular activities) প্রবর্তন ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনেকটা উন্নত করা হোল। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক পর্যৎ অনেক প্রদেশে গঠিত হয় কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক, ইণ্টারমিডিয়েট ও কলেজী শিক্ষা—সর্বপ্রকার শিক্ষাকেই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। ফলে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে ও তাকে কার্যকরী করতে বিলম্ব হয়।

কার্জন সাহেবের আমলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন

কার্জনের শিক্ষানীতির প্রতিবাদে এ দেশের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা সমিতি গঠিত হয় এবং জেলায় জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে শিক্ষার পাঠক্রমে জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, মৌলিক বিজ্ঞানের গবেষণা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ স্থান লাভ করে।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

এর পর ১৯১৭ সালে এদেশে স্যাডলার কমিশন আসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন সম্পর্কে সুপারিশ করবার জন্য। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়েও কতকগুলি সুপারিশ করেন। এই কমিটি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং মাধ্যমিক ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতি রাজ্যে একটি ক'রে ইণ্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন।

স্যাডলার কমিশন

১৯১৯ খ্রীঃ প্রাদেশিক সরকারের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার আসে কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রায় এক-রূপই থেকে যায়। শুধু মাতৃভাষা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহনরূপে গৃহীত হয়। স্ত্রী-শিক্ষা দ্রুত প্রসারের ফলে মেয়েদের পৃথক পাঠ্যতালিকার কথা চিন্তা করা হয়।

প্রাদেশিক সরকারের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ

১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি মাধ্যমিক স্তরে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্য হওয়ার কারণ স্বরূপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একমুখিতা ও শুধু ভাষাশিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই কমিটি সর্বপ্রথম মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।

হার্টগ কমিটির সুপারিশ

দেশব্যাপী বেকারসমস্যার কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে সাপ্রু কমিটি লক্ষ্য করেন যে একমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অন্য কোন বৃত্তির সুযোগ না পেয়ে অগত্যা ডিগ্রীলাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াতেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর জীবনে শিক্ষার্থীরা কে কি বৃত্তি, নির্বাচন করবে, কোন্ কাজের প্রতি তার ঝোঁক আছে কোন্ কাজে তার আনন্দ আছে, কোন্ কাজে তার আগ্রহ আছে, কোন্ কাজে তার যোগ্যতা আছে ইত্যাদি বিষয় শিক্ষক ও অভিভাবকেরা ভাবেন নি। ছাত্রদের আর একথা ভাববার অবকাশ কোথায়?

সাপ্রু কমিটির সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষার স্বরূপ—মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমরা দেখেছি যে বয়ঃসন্ধিকালে ধীরে ধীরে শিশুর মধ্যে সৃজনাত্মক কাজের সম্ভাবনা আত্ম-প্রকাশ করতে থাকে। এই সময় সেগুলি এদের জীবনে জীবন-জিজ্ঞাসারূপে দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, এইসময় এদের কাছে জীবনের উচ্চ আদর্শগুলি তুলে ধরতে হবে। সমাজের কাজ, গঠনমূলক কাজ ও বীরত্ব ব্যঞ্জক কাজের মধ্যে আত্মনিয়োগ করতে এরা ভালবাসে। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন হবে যাতে শিশুর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ থাকে। এ জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী করতে হবে বহুমুখী। অবশ্য কিছুসংখ্যক যোগ্য ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, কিন্তু অধিকাংশ ছেলেমেয়েকেই কর্মসংস্থানের জন্য কোন না কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পর। কোন বৃত্তিকে অবলম্বন করতে গেলে যে শিক্ষা, যে গতানুগতিক ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় তা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বহুমুখী করতে পারলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনের জন্য তাদের মন ও কর্ম-প্রবণতাকে উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নূতন ধারণা

করবার সুযোগ পাবে। সাপ্রু কমিটির মতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে আর একবছর বাড়িয়ে দিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক এবং নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ইহা ছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সময় মত জীবনের বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে চাকুরীর অভাবে সমাজের যে বৃত্তির সে অযোগ্য এবং যার জন্য তার মনের প্রস্তুতি নেই, তা গ্রহণ করে তাকে আত্মগ্লানিতে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তি তার যোগ্য স্থান খুঁজে নেবার সুযোগ পাবে।

উড-এবট্ রিপোর্টের বক্তব্য

১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার স্থান নির্ণয় করে দেয় উড-এবট্ রিপোর্ট। মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্যসূচী গ্রহণ করার জন্য পলিটেকনিক নামক কারিগরী স্কুলের পত্তন হয়। অবশ্য সমাজের চাহিদার তুলনায় এগুলির সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই অভাব পুরণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কারিগরী, বৃত্তিবিষয়ক ও বাণিজ্যবিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু এতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

সার্জেণ্ট রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো

১৯৪৪ সালে সার্জেণ্ট রিপোর্ট নিম্ন বুনিয়াদি ও উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মাধ্যমিক স্তরের শেষের তিন শ্রেণীতে একাডেমিক ও টেকনিক্যাল এই দুইরকম পাঠক্রমের সুপারিশ করা হয়। শুধু যোগ্য শিক্ষার্থীদেরই উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবমুখিতার অভাব

মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবমুখিতার অভাবেই শিক্ষিত বেকার সমস্যা এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এখানেই প্রচলিত গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি। আজ বিশ্বের সর্বত্র মাধ্যমিক শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে। ভারতবর্ষ অন্যান্য উন্নত দেশের গবেষণা থেকে নিজের প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, অবশ্য প্রত্যেক দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা সে দেশের নিজস্ব। এই সমস্যার সমাধান বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো, পাঠক্রম ও শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত এবং বিদ্যালয় গৃহ ও তার পরিবেশ সৃষ্টি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষক-শিক্ষণ পরিবর্তন সাপেক্ষ।

প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের জন্য, অতএব প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক, অবৈতনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই বলে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক তথা উচ্চ শিক্ষার যে কোন যোগাযোগ থাকবে না একথা কেহ

বলবেন না বরং প্রাথমিক শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা যায় সেদিকে চেষ্টা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের বৃহত্তর সমাজের জন্য। সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কোন না কোন উপজীবিকা অবলম্বন করতে হয়। সেইজন্য মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্কুলজীবনের পর শতকরা ৯০ জন যাতে স্বীয় উপজীবিকার বিষয় ঠিক করে নিতে পারে সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা—স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ খৃঃ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের নির্দেশ দেবার জন্য তারাচাঁদ কমিটি নিযুক্ত হয়।

তারাচাঁদ কমিটি ও মুদালিয়র কমিশন

এর পর ১৯৫২ খৃঃ ভারত সরকার মুদালিয়র কমিশন নিযুক্ত করেন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে এর নীতি নির্ধারণ করবার জন্য।

শিক্ষার সর্বস্তরের সমস্যার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত করতে হলে শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা চাই। মাধ্যমিক

মাধ্যমিক শিক্ষা এ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড স্বরূপ

শিক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ তাঁরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করেন। আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চতর কারিগরী ও পেশামূলক কলেজে ভর্তি হয়ে থাকে। অনেক ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায় শেষ করে বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটি শিক্ষাক্রমের (Educational ladder) অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার সামগ্রিক কল্যাণসাধন ও উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে। নব শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করতে যে সমস্ত সমস্যা আসতে পারে সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। মুদালিয়র কমিশনের উপর মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টকে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কিত গীতা বলা হয়ে থাকে। এই কমিশন ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণ করে কতকগুলি মূল ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছে। ইতিপূর্বে এই ত্রুটিগুলির কিছু কিছু অন্যান্য কমিশন উল্লেখ করেছে। কিন্তু এরূপ সামগ্রিক ভাবে এর পুর্বে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিচার করা হয়নি। এই কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি যথাসম্ভব দ্রুত অপসারণ করা প্রয়োজন।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য যে শক্তি ও সময়ের অপচয় হয় সেই শক্তি ও

সময় দিতে হবে ভবিষ্যতের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য। মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে কিন্তু ভাষা শিক্ষার সময় সাহিত্য শিক্ষার জন্য সকল ছাত্রের সর্ব শক্তি নিয়োগের প্রয়োজন নেই। যারা মানবাদি বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করে ভাষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে চায় তাদের অন্য বিষয়ের চাপ কমিয়ে দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এক শ্রেণীতে অত্যধিক ছাত্র সংখ্যার জন্য ভাষা শিক্ষা ব্যাহত হয়, তাই ছাত্রেরা গৃহশিক্ষক রাখতে বাধ্য হয়। চাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যাগত হার এমন হওয়া চাই যাতে শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ব্যক্তিগত যত্ন নিতে পারেন। ছাত্রের রচনাত্মক গুণাবলীর স্ফুরণের জন্য তাকে উপযুক্ত নির্দেশনা দিতে হবে। শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করতে হবে গ্রন্থাগার ও বীক্ষণাগার স্থাপনের জন্য সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শিক্ষককে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে; জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যও উপযুক্ত বেতন দিতে হবে এবং তাঁদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ও অবকাশ গ্রহণের পর অন্যান্য চাকুরীতে যেসব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয় সেগুলি দিতে হবে। নতুবা উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে না; শিক্ষা-সংস্কারের সর্ববিধ চেষ্টা ব্যর্থ হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার একমুখিতা শিক্ষিত বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ হলেও মুদালিয়র কমিশনের পূর্বে কোন শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের সুষ্ঠুরূপ দিতে পারেন নি। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষায় দু'টি স্তর থাকবে।

কমিশনের সুপারিশের সার সংক্ষেপ

(১) ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত—নিম্নমাধ্যমিক স্তর

(২) ৯ম শ্রেণী থেকে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত—উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর

পাঠ্যসূচীর মূল বিষয়:—

(ক) বিভিন্ন স্তরে তিনটি ভাষা (মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরেজী ভাষা) শিখতে হবে। শেষ পরীক্ষায় মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষা হবে আবশ্যিক বিষয়।

(খ) সমাজ বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান (সাধারণ গণিতসহ)

(গ) একটি কারুশিল্প বা চারুশিল্প

(ঘ) নিম্নলিখিত **সাতটি শিক্ষাধারা** (Educational streams) থেকে একটি বেছে নিতে হবে ৯ম শ্রেণীতে উঠে:

(১) মানবতামূলক বিজ্ঞান (Humanities) (২) বিজ্ঞান (Science) (৩) কারিগরী শিক্ষা (Technical). (৪) বাণিজ্য (Commerce), (৫) কৃষি বিদ্যা (Agriculture), (৬) চারুকলা (Fine arts) এবং (৭) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science)। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে (Multipurpose School) এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Higher Secondary School)

এই বিষয়গুলির একাধিক বিষয় পড়ান হবে। এইসব বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে যে কোন শিক্ষা-ধারায় স্বয়ং সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করা হবে। এই কমিশন মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষণের উন্নয়ন, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়ও সুপারিশ করেন।

এ ছাড়া কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পাঠাগার স্থাপন, বীক্ষণাগার নির্মান এবং সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী সংঘটনের উপর যথেষ্ট জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কর্মরত শিক্ষকদের স্বল্পস্থায়ী প্রশিক্ষণ, সেমিনার ইত্যাদির কথাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে ১১ বৎসর থেকে ১৭ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তিত আছে। এই মাধ্যমিক শিক্ষা নিম্নানুরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহে দেওয়া হয়। গত তিনটি শিক্ষা পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসারের পরিচয় পাওয়া যাবে বিদ্যালয়গুলির ক্রমবর্ধমান সংখ্যার হিসেব থেকে। *

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সময় ১৯৪৮-৪৯	সময় ৫০-৫১	সময় ৫৫-৫৬	সময় ৬০-৬১	সময় ৬৫-৬৬
(১) উচ্চবুনিয়াদি	১২	৩৫০	১৬৫০	৪৫০০	৬০০০
(২) মিডল স্কুল	১৩,৫০০	১৩৫৮০	১৯,৩০০	২২,৭০০	২৫০০০
(৩) উচ্চ মাধ্যমিক	৬,১০০	৮৭৩০	১০,৬০০	১২,২০০	১৮৫৭০
(৪) বহুসাধক বিদ্যালয়	—	—	২২৫	৯৩০	১২৫০
(৫) উচ্চতর মাধ্যমিক	—	—	৫০	১,২০০	৪৮০০
(৬) বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়	১০	৩০	৪৩০	১,২০০	২১০০
(৭) কারিগরী বিদ্যালয়	৯০	১৩০	৪৮০	৮২০	১১০০

প্রশাসনিক দিক থেকে বর্তমানে তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

(১) সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় (Government Schools)

(২) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় (Govt. aided Schools)

(৩) স্বাধীন সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয় (Private Schools)

এছাড়া সর্ব ভারতে ১৪।১৫টি পাব্লিক স্কুল (Public School) ৪০।৪২টি সৈনিক স্কুল আছে। এদের কতকগুলি সরকারী সাহায্য পায়, আর কতকগুলি রাজা-মহারাজা, ধনিক ও বণিকশ্রেণীর নিকট আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

ইংরেজ আমল থেকেই এই তিন জাতীয় বিদ্যালয় এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা দান করছে। তবে গোড়ার দিকে মিশনারী স্কুলের সংখ্যা যেমন বেশী ছিল এখন তেমনি নানাবিধ সংস্থা ও মিশন কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

* হিসাব লক্ষ সংখ্যায় ধরা হয়েছে।

সংখ্যা বেশী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে গণতন্ত্রী ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারে দেশবাসীর আগ্রহ বেশী দেখা যায়।

ডিগ্রীর ও চাকুরির মোহ আমাদের ছেলেমেয়েরা ছাড়তে পারবে না যতদিন পর্যন্ত না ডিগ্রীর চাইতে কর্মনৈপুণ্যের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনবোধ ও উপযুক্ত বৃত্তি নির্বাচনের সহায়ক পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে, নতুবা বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর ছাত্র-সমাজ বাস্তব সামাজিক জীবনের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। বয়ঃসন্ধিকালের সর্বতোমুখী সৃজনা মনোভাবকে কর্মকুশলতার মধ্যে রূপ দেবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করে বহুমুখী পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন করতে হবে। অনেকে বলেন, এই বয়সে (১৪ বৎসর) কোমলমতি শিশুরা বৃত্তি নির্বাচনের মত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে পারে না তাই পাঠ্য বিষয় এমন হবে যে প্রয়োজন হলে একটি বিশেষ শিক্ষাধারা (Stream) থেকে সরে এসে অন্য ধারায় যোগদান করতে পারে এবং এতে তার সময় ও শক্তির খুব অপচয় না হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সুনিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করবার জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শদান বিভাগ (Guidance & Counselling Deptt.) স্থাপন করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগটি পরিচালিত হবে।

বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

সর্বোপরি মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তিত করতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে রচনাত্মক (essay type) প্রশ্নের সাথে বাস্তবমুখী (objective type) প্রশ্নও দিতে হবে। শুধু বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার (Public examination) উপর জোর দিলে ছাত্রেরা গোটাকতক প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের জন্য প্রস্তুত হয়; প্রকৃত শিক্ষালাভের চেষ্টা করে না। এইভাবে প্রকৃত শিক্ষার পরীক্ষাও সম্ভব নয়। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার (internal examination) সংস্কার করতে হবে এবং এতে জোর দিতে হবে। বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার নম্বরের সাথে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নম্বর যোগ করে কোন্ বিষয়ে ছাত্রদের বিশেষ যোগ্যতা তা নির্ণয় করতে হবে। শুধু পরীক্ষা পাশ মাধ্যমিক স্তরের লক্ষ্য হবে না। ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রগঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য প্রস্তুতিপর্ব মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকেই শুরু হবে।

পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার

স্ত্রী-শিক্ষা ও কারিগরী-শিক্ষা—মাধ্যমিক শিক্ষার আলোচনায় এদেশের স্ত্রী-শিক্ষার ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারের কথা উল্লেখ না করলে উহা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রাথমিক স্তরে বালক বালিকারা একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের কথা আলোচনার সময় বালক বালিকাদের কথা আলাদা করে ভাবতে হয় না; কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা বয়ঃসন্ধিকালের

শিক্ষা, তাই এখানে কিশোর ও কিশোরীদের শিক্ষার কথা পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা একসাথে পড়বার সুযোগ পায় কিন্তু কারিগরী বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে পলিটেক্‌নিক-গুলিতে যুবক ও যুবতীদের জন্যে পৃথক্‌ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া মহিলাদের জন্যে গার্হস্থ-বিজ্ঞান, কারুশিল্প ও চারুশিল্প শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মাধ্যমিক শিক্ষায় স্ত্রী-শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার স্থান

স্ত্রী-শিক্ষার গোড়ার কথা—বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নারী প্রগতি ও স্ত্রী-শিক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার খুবই প্রণিধানযোগ্য। এক শতাব্দী পূর্বে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি এদেশে প্রবল বিরোধিতা ও বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশীয় মিশনারী এবং স্বনামধন্য রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তির চেষ্টায় এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থা সুরু হয়। কোম্পানি আমলে মেয়েদের জন্য সরকারী বিদ্যালয় ছিল না। ১৮৮২ খ্রীঃ শিক্ষা-কমিশন স্ত্রী-শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য জোর মন্তব্য করেন। ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সমাজের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের হাতে মাত্র কয়েকটি স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আসে। উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবে এবং পাঠ্যতালিকা মহিলাদের উপযোগী না হওয়ায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হয়। এতাবৎকাল পর্যন্ত মেয়েদের স্কুলে ছেলেদের জন্য প্রস্তুত পাঠ্য বিষয়ই পড়ান হত। মেয়েদের জন্য কোন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। ১৯২১ খ্রীঃ সর্ব প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের ধাক্কায় দেশের নারী প্রগতি সর্ব স্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

নারী প্রগতি

পৌনে দু'শত বৎসর সুসভ্য ইংরেজী সভ্যতার তত্ত্বাবধানে ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। প্রথম মহাসমরের পর আমেরিকা ও ইউরোপে নারী প্রগতি ও স্ত্রী-শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হয়; ভারতবর্ষেও তার প্রভাব পড়ে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বিশেষ ভাবে যুক্ত। জাতীয় কর্ম-প্রচেষ্টায় যে মহিলাদের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই বোধ স্বদেশী যুগে জাগরিত হয় এবং মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার হয়। অনেক মহিলা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা কেন্দ্রে কুটির শিল্পমূলক বৃত্তি শিক্ষা প্রবর্তিত হতে থাকে।

১৮৮৩ খ্রীঃ হাণ্টার কমিশন নারী শিক্ষার বিবিধ দিক বিচার করে স্ত্রী-শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার উপযোগী সামাজিক অবস্থা তখনও হয় নি বলে মনে করেন। দ্রুত নারী শিক্ষার বিস্তারের কথায় কমিশন তেমন জোর দিতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারী প্রগতি দ্রুত এগিয়ে চলে।

বৃত্তিমূলক স্ত্রী-শিক্ষার দাবী নারী সমাজ থেকেই আসে। শিক্ষিকার কাজ, ধাত্রী-বিদ্যা ও শিল্প-শিক্ষায় নারী সম্প্রদায় এগিয়ে আসেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১৯২১ খ্রীঃ অসহযোগ আন্দোলনে দেশের মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময় থেকে নারী-প্রগতি দ্রুত এগিয়ে চলে। ১৯২৯ খ্রীঃ হর্টগ কমিটি নারী শিক্ষাকে সুসংবদ্ধ ভিত্তির উপর স্থাপন করার সুপারিশ করেন। নারী শিক্ষা পরিচালনার জন্য উপযুক্ত নারী কর্মচারী নিয়োগ এবং বেশী সংখ্যক নারী পরিদর্শিকা নিয়োগের কথাও এই কমিটি সুপারিশ করেন।

বৃত্তিমূলক স্ত্রী-শিক্ষা—ভারতবর্ষে মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য পাঁচ প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কতকগুলিতে শুধু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আবার কতকগুলিতে প্রশিক্ষণের সাথে কাজেও লওয়া হয়। মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নরূপ—

মহিলাদের জন্য বৃত্তি-মূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

(১) মহিলা সমিতির দ্বারা পরিচালিত কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সমবায় প্রথায় পরিচালিত কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও কর্ম সংস্থান কেন্দ্র।

(২) শিক্ষা-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার নারী শিক্ষার শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(৩) মিল বা ফ্যাক্টরী সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্ম-সংস্থান-কেন্দ্র।

(৪) শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন কেন্দ্রে চাকুরি লাভের পুর্বে typing, stenography, telephone operation ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার জন্য ছোট বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(৫) ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, কারিগরী, ধাত্রী-বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা লাভের জন্য মেয়েদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সহ-শিক্ষামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব দেখা দেয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের দর হু হু করে বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালের দ্রব্য মূল্য গড়ে প্রায় তিন গুণ বেড়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুতগতিতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হতে থাকে। দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু কৃষির উপর চাপ পড়ে এবং উহা কমাবার জন্য শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত

মহিলারা সহধর্মিণী তথা সহকর্মিণী

গ্রামবাসী মিল, ফ্যাক্টরী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য সহরে আসতে থাকে। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙ্গন ধরে। ক্ষুদ্র পরিবার হলেও সহরে খরচা এত বেশী যে স্বামীকে অর্থ সাহায্য করবার জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের নানাজাতীয় বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। মহিলারা এখন শুধু কুলবধূ নহেন, তাঁরা পুরুষের পাশে সহধর্মিণী

ও সহকর্মিণী। গণতন্ত্রীদেশে পুরুষদের সাথে মহিলাদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের সমান অধিকার।

কারিগরী শিক্ষার গোড়ার কথা—কারিগরী শিক্ষা মূলতঃ ছ'টি পর্যায়ে এদেশে বিস্তার লাভ করেছে; (১) টেকনিক্যাল স্কুল ও পলিটেকনিকের শিক্ষা এবং (২) কলেজীয় ও টেকনোলজিক্যাল শিক্ষা।

বৃটিশ আমলে এদেশে কোনরূপ সুসংবদ্ধ কারিগরী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল না। পরে কোম্পানির প্রয়োজনে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রুড়কী, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও পুনাতে প্রথমে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। পঞ্চাশ বৎসর পরও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয় না। রেলওয়ে ওয়ার্কসপ, জাহাজ মেরামত কারখানা এবং কিছু কিছু দেশীয় শিল্পকে আশ্রয় করে মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি বিষয়ে কারিগরী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা চালু হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের চাপে এদেশে শিল্পের প্রসার হয়। নির্বাচিত কিছু কিছু শিক্ষার্থীকে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায় পারদর্শী করতে ভারত সরকার আমেরিকায় ও যুক্তরাজ্যে প্রেরণ করার নীতি গ্রহণ করেন। গত ছ'টি মহাযুদ্ধে শিল্প দ্রব্যের মহার্ঘতা ও অভাব হেতু ভারত সরকার শিল্পোন্নতির প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় টেক্‌নিক্যাল কাউন্সিল গঠন করেন। এই বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ও গবেষণা কার্য এদেশে শুরু হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হলেও ফল আশানুরূপ হয়নি। তাছাড়া কারিগরী শিক্ষার পর প্রায়ই চাকুরি সন্ধান করতে হয় না বলে পরীক্ষা পাশের দিকে ঝোঁক বেশী থাকে, শিক্ষার আগ্রহ থাকে কম।

১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষা

গত ২০ বৎসরে কারিগরী শিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসার ও উন্নতি হয়েছে। জাতিকে নূতন করে গড়ে তুলতে হলে তার শিল্প-বাণিজ্য, যানবাহন, খনি, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলির দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন প্রয়োজন। প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশে এদেশে চারি প্রকারের কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করান হচ্ছে।

(১) ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ টেকনোলজী—স্নাতকোত্তর কারিগরী শিক্ষা
(২) ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ—স্নাতক পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষা
(৩) পলিটেকনিক—প্রাক্‌স্নাতক কারিগরী শিক্ষা
(৪) জুনিয়র ও সিনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল, ট্রেড্ স্কুল ইত্যাদি—বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংএর (Man power planning)

উপর জোর দেওয়া হয়েছে ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রসার বেশ আশাপ্রদ। নিম্নে উহার হিসাব দেওয়া হোল।

	ডিগ্রীকোর্স			ডিপ্লোমা কোর্স		
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্র ভর্তি	উত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ছাত্র ভর্তি	উত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা
১৯৫০-৫১	৪৯	৪১২০	২২০০	৮৬	৫৯০০	২৪০০
১৯৫৫-৫৬	৬৫	৫৮৯০	৪০২০	১১৪	১০৪০০	৪৫০০
১৯৬০-৬১	১০০	১৩৮৬০	৫৭০০	১৯৬	২৫৫৭০	৮০০০
১৯৬৫-৬৬	১১৭	১৯১৪০	১২০০০	২৬৩	৩৭৩৯০	১৯০০০

ইঞ্জিনীয়ারিং ছাড়া অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে উপজীবিকার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। এগুলির মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, কৃষি ও শিল্পসংস্থা, টেক্‌নিক্যাল ল্যাবরেটারী, হাঁস-মুরগী পালন ব্যবস্থা, দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে হলে যে প্রকার কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন তারও যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ঐগুলির কার্যের পরিধি আরও ব্যাপকতর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতের উচ্চ-শিক্ষার গোড়ার কথা

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে এদেশে উচ্চ-শিক্ষার খুব প্রসার হয়েছিল। মুসলমান যুগে উচ্চশিক্ষার প্রসার তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কোম্পানি আমলে মিশনারীরা এদেশে পাশ্চাত্য উচ্চ-শিক্ষার প্রসার কল্পে দেশের বিভিন্ন স্থলে অনেকগুলি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে। সরকার পক্ষ থেকে কলিকাতায় কলিকাতা মাদ্রাসা এবং বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হয়। এই দুটি উচ্চ-শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাচ্য আদর্শে ব্যাকরণ, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ভাষা (classical language) শিক্ষা দেওয়া হোত। সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য লর্ড মিণ্টো বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। এর পর আসে উচ্চ-শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ভাবধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব। ১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড বেণ্টিক ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে মেকলের মিনিট (Macaulay's minute) অনুমোদন করলে এদেশের উচ্চ-শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগিতা সরকারের নীতি নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করেছিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করেছিলেন। বেণ্টিকের নির্দেশে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে কঠোর ভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়।

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ কোম্পানির

ডিরেক্টরদের হাতে পৌঁছিলে তাঁরা শিক্ষা-ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তনের জন্ত প্রস্তুত হলেন। ১৮৫৭ সালে এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে প্রদেশের গভর্ণর হোলেন চ্যান্সেলার এবং একজন ভাইস চ্যান্সেলারকে সরকার মনোনীত করলেন। সমস্ত ফেলো সরকার কর্তৃক মনোনীত হোলেন। ঠিক হোল এঁরা আমৃত্যু সদস্য থাকতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সিনেটের (Senate) সদস্যসংখ্যা হোল অনেক। এই আইনে সিণ্ডিকেটের (Syndicate) কথা বলা হয়নি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য পরীক্ষা গ্রহণ ও কলেজসমূহের অনুমোদন দানের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তৎকালীন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছিল। দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনরূপ সংযোগ ছিল না, সরকার সে সংযোগ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদের জীবনের লক্ষ্য হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ এবং তারপর চাকুরি সংগ্রহ। তখন একটু ইংরেজী শিখলেই চাকুরি জুটে যেত। তাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দরজায় ছাত্রদের এত ভীড়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে ২০ বৎসর পর্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ চলে। ১৮৮৭ খ্রীঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলেজসমূহের অনুমোদন এবং পরীক্ষা গ্রহণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় যদি মনে করে তবে অধ্যাপনা বিভাগ খুলতে পারে এরূপ নির্দেশও সরকার দিয়েছিলেন।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

১৯০২ খ্রীঃ লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রূপ দেবার জন্ত কমিশন সুপারিশ করে।

কমিশনের বিবেচ্য বিষয় ছিল দুইটি। প্রথমটি হোল বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও কার্যকলাপ কি হবে এবং কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। আর দ্বিতীয়টি হোল বর্তমান কাঠামো কিরূপে এবং কত তাড়াতাড়ি নূতন কাঠামোতে রূপান্তরিত করা হবে।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মূল বিষয় ছিল কিরূপে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নূতন কাঠামোর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। কমিশনের মতে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা ঠিক হবে না। নিম্ন-স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদান কার্য কলেজগুলি করবে। বিশ্ব-বিদ্যালয় শুধু স্নাতকোত্তর শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করবে নিজের কর্তৃত্বাধীনে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্নাতকোত্তর শিক্ষা পর্যায় খুলবার সঙ্গে গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও উপযুক্ত ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও গ্রহণ করবে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন

সেনেটের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করতে হবে এবং অধ্যাপকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা সেনেটে স্থান লাভ করবেন। শিক্ষাবিদ্ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সেনেটে মনোনয়নের দ্বারা স্থান করে দিতে হবে। সর্বপ্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিনিধিরা এখানে আসন গ্রহণে অধিকারী হবেন। সিণ্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকবে ৯ থেকে ১৫ জনের মধ্যে। সিণ্ডিকেটের সদস্যেরা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আসবেন সেনেট থেকে। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সেনেটের সদস্য সংখ্যার একপঞ্চমাংশ প্রতি বছর নিজেদের পদাধিকার ত্যাগ করবেন এবং সেইস্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন।

এই সময় মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষাকে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন মন্তব্য করেন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। কমিশনের মতে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা তুলে দিয়ে তৎস্থলে ৩ বৎসরের ডিগ্রীকোর্স প্রবর্তন করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার মান উন্নত করবার চেষ্টা করবে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিবার নিয়মগুলি কঠোরতর হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সেনেটকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাঞ্চল নির্ণয়ের ক্ষমতা রইল বড়লাটের উপর। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী নিয়োগ করবে। সিণ্ডিকেটের সভায় সেই সমস্ত কার্যাবলীর বিবরণী দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুমোদন লওয়া হবে।

১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন বসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য। এই কমিশনের সুপারিশ ক্রমে ইণ্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক বোর্ড অনেক প্রদেশেই গঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও ক্রমোন্নতির উপর মন্তব্য করা এই কমিশনের মূল দায়িত্ব ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্ট সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষক শিক্ষণ-ব্যবস্থার উন্নতি ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এই রিপোর্টের পরোক্ষ ফল। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর জোর সুপারিশ করেন এবং অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা সত্বর কার্যকরী করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানের সমতা রক্ষার জন্য ও নানাবিষয়ে সংহতি স্থাপনের জন্য আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠিত হয়। এর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও বীক্ষণাগারের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান দ্রুত নামতে সুরু করে। শিক্ষকদের স্বল্প

বেতন এবং কলেজ পরিদর্শকের কার্যের গাফিলতি বা কলেজের উপর কর্তৃত্ব করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্বলতা এর জন্য অনেকটা দায়ী।

১৯৪৪ সালে সার্জেণ্ট রিপোর্টের অনুমোদনক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্ট কমিশন স্থাপিত হয়। প্রয়োজন স্থলে আর্থিক সাহায্য দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজের মধ্যে সংহতি রক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত রাখা এই কমিটির মূল কর্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার—১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উপর বসে বিখ্যাত রাধাকিষণ কমিশন। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা সম্পর্কে অনেক-গুলি গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন, সিনেট ও সিণ্ডিকেটের কার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রদের বাসস্থান ও অন্যান্য ছাত্রকল্যাণমুলক কাজের বিষয় এই কমিশন সুপারিশ করেন।

রাধাকিষণ কমিশন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের যোগ্যতা ও চাকুরীর সিনিওরিটি হিসাবে তাঁদের প্রফেসর, রীডার, লেকচারার ও ইনস্ট্রাক্টর চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। কাজের যোগ্যতা দেখিয়ে পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ে যাবার দরজা খোলা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব স্তরের ও সর্ব বিষয়ের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য কমিশন নির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ দেন। সর্ব স্তরে কৃষি-বিদ্যার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং প্রয়োজন স্থলে গ্রামে ভরা ভারতবর্ষে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University) স্থাপনের সুপারিশ করেন। বাণিজ্য, শিক্ষাতত্ত্ব, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদির প্রয়োগমুলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা এতে বলা হয়। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিশন সর্বস্তরে রাষ্ট্রীয় ভাষার উপর জোর দিতে বলেন এবং ধীরে ধীরে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে একটি ভারতীয় ভাষাকে স্থান দেওয়ার কথা বিচার করেন।

১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তিত হয়। এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বেতনভোগী ভাইস্‌চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিচালনার জন্য দায়ী থাকেন। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষের মত নারীর উচ্চ-শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গ্রাণ্ট-কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ঠিক রাখবার জন্য সুচিন্তিত পন্থা অনুসরণ করবে।

১৮৫১ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন

স্বাধীনতা লাভের পুর্বে মোট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ২১টি। ১৯৫৩ সালের মধ্যে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৫ অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় এই সংখ্যা তেমন কিছু নয় কিন্তু মাত্র ১৪ বৎসরের

উচ্চ-শিক্ষার প্রসার ও নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

মধ্যে ৩৮টি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে দেশের উচ্চ-শিক্ষার চাহিদার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশের চাহিদা হিসাবে ও কর্ম সংস্থানের উপযোগিতা হিসেবে শুধু মেধাবী ও কর্মক্ষম ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পাঠ্য-তালিকা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নির্ণীত হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশী অর্থের যোগান দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি দেখে মনে হয় সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার যোগ্যতা

অনেকে বলবেন উচ্চ-শিক্ষা দেশের শতকরা একজনের শিক্ষা—এর জন্যে এত বেশী চিন্তার কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে এরাই দেশের নেতৃস্থানীয়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন, শিক্ষা-দীক্ষা এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে এঁরাই গুরু দায়িত্ব বহন করেন। উন্নত দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করছে দেশের উচ্চ-শিক্ষার উপর।

উচ্চ-শিক্ষা ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়—বর্তমানে উচ্চ-শিক্ষার এরূপ আদর্শ হবে যাতে দেশের বৃত্তিমূলক, বাণিজ্য-সংক্রান্ত, কলাকৃষ্টিসংক্রান্ত, শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা শিক্ষার্থীদের হয়। উচ্চ-শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা লাভ করবে কার্যক্ষেত্রে যাতে তার প্রয়োগের সুযোগ থাকে সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেরূপ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ-শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব প্রথম প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষার মনোভাব সৃষ্টি করা এবং উচ্চ-শিক্ষা লাভের পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর জন্য একদিকে যেমন শিক্ষা-উপকরণ ও গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও কলেজের বিশেষ করণীয়, তেমনি উপযুক্ত জ্ঞানী ও গুণী অধ্যাপকবৃন্দের সমাবেশ করাও প্রয়োজন। অধ্যাপকগণ তাঁদের গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবেন, আর রাষ্ট্র ও সমাজকে তাঁদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক মর্যাদার ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ-শিক্ষার সংগঠন

শিক্ষার্থী নির্বাচন এক গুরুতর সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা যাদের নেই তারা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে ভীড় না করে, নিজ নিজ কর্মসংস্থান করে নিজের যোগ্যতা ও গুণ অনুযায়ী বৃত্তিতে আত্ম নিয়োগ করতে পারে সে দিকে জাতীয় সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষার্থী নির্বাচন

বিগত কয়েক বৎসরে কলেজগুলি ফ্যাক্টরীর মত দিবারাত্র বিদ্যা দান করে স্নাতক উৎপাদন করে চলেছে। স্বল্প বেতনে যোগ্য শিক্ষকের অভাবে ও একই শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করাতে উচ্চ-শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত হয় নাই। গ্রন্থাগার, বীক্ষণাগার ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে এদেশের উচ্চ-শিক্ষা উন্নত দেশের উচ্চ-শিক্ষার সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। যৎসামান্য বিদ্যাদান ও বিদ্যার্জন বর্তমান অবস্থায় সম্ভব। দেশের নানা প্রকার সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে ও বিষ ক্রিয়ায় তাও সম্ভব হচ্ছে না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও সদাচারের অভাব বেশ অনুভূত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলে যে ছাত্রমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় তা থেকেই উচ্চ-শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের মনে নানা প্রকার প্রশ্ন জাগে।

উচ্চ-শিক্ষার ত্রুটি

স্নাতকোত্তর পর্যন্ত কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া হবে। ফলিতবিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রতি বেশী নজর দিতে হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রেও সাধারণ উচ্চ-শিক্ষা থাকবে এবং শিক্ষার উন্নত আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্নাতকোত্তর বিভাগে উচ্চতম জ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃত্তিমূলক উচ্চ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে। উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক ও জ্ঞানমূলক নিবন্ধ বা প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের উচ্চতম চর্চা ছাড়া D. Phil., Ph. D., D. Litt অথবা D. Sc. উপাধি দেওয়া উচিত হবে না। এই শ্রেণীর ছাত্রগণ যাতে গবেষণায় উৎসাহিত হয় তার জন্য এদের ভাল বৃত্তি (Scholarship) দেওয়া উচিত। ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য উন্নত গ্রন্থাগার, বীক্ষণাগার, পাঠ্যপুস্তক, যাদুঘর ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ-শিক্ষার পাঠক্রম ও তার উন্নয়ন

ভারতীয় উচ্চ-শিক্ষার সমস্যা—ভারতীয় উচ্চ-শিক্ষার সমস্যাগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) প্রশাসনিক ব্যবস্থা

(২) অর্থমঞ্জুরী ও অর্থনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

(৩) উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ধরণের শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যে সাহায্য দান সমস্যা।

(৪) শিক্ষক সমস্যা

(৫) শিক্ষার মান রক্ষা ও উহার উন্নয়ন সমস্যা।

প্রত্যেকটি সমস্যা অন্যান্য সমস্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা সংক্ষেপে প্রত্যেকটি সমস্যার সম্পর্কে আলোচনা করে উচ্চ-শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ার মূল সমস্যায় আসতে চাই। বৃটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক

ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তাছাড়া স্কুলফাইন্যাল বা ম্যাট্রিকুলেশন শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত থাকায় মাধ্যমিক শিক্ষার মান খুবই নিম্নগামী। নিম্নগামী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রভাব, উচ্চ-শিক্ষার উপর গিয়ে পড়ে এবং ফলে উচ্চ-শিক্ষা দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হয়।

নিম্নগামী উচ্চ-শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ও শিক্ষানীতি নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ হাত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। সরকার তার প্রতিনিধির সাহায্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস্ কমিশনের মারফৎ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ সংগ্রহ করে থাকে এবং পরীক্ষার পাশের হার গ্রেস নম্বর দিয়ে প্রয়োজন অনুরূপ বাড়িয়ে থাকে বা কমিয়ে দেয়। অর্থমঞ্জুরী ও অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হলেও সরকারের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুরূপ অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থের সমস্যাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্যাগুলিকে বড় করে তুলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত

সাধারণ কলেজগুলি ছাত্রদত্ত বেতনে পরিচালিত হয়ে থাকে। কলেজের অস্তিত্ব নির্ভর করে ছাত্র সংখ্যার উপর। তাই ছাত্র ভর্তি বিষয়ে বড় বড় সহর ছাড়া অন্যত্র কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন কড়াকড়ি করতে পারেন না। বড় বড় সহরে কলেজগুলিতে ছাত্রদের জায়গা দেওয়া এক ভীষণ সমস্যা। কলিকাতায় সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত সংকীর্তনের আসরের মত কলেজে কীর্তন হচ্ছে। অথচ কলেজের প্রবেশদ্বারে ছাত্রভর্তির জায়গা নেই বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গান আছে।

কলেজের আর্থিক অবস্থা

অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজগুলিতে উপযুক্ত গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটারী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাভাবে কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগের সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না।

অর্থের অভাবে উচ্চ-শিক্ষা নিম্নগামী

এ ছাড়া শিক্ষক সমস্যা বর্তমানে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা প্রায় চারগুণ হয়েছে কিন্তু সেই অনুপাতে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। পরীক্ষা পাশের মোহ এত বেশী যে উচ্চ-শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সেখানে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় যারা ১ম শ্রেণীতে পাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০জন শিক্ষার্থীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বেশীর ভাগ অধ্যাপককে

শিক্ষকের মান

দেখা যায় ছাত্র জীবনে কলেজের ক্লাসে যে নোট নিয়েছিলেন তাই একটু ঢেলে সেজে তাঁর ছাত্রদের কাছে পরিবেশন করেন। নোট তৈরী ও নোট মুখস্থ করা উচ্চ-শিক্ষা জগতে মড়ক এনেছে। বাজারে Note Book, Suggestion, Tutors ইত্যাদির সংখ্যা এত বেশী যে শুধু পাশ করার জন্য বিশেষ কিছু শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাই নূতন যুগে যারা শিক্ষক বা অধ্যাপক হচ্ছেন তাঁদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাঁরা অনেকেই প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের সাহচর্য পান নি তাই জীবনে শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা বিগত যুগের মত অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না।

তাছাড়া সে যুগে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আদর্শবাদ ছিল; বর্তমান আর্থিক অবস্থার জন্য অনেকেই সে আদর্শ থেকে দূরে সরে এসেছেন। শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সেই কারণে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার, I.A.S ও অন্যান্য সওদাগরী ও সরকারী কর্মচারীদের বাজার দর বেশী এবং সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিও বেশী। শিক্ষকের আদর্শ আজ ছাত্র অনুসরণ করে না কারণ জীবনযুদ্ধে যারা পরাজিত তাঁরাই শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের শতকরা ৯৫ জন শিক্ষকতা বৃত্তিগ্রহণ করাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করে গোড়া থেকেই সরে পড়ে। তাই এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ., এম. এস্‌সি. শ্রেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকদের অধ্যাপনা করতে দেখা যায়। অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সংখ্যক দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক পর্যন্ত নিয়োগ করতে পারছেন না।

উচ্চ-শিক্ষা দেবার শিক্ষকের অভাব

শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি ও চাকুরীর সর্ত উন্নয়নের আন্দোলন শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়াতেই জোরাল হয়েছে। বর্তমানে যাঁরা শিক্ষকতা বৃত্তিতে আছেন তাঁরা আর্থিক মর্যাদায় তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের সমান পংক্তিতে বসতে পারেন না। তাঁরা শিক্ষিত এবং আরও দশজনের মত বৃত্তিজীবী। তাঁদের স্ত্রীপুত্র পরিবার অন্যান্য দশজনের মত সামাজিক মর্যাদা পেতে চান এবং উৎসবে ও পার্বণে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সওদা করতে তাঁদের স্ত্রীপুত্রদেরও ইচ্ছা হয় এবং তাঁরাও তাঁদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁরা বুদ্ধিজীবী বলে হাইকোর্টের বিচারকদের মত হয়ত ছুটিগুলি সমানই পান কিন্তু ছুটি ভোগ করতে পারেন না। জীবনের দৈন্য দশার জন্য সমাজকে ও রাষ্ট্রকে দায়ী না করে জনসাধারণ শিক্ষকতা (কি কলেজে, কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি স্কুলে) বৃত্তিকে দায়ী করে থাকেন এবং শিক্ষকগণ ভগ্নহৃদয়ে এই বৃত্তিটির বোঝা বয়ে বেড়ান। প্রকৃতপক্ষে সমাজের ও রাষ্ট্রের বৃত্তি বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব এর জন্য

অধ্যাপকদের স্বল্প বেতনের চাকুরী ও সামাজিক মর্যাদার অভাব হেতু উচ্চ-শিক্ষার মান নিম্নগামী

দায়ী। তাছাড়া শিল্প, কৃষি বা বাণিজ্য বিভাগের তুলনায় শিক্ষা বিভাগে আয়ের সম্ভাবনা কম অথচ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত বিবিধ রকম শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হলে সরকারের অনুমোদন চাই। জনসাধারণের দাবী জোরাল না হওয়াতে সরকারী শিক্ষাখাতে ব্যয় না বাড়িয়ে বরং কমিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। শিক্ষকদের জাতির সংগঠক (Builders of Nation) বলে ফলাও করে গুণ কীর্তন করা হয় কিন্তু সরকার শিক্ষকদের ভদ্র ও সংস্কৃতি সম্পন্ন জীবন যাপনের সুযোগ দিতে চান না সেইজন্য প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা শিক্ষকতা বৃত্তি ত্যাগ করে যে সব বৃত্তিতে আয় বেশী সেই সব বৃত্তিতে যোগদান করেন। একদিকে যোগ্য শিক্ষকের অভাব অন্যদিকে প্রকৃত শিক্ষার সমাদর না থাকায় ছাত্রেরা শিক্ষা অপেক্ষা ডিগ্রী লাভকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাছাড়া শিক্ষা-উপকরণের অভাব, গ্রন্থাগার ও বীক্ষণাগারের অভাব শিক্ষার নিম্নগামিতার জন্য দায়ী।

উচ্চ-শিক্ষার বর্তমান অবস্থা—বর্তমানে প্রশাসনিক দিক থেকে বিচার করলে চার জাতীয় মহাবিদ্যালয় দেখা যায়। এদের মধ্যে কিছু সাহায্যপ্রাপ্ত বাকীগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত নয়। কলেজের পাঠক্রমের দিক থেকে বিচার করলে তিন শ্রেণীর কলেজ দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নের চার্ট* থেকে বিষয়টি বুঝতে পারা যাবে।

প্রশাসনিক দিক থেকে চার জাতীয় মহাবিদ্যালয়	কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	বৃত্তিমূলক কলেজ	বিশেষ প্রকার কলেজ	শতকরা হিসাব
(১) সরকারী পরিচালিত কলেজ	১৮৬	১৯৪	২৮	৩৩.৯%
(২) স্থানীয় সংস্থা পরিচালিত কলেজ	৩	৩	১	০.৬%
(৩) বেসরকারী কলেজ (সাহায্যপ্রাপ্ত)	৪৫৮	১০১	৬৮	৫২.৩%
(৪) যেগুলি কলেজ সাহায্য গ্রহণ করে না	৯৯	৪৫	১৫	১৩ ২%
	৭৪৬	৩৪৩	১১২	১০০.%

উক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা জনসাধারণের চেষ্টায় এগিয়ে গেছে ৬৬% ভাগের বেশী। সরকারী প্রচেষ্টায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে শতকরা ৬০% ভাগের বেশী। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করতে হয় পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী পাঠাবার জন্য।

বর্তমানে বৃত্তিমুলক শিক্ষার দায়িত্ব সরকার নিজেই গ্রহণ করছেন তাছাড়া উচ্চতর কারিগরী মহাবিদ্যালয় ও টেকনোলজীগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে।

বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষা

* ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মূলতঃ তিন প্রকারের।

(১) অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় (Affiliating University): এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে স্থানীয় প্রয়োজনে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনুমোদন দান, কলেজ পরিদর্শন, পরীক্ষা পরিচালনা, কলেজে পাঠক্রম প্রস্তুত ইত্যাদি কার্য করে থাকে। এই বিস্তীর্ণ দেশে উচ্চ-শিক্ষার প্রসার কল্পে এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

তিন প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয়

(২) একক বিশ্ববিদ্যালয় (Unitary University)—একটি বিশেষ অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্ররূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। সিনেটে বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধি থাকবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করবেন। শিক্ষকদের চাকুরীর সর্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(৩) ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয় (*Federal* University)—কতকগুলি কনষ্টিটুয়েণ্ট কলেজ নিয়ে এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে এবং বিভিন্ন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় পড়ান হবে। প্রত্যেকটি কলেজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে তবে শিক্ষা সম্পর্কিত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বিষয়ে মুলনীতিগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। উচ্চ-শিক্ষার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষানীতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্নমুখী প্রয়োজনকে মেটাবার জন্য এদেশে বর্তমানে প্রায় ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫টি টেকনোলজি স্থাপিত হয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠা বিশ্ববিদ্যালয়

এ ছাড়া বর্তমানে বিশেষ-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশে টেকনোলজিকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সমস্যাসঙ্কুল উচ্চশিক্ষা

তবে নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সমস্যাসঙ্কুল। এগুলির মধ্যে—(১) সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সমস্যা, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, (৪) জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত কলেজগুলির বিবিধ সমস্যা, সর্বোপরি (৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের অবনতি ও পরীক্ষার বিবিধ সমস্যা ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষাকে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলেছে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তৎসম্পর্কিত নানা সমস্যা ও ভারতবর্ষের সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির সাথে যুক্ত রয়েছে। তাছাড়া নানা বিষয়ে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে এলেও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত দেশের বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।

গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনামূলক ভাবে উচ্চ-শিক্ষার অগ্রগতির পরিচয়—স্বাধীনতা লাভের ১২ বৎসর পূর্বে দেশীয় মন্ত্রীগণ শিক্ষা ব্যবস্থার চাবিকাঠি হাতে পেয়ে ছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা খাতে খুব সামান্য অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার কোন স্তরেই তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হয়। এই জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাকে দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী দু'টি পর্যায়ে রেখে মূল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সাথে শিক্ষা পরিকল্পনাকে সন্নিবেশিত করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিপ্লবাত্মক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দিকে শিক্ষাবিদ্‌দের প্রবণতা দেখা যায়। বুনিয়াদি শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং তৃতীয় বার্ষিক স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ২ বৎসরের স্নাতোকোত্তর শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের সাথে তাল রেখে উচ্চ শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশ বেড়ে চলেছে। সাধারণ হিসাবে দেখা যায় প্রতি ১০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ জন প্রাথমিক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দেয়। বাকী ৫০ জনের মধ্যে ২০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে। এদের মধ্যে ৮ জন মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; আবার এই ৮ জনের মধ্যে ৫জন বৃত্তি অবলম্বন করেন আর তিন জনের মধ্যে ১ জন টেকনিক্যাল লাইনে যান ২ জন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলেজে ভর্তি হন এবং ১ জন স্নাতক হয়ে আসেন। স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পেরিয়ে এম, এ বা এম, এসসি হয় ০'২ জন। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বেশী; আবার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের তুলনায় উচ্চ-শিক্ষার প্রসার অনেক বেশী। পরপৃষ্ঠার চার্ট থেকে ইহা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে।

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি

বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির * তুলনামূলক হিসাব

বৎসর	প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬—১১)	মধ্য-বিদ্যালয় (১১—১৪)	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ('৪—১৭)	বিশ্ববিদ্যালয় (১৭—২৩)
১৯৫০—৫১	১৯১'৫	৩১'২	১২'২	৩'৬০
১৯৫৫—৫৬	২৫১'৭	৪২'৯	১৮'৮	৬'৩৪
১৯৬০—৬১	৩৪৩ ৪	৬২'৯	২৯'১	৯'০০
১৯৬৫—৬৬	৬৯৬'৪	৯৭'৫	৪৫'৫	১৩'০০

উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় ১৯৫০—৫১ সালে ১৯১ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকলে ১৯৬৫—৬৬ সালে উহা প্রায় ৬৯৬ জনে দাঁড়াবে অর্থাৎ আড়াই গুণ হবে। তুলনামূলক ভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (মিডলস্কুলসহ) ছাত্র সংখ্যার হার ১৯৫০—৫১ সালে ৪৩ জনের স্থলে ১৯৬৫—৬৬ সালে ১৪২ জন হবে অর্থাৎ সাড়ে তিন গুণ হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বেশী। উচ্চ-শিক্ষার প্রসার হয়েছে পুর্বের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বেশী। অতএব তুলনামূলক ভাবে উচ্চ-শিক্ষার প্রসার সব চেয়ে বেশী।

শিক্ষার প্রসারের স্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য **তুলনামূলক* শতকরা হিসাব।**

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মধ্য-বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়
বয়সের মান	(৬—	১১—১৪)	(১৪—১৭)	(১৭—২৩)
বৎসর—				
১৯৫০-৫১	৪২'৬	১২'৭	৫'৩	০'৯
১৯৫৫-৫৬	৫২.৯	১৬'৫	৭'৮	১'৫
১৯৬০-৬১	৬১'১	২২'৮	১১'৫	১'৮
১৯৬৫-৬৬	৭৬'৪	২৮'৬	১৫'৬	২'৪

*শতকরা হিসাব বয়সের মান-এরদল (Age group) হিসেবে লওয়া হয়েছে এই বিষয়টিকে অন্য দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় গত ১৫ বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার উপযুক্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৪২'৬ জনের স্থলে ৭৬'৪ জন, মাধ্যমিকস্তরে শতকরা ১৮ জনের স্থলে ৪৪'২ এবং বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে শতকরা ০'৯ জনের স্থলে ২'৪ জন বর্তমানে শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

পরপৃষ্ঠায় উচ্চ শিক্ষার প্রসারের বিচার করা হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার বাড়তি থেকে।

উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
বিশ্ববিদ্যালয়	২৭	৩২	৪৬	৫৫
ইনষ্টিটিউট্ অফ্ টেকনোলজি	০	২	৫	৭
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	৪৯	৬৫	৯৮	১১৭
পলিটেকনিক	৮৬	১১৪	১৯৬	২৬৩
পরিচালনা বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০	০	১	৩
গবেষণা কেন্দ্র (বিশ্ববিদ্যালয় বাদে)	৫	১৭	২১	৩৫

বর্তমানে ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী, কৃষি ও বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ফলিত বিজ্ঞানের উপর স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশেই প্রবর্তিত হয়েছে। গবেষণার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। নিম্নে মূল গবেষণা (Basic Reseach) এবং শিল্প সম্পর্কিত গবেষণা (Industrial Research) এর জন্য *ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হোল। ইহা উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণার কি স্থান তা নির্দেশ করে দেবে।

গবেষণার ক্ষেত্র	২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়	৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়	৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
বিজ্ঞান ও শিল্পের উপর গবেষণায়	২০ ০০	৩৫'০০	৪৬ ০০
আণবিক শক্তির উপর গবেষণায়	২৭'০০	৩৫'০০	৫০'০০
কৃষি বিজ্ঞানের উপর গবেষণায়	১৩'৮০	২৬'৪০	২৪'০০
চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর গবেষণায়	২'২০	৩'৫০	
বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায়	৯'০০	৩০'৮৯	২০'০০
মোট	৭২'০০	১৩০'৭৯	১৪০'০০

* ব্যয়ের পরিমান কোটি টাকার হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ১৪ কোটি টাকা, ২য় পরিকল্পনায় ৪৫ কোটি টাকা এবং ৩য় পরিকল্পনায় ৮২ কোটি টাকা। এ ছাড়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বেসরকারী তরফ থেকে উচ্চ-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য। সর্বদিক বিচার করলে দেখা যায় গত ১৫ বৎসরে উচ্চ-শিক্ষার প্রসারে ও গবেষণায় ভারতবর্ষ অনেকটা এগিয়ে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের পথে

শিক্ষার কাঠামো গড়ে তোলে যারা—ভারতবর্ষের শিক্ষার যে কাঠামো গত দু' শত বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে এদেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ছাপ তথা বিদেশী শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতবর্ষ পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করবার পর এ দেশের শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য নানা দিক থেকে প্রচেষ্টা চলতে থাকে। কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নদীর ধারার মত অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান। সভ্য মানুষ শিক্ষালাভের দ্বারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক-বংশগতির উত্তরাধিকারী হয়। অবশ্য বিজ্ঞান যেরূপ দ্রুতগতিতে মানুষের ধর্ম ও কর্ম জীবনকে নূতন পথে চালিত করছে তাতে সাংস্কৃতিক-বংশগতির কতটুকু কোন যুগে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে তা রীতিমত চিন্তার বিষয়। তবু একথা ঠিক জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর। দেশের মাটিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো গড়ে তুলতে না পারলে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না। আমরা 'ভারতীয় শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমিকা'য় এদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করছি। 'শিক্ষার কাঠামো' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বার বার একথাই আলোচনায় এসে পড়েছে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ধারার প্রভাব খুব বেশী রয়েছে এ দেশের আধুনিক শিক্ষার উপর। বিজ্ঞান শুধু শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ও কৃষিকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেনি, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও বিজ্ঞানের প্রভাব কম নয়। তাই আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন করতে গিয়ে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

শিক্ষা পুনর্গঠনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা পুনর্গঠনের নিয়ামক ও সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত-সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের গঠন মূলক পরিবর্তন ও তাদের কার্য ধারার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তর—স্বাধীনতা লাভের পর সুযোগ্য শিক্ষাবিদ মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরটি একজন শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে যায়। এইভাবে শিক্ষা বিষয়টির স্থান হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে

(Central Cabinet)। শিক্ষা পরিচালনা, শিক্ষা-সংস্কার, শিক্ষার নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগকে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর প্রধান প্রধান বিষয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার প্রধানতম দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে। শিক্ষা পরিচালনা বিষয়টি মূলতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। এরা হচ্ছে (১) কেন্দ্রীয় সরকার (২) রাজ্য সরকার (৩) আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানসমূহ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা নীতির স্বরূপ নির্ধারণ। সর্ব ভারতীয় শিক্ষার মান সংরক্ষণ, বিদেশে উচ্চ-শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রেরণ, আন্তঃবিদ্যালয় শিক্ষাসম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, রাষ্ট্রভাষার উন্নয়ন, শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহা পরিচালনা, যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সামাজিক শিক্ষার সর্বভারতীয় মান নির্ণয় ও মান সংরক্ষণ ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব

রাজ্যের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করেন রাজ্য সরকার। ভারতীয় শিক্ষানীতি পরিচালনার নির্দেশ যা দেওয়া হয় রাজ্য সরকার প্রয়োজন হলে তা পরিবর্তন করে কার্যকরী করতে পারেন, রাজ্যের প্রয়োজনে অবশ্য পরিকল্পনার মূল কাঠামো ঠিকই রাখা হয়। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয় রাজ্য সরকার সেই পরিমাণ অর্থ সেই বিষয়ে খরচ করতে বাধ্য থাকেন। আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি অনুসরণ করে, শিক্ষার কোন নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এদের নেই। আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি, রাজ্য সরকার ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তরের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একে নিম্নলিখিত **আটটি বিভাগে** বিভক্ত করা হয়েছে। (১) প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর, (২) মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর, (৩) উচ্চ-শিক্ষা ও ইউনেস্কো শিক্ষা দপ্তর, (৪) হিন্দী প্রচার ও প্রসার বিভাগ, (৫) সামাজিক শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ, (৬) শারীরিক শিক্ষা ও চিত্ত বিনোদন বিভাগ, (৭) বৃত্তি বিভাগ ও (৮) শিক্ষা পরিচালনা বিভাগ (সাধারণ)।

এ ছাড়া নিম্নলিখিত উপদেষ্টা কমিটিগুলি শিক্ষা-দপ্তরকে নানাভাবে সাহায্য করছে। (১) কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, (২) বিশ্বদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, (৩) নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, (৪) নিখিল ভারত প্রাথমিক

শিক্ষা পরিষদ, (৫) কেন্দ্রীয় সামাজিক শিক্ষা পর্ষদ, (৮) জাতীয় অডিও ভিস্যুয়াল বোর্ড, (৯) জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা পরিষদ, (১০) জাতীয় পল্লী-উচ্চ-শিক্ষা পরিষদ ইত্যাদি। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তথা পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন।

শিক্ষা বিষয়ে উপদেষ্টা কমিটি সমূহ

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তর—স্বাধীনতা লাভের পর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের উপর দেশের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের দায়িত্ব এসে পড়ে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষ ভাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ না করলেও বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে পরোক্ষ ভাবে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, শিক্ষার কাঠামো গঠন, এমন কি শিক্ষার মান নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। রাজ্য সরকার শিক্ষার বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায়। তাছাড়া বিভিন্ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রভূত অর্থ রাজ্য সরকারের মারফত খরচ করেন। মূলতঃ সর্বস্তরের শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের আর শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, শিক্ষার নূতন কাঠামো গঠন ও শিক্ষা সম্পর্কে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। অবশ্য ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টার দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করাতে 'একজাতি একপ্রাণ একতা' ভাবটি শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেক্‌নোলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্-এর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। রাজ্য-সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বা উচ্চতর টেকনিক্যাল শিক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের দ্বারা উচ্চ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করে থাকেন এবং নীতিগতভাবে এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইন্‌ষ্টিটিউট্‌গুলির শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী থাকেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর ও প্রাদেশিক শিক্ষাদপ্তরের পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা

প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ডিস্ট্রিক্টবোর্ড, লোক্যালবোর্ড, ইউনিয়নবোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকিলেও এর নিয়ন্ত্রণের ভার রয়েছে রাজ্য সরকারের হাতে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও কলেজীয় শিক্ষা ছাড়া নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা এবং সঙ্গীত, চারুকলা, অঙ্কন এবং বিকলাঙ্গদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য সরকারের হাতে। প্রকৃত পক্ষে রাজ্য সরকারের হাতেই রাজ্যের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির দায়িত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষা পরিকল্পনা গঠন, শিক্ষা নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে রাজ্যের আইনসভার কাছে দায়ী। শিক্ষা বিভাগটিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন।

রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের দু'টি অংশ, যথা:—

(১) শিক্ষা মহাকরণ (Secretariat of Education)

(২) শিক্ষা অধিকার (Directorate of Education)

শিক্ষা মহাকরণ

শিক্ষামন্ত্রীর কার্যকলাপের সাথে শিক্ষামহাকরণটি যুক্ত। শিক্ষাসচিব (Education Secretary) তাঁহার সহকারীদের নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে সাহায্য করেন। শিক্ষা পরিকল্পনা ও সরকারী শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও তার রূপ দান শিক্ষা মহাকরণের অন্যতম কর্তব্য। রাজ্যের শিক্ষার অবস্থার তদন্ত করা এবং জনগণের শিক্ষা দাবীর কথা বিচার করাও এই মহাকরণের করণীয় কার্য।

শিক্ষা অধিকার

শিক্ষা অধিকারের মূল কর্তা হচ্ছেন শিক্ষা-অধিকর্তা (Director of Instruction)। পশ্চিমবঙ্গে এই অধিকর্তার নাম হচ্ছে জনশিক্ষা-অধিকর্তা (Director of Public Instruction)। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কার্যনির্বাহক কর্মচারী হিসেবে তাঁকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিকল্পনার রূপায়ণ ও সরকারের শিক্ষানীতির উপযুক্ত প্রয়োগ ব্যাপারে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা। রাজ্যের সর্বপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন।

শিক্ষা অধিকর্তাকে সাহায্য করবার জন্য কয়েকজন উপ-শিক্ষা-অধিকর্তা আছেন। এঁরা শিক্ষার এক একটি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-সম্পর্কিত বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য প্রধান পরিদর্শক আছেন। আবার প্রতি জেলায় একজন করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আছেন। প্রধান পরিদর্শক এঁদের কার্যের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ জেলা পরিদর্শককে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন। প্রত্যেক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি পরিদর্শন করবার জন্য সহকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

এখনও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসনের অবসান হয়নি। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ ও শিক্ষা দপ্তরের হাতে আছে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ—পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য। সরকারী শিক্ষা দপ্তরের হাতে ছিল বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের

ক্ষমতা। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চাবিকাঠি সরকারের থাকলেও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমান ভাবে পরিচালিত করবার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাশ হবার পর। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাত থেকে তুলে নিয়ে পর্ষদের হাতে দেওয়া হয়েছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদের কার্যক্রম

(১) স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণের ফলাফল প্রকাশের পূর্ণ দায়িত্ব।

(২) পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন এবং পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন।

(৩) সরকারী শিক্ষা দপ্তরের সুপারিশ অনুসারে গ্র্যাণ্ট-ইন-এড্ দেওয়া।

(৪) বিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কে স্কুল কোড (School Code) প্রণয়ন করা।

(৫) স্কুলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মেটাবার জন্য সালিশীর বন্দোবস্ত করা।

(৬) প্রয়োজন স্থলে স্কুল কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে পরিচালক (Administrator) নিয়োগ করা।

শিক্ষা দপ্তর বোর্ডকে গ্রাণ্ট দিয়ে থাকেন এবং এই গ্রাণ্ট থেকে বোর্ড প্রয়োজনীয় খরচ করে থাকে। তবে পরীক্ষার দক্ষিণা (Examination fee) থেকে বোর্ডের প্রচুর আয় হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাশ হবার পর গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের সাহায্যে বোর্ডের বেশীর ভাগ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অবশ্য আইন অনুসারে কয়েকটি পদ সরকারের ও অন্যান্য শিক্ষা সংস্থার মনোনয়নের সাহায্যে পূর্ণ করা হয়েছিল। বোর্ডের সভ্য তালিকায় নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী ছিল এবং বোর্ডটি সত্যই একটি স্বয়ংচালিত সংস্থা রূপে গড়ে উঠেছিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কার্য ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে স্কুলগুলির পরিচালনার উপর ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে থাকে যে বোর্ড ও সরকারী দপ্তরের দ্বৈত শাসনের কুফল স্বরূপ বিভিন্ন স্কুলে স্বৈরাচারী পরিচালক সমিতি স্কুলের কর্তৃত্ব নিয়ে বেশ দলাদলির সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। সরকারী দপ্তর বোর্ডের স্বাধীন সত্তাকে কখনও ভাল চোখে দেখে নি। তা ছাড়া বোর্ড তার গুরুদায়িত্ব ঠিকমত পালন করিতে সমর্থ না হওয়াতে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

পর্ষদের সংগঠন

দেশ বিভাগের ফলে বহু শিক্ষিত পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্র সংখ্যাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পুরাতন পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করে যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, দশমশ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ের স্থলে একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বহুমুখী বিদ্যালয়

পর্ষদের কার্যের পরিধি বৃদ্ধি

স্থাপন এবং পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি একের পর এক এসে বোর্ডের কার্য তালিকায় ভীড় করতে থাকে।

বৎসরের পর বৎসর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্ষদের চরম ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হাওয়ায় সরকার নিজহস্তে পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পর্ষদের কার্য পরিচালনা করবার জন্য পরিচালক (Administrator) নিযুক্ত করেন।

গত কয়েক বৎসর ধরে নূতন করে বোর্ড গঠনের জন্য জনমত সৃষ্টি হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ নূতন করে গঠন করেনি। দে-কমিশনের রিপোর্ট ও মুদালিয়র কমিশনের নির্দেশ অনুসারে মাধ্যমিক বোর্ডকে একটি উপদেষ্টা সংসদরূপে গঠন করার প্রস্তাব হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর সরাসরি ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে বদ্ধপরিকর। সরকারের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরাট জনমত সৃষ্টি হয়েছে বলে সরকার এখনও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের বিপুলায়তন কর্মধারাকে সরকারের কুক্ষিগত করেন নি।

পর্ষদকে একটি উপদেষ্টা সংসদ রূপে গড়ে তোলবার প্রস্তাব

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বৈতশাসন বহুদিন যাবৎ চলে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতেন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আর সরকার করতেন মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ। বর্তমানে সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণের ভারটি ঠিকই আছে। সরকার শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ দুইই করতে চাইছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বৈত-শাসন

মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন সেই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠন করতে হবে। এই বোর্ডের হাতেই মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে। এই বোর্ড স্বাধীনভাবে সরকারী আওতার বাইরে থেকে এর কার্য পরিচালনা করে যাবেন।

নূতন মাধ্যমিক বোর্ডের সদস্য সংখ্যাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মাধ্যমিক বোর্ডটি মূলতঃ সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি উপদেষ্টা সমিতি। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন ও প্রসার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করাই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য। এই বোর্ডটিকে মোটেই গণতন্ত্র সম্মত বোর্ড বলা চলে না।

নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের গঠন

তাছাড়া এই বোর্ডটি মোটেই স্বয়ংচালিত নয় এবং অর্থের জন্য ইহাকে সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হয়। অর্থের যোগান দিয়ে সরকারী দপ্তর বোর্ডের উপর নানা প্রকার ফতোয়া জারী করবার সুযোগ পাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার

নিয়মকানুন রচনা করবার অধিকার বোর্ডের থাকলেও মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের বিধান অনুসারে (Secondary Education Act) বোর্ডের নিয়মকানুন সবই সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ। নানা পাকচক্রে এমন ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে যে মাধ্যমিক বোর্ড শেষ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত একটি উপদেষ্টা কমিটিরূপে কাজ করতে বাধ্য হবে।

সরকারের দায়িত্ব হবে মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করা এবং এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাথে সংযোগ (Co-ordination) স্থাপনের দায়িত্ব থাকবে সরকারী শিক্ষা বিভাগের। শিক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থের বিলি বন্দোবস্ত সরকারী নির্দেশে বোর্ডকে করতে হবে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এই পর্ষদের সভাপতির কাজ করলে অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযোগ স্থাপনের সুবিধা হবে। মূলতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী থাকবেন।

সরকার ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ

কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি এদেশের শিক্ষার পুনর্গঠনে বিশেষ সাহায্য করছে—

১। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ (Central Advisory Board of Education)

২। জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা সমিতি—(National commitee of women Education)

৩। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (University grants Commission)

৪। নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ (All India Councial for Elementry Education)

৪। নিখিলভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (All India council for Secnondary education)

৫। নিখিলভারত কারিগরী শিক্ষা সংসদ (All India council for Technical Education)

এ ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষা, পরিচালক শিক্ষা (Management trainig) শ্রমিক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার কাঠামো প্রস্তুত এবং ঐ জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার পরামর্শ দেবার জন্য ভারত সরকার কয়েকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন করেন। এখানে উক্ত সংস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ—শিক্ষা প্রাদেশিক সরকারের হাতে যাবার পর শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার

সাথে নানা বিষয়ে সংযোগ সাধনের জন্য সরকার একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কথা চিন্তা করেন। এই পরিষদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ (Central Advisory Board of Eduction) স্থাপিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদ হিসাবে এই পরিষদের কার্য প্রশংসনীয় হ'লে শিক্ষার ব্যয় সংকোচের জন্য পরিষদটিকে তুলে দেওয়া হয়। শীঘ্রই এই ব্যবস্থার ত্রুটি ধরা পড়ে এবং ১৯৩৫ খ্রীঃ পুনরায় কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষামন্ত্রীর নিয়ন্ত্রাধীনে" শিক্ষাদপ্তর পরিচালিত হতে থাকে। শিক্ষা দপ্তরের কলেবর অনেকটা বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটির কার্যের পরিধিও বেড়ে যায় স্বাধীনতা লাভের পর।

শিক্ষার সর্বস্তরের নানা পরিবর্তন সম্পর্কে বোর্ডকে সচেতন থাকতে হয়। মাধ্যমিক, প্রাথমিক বা বিশেষ শিক্ষার নীতি নির্ধারণের জন্য সরকার বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন, শিক্ষার নূতন মাধ্যম গ্রহণ, মাধ্যমিক শিক্ষায় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব, প্রাথমিক শিক্ষায় কারুশিল্পের প্রচলন ইত্যাদি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে বোর্ডের পরামর্শ অপরিহার্য। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে বোর্ড গঠিত হওয়ায় শিক্ষার নীতি নির্ধারণে বোর্ডের পরামর্শের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন বোর্ডের অন্যতম কর্তব্য।

জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা কমিটি—স্ত্রী-শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির জন্যে জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা কমিটি (National Committee of Women's Education) গঠিত হয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষায় ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই অগ্রণী, তবে গত ১০০ বৎসরের বেশী সময় স্ত্রী-শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মহিলারা বৃত্তি শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হবার পর গণতন্ত্রী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্ত্রীলোকের সমান রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই অধিকার রক্ষার জন্য শিক্ষার সর্ব স্তরে এবং সমস্ত বিভাগে প্রবেশ করবার জন্য মহিলাদের সমান অধিকার দিতে হবে। এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি স্ত্রী-শিক্ষার বিভিন্ন দিকের কর্ম পরিচালনা ও তদারক করবে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা সমিতির কার্যকলাপ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা কমিটি গঠন

(১) বালিকাদের জন্য (৬—১১ বৎ) সার্বজনীন ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অগ্রাধিকার। এজন্য গ্রামে বিশেষ করে অনুন্নত এলাকায়, শিক্ষিকা নিয়োগ বাঞ্ছনীয়; (২) প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের সামাজিক শিক্ষার

সুব্যবস্থা করা অবশ্য করণীয় ; (৩) কৃষক পল্লীতে ও শ্রমিক বস্তিতে মহিলাদের জন্য কারুশিল্প প্রশিক্ষণের (Craft Training Centre) ব্যবস্থা করতে হবে ; (৪) মধ্যবিত্ত মহিলাদের জন্য সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে নানা প্রকার বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তি নির্দেষণার ব্যবস্থা রাখতে হবে ; (৫) প্রসূতি কল্যাণ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করে মা ও সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে ; (৬) বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী স্তর পর্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষাকে অবৈতনিক করার জন্য জোর দিতে হবে ; (৭) স্ত্রী-স্বাধীনতা রক্ষা ও মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করার জন্যে সভাসমিতি ও ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে ; (৮) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সূচীশিল্প, চারুশিল্প, গার্হস্থ বিজ্ঞান, সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে ; (৯) কলেজীয় শিক্ষায় বিশেষ করে শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণে মাহলাদের বিশেষ সুযোগ দিতে হবে ; (১০) বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বস্তরে যোগ্যতা অনুসারে মহিলাদের ভর্তি হবার সুযোগ দিতে হবে ;

জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা কমিটির কার্যাবলী

উপরোক্ত বিষয়গুলি যাতে শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যে পরিণত করা হয় সেজন্য জাতীয় মহিলা শিক্ষা সমিতি সর্ব প্রকার চেষ্টা করে যাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন—ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত সম্পূর্ণ স্বাধীন বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের (যেমন জার্মাণীর) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মত সম্পূর্ণ রূপে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নয়। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বয়ং শাসিত প্রতিষ্ঠান। তবে দু'টি বিষয়ে সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ দু'টি হচ্ছে (১) রাজ্য সরকারের আইন থেকে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলাভ করে (২) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য রাজ্য-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার চলতি সাহায্য (recurring grant) এবং এক কালীন সাহায্য (Non-recurring grant) দিয়ে থাকেন। রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (chancellor) এবং প্রধান মন্ত্রী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। এই সূত্র ধরেই ক্ষমতাসীন দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। কথায় বলে 'টাকা দেয় যে কর্তৃত্ব করে সে'। সরকারী সাহায্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আসে সরকারী সাহায্য থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রাথমিক শিক্ষা (বুনিয়াদী শিক্ষাসহ) ও মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ; তাই রাজ্য সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশী অর্থ মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। অথচ অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অচল হবার উপক্রম। এই ব্যবস্থার প্রতিকার করার জন্য ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার বিশ্ব-

বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৬৫ সালে এক আইনের বলে এই প্রতিষ্ঠানটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গ হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের উচ্চ শিক্ষাকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করত। জাতীয় উচ্চ শিক্ষার নীতি নির্দ্ধারণ ও শিক্ষার মান নির্ণয় এবং জাতীয় গবেষণাগার সমূহের সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীত প্রায় সমুদয় কার্যের ভার দেওয়া হয়। কমিশন কতকগুলি সর্তের উপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্য করে থাকে। কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে অর্থ সাহায্য করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যসূচীতে কমিশন কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের উপর রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কারও হাত নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার, উন্নতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, হোষ্টেল, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ইত্যাদির উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নূতন বিভাগের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ, অধ্যয়ন ও গবেষণা করবার সুবিধা দেওয়া এবং শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করে তাদের সামাজিক মর্যাদা দান ও আর্থিক সুবিধা দান ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব মঞ্জুরী কমিশনের হাতে রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কার্যাবলী

কমিশন কতকগুলি সাহায্য সরাসরি দান করেন রাজ্য সরকারের মারফৎ আর কতকগুলি সাহায্য রাজ্য সরকারের সাথে ভাগে দিয়ে থাকেন। প্রাক্ স্নাতক শিক্ষার ব্যয়ভারের বেশী অংশ রাজ্য সরকারের দেয় আর স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যয়ভার কমিশনের দেয়। গবেষণার বেশীর ভাগ খরচ কমিশন দিয়ে থাকে। চলিত সাহায্যের ½ অংশ রাজ্য সরকার আর ½ অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়, আর এক কালীন সাহায্যের ⅓ অংশ রাজ্য সরকারের এবং ⅔ অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে রাজ্য সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ খরচ বহন করতে বাধ্য থাকবে কিন্তু কার্যকালে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ অনেক বাড়াতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান নিম্নগামী। উচ্চ-শিক্ষার মানের এই নিম্নগামিতায় উদ্বিগ্ন হয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য মঞ্জুরী কমিশনকে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্য দান

নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ—এই পরিষদ ১৯৫৫ খ্রীঃ স্থাপিত হয়েছে ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, নূতন নীতি প্রবর্তনের সুপারিশ ও উহার প্রসার ও উন্নতির প্রতি কড়া নজর রাখার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষা-সম্পাদক ও আরও অনেকে এই পরিষদের সদস্য হিসেবে থেকে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সংসদ—১৯৪৫ খ্রীঃ এই সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারিগরী ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিষয়ে এই সংসদের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। পার্লামেণ্ট, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, রাজ্য সরকার, বেসরকারী শিল্পসংস্থা, পেশা সংস্থা ইত্যাদির ৬০ জন প্রতিনিধি এই সংসদদের সদস্য হিসেবে আছেন। কাজের সুবিধার জন্য ছোট একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই সংস্থার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন। সংসদের সুপারিশ ক্রমে চারিটি আঞ্চলিক সমিতি গঠিত হয়েছে। ঐগুলি আঞ্চলিক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তদারক করে থাকে।

স্কুলবোর্ড ও পৌরসভা—বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হয়েছে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিক দায়িত্ব, শিক্ষক নিয়োগ, স্কুল গৃহ নির্মাণ, স্কুলের আসবাবপত্র ও অধ্যাপনার সাজসরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব স্থানীয় স্কুলবোর্ড বা পৌরসভার। শিক্ষা মহাকরণের মারফৎ প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা প্রস্তুত, পাঠক্রম রচনা, বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দান ইত্যাদি কাজগুলি সরকার করে থাকেন। রাজ্য সরকারের জেলা পরিদর্শক স্কুল বোর্ডের সম্পাদক রূপে সরকারী এবং স্কুলবোর্ড বা পৌরসংস্থার প্রশাসনিক কার্যের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করে থাকেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুলবোর্ড ও পৌর-সভার দায়িত্ব

প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের দায়িত্ব

দ্বৈত শাসনের আওতায় থেকে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার মোটেই আশাপ্রদ হয় নি প্রাথমিক শিক্ষার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সংস্থাগুলির উপর কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করবার ক্ষমতা ঐ সংস্থাগুলির নেই। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষাকর প্রবর্তনের অধিকার সংস্থাগুলির উপর দেওয়া আছে কিন্তু সংস্থাগুলি শিক্ষাকর প্রবর্তনে সমর্থ নয় কারণ এই সব পৌরসভার সদস্যেরা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত। শিক্ষাকর প্রবর্তন করে এঁরা জন সাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করতে চান না। অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার বিশেষ ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, তার প্রসার ও

উন্নয়নের জন্য কোন বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নেই। গণতন্ত্রী ভারতে উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া এই বিরাট দায়িত্ব পালন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা—১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় গণতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধান অনুসারে ভারতবর্ষে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির সগোত্র রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলবার জন্য ভারত সরকার পরপর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হন।

এ পর্যন্ত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ভারত সরকার তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন কল্যান সাধন। ভারতবাসীরা বিশ্বের দরবারে একটি প্রাচীন সভ্য জাতির মর্যাদা লাভ করে থাকে কিন্তু যারা ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল করে অধ্যয়ন করেছেন তারা জানেন যে দীর্ঘকাল ধরে পরাধীন থাকবার পর স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, শিক্ষা ব্যবস্থায়, অর্থনীতিতে ও রাষ্ট্রনীতিতে নানা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর গণতন্ত্রী ভারতবর্ষে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যাগুলির মধ্যে শিক্ষা সমস্যা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এর কারণ দেশকে গড়তে হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল সংস্কার প্রয়োজন এবং এই কাজে চাই প্রচুর অর্থের জোগান কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের উদ্দেশ্যে নানাবিধ কমিশন ও কমিটি নিযুক্ত হলেও শিক্ষাখাতে অর্থের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম থেকে যায়। নিম্নের হিসাব থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	মোট বরাদ্দ	শিক্ষা খাতে বরাদ্দ	মোট ব্যয়ের শতকরা হার
১ম পরিকল্পনা	২০৬৮	১৩৩	৬.৪
২য় পরিকল্পনা	৪৮০০	২০৮	৪.৯
৩য় পরিকল্পনা	৭৫০০	৪১৮	৫.৫

*পরিকল্পনাগুলিতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ থেকে একথা সহজেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে গত ১৮।১৯ বৎসর যাবৎ দেশের স্বদেশী শাসকেরা শুধু গালভরা বক্তৃতাই

*হিসাব কোটি টাকার

দিয়েছেন। জাতি গঠনে উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলে নেতৃবৃন্দ এতদিন ধরে শিক্ষাকে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় স্থান দিতেন না।

কয়েকটি উন্নতিকামী দেশের শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কারণ শিক্ষা খাতে ব্যয় উন্নত ধরণের লগ্নী। শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ :—

রাশিয়া ১১'৪১%, জাপান ১০'৩৪%, সিংহল ১১'৪৮%, অষ্ট্রেলিয়া ১৪'১৫%, ফিলিপাইন ২০'৯০%, পাকিস্তান ৩'৬৮%, ভারতবর্ষ ৬'৩১%।

উপরোক্ত হিসাব দেশের মূল বাজেটের শতাংশ যাহা শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।

শিক্ষা খাতে বার্ষিক * মাথা পিছু ব্যয় এবং এতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কতটুকু অংশ তা নিম্নে দেওয়া হোল।

বৎসর	জনসংখ্যা	মোট অর্থ বরাদ্দ	শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয়	শিক্ষা খাতে সরকারীব্যয়	শিক্ষা খাতে মাথা পিছু ব্যয়	শিক্ষা খাতে মাথা পিছু সরকারীব্যয়
১৯৪৮—৪৯	৩৪১০ লক্ষ	৫৭১,৬৮ লক্ষ	৬,৮৩৩	৩,৩৪৭	টা. ২'০০	টা. ০'৯৮
১৯৫০—৫১	৩৫৬৯ লক্ষ	৭৩৬,৪১ লক্ষ	১১,৪৩৮	৬,৫২৭	টা. ৩'২০	টা. ১'৮৩
১৯৫৫—৫৬	৩৮৬৯ লক্ষ	১০১০,৮২ লক্ষ	১৮,৯৬৬	১১,৭২০	টা. ৪'৯০	টা. ৩'০৩

[*Financing Education, Unesco Publication No 168 (Geneva International Bureau of Education.]

এদেশে শিক্ষা খাতে মাথাপিছু ব্যয় ৪৮-৪৯ সালে এক টাকার কম ছিল। বর্তমানে (১৯৬৬-৬৭ সালে) উহা ৬ টাকার কিছু বেশী। এই গরীব দেশে মাথাপিছু বার্ষিক ৬ টাকা ব্যয়ে কিরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। যা হোক, স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষ শিক্ষা ক্ষেত্রে কতদূর উন্নত হয়েছে, এই উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সবকার, রাজ্য সরকার, পৌর প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কতটুকু তা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

ঐতিহাসিক দিক থেকে উচ্চ-শিক্ষার সংস্কার কল্পে রাধাকিষণ কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কল্পে মুদালিয়র কমিশন ও শিক্ষার সামগ্রিক রূপ বিচার করবার জন্য কোঠারী কমিশনের* কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার উপর বিভিন্ন রাজ্য সরকার অনেকগুলি

*The Education Commission 1964—66

কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। এই সমস্ত কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট থেকে একথাই প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ জটিল সমস্যার দ্বারা বিশেষ ভাবে কণ্টকিত।

স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের প্রাক্-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার যে প্রসার ও উন্নয়ন হয় নি একথা বলা চলে না। তবে উহা যে আশানুরূপ হয় নি একথা সর্বজন গ্রাহ্য।

রাধাকিষণ কমিশন

কেন্দ্রীয় সরকার এ দেশের উচ্চ শিক্ষার পুনর্গঠন কার্য আরম্ভ করবার পুর্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অবস্থা ভাল করে পর্যালোচনা করতে চান। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সর্বপল্লী রাধাকিষণের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে অনেকগুলি গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন, সিনেট ও সিণ্ডিকেটের কার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রদের বাসস্থান ও অন্যান্য ছাত্রকল্যাণ-মূলক কাজের বিষয় এই কমিশন সুপারিশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের যোগ্যতা ও চাকুরীর সিনিওরিটি হিসাবে তাঁদের প্রফেসর, রীডার, লেক্‌চারার ও ইন্‌স্ট্রাক্টর—এই চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে হবে। কাজের যোগ্যতা দেখিয়ে পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ে যাবার দরজা খোলা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের ও সর্ববিষয়ের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য কমিশন নির্দিষ্ট কর্মপন্থার নির্দেশ দেন। এই কমিশন সর্বস্তরে কৃষিবিদ্যার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং প্রয়োজন স্থলে গ্রামে ভরা ভারতবর্ষে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় (Rural University স্থাপনের সুপারিশ করেন। বাণিজ্য, শিক্ষাতত্ত্ব, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদির প্রয়োগমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ও বলা হয়। শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিশন সর্ব স্তরে রাষ্ট্রীয় ভাষা-শিক্ষার উপর জোর দিতে বলেন এবং ধীরে ধীরে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে একটি ভারতীয় ভাষাকে স্থান দেওয়ার কথা বিবেচনা করেন। ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত ছাত্রবাসের ব্যবস্থা করা শারীরিক শিক্ষার প্রবর্তন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাত্র কল্যাণ মূলক কার্যাদির উপর জোর দিতে বলেন।

রাধাকিষণ কমিশনের সুপারিশ

উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও পুনর্গঠন—স্বাধীনতা লাভের ১২ বৎসর পুর্বে দেশীয় মন্ত্রীগণ শিক্ষা ব্যবস্থার চাবিকাঠি হাতে পেয়েছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা খাতে খুব সামান্য অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার কোন স্তরেই তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না।

স্বাধীনতা লাভের পর সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাকে দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী দু'টি পর্যায়ে রেখে মূল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সাথে এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সন্নিবেশিত করে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও বিপ্লবাত্মক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দিকে শিক্ষাবিদ্‌দের প্রবণতা দেখা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং তৃতীয় বার্ষিক স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ২ বৎসরের স্নাতোকোত্তর শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা গত ১০ বৎসর চালু হওয়াতে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির দিকে শিক্ষার্থীদের ঝোঁক দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর ভীড় রয়েছে প্রচুর। প্রাথমিক, মধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ করার পর উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্বন করতে অসমর্থ হওয়ার পুনরায় এসে ঐ সব শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভীড় করে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপ্তির পর মাত্র শতকরা দশ-বার জন উপযুক্ত বৃত্তি অবলম্বন করতে সমর্থ হন বাকী সকলকে যোগ্যতার তুলনায় নিম্নপর্যায়ের বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। বহু ডবল এম. এ কেরাণীর কাজ করে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হন। পাশাপাশি টেবিলে একজন ম্যাট্রিকুলেট আর একজন ডবল এম. এ. প্রায় সমান মর্যাদা ও সমান বেতন পাচ্ছেন সরকারী ও বেসরকারী আপিসে। এ কথা ভাল ভাবে জেনেও কেন উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ভীড়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে সে কথা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বেশী ; আবার মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের তুলনায় উচ্চ শিক্ষার প্রসার অনেক বেশী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভীড়

মুদালিয়র কমিশন

রাধাকিষণ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ করবার পূর্বে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপটিকে ভাল করে পর্যালোচনা করে এই মন্তব্য করেন যে দেশের গতানুগতিক মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রগতিশীল করা সম্ভব হবে না। ইতিপূর্বে তারাচাঁদ কমিটিও মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায়

রূপান্তরিত করবার জন্য সুপারিশ করেন। পরিশেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার ১৯৫২ খ্রীঃ ডঃ এ. ল. মুদালিয়রের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যালোচনা করবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনে এই কমিশনের সুপারিশগুলি বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয়।

মুদালিয়র কমিশন গঠন

এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর বিস্তৃত অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে এর সামগ্রিক রূপটি দেশবাসীর কাছে উপস্থাপন করেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য এক বিস্তৃত সুপারিশও করেন। আমরা সংক্ষেপে মূল সুপারিশগুলি উল্লেখ করতে প্রয়াসী হয়েছি।

শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে এই কমিশন প্রস্তাব করেন যে ৪ বা ৫ বৎসর প্রাথমিক শিক্ষার পর ৩ বৎসর উচ্চ বুনিয়াদী বা মিডল স্কুল স্তর বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থাকবে এবং তারপর হবে ৪ বৎসর উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর। ইন্টারমিডিয়েট স্তর তুলে দিয়ে ১ম বর্ষ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীতে এবং ৩ বৎসর ব্যাপী স্নাতক পর্যায়ের ১ম বর্ষে ইণ্টার মিডিয়েটের ২য় বর্ষ যুক্ত হবে। যত দিন না ১০ম শ্রেণী যুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত দশম শ্রেণী থেকে পাশ করে এক বৎসর প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্সে ভর্তি হতে হবে। পেশামূলক কলেজগুলিতে ঐ এক বৎসর প্রাক্ পেশা পাঠক্রম অনুসরণ করতে হবে। পেশামূলক কলেজগুলিতে স্থান সংকুলান না হলে সাময়িক ভাবে সাধারণ কলেজগুলিতে ঐ জাতীয় পাঠক্রম ১ বৎসর ধরে পড়ান হবে এবং একটি বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষায় পাশ করলে স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রম অনুসরণ করবার জন্য সাধারণ মহাবিদ্যালয়ে ও পেশামূলক মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বা বহুমুখী বিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার সুযোগ পাবে। পেশামূলক মহাবিদ্যালয় ও পলিটেকনিকেও শিক্ষার্থীদের সোজাসুজি ভর্তি হবার কোন বাধা থাকবে না যদি সেই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার মত বুদ্ধি, বিষয়ের প্রতি ঝোক এবং কর্মক্ষমতা শিক্ষার্থীর থাকে। কার্যক্ষেত্রে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর আরম্ভ হয়েছে অষ্টম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এই তিন বৎসর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে সাতটি বিষয় থেকে একটি বিষয় বেছে নিয়ে উহা অধ্যয়ন করবে। তবে সাতটি শিক্ষা প্রবাহের জন্য একটি সাধারণ পাঠক্রম থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়ে—

মুদালিয় কমিশনের সুপারিশ

(ক) ভাষা—মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক

আর রাষ্ট্রভাষার সাধারণ জ্ঞান। শেষ পরীক্ষায় রাষ্ট্রভাষা পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকবে না।

(খ) সামাজিক শিক্ষা ও সাধারণ বিজ্ঞান (কোরগণিত সহ)

(গ) নির্বাচিত কারুশিল্পের তালিকা থেকে একটি কারুশিল্প বেছে নিতে হবে। কমিশন নিম্নলিখিত সাতটি শিক্ষাধারাকে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী হিসেবে সুপারিশ করেন। এই সাতটি শিক্ষাধারা বিভিন্ন শিক্ষার্থীকে বিভিন্নমুখী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনবোধে এই সাতটি ধারার সাথে নূতন ধারাও যুক্ত হতে পারে; তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে (১) মানবতামূলক বিজ্ঞান, (২) বিজ্ঞান, (৩) বণিজ্য (৪) কারিগরী বিদ্যা, (৫) কৃষিবিদ্যা, (৬) চারুকলা এবং (৭) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এই সাতটি শিক্ষা ধারা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। বলা বাহুল্য প্রাথমিক শিক্ষার যে স্তরটি (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী) এখনও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাতে উচ্চ বুনিয়াদী, মিডলস্কুল ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম চালু থাকবে। এই স্তরের পাঠক্রমের মধ্যে যতদূর সম্ভব সংহতি রক্ষার চেষ্টা করা হবে। কমিশন ভারতের পল্লী অঞ্চলের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা রূপে গড়ে উঠবার সুযোগ দিতে প্রয়াসী।

মাধ্যমিক শিক্ষার একমুখীতা দূর করে পাঠ্য সূচীকে বহুমুখী করার পেছনে যুক্তি হোল এই যে মাধ্যমিক শিক্ষা বয়সন্ধিকালের শিক্ষা। শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতাকে এই সময় সব চেয়ে বেশী মুল্য দিতে হবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনকে গড়ে তোলবার সুযোগ দেবার জন্য। এই উদ্দেশ্যে কমিশন দশম শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নত করতে এবং সম্ভব স্থলে নূতন বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করতে সুপারিশ করেন। শিক্ষাধারা নির্বাচনে সাহায্য করবার জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনা বিভাগ খুলতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা-নির্দেশক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। বিদ্যালয়ে উন্নত শ্রেণীর পাঠাগার স্থাপন, পরীক্ষণাগার নির্মাণ এবং শারীর শিক্ষার সর্ব প্রকার সুবিধা দেবার কথা বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থলে অভীক্ষা প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, সর্ব স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাত্মক মন্তব্য লিপি প্রস্তুত এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশের সময় বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলের বিচার করতে কমিশন সুপারিশ করেন। শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ করতে গিয়ে কমিশন মন্তব্য করেন যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রক্রিয়াকে কর্মকেন্দ্রিক ও সমস্যাভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণের

প্রক্রিয়ায়রূপে গণ্য করতে হবে। বক্তৃতার মাত্রা কমিয়ে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান, প্রজেক্ট পদ্ধতির প্রয়োগ ও ওয়ার্কসপ পদ্ধতির প্রচলন বাঞ্ছনীয়। তা না হ'লে রচনাত্মক কয়েকটি প্রশ্ন মুখস্থ করে বহিরনুষ্ঠিত শেষ পরীক্ষায় পাশের উদ্দেশ্যে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষাধারা যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার প্রতিকার সম্ভব নয়। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হবার উপযুক্ত যোগ্যতা যাচাই করে নেবার সুযোগ পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকা চাই। সর্বশেষে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের যোগ্যতার বিশেষ উন্নয়ন বাঞ্ছনীয়। যে বিষয়ে শিক্ষক অধ্যাপনা করেন সে বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য যেমন প্রয়োজন তেমনি বিষয়টিকে প্রাঞ্জল ভাবে সুকুমারমতি কিশোর কিশোরীদের কাছে উপস্থিত করবার আধুনিকতম শিক্ষা পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ক্ষমতাও থাকা চাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক (কারুশিল্প শিক্ষক ছাড়া) যাতে স্নাতক হন এবং শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত হন সে বিষয়ে বিশেষভাবে সুপারিশ করেন। শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরীর সর্তের উন্নয়ন এবং পেনসনাদির বিষয়েও মন্তব্য করেন। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও বিস্তারের কথা কমিশন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দে কমিশন এই রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যানুসন্ধান করে এই রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য এক বিস্তৃত সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব মূলতঃ রাজ্য সরকারের তাই দে-কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দে কমিশন মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশকে মেনে নিয়েছেন। মাধ্যমিক শিক্ষাকে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী করার প্রস্তাব করা হয় এবং সেই ভাবে এই রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো গড়ে ওঠে।

মুদালিয়র কমিশনের মতে শিক্ষার সর্ব স্তরের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষকেরাই প্রাথমিক শিক্ষার রূপকার; মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিয়েই বৃত্তিমূলক ও পেশামূলক উচ্চ-শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়; আবার নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে বা এই স্তরের অধ্যয়ন সমাপন করে শতকরা ৮০ জন শিক্ষিত ভারতবাসী নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। অতএব মাধ্যমিক শিক্ষাকে একাধারে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা, অপরদিকে এতে থাকবে সংস্কৃতি-মূলক বিষয়; বৃত্তিমূলক বিষয়, সহ-পাঠ্য বিষয় এবং বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিষয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও প্রসার—ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার

কারণ নির্দ্ধারণ করতে সাপ্রু কমিটিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই কমিটি মন্তব্য করে যে একমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকার ফলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং সেখান থেকে ডিগ্রী লাভ করবার পর বা অকৃতকার্য হবার পর চাকুরী লাভের চেষ্টাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে নেয়।

সাপ্রুকমিটি

এই মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবমুখিতার অভাবই এ অবস্থার জন্য দায়ী। আজ বিশ্বের সর্বত্রই মাধ্যমিক শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা জনসাধারণের জন্য, কাজেই উহা আবিশ্যিক ও অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের বৃহত্তর সমাজের জন্য। সমাজে বাঁচবার জন্য প্রত্যেককে কোন না কোন উপজীবিকা অবলম্বন করতে হয়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা বাস্তবমুখী, বৃত্তিমুখী ও বহুমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবমুখিতা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গঠন, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পরিচালন ব্যবস্থা, সরকারী, বেসরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গ্রাণ্ট্-ইন্-এড্ ও বিদ্যালয় অনুমোদন ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি একত্র মিলিত হয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর (.৯৪৮) তারাচাঁদ কমিটি তৎকালে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন এবং এ সম্পর্কে কি কি করণীয় তার উপর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। এর পর ১৯৫২ খ্রীঃ মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিস্তৃত তদন্ত ও সুপারিশের জন্য মুদালিয়র কমিশন নিয়োগ করা হয়। মুদালিয়র কমিশন বহুসাধক (Multipurpose) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। সেই হিসাবে ১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে ২২৫, ২১৫৫টি বহুসাধক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। সমগ্র ভারতে হাইস্কুলের সংখ্যা ১৬০০০ হাজারের উপর, এই হারে এমন কি এর চাইতে দ্রুতগতিতে হাইস্কুল-গুলিকে আধুনিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে ২০।২৫ বৎসর লাগবে, এমন কি বেশী সময়ও লাগতে পারে, কারণ ইতিমধ্যে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ফলে হাইস্কুলে পড়বার মত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে। মোট ছাত্র সংখ্যার মাত্র ৭% জন বহুসাধক বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছে। তার মধ্যে ৪৫%টি স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক নেই। গ্রন্থাগার, পরীক্ষণাগার, খেলার মাঠ, শিক্ষার সাজসরঞ্জামের অভাবে প্রতি পদেই মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতির পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধান

প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারত সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকেই

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, বিশেষ করে গণশিক্ষা তথা গণতন্ত্রী দেশের নাগরিকদের আবশ্যিক শিক্ষারূপে গ্রহণ করেছেন এবং সংবিধানের ৪৫নং ধারায় স্বাধীনতা লাভের ১০ বৎসরের মধ্যে সর্ব ভারতে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের কথা পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেছেন। বলাবাহুল্য এই যে প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষারূপে (১৪ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষা) গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণাটি সরকারের খুবই উচ্চাশার পরিচয় বহন করে। কিন্তু বিগত ২০ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস থেকে এ কথা প্রতিপন্ন হয়েছে যে সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনাটি খুবই অবাস্তব। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত দায়িত্ব দেওয়া আছে স্থানীয় সংস্থার উপর। নানা কারণে এই সংস্থাগুলি আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বিশেষ কৃতকার্য হতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার সময় উহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হবে। এখন সংক্ষেপে নবপ্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ—স্বাধীন ভারতবর্ষেও ইংরেজ শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষাই একটু রদবদল করে চালু আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক্রম ও পদ্ধতির সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও এই শিক্ষা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকূলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজনৈতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজতে হলে গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে অচল। হুজুর ও মজুর তৈরী গতানুগতিক শিক্ষার মূল নীতি। শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্কও এতে খুব কম। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্ব হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োগ সম্ভব হলে সমাজনৈতিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। গান্ধিজীর মতে বালক বালিকাদের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য যতদূর সম্ভব সমগ্র শিক্ষা কোন না কোন শিল্পের মাধ্যমে দেওয়া উচিত। এর ফলে ছাত্রেরা অধ্যয়ন কালে কিছু না কিছু উপার্জন করতে পারবে। আর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার ভেতর দিয়ে বালকবালিকারা সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হবার গুণ ও শক্তি অর্জন করবে। আমাদের মত গরীব দেশে অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। সরকারী সাহায্য নিয়ে ১০০ বৎসরের মধ্যেও উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না। আর হলেও সরকারী প্রভাব তাতে থেকে যাবে। গান্ধিজী যে সর্বোদয় সমাজের পরিকল্পনা করেছেন তাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে হলে শিল্পকেন্দ্রিক, সমাজভিত্তিক ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্মত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাপকতর ভাবে প্রবর্তন করতে হবে।

সমাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা

শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন শিশুর মন সৃষ্টিধর্মী। সে খেলার মধ্য দিয়ে সৃজনের আনন্দ লাভ করে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে শিশুকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু জীবনের প্রয়োজনকেই বেশী মূল্য দিতে হবে। শিশু সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে। শিশু নেতৃত্ব করতে চায়; অবসর সময় নিজের রুচিমত কিছু করতে চায়। শিশু-শিক্ষায় এই সুযোগ তাকে দিতে হবে। অনেকে বলবেন শিল্প-শিক্ষার উপর জোর দিলে মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে বাদ দিতে হয়, বিশেষ করে শিল্প দ্রব্যের বাজার দর পেতে গেলে শিল্প কর্মের উৎপাদন ও মালের উৎকর্ষতার প্রতি নজর রাখতে হবে। এতে শিশুর সৃজনী প্রতিভা অনেকটা নষ্ট হবে। ফলে শিশু হয়ে উঠবে ক্ষুদ্র কারিগর। শিশুর সামগ্রিক জীবনের বিকাশ এতে ব্যাহত হবে ও কারিগরী বৃত্তির দিকে তার ঝোঁক চলে যাবে। গান্ধিজী বলেন যে, যে কাজের সামাজিক মূল্য তথা বাজার মূল্য নেই সেই শিল্পকর্মের দ্বারা শিশুর আত্ম প্রত্যয় জন্মে না। শিশুর সৃজনশীল মনের বিকাশের জন্য আত্ম প্রত্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তব জীবনে এই আত্ম প্রত্যয়ের মূল্য সৃজনশীল মনের আনন্দের চাইতে কম নয়।

কারুশিল্প ও চারু-শিল্পের সমন্বয়

আর যারা বলতে চান শিশু খেয়াল খুসীমত যা করে তার মধ্যেই শুধু তার সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হয় এবং যাঁরা বলেন শিক্ষক নিয়ন্ত্রিত শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ হয় না, শুধু কারিগরী মনোভাব গড়ে তোলা হয়, তাঁরা ভ্রান্ত। বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে এদেশে যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে চর্‌খায় সুতো কেটে, তাঁত বুনেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রচুর চারুশিল্পী গড়ে উঠেছে। জীবনের পরিকল্পনায় এবং সামাজিক জীবন উন্নয়নে তারা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের ছেলেমেয়েদের পেছনে পড়ে নেই। প্রকৃতপক্ষে কারুশিল্প চারুশিল্পের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত।

আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা যে শিশুকেন্দ্রিক হবে একথা জাকির হোসেন কমিটি বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের যে বিস্তৃত পটভূমিকা লওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডিউই, মণ্টেসরী, ফ্রয়েবল, পেস্‌তালৎসী ও রুশো এদের প্রত্যেকের নিজস্ব মতবাদের জায়গা আছে। গান্ধিজী শুধু ভাব ও ভাষার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। শিল্পকর্মের মুক্তধারায় শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। কর্মের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিধৃত, তাই কর্মের মধ্য দিয়ে গান্ধিজী শিশু জীবনকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করতে চান।

সামাজিক উৎপাদন-মূলক কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার প্রবর্তন একটি বৈপ্লবিক চিন্তার সার্থক প্রয়োগ

যে কোন একটি মূল শিল্পের মাধ্যমে অনুসঙ্গ প্রণালীতে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। শিল্পকর্মের মাধ্যমে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব না হলে সমাজ ও পরিবেশের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। এই শিক্ষা-

ব্যবস্থা পাঠ্য পুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করবে না। শিক্ষকের অবদান এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। উপযুক্ত চিন্তাশীল, কর্মঠ ও সমাজসেবী শিক্ষক না হলে বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব। যদিও শিক্ষা-ব্যবস্থাটি শিশুকেন্দ্রিক, তথাপি শিক্ষক ঘড়ির মেইন স্প্রিংএর মত সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেন। জীবনের সাথে যে সমস্ত বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেগুলির ব্যবহারিক দিকটার একটা সম্পূর্ণ পরিচয় পাবে শিশুরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থায়। পরে বড় হলে যেদিকে শিশুর ঝোঁক সেই দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বমূলক বা টেক্‌নলজিতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করতে পারে। মনে রাখতে হবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় ট্রেড স্কুল, কারিগরী বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল্ স্কুল নয়। সুন্দর পরিবেশে শিশু স্বভাবতঃ সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে ভালবাসে। গান্ধিজী বলেছেন, "শিশুদের শুধু হস্তশিল্প শেখালেই হবে না। সুন্দর সামাজিক পরিবেশে তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।"

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন—১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের পর সর্বভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছে নির্দেশনাম প্রেরণ করেন। অবশ্য প্রত্যেক রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বীয় প্রয়োজনে অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। বুনিয়াদি শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছেন।

স্বাধীন ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন

১৯৫১ খ্রীঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় কারুশিল্প এবং শিক্ষার চলতি ব্যয়ের স্বনির্ভরতার বিষয়টি বিচার করবার জন্য দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর ভার দেন। ১৯৫২ খ্রীঃ উপদেষ্টা পরিষদ বলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার কারুশিল্পগত গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। সাধারণ গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষার উচ্ছেদ করে যত দ্রুত সম্ভব বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার পত্তন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষায় শিক্ষাগত এবং শিল্প-কর্মগত যোগ্যতা দু'দিকেরই প্রতি উপযুক্ত নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কারুশিল্পের গুরুত্ব

এর পূর্বে ১৯৫০ খ্রীঃ বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ১৯৪৯ খ্রীঃ বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির সুপারিশ ক্রমে রাজ্যে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয় স্থাপন, বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য

কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ভাবী শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে।

আজ প্রায় ২০।২৫ বৎসর ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিবেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হচ্ছে। প্রত্যেক রাজ্যই স্বীয় প্রয়োজন মত বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে সামান্য রদবদল করে প্রবর্তন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিল্পকেন্দ্রিক না করে কর্মকেন্দ্রিক করেছেন। একটি মাত্র শিল্পকে মূল শিল্প হিসাবে না নিয়ে আঞ্চলিক শিল্পকে অনেক ক্ষেত্রে মূল শিল্প হিসেবে লওয়া হয়েছে।

সর্বভারতের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুনিয়াদী শিক্ষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয় বলে ভারত সরকারের নির্দেশে সর্বভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী ছাঁচে গড়ে তুলবার জন্য রাজ্য সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একযোগে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা বুঝতে পারেন যে কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। আর্থিক অভাব, উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের অভাব এবং বুনিয়াদী শিক্ষায় জনসাধারণের সাগ্রহ সহযোগিতার অভাব এই পরিকল্পনার রূপদানে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেছে।

স্কুল এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট—পশ্চিমবঙ্গে স্কুল এডুকেশন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন কার্য গত ১৮ বৎসর যাবৎ সুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ী শিক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য এবং উপযুক্ত বিদ্যালয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ১৯৪৮ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্র রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। তদন্ত শেষ করে কমিটি দীর্ঘ সুপারিশ করেন। বিদ্যালয় কমিটির সুপারিশগুলি মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এ রাজ্যের বিদ্যালয়ী শিক্ষার পুনর্গঠনে অগ্রনী হন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ। কমিটির মতে প্রাথমিক শিক্ষার (নিম্নবুনিয়াদী) উদ্দেশ্য হবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং উহার সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষার জন্য সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক শিক্ষাকাল ৫ বৎসর ব্যাপী হবে। সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে সহ-শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের সংখ্যাধিক্য বাঞ্ছনীয়। সৃজনমূলক কাজের দিকে জোর দিতে হবে। এগুলির মধ্যে কাগজের কাজ, অঙ্কন, চিত্রন, পুতুলগড়া, খেলনা তৈরী, ইট, মাটি খড় দিয়ে খেলাঘর তৈরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কারিগরী কাজের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, কাঠ ও কার্ডবোর্ডের কাজ, কাগজ তৈরী, চামড়ার কাজ, হাঁড়ি-কলসী

গড়া, গৃহশিল্প, সূচের কাজ, কাপড় কাচা, ফলমূল ও শাকশব্জী উৎপাদন করা ইত্যাদি কাজগুলি পল্লী ও সহর অঞ্চলের উপযোগিতা হিসেবে পাঠক্রমে যুক্ত করতে হবে। শুধু ভাষা শিক্ষা ও সামান্য গণিতের জ্ঞানের পরিবর্তে কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিশু কেন্দ্রিক ও কর্ম ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য সুপারিশ করেন। পরীক্ষার ভীতি সৃষ্টি না করে বিষয়গুলিকে জীবনের সাথে অঙ্গীভূত করবার দিকেই পাঠ-প্রক্রিয়া ও কর্ম-প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সম্ভবস্থলে পাঠক্রমের রদবদল করতে হবে নিম্নের বিষয়গুলি থেকে—(১) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা, (২) ব্যায়াম শিক্ষা ও খেলা ধূলা, (৩) সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা, (৪) সৃজনমূলক কাজ ও কারিগরী শিক্ষা (৫) গৃহশিল্প তৎসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও উদ্যান রচনা, (৬) ভাষা ও সাহিত্য, (৭) সহজ গণিত (৮) পারিপার্শিক বিষয় সহযোগে, ইতিহাস, ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা, (৯) কলা, সঙ্গীত নৃত্য এবং (১০) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষকদের অবশ্যই শিক্ষক-শিক্ষণ থাকা চাই।

শিক্ষা পরিকল্পনা

শিক্ষা-পরিকল্পনার ভূমিকা—ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ সরকারের নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পৌনে দু'শ বৎসর ইংরেজ শাসনে আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮%, অথচ এডামের রিপোর্টে পাওয়া যায় যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পুর্বে এদেশে আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল ৩%। দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারে সরকারের অবদান ছিল ১৪%, মিশনারীদের ১২% এবং বাকী ৭৪% বেসরকারী প্রচেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রধানতঃ সরকারী প্রচেষ্টায় এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ডিগ্রীর মোহ এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি বাতিক গ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীর ছাড়পত্র জোগাড়ের প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় কার্য করতে থাকে। বিগত ৪০ বৎসর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা দান ও গবেষণা কার্য চলছে।

তখন বিভিন্ন প্রকার শিক্ষায়তনের সাথে সত্যিকার কোন যোগাযোগ ছিল না। বিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হোত বলে হাইস্কুল ও কলেজগুলি পাঠক্রম ও পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মেনে চলতো। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই জনসাধারণের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকার সংখ্যায়। ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, যানবাহন ইত্যাদি বিষয়ের কোন উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে ছিল না, বাণিজ্য বিভাগে

শিক্ষার কোন সুসংহত পরিকল্পনা ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয় যে ডিগ্রী দিত তার সাথে কোন ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকাতে কেরাণীগিরি ছাড়া শিক্ষার্থীরা আর কিছুই করতে পারতো না। শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেই আধুনিক ছিল না এবং প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষার প্রসার ছিল যথেষ্ট অকিঞ্চিৎকর। সমাজ-শিক্ষা ও বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না বললেই হয়। যুবকদের সামাজিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই জাতীয় শিক্ষার একটি সুসংহত কাঠামো গড়ে তোলবার জন্যে শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুতের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়।

এদেশের শিক্ষাসম্পর্কে নানাবিধ কমিশন ও কমিটি নিয়োগ

শিক্ষা-ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত করেন। রাজ্য সরকার আঞ্চলিক শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের সুপারিশের জন্য কোন কোন রাজ্যে ২।১টি কমিটি ও কমিশন নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত কমিটি ও কমিশনের বিস্তৃত তদন্তের ফলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার এক সমস্যাসঙ্কুল চিত্র ফুটে ওঠে। কমিটি ও কমিশনের সুপারিশগুলি প্ল্যানিং কমিশন বিবেচনা করেন সরকারের দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে।

১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষা-পরিকল্পনা

প্ল্যানিং কমিশন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা-পরিকল্পনা করেছেন শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি বিধান কল্পে। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষার সংস্কার, পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ, নূতন বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা, নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কয়েক প্রকার নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও তাদের পরিচালনা এই পরিকল্পনাগুলির মূল বিবেচ্য বিষয়। শিক্ষণ-শিক্ষা এবং শিক্ষার সহায়ক প্রতিষ্ঠান, যথা, গ্রন্থাগার, সংরক্ষণশালা, জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র এবং অন্যান্য মূল গবেষণা শিক্ষা-পরিকল্পনার বৃহত্তর অংশ। কৃষির সঙ্গে দেশের খাদ্য সমস্যা এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রম বর্ধমান মূল্য তালিকা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ভারতবর্ষে মানব-শক্তি ও মানব-কর্মকুশলতা (Human Resources) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এদেশের জন শিক্ষার কথা ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা সবচেয়ে প্রথমে মনে পড়ে। দারিদ্র্য আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমাজ-তান্ত্রিক কাঠামোতে দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সংস্কার সাধন করবার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা এই মূল পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

শিক্ষা পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ—ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সত্যকার জাতীয় শিক্ষা রূপে গড়ে তোলবার জন্য তিনটি পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থের

পরিমাণ থেকে শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি বাস্তব চিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। এ ছাড়া শিক্ষার বিশেষ বিশেষ দিকের লক্ষ্য (Target) সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে সেগুলির সাহায্যে শিক্ষা-পরিকল্পনার গুরুত্ব, আয়তন ও বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। নিম্নে পরিকল্পনার আর্থিক বরাদ্দ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেওয়া হোল।

শিক্ষা পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ও শিক্ষার লক্ষ্য

তিনটি শিক্ষা-পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থের তুলনামূলক হিসাব *

শিক্ষার খাত	বরাদ্দ অর্থ কোটি টাকা হিঃ			শতকরা হিসাব		
	১ম	২য়	৩য়	১ম	২য়	৩য়
প্রাথমিক শিক্ষা	৮৫	৮৭	২০৯	৬৩ ৯%	৪২.৯%	৫০%
মাধ্যমিক শিক্ষা	২০	৪৮	৮৮	১৫%	২৩.১%	২১.১%
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৪	৪৫	৮২	১০.৫%	২১.৬%	১৯.৬%
সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি	১৪	২৪	২৯	১০ ৫%	১০.৫%	৬.৯%
সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা	**	৪	১০	০.১%	১.৯%	২.৪%
মোট হিসাব—	১৩৩	২০৮	৪১৮	১০০%	১০০%	১০০%

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে—প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদী ছাঁচে (Pattern) গড়ে তুলতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করবার পর কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষা-খাতে যে অর্থ ব্যয় হবে তার বড় একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতে সম্মত আছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা পল্লী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নগর ও শিল্পাঞ্চলেও বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তুলবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পারকল্পনার শেষে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা হয়েছে ১৩০০; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৪০০ শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এগুলির শতকরা ৭০টি বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হবে। ৪র্থ পরিকল্পনার শেষে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাকেই বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় পর্যবসিত করা হবে। শিক্ষণ-শিক্ষা কালকে ১ বৎসরের স্থলে দু'বৎসরে নিয়ে যেতে সুপারিশ করা হয়েছে; যাতে করে শিক্ষকদের বিষয় জ্ঞান ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুশীলন অনেকটা উন্নত

বরাদ্দ অর্থের তুলনামূলক হিসাব

বুনিয়াদী শিক্ষা

*এই হিসেবে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ও পরিচালক শিক্ষার খরচ ধরা হয় নি। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাখাতে ১৪২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ** প্রথম পরিকল্পনায় সংস্কৃতিমূলক শিক্ষাখাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তা অন্যত্র ধরা হয়েছে।

হয়। এ ছাড়া আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে চালু করবার জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষণ-শিক্ষা (Short term course), রিফ্রেসার কোর্স, সেমিনার সিম্‌পোজিয়াম, কনফারেন্স ও এই জাতীয় শিক্ষার উপর গবেষণার জন্য ২৭০টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রমের মধ্যে। কয়েকটি অঞ্চলে উত্তর বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করে কিরূপে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বুনিয়াদী শিক্ষার সমন্বয় করা যায় এবং সহজেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসে ছাত্রেরা বিশেষ যোগ্যতার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে ও বাস্তবক্ষেত্রে উহার পরীক্ষা চলছে। মোটামুটি হিসেবে ধরা হয়েছিল যে শতকরা ১০ জন ১ম পরিকল্পনায়, শতকরা ৪৫ জন দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, শতকরা ৬০ জন তৃতীয় পরিকল্পনায় আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার (৬ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর) আওতায় আসবে। ৪র্থ ও ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে শতকরা ১০০টি শিশু আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবে বলে আশা করা যায়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসঙ্গে—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠক্রম **নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলিতে** গৃহীত হবে বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১) দশম শ্রেণীযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয় (High School), (২) একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Higher Secondary School), (৩) বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose School), (৪) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Junior High School), (৫) মিডল স্কুল (Middle School), (৬) কারুকলা কেন্দ্র (Craft Centre), (৭) জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল (Junior Technical School), (৮) বৃত্তি শিক্ষাকেন্দ্র (Vocational Traning Centre), এবং (৯) এক্সটেন্‌সন্ সার্ভিস সেণ্টার (Extension Service Centre)।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ১ম পরিকল্পনার শেষে ৫৩টি এবং ২য় পরিকল্পনার শেষে ২৩৬টি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে ৩৩০টির বেশী। এ ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে নব জাগরণকে সুসংহত করবার জন্য বিস্তৃতভাবে সামাজিক শিক্ষাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি সেণ্টার, এক্সটেন্‌শন্ সেণ্টার ও নানাপ্রকার সেবা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেমিনার, ওয়ার্কসপ, সবাক ও নির্বাক চিত্রপ্রদর্শনী, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের কার্য, নির্দেশনা কার্য ইত্যাদির সাহায্যে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে দিতে হবে।

একাধারে ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক করা, অপরদিকে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা তৃতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিও প্রয়োজনানুরূপ যত্ন লওয়া হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ও বৃত্তি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন, বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রদের বিজ্ঞান, কারিগরী ও মানবাদি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রচুর বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে দেশের প্রত্যেকটি ভবিষ্যৎ নাগরিক শিক্ষার সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম শিক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত গরীবের সন্তান যাতে সহজেই শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তার জন্য একাধারে যেমন উপযুক্ত বৃত্তির (Scholarship) ব্যবস্থা করা হয়েছে তেমনি অপর দিকে শিক্ষা ঋণের (Educational loan) ব্যবস্থাও করা হয়েছে গণতন্ত্রী দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ দেবার জন্য।

শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্য

শিক্ষণ-শিক্ষা প্রসঙ্গে—এই শিক্ষণ-শিক্ষা হবে দু'জাতীয়—(১) প্রাক্-স্নাতক শিক্ষণ-শিক্ষা, (২) স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-শিক্ষা। এই দুই প্রকার শিক্ষণ আবার চার রকম হতে পারে, যেমন—

(ক) পূর্ণ সময় কালীন শিক্ষণ-শিক্ষা (Full time course),
(খ) স্বল্পকালীন শিক্ষণ-শিক্ষা (Short course),
(গ) ছুটির সময়ে শিক্ষণ-শিক্ষা (Vacation course),
(ঘ) স্বল্প সময়ের শিক্ষণ-শিক্ষা (Part time course).

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার হচ্ছে। শিক্ষণ-শিক্ষা দিয়ে বহু শিক্ষককে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হবে। এরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দিতে পারবেন। যারা শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ না করে বিদ্যালয়ে কাজ করছেন তারা ১০ মাসের জন্য পূর্ণসময় কালীন শিক্ষণ-শিকা বা স্বল্পসময় কালীন শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৫০% জন শিক্ষক (মাধ্যমিক পর্যায়ে চাকুরীরত) শিক্ষণ-শিক্ষা লাভ করবেন। ৫ম পরিকল্পনার শেষে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ-শিক্ষা লাভ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। সাধারণ শিক্ষণ ছাড়া নিম্নলিখিত বিশেষ জাতীয় (Special type) শিক্ষণ-শিক্ষার কথা তৃতীয় পরিকল্পনা উল্লিখিত হয়েছে।

শিক্ষণ শিক্ষা

(১) সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা (Social Studies), (২) সাধারণ বিজ্ঞানশিক্ষা (General Sciences), (৩) বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা (Special Science),

(৪) বিদ্যালয়ে গৃহীত কারুশিল্প (School Crafts), (৫) চারু ও কারুশিল্প (Art & Craft), (৬) নির্দেশনা (Guidance), (৭) বিদ্যালয় পরিচালনা (School Administration), (৮) শারীর শিক্ষা (Physical education), (৯) চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যকারী যন্ত্রশিক্ষা (Audio-visual education), (১০) (বিদ্যা-পরিমাপন পদ্ধতি (Technique of evaluation).

১ম, ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা পরিকল্পনার বিশেষ কয়েকটি দিক —এই দু'টি শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে আমরা লক্ষ্য করেছি, যে শিক্ষা পরিকল্পনায় স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী দু'প্রকার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য তথা আর্থিক অগ্রগতির সাথে শিক্ষার প্রসারের একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচন বর্তমানে সমস্ত শিক্ষাবিদ্, শিক্ষাধিকারিক ও রাজনৈতিক দলগুলিকে ভাবিয়ে তুলেছে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব-শিক্ষা, দল গঠন ও দল পরিচালন শিক্ষার একটা বড় অংশ। তাছাড়া গণতন্ত্রী দেশে সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি দেশের মেধাবী ও কর্মঠ ছেলেমেয়ে যাতে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার সমান সুযোগ পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখবারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১ম ও দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী শিক্ষা পরি-কল্পনায় শিক্ষা

এই দু'টি শিক্ষা পরিকল্পনা থেকে আরও লক্ষ্য করা গেছে যে দেশের জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের চাইতে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের দিকে বেশ নজর দিয়েছে। দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহায় সম্বল হয় শিক্ষা তথা ডিগ্রী। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাই শুধু ৩ গুণ হয়নি উচ্চ-শিক্ষার প্রসারও হয়েছে অভাবিত। ফলে শিক্ষিত বেকার সমস্যা দেশের অর্থনীতির উপর বিশেষ চাপ দিচ্ছে। হাইস্কুলগুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করে ওগুলিতে বহুমুখী পাঠক্রম চালু করা হয়েছে কিন্তু সেখানে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত অভাব। তাছাড়া অর্থের অভাব, শিক্ষকদের নিম্ন বেতন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার অভাব ইত্যাদি মিলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিম্নগামী করেছে। এর সুদূরপ্রসারী ফল স্বরূপ কলেজী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান দ্রুত নেমে গেছে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এমন কি সরকারী চাকুরীতে বেতন বেশী বলে প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সেইদিকেই যায়; শিক্ষক হিসেবে কেহ কাজ করতে চান না। উপযুক্ত বৃত্তি নির্দেশনা এবং এই সম্পর্কে উপযুক্ত পরিসংখ্যান না থাকাতে সাধারণ শিক্ষা এমন কি কারিগরী শিক্ষায়ও প্রচুর অপচয় হচ্ছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্পর্কিত নানা বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছে। তবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ

করবার সময় **নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।**

(১) ৬ বৎসর থেকে ১১ বৎসর বয়স্ক বিদ্যালয় গমন উপযোগী বালক বালিকাদের জন্য সার্বজনীন, অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন : প্রথম দু'টি পরিকল্পনায় এ কার্য খানিকটা এগিয়েছে। আশা করা গিয়েছিল তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে শতকরা ৭৫ জন বালক-বালিকা (৬—১১ বৎ) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

কিন্তু তা হয়নি। পার্বত্য অঞ্চল, আদিবাসী অঞ্চল এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রস্তাব হয়েছে এবং এজন্য বিশেষ অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনায়। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বুনিয়াদি না হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দু'একটি কারুশিল্প চালু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী প্যাটার্নে গড়ে তুলতে হবে এরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কারণে বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং পরীক্ষণাগার স্থাপনের জন্য ও উহার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের উপর আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ণের জন্যও পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা

(৩) কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নূতন নূতন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজিতে পৃথিবী যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার সাথে তাল রেখে চলার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই খাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে স্নাতক পর্যায়ে ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য গ্রন্থাগার ও পরীক্ষণাগারের প্রসার লক্ষ্যণীয়। বিজ্ঞানের উপর গবেষণা কার্য বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার জলপানির (scholarship) ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া বিজ্ঞানের উন্নততর শিক্ষার জন্য বিদেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টেকনোলজিতে যোগ্য শিক্ষার্থীদের প্রেরণ করা হচ্ছে। বিদেশী মুদ্রার বিশেষ অভাব সত্ত্বেও দেশকে শিল্পবিজ্ঞানে এবং কৃষি, বাণিজ্য ও যানবাহনে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে

(৪) স্বাধীনতা লাভের পর দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও যান-বাহনের দ্রুত প্রসার হচ্ছে। বৃটিশ ভারতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর সরকার জোর দেন নি কারণ ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের দেশের শিল্পজাত মাল চড়া দরে এ দেশে বিক্রয় করবে, ইংরেজ ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইংলণ্ড থেকে শিক্ষা করে এসে এ দেশে মোটা মাইনের চাকুরী করবে, আর এ দেশের লোকে করবে কেরাণীগিরি এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে নেবে ইংরেজ বণিকদের দালালি (Agency)। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে সরকারী, বেসরকারী এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্ব স্তরেই ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয়েছে। শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে। সেইজন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনশক্তি নিয়োগের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ (Man-power planning) এবং কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অগ্রাধিকার

(৫) শিক্ষণ-শিক্ষার জন্য একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হয়েছে। বাস্তব দৃষ্টি-কোণ থেকে এই পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করিবার দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক (বুনিয়াদীসহ) ও মাধ্যমিক শিক্ষক, এবং শ্রমিক শিক্ষক, শিল্প-শিক্ষালয়ের শিক্ষক, পলিটেক্‌নিকের শিক্ষক, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন অনুরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দিকে বিশেষ যত্ন লওয়া হয়েছে।

শিক্ষণ শিক্ষার প্রসার

(৬) স্ত্রী-শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির জন্য বিস্তৃত এবং বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করেছে যুক্তভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদষ্টা পরিষদ এবং জাতীয় স্ত্রী-শিক্ষা কমিটি।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

(৭) তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স চালু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পুনর্গঠনকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করা হয়েছে এবং দশম শ্রেণী যুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে একাদশ শ্রেণী যুক্ত করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করা হয়েছে।

৩ বৎসরের ডিগ্রীকোর্স চালু

(৮) মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সর্বপ্রকার শিক্ষালাভের সমান সুযোগ দেবার জন্য প্রচুর জলপানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে একটু বেশী সুবিধা দেওয়া হয়েছে দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষাকে উন্নত করবার জন্য। শিক্ষার্থীদের জন্যে শিক্ষা-ঋণ ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়েছে।

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য জলপানি ও শিক্ষা ঋণ

(৯) এ ছাড়া উচ্চ **শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা** কার্য চালাবার জন্য নানাবিধ সুযোগ ও অর্থ সাহায্য দেবার কথাও প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা পরিকল্পনার ফলশ্রুতি

প্রাক প্রাথমিক স্তর—আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার একটি সুসংহত রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার মূল দায়িত্ব অভিভাবকদের। চাকুরিয়া মায়েদের সন্তানসন্ততির তদারক করবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রাক্-বিদ্যালয় স্কুলগুলি গড়ে ওঠে। এগুলি এখন ব্যবসা- প্রতিষ্ঠানের মত। তবে মিশন চালিত ও বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত নার্শারী, কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি উন্নত ধরণের শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সরকার স্বীকার করলেও এই খাতে সামান্য অর্থ খরচ করা হয়েছে। স্কুলগুলি চলবে জনসাধারণের প্রচেষ্টায়, কিন্তু এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য গবেষণা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হবে।

প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা

প্রাথমিক স্তর—গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার ও নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন সরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টার অন্যতম বিষয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ১১+ শিশুদের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গতানুগতিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করে নূতন কিছু প্রবর্তন করলেও শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন সহজে সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল। এই স্তরে এখনও শিক্ষণ-শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় নি। বিদ্যালয় বা কলেজ ত্যাগ করে মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার চাকুরী গ্রহণ করেন কিন্তু ছেলেরা যেতে চায় না। যাদের কোন কাজ জোটে না তারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যায়। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন অপেক্ষাও কম। এই সমস্ত শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বলে কিছুই নেই। কয়েক বছর শিক্ষক আন্দোলনের পর এঁদের বেতনের হার কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন এঁদের জন্য বাঁচবার মত বেতনের ব্যবস্থা এখনও করেন নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে কেউ বৃত্তি হিসেবে নিতে পারে নি। শিক্ষাদানে প্রাথমিক শিক্ষকদের আর তেমন দরদ নেই। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থা এবং আর্থিক দায়িত্ব রয়েছে পৌর-সভার উপর। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন দূরে থাকুক, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে

বুনিয়াদী ও প্রাথমিক শিক্ষা

চালিয়ে যাওয়া পৌরসভাগুলির পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়েছে পৌর সভার সদস্যদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক শক্তির লড়াইয়ের ফলে।

১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা রূপে গ্রহণ করা হয়। নব শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করে বুনিয়াদী ধরণে (pattern) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবশ্যই বুনিয়াদী বিদ্যালয় হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রসার শহরে সীমাবদ্ধ থাকলেও গ্রাম দেশে ইহার বেশ প্রসার হয়। কিছু সংখ্যক শিক্ষক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যোগদান করেন জনসেবার আদর্শ নিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বুনিয়াদী ট্রেনিংএর জন্য ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষা

ভারত সরকারের নির্দেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয় কারণ গতানুগতিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করে দেখা গেছে যে শিক্ষক মহাশয়েরা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেও আবার সেই পুরনো পদ্ধতিতেই পাঠশালা পরিচালনা করতে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবার সময় উহাকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৬০০০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সমস্ত রাজ্যেই যথাসম্ভব সত্বর প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদী প্যাটার্ণে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করবে সে রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সাহায্য পাবে। সহরাঞ্চলে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলছে। উত্তর-শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থার (Refresher course) জন্য নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেবার পরিকল্পনায় অবৈতনিক ও বৃত্তিযুক্ত (with the scope of deputation) শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রত্যেক রাজ্যের প্রয়োজন মত বুনিয়াদী শিক্ষাকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা চলছে। প্রচলিত পুঁথিসর্বস্ব প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় শিল্পকেন্দ্রিক ও অনুবন্ধ প্রণালী সমন্বিত বুনিয়াদী শিক্ষা অনেক উন্নত। জীবনের মূল প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় শিল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা কর্ম মুখর। ইহা শিক্ষায় স্বাবলম্বন এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রমের মর্যাদা ও বাস্তব

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষা

অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বলে বুনিয়াদী শিক্ষা নূতন সমাজ গঠনের ক্ষমতা সম্পন্ন। তা ছাড়া সামাজিক পরিবেশে সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হয় বলে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বস্তরেই শিক্ষার্থীর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

মাধ্যমিক স্তর—মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য অনুসন্ধান করে এ জাতীয় শিক্ষার উন্নতির পন্থা নির্ণয়ের জন্য **মুদালিয়র কমিশন** নিযুক্ত করা হয়েছিল এই কমিশনের অনেকগুলি সুপারিশ কার্যে রূপায়িত করবার জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট আছেন। মাধ্যমিক শিক্ষায় নিজস্ব সত্তা গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকার জাতীয় জীবনে মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পনার **চারিটি দিক** আছে—

(১) বর্তমান হাইস্কুলগুলি সুপরিকল্পনা অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা।

(২) প্রয়োজন স্থলে নূতন সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয় স্থাপন।

(৩) বৃত্তিমূলক, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষামূলক বিদ্যালয় স্থাপন।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

নিম্নের হিসাব থেকে শিক্ষণ-শিক্ষার প্রসারের পরিচয় পাওয়া যাবে। শিক্ষণ-শিক্ষার কলেজের সংখ্যা কোন কোন প্রদেশে ৫ গুণ হয়েছে। এ সত্ত্বেও প্রতি বৎসর ২০% জন শিক্ষক ভর্তির সুযোগ পান, বাকী ৮০% জনকে পরবর্তী সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

শিক্ষক	'৪৮-'৪৯	'৫০-'৫১	'৫৫-'৫৬	'৬০-'৬১
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে	৫০%	৫৩.৫%	৫৮.৫%	৬৫%
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে	৪০%	৫৩.৮%	৫৯.৭%	৬৮%

বাকী সমস্ত শিক্ষক আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ। আবার এই শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষিকাদের ধরা হয়েছে। মোটামুটি হিসেবে শিক্ষক ২০% এবং শিক্ষিকা ৮০% জন শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত। কাজেই ছেলেদের স্কুলে শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা সেই অনুপাতে কমে যাবে।

এ ছাড়া শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় বেতন এত কম যে ভাল ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে খুব কমই (২%) গ্রহণ করে। মেয়েরা ২৫% জন শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে নিয়েছেন কিন্তু তাঁদেরও শিক্ষকতায় প্রাণ নেই। শিল্প, বাণিজ্য এমন কি সরকারী চাকুরীতেও গুণগত যোগ্যতার মূল্য দেওয়া হয় না। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির

গত ১০ বৎসর ধরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই কথা বরাবরই বলেছেন যে স্কুল-কলেজে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া না গেলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (শিক্ষাবিষয়ক) একেবারে বানচাল হ'য়ে যাবে। শিক্ষকদের বাঁচবার মত বেতন, চাকুরীর ভাল সর্ত, বার্ধক্যের জন্য কতকগুলি সুযোগ এবং সর্বোপরি সামাজিক মর্যাদা না দিতে পারলে উপযুক্ত এবং উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া শক্ত হবে। বর্তমানে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন তাঁদের ৫% জন মনে-প্রাণে শিক্ষক কিনা একথা চিন্তার বিষয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলস্বরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অগ্নিমূল্য। তাই সামাজিক মানুষ হিসেবে বাঁচার জন্য উপ-শিক্ষকতা এখন শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক উপজীবিকা।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের যোগান কিরূপে বাড়ান যায়

এত অসুবিধা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি দেখলে আশান্বিত হওয়া যায়। ছাত্রসংখ্যার অগ্রগতি আশাপ্রদ কিন্তু অকৃতকার্য ছাত্রদের সংখ্যা সকলকেই ভাবিয়ে তোলে।* নিম্নের তালিকায় ১১+থেকে ১৭+পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে ১৪+থেকে ১৭+বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ধরা উচিত।

শিক্ষার স্তর	'৪৮-'৪৯	'৫০-'৫১	'৫৫-'৫৬	'৬০-'৬১
নিম্ন মাধ্যমিক	২৮·১	৩১·২	৪২·৯	৬২·৯
মাধ্যমিক	১০·১	১২·২	১৮·৮	২৯·১

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার যেমন দ্রুত হয়েছে তেমনি শিক্ষার মান হয়েছে নিম্নগামী। শিক্ষার অপচয়ের চিত্র প্ল্যানিং কমিশনকে তথা সমগ্র ভারতবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই অপচয়ের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষার অধোগতির কারণ বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয় গৃহের পুনর্গঠন; বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও পরীক্ষণাগার স্থাপন ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যের প্রবর্তন এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার, প্রভূত অপচয় তথা শিক্ষার নিম্নগামিতা

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের অন্যতম প্রচেষ্টা প্রমাণিত হয়েছে একমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার মধ্যে। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। নিম্নে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের চিত্র দেওয়া হল।

* হিসাব লক্ষ সংখ্যায় ধরা হয়েছে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	১৯৪৮-৪৯	’৫০-’৫১	’৫৫-৫৬	’৬০-’৬১	৬৫-৬৬
উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১২	৩৫০	১৬৫০	৪৫০০	৬০০০
মিডল স্কুল	১৩,৫০০	১৩,৮৫০	১৯,৩০০	২২,৭০০	২৫০০০
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬,১০০	৭,৩০০	১০,৬০০	১২,২০০	২০০০০
উচ্চতর মাধ্যমিক „	——	——	৫০	১,২০০	৭৫০০
বহুসাধক বিদ্যালয়	——	——	২২৫	৯৩০	১৫০০
বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়	১০	৩০	৪৩০	১,২০০	১৮০০
কারিগরী বিদ্যালয়	৯০	১৩০	৪৮০	৯২০	১১০০

উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলি ছাড়া বহু বিদ্যালয় আছে যেগুলি সরকারের, বোর্ডের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন এখনও পায় নি।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা কমিশনের সুনজর

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়। মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষায় ৫০% জন ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্যতা এবং পাশকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭% থেকে ১০% জন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাওয়াতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাদের ৩% থেকে ৫% জন প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয়। বাকী ৯৫% থেকে ৯৭% ছাত্রছাত্রীর জীবনে এ শিক্ষার কার্যকরী ফল ফলে না। তাই সারা দেশময় বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়েছে। টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন ও শিল্পকেন্দ্রে শিক্ষানবিশী ব্যবস্থা চালু করা, মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

উচ্চ-শিক্ষা স্তর—১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বেশী নজর দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্ক, তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিশেষ করে এতাবৎকাল একমুখী হাইস্কুলগুলি থেকে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক গতি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। উচ্চ শিক্ষার ভীড় কমাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিতে খুব কড়াকড়ি করা হয় এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। সহরের কলেজের ভীড় কমাবার জন্য মফঃস্বলে নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালে মোটামুটি ৬০,০০০ ছেলেমেয়ে ভারতবর্ষের কলেজগুলিতে অধ্যয়ন করতো। ১ম ও ২য় পরিকল্পনার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা পুর্বের তুলনায় ৩ গুণ হয়েছে এবং প্রায় সেই অনুপাতে শিক্ষার মান নীচে নেমে গেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৫। আজকাল কলা-বিভাগে

ছাত্রদের ভীড় কিছুটা কমেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজিতে ভর্তির জন্য খুব ভীড় হয়েছে, যদিও ইতিমধ্যে এ সব প্রতিষ্ঠানে তিন গুণ সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজ্ঞানে সুযোগ না পেলে শিক্ষার্থীরা বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হয়। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপ কমাবার জন্য অনেক নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। খড়্গপুর, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, দিল্লী ও বোম্বাইয়ে উচ্চ শ্রেণীর টেক্‌নোলজি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৌলিক গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক ব্যবস্থা আছে এবং এ ব্যবস্থা আরও উন্নত হচ্ছে। গণতন্ত্রীদেশের সমস্ত নাগরিককে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রদের জলপানি দেওয়া হচ্ছে। নিম্নের হিসেব থেকে প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশে গ্রাণ্টস্ কমিশন কি পরিমাণ অর্থ জলপানি হিসেবে মেধাবী ছেলেদের দিচ্ছেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

বিগত ১০০শ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার

বৎসর	'৫০-'৫১	'৫৫-'৫৬	'৫৭-'৫৮
অর্থব্যয়	৩'৬ কোটি	৮ কোঃ	১১ কোঃ
ছাত্রসংখ্যা	৩'৬ লক্ষ (৩'২ লক্ষ স্কুল ও ০'৪ লক্ষ কলেজ)	*	৮'৮ লক্ষ (৭'৮ লক্ষ স্কুল ও ১ লক্ষ কলেজ)

এ ছাড়া সরকারী অর্থে ৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে বিনা বেতনে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। শতকরা হিসেবে ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৯% এবং ২য় পরিকল্পনার শেষে ১৬% জন জলপানির সুযোগ পাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত পরিবর্তন করা দরকার। বর্তমানে ছাঃ শিঃ :: ১০০ : ১। টিউটোরিয়াল ব্যবস্থা ও একজন অধ্যাপকের কর্তৃত্বাধীনে ১০।১৫ জন ছাত্রের নির্দেশনার ব্যবস্থা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতি-মূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং খেলাধূলা, N.C.C. দল গঠন, ব্যায়ামের ব্যবস্থা এবং দলবদ্ধ শিক্ষামূলক ভ্রমণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা হয়েছে। এক কথায় পরীক্ষা পাশের কারখানায় প্রাণের স্পন্দন আনবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নেমে যাওয়া মানে জাতীয় শিক্ষার মান নেমে যাওয়া এবং বিশ্বের দরবারে জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্য ছাত্রদের হাতেই যাতে গণতন্ত্রী দেশের নেতৃত্ব থাকে একথা ভেবে প্ল্যানিং কমিশনকে অগ্রসর হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন

* হিসেব পাওয়া যায় নি

কারিগরী শিক্ষা—গত ১০ বৎসরে কারিগরী শিক্ষার অভূতপুর্ব প্রসার ও উন্নতি হয়েছে। জাতিকে নূতন করে গড়তে হলে তার শিল্প-বাণিজ্য, যানবাহন, খনি, বন ও অন্যান্য সম্পদের প্রসার ও উন্নয়ন প্রয়োজন। বিদেশী শাসকেরা আমাদের দেশে কেরাণী তৈরীর কারখানা রূপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু যাতে জাতির অর্থনৈতিক কাঠামো দৃঢ় হয় সেরূপ কোন ব্যবস্থা বিদেশী সরকার করে নি। জাতীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্ল্যানিং কমিশনের নির্দেশে এদেশে চারিপ্রকার কারিগরী শিক্ষার প্রসার হয়েছে; যথা—

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার দ্রুত উন্নয়ন

(১) ইনষ্টিটিউট্ অব্ টেক্‌নোলজী;
(২) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ;
(৩) পলিটেক্‌নিক;
(৪) জুনিয়ার ও সিনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল, টেড স্কুল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতির উপর জোর দেওয়ায় টেকনিক্যাল শিক্ষার সর্বস্তরেই আগ্রহ বেড়েছে। টেক্‌নোলজির উপর নানা-প্রকার গবেষণাও আরম্ভ হয়েছে।

সামাজিক শিক্ষা—আদমসুমারী থেকে দেখা গেছে ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে আক্ষরিকজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা ১৬.৬%। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলতে চায়। এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে হলে বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কমিউনিটি প্রজেক্টের সহযোগে সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বহুসংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার চালু করা, জনতা কলেজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে জন-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সামাজিক শিক্ষার নব রূপায়ণ

শিক্ষা কমিশনের পর্যালোচনা (কোঠারী কমিশন)

প্রস্তাবনা—পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ যখন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে তখন ভারত সরকার নানাবিধ বিপর্যয়ের মুখে। দেশের খাদ্যসমস্যা চরমতম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর নাগরিকদের বেকার সমস্যা কল্পনাতীত বেড়ে গেছে, দ্রব্যমুল্য হয়েছে আকাশচুম্বী, সর্বোপরি শিক্ষা-ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার অভাব এবং অপরিমেয় অপচয় ও অমুন্নয় দেশের কর্ণধার ও শিক্ষাবিদ্‌দের ভাবিয়ে তোলে। কংগ্রেস সরকার

উচ্চভাবাদর্শের দ্বারা পরিচালিত তাই মিশ্র অর্থনীতিকে আশ্রয় করতে গিয়ে এ দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কয়েকজন শিল্পপতি ও কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী একচেটিয়া ক্ষমতা লাভের সুযোগ পেয়ে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ যুগ্মভাবে দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। শিল্পের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে গিয়ে কৃষির প্রতি হয়েছে চরম অবহেলা। দেশের নাগরিকদের মধ্যে অর্থ বৈষম্য বড়ই প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে গণতন্ত্রী ভারতবর্ষের নাগরিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম অসন্তোষের ভাব। দেশ একটা বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাও নানা প্রকার সংস্কারের ভেতর দিয়ে একটা নবরূপায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বড় রকম গলদ রয়ে গেছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে দেশের সামাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির গভীর যোগ রয়েছে। তাই শিক্ষা-ব্যবস্থা নানাবিধ সমস্যা-সঙ্কুল। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য দেশও কাল উপযোগী উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন না করতে পারলে দেশের অগ্রগতি প্রতি পদেই ব্যাহত হবে।

কেন্দ্রীয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা শিক্ষা দপ্তরের ভার নেবার কিছুদিন পরেই লক্ষ্য করেন যে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন মানসে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর তদন্ত করবার জন্য কতকগুলি কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিটি ও কমিশনগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার পর পর তিনটি শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ফল আশাপ্রদ হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ববর্তী কমিশন বা কমিটি কোনটিই ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করবার সুযোগ পান নি, তা ছাড়া শিক্ষা পুনর্গঠন করতে গিয়ে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার অনেকগুলি পূর্বে জানা ছিল না। তাই শিক্ষার সামগ্রিক রূপটির তদন্ত করবার জন্য ভারত সরকার ১৯৬৪ খ্রীঃ **কোঠারী কমিশন** নিয়োগ করেন। এই কমিশন জাতীয় শিক্ষার কাঠামো প্রস্তুত করতে, সর্বস্তরের জন্য সাধারণ শিক্ষানীতি নির্ণয় করতে ও শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ নীতির প্রয়োগ ব্যাপারে ভারত সরকারকে পরামর্শ দিতে অনুরুদ্ধ হন।

কমিশনের মতে ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে গড়ে তুলতে হবে জাতীয় শিক্ষা। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞানের দানে আজ আমরা বিশ্বের অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলির সাথে প্রাতিবেশীর মত বাস করছি। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না। জাতির নিজস্ব প্রয়োজনে এতদিন জাতির অগ্রগতির জন্য যে বিপ্লবাত্মক

শিক্ষাধারা গড়ে ওঠা প্রয়োজন ছিল তা বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে সম্ভব হয়নি। কোঠারী কমিশনের মতে একমাত্র সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই নব ভারতের জন্ম হতে পারে। দেশের সমস্যাগুলিকে বিচ্ছিন্ন-ভাবে বিচার না করে সমস্যাগুলির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলেই দেখা যাবে যে এ দেশের অবৈজ্ঞানিক ও অনুদার শিক্ষানীতি এর জন্য কম দায়ী নয়। তাই এই কমিশন কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেছেন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য। সুপারিশগুলি একেবারে অভিনব নয় তবে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য অনেকগুলি সুপারিশ সময় উপযোগী।

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন উন্নত দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদও ছিলেন। তা ছাড়া কমিশনের সদস্যদের একটি দল আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ায় কয়েকটি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়ে এসেছেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-সংস্থা এবং রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে আলাপ আলোচনা করে দেশে কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং কিভাবে ঐ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায় সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা কমিশন লাভ করেছেন। তাছাড়া সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা করে শিক্ষানীতিকে কিরূপে স্বল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা-পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব সে সম্বন্ধেও একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সরকার যদি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে চান তবে কমিশনের সুপারিশগুলি যতদূর সম্ভব সত্বর বিবেচনা করে শিক্ষা পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে পারেন। নিম্নে খুব সংক্ষেপে সুপারিশগুলি উল্লেখ করা গেল—

প্রাক্ প্রাথমিক স্তর—(১) এই স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব জনসাধারণের, তবে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের কাঠামো, পাঠক্রম, পাঠপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা কার্যের দায়িত্ব এবং শিক্ষিকাদের শিক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকবে সরকারের। **রাজ্য শিক্ষা-সংস্থা** (State Institute of Education) এ বিষয়ে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করবেন।

প্রাথমিক স্তর—কর্মভিত্তিক বুনিয়াদী শিক্ষা বা বুনিয়াদী প্যাটার্ণে প্রাথমিক শিক্ষাকে (৬—১১ বৎ) বয়স্ক সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য ১৯৭৫—৭৬ খ্রীঃ মধ্যে আবশ্যিক ও অবৈতনিক করতে হবে, আর ১৯৮৫—৮৬ খ্রীঃ মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স্ক সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি এক মাইলের মধ্যে একটি করে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং সর্ব প্রকারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ করতে হবে। ১১—১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য

প্রয়োজনস্থলে অবসরকালীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাধ্যমিক স্তর—মাধ্যমিক শিক্ষায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পর যাতে শতকরা ২০ জন বৃত্তিমুখী শিক্ষায় যোগদান করে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর শতকরা ৫০ জন বৃত্তিমুখী শিক্ষায় যোগদান করে সেরূপ ব্যবস্থা থাকবে। দশম শ্রেণীতে প্রথম বহিরন্থুষ্ঠিত পরীক্ষা দিতে পারবে। একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষা নির্দেশনা হিসেবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষাধারায় যোগদান করবে। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যুক্ত হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কেবলমাত্র যোগ্য শিক্ষার্থীরা ৩ বৎসরে স্নাতক পর্যায়ের পাঠক্রম অনুসরণ করবার জন্য মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার সুযোগ পাবে। বাকী শিক্ষার্থীরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের যোগ্যতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই লাভ করবে। দশম শ্রেণীর সমস্ত বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করবার প্রয়োজন নেই। স্থানীয় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার কথা, বিশেষ করে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়, বিবেচনা করেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই যাতে মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায় সেজন্য অবসরকালীন বা স্বল্পকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশেষ করে যারা কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প, গৃহকার্য বা অন্য প্রকার বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করেছেন তাদের জন্য এই জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করা বিশেষ প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলের ও অনুন্নত আদিবাসীদের মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে সরকারী ব্যয়ে। এ ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে স্বাবলম্বী হয় সেদিকে সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বৃত্তিমুখী বিদ্যালয়গুলি শিল্পকেন্দ্রে, কৃষিখামারে বা ব্যবসা কেন্দ্রের সন্নিকটে স্থাপন করতে হবে এবং ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়টি হাতে কলমে শিখতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাও রাখতে হবে। রাজ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য **রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ** (State Board of School Education) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিস্তৃত পাঠক্রম নির্ণয় করবেন এবং প্রয়োজন স্থলে উহার পরিবর্তন করবেন। রাজ্যের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য নূতন করে **উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ** গঠন করতে হবে। তিনটি ভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও অঙ্ক মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য পাঠ্য থাকবে। বৎসরে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ৩০ দিন ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ২০ দিন আবশ্যিক সমাজ সেবা যুক্ত হবে।

মাধ্যমিক স্তরে একটি কারুশিল্প অবশ্যপাঠ্য থাকবে এবং মূল শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত করে তুলতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যার স্থলে শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা ও কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকবে আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। শারীর শিক্ষা এবং সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তুলবে। বক্তৃতা ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্মাশ্রিত ও পাঠচক্রভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে জীবনবোধ আনতে সমর্থ হবে। সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষাগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকের চাকুরীর সর্ত যাতে আকর্ষণীয় ও বেতন যাতে উন্নত জীবন যাপনের উপযোগী হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পাঠাগার, পরীক্ষণাগার, খেলার মাঠ ও ভাল বিদ্যালয়গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ ছাড়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব নয়; সরকারকে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

উচ্চ শিক্ষাস্তর—বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা হবে ৩ বৎসরব্যাপী আর স্নাতকোত্তর শিক্ষা হবে ২ বা ৩ বৎসরব্যাপী। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীর ভীড় কমিয়ে যোগ্য শিক্ষার্থীদের শুধু ভর্তি করতে হবে নতুবা উচ্চ শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ করা যাবে না। তা ছাড়া স্নাতক পর্যায়ে যারা শিক্ষা গ্রহণ করবেন তারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবেন কাজেই তাদের শিক্ষার উন্নয়নের উপর জাতীয় উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে উচ্চ শিক্ষা নিম্নগামী তাই কমিশন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে **উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়রূপে** গড়ে তুলতে সুপারিশ করেছেন। এই সমস্ত উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা দিয়ে বা গবেষণা কার্য সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা ভাল অধ্যাপক হবার যোগ্যতা লাভ করবেন। অধ্যাপকদের শিক্ষানবিশির সময় পেশামূলক শিক্ষা লাভের সুযোগ দেবার জন্য **অধ্যাপনা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়** (Staff College for College teachers) স্থাপনের কথাও কমিশন বিবেচনা করেছেন। তা ছাড়া নূতন অধ্যাপকগণ যাতে সে বিষয়ের প্রধান অধ্যাপকদের কাছে তাদের পেশামূলক শিক্ষা গ্রহণ করেন তার জন্য কমিশন জোর সুপারিশ করেছেন। মহাবিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যাতে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা যোগদান করে তার জন্য অধ্যাপকদের চাকুরীর সর্ত ও বেতনের হার আকর্ষণীয় করতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের মত সর্ব প্রকার ভাতা সর্ব স্তরের শিক্ষকদের দিতে হবে এবং প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর শিক্ষকদের বেতন পুনর্বিবেচনা করতে হবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলিতে এবং স্নাতকোত্তর

শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে যথাক্রমে কলা ও বিজ্ঞানের উপর এবং শিক্ষাতত্ত্বের উপর গবেষণা কার্যের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। পেশামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিষদগুলি বিশেষ বিশেষ পেশার উপর গবেষণা কার্য যাতে পরিচালনা করতে পারেন তার সুযোগ এবং সরকারী সংস্থাও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সেরূপ সুযোগ দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নত করবার জন্য স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বক্তৃতার মাত্রা যথেষ্ট কমাতে হবে এবং ছোট ছোট দলে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের মৌলিক বিষয় পাঠের জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। তাহলে অধ্যাপকবৃন্দের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সহজেই গবেষণামূলক পাঠের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে। এ জন্য স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থী নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতার মানকে বেশ উন্নত পর্যায়ে রাখতে হবে। মানব শক্তি নিয়োগ পরিকল্পনা (Man Power Planning) সংস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে জানিয়ে দিতে হবে কোন বিষয়ে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে কত শিক্ষার্থীর চাকুরী লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রার্থীদের মধ্য থেকে যাদের শিক্ষাগত মান অপেক্ষাকৃত ভাল তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হবে। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর জলপানির (Scholarship) ব্যবস্থা থাকবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল যোগ্য নাগরিককে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনমত শিক্ষা-ঋণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থীদের (Non-Collegiate Candidates) আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। সান্ধ্যকালীন বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার জন্য সম্ভব স্থলে ব্যবস্থা করতে হবে। ডাকযোগে উচ্চ শিক্ষার (Correspondence Course) ব্যবস্থা চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দিতে কমিশন সুপারিশ করেন। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে সমস্ত বিভাগে মহিলাদের ভর্তির সমান সুযোগ দিতে হবে। কমিশন মনে করেন যে একটি সুপরিকল্পনা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষাকে (Regional Language) গ্রহণ করা উচিত।

এ ছাড়া **কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে** কমিশন নূতন পথের নির্দেশ দিয়েছেন।

(১) **National Board of School Education**—ভারতবর্ষে সর্ব স্তরের শিক্ষার মান দ্রুত নিম্নগামী হওয়াতে কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে State Education Organisation এবং State Boards of Education রাজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার মান নির্ধারণ করবেন আর National Board of School Education স্কুলের শিক্ষার সর্ব ভারতীয় মান রক্ষার সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করবেন। এ ছাড়া Central Board of Secondary Education দশম শ্রেণীর পর ও দ্বাদশ শ্রেণীর পর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে

বিশেষ বিশেষ বিষয়ের (Subjects) উপর বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এই পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব হবে। State Board of School Education রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সাথে একযোগে কাজ করবে এবং Board of Secondary Education ও এই জাতীয় সংস্থাগুলি State Board-এর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। রাজ্যের বিদ্যালয়-শিক্ষার একটা সুসংহত রূপ দানের সর্ব প্রকার দায়িত্ব থাকবে এই বোর্ডের উপর।

(২) **Major Universities**—ভারতীয় উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করবার জন্য অবিলম্বে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ও একটি আই. আই. টি. কে Major Universityতে উন্নীত করার আশু প্রয়োজন রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। দেশের যোগ্য ও বিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করতে হবে। প্রয়োজন স্থলে স্বনামধন্য বিদেশী অধ্যাপকদেরও নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে। উচ্চতম জ্ঞানভাণ্ডার যাতে এদেশেই প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্যই এই প্রচেষ্টা। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী নির্বাচনে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শুধু এই সমস্ত উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চতম শিক্ষালাভের পথে বাধার সৃষ্টি না করে তার জন্য প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত জলপানি দিতে হবে। মহাবিদ্যালয়ের নূতন অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এই সমস্ত উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যাতে নিয়োগ করা হয় তার জন্য উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিভাবান শিক্ষার্থী যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক হয় তার জন্য উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ দিতে কমিশন বিশেষভাবে সুপারিশ করেছেন।

(৩) **Evaluation** (শিক্ষার বিচার)—এতদিন শিক্ষার উন্নতির সাথে পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বিচার করা হয়েছে, কিন্তু কমিশনের মতে দেশবাসীর শিক্ষার মান (প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত) উন্নত করতে হলে শিক্ষার বিচার সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। রচনাত্মক পরীক্ষা, প্রয়োগমূলক পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবর্তন এবং অভীক্ষার প্রয়োগ ও সর্বাত্মক ধারাবাহিক প্রগতি পত্র প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষার বিচার সম্ভব। এই বিচার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনরায় পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়বে।

(৪) **Teaching Method** (শিক্ষা পদ্ধতি)—কমিশন মনে করেন যে

শিক্ষার সর্ব স্তরে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। এইজন্য শিক্ষক শিক্ষণের দ্রুত প্রসার এবং শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পদ্ধতির উপর আধুনিকতম গবেষণা কার্য চালিয়ে উহার ফলশ্রুতির সুযোগ যাতে দেশের সমস্ত নাগরিকেরা পায় সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতির সাথে পাঠক্রমের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। সর্ব স্তরের পাঠক্রমের উপর গবেষণার সুযোগ দিতে হবে প্রতিভাবান শিক্ষাবিদ্‌দের। বুনিয়াদী পাঠক্রমে যাতে উৎপাদকাত্মক কার্যাবলী, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, সামুদায়িক জীবন ও সৃজনাত্মক কার্যাবলীর সুসংহত রূপটি গৃহীত হয় সেদিকে কমিশন দৃষ্টি দিতে বলেন কারণ বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমেই এ দেশে উন্নত পর্যায়ের নাগরিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

(৫) **Guidance & Counselling**—(শিক্ষা নির্দেশনা ও পরামর্শ দান) বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তনের সাথে শিক্ষা নির্দেশনা ও পরমর্শদানের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু কমিশনের মতে শিক্ষার সর্ব স্তরেই শিক্ষা নির্দেশনার প্রবর্তন প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শতকরা ২০ জনের বৃত্তি নির্বাচনের জন্য এবং মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরের পর শতকরা ৫০ জনের ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর শতকরা ৫০ জনের বৃত্তি নির্বাচনের নির্দেশনার প্রয়োজন হবে ; এ জন্য প্রত্যেক স্তরের শেষের দিকে দুই বা তিন বৎসর ধরে ধারাবাহিক শিক্ষা নির্দেশনা দিতে হবে। শিক্ষায় উৎপাদকতা (Productivity) আনতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তা ছাড়া শিক্ষার প্রতি স্তরে যে পরিমাণ অপচয় ও অনুন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি নির্দেশনার প্রবর্তন করে। অবশ্য এ জন্য শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার প্রয়োজন।

(৬) **The Common School System of Public Education**—গণতন্ত্রী ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি শিশুর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগের ব্যবস্থা করবার মানসে কমিশন সরকারী, সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ও পৌরসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সর্ব প্রকার বিদ্যালয়কে একই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সুপারিশ করেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে এবং ধীরে ধীরে ৫ম পরিকল্পনার শেষে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এই নীতি প্রবর্তিত হবে। অবৈতনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এবং পরিবেশ যাতে ভাল স্কুলগুলির সমান হয় সেদিকে সর্ব প্রকার যত্ন নিতে হবে।

সর্ব শেষে কমিশনের সভাপতির মন্তব্য থেকে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে জাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা দেশের সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে বিবর্তিত হচ্ছে এবং বর্তমানের শিক্ষা বর্তমান নাগরিকদের প্রয়োজন ও চাহিদার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল।

বর্তমানে নিম্নলিখিত দশটি উপায়ের মধ্য দিয়ে এ দেশে বৈপ্লবিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

(১) সর্ব স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে কর্মের অভিজ্ঞতা (Work-experince) বিশেষ প্রয়োজনীয়। গান্ধিজীর মতে উৎপাদকাত্মক কার্যের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর আত্ম প্রত্যয় লাভে তথা ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরম সহায়ক। (২) গণতন্ত্রী ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব স্তরে আবশ্যিক ভাবে সমাজ-সেবা যুক্ত করতে হবে এবং ভাবী নাগরিকদের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য বোধ জাগাতে হবে। (৩) নিম্ন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাকে যথাসম্ভব বৃত্তিমুখী করে তুলতে হবে। (৪) উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের (Major University) প্রতিষ্ঠা করে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ দেশেই সর্ব শাস্ত্রের উচ্চতম শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। (৫) শিক্ষায় মান উন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতম উন্নত শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। (৬) সর্ব প্রকার কৃষি সংক্রান্ত শিক্ষা ও কৃষি গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (৭) সামাজিক শিক্ষা, সমাজ বিজ্ঞানের উন্নত প্রয়োগ ও মানবাদি বিজ্ঞানের প্রসার জাতীয় উন্নতির পরম সহায়ক। (৮) শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নয়ন বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। (৯) শিক্ষা-ব্যবস্থায় উৎপাদকতা (Productivity) আনতে হলে একে করতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক, বৃত্তিমুখী এবং সমাজ-সচেতন। জাতীয় শিক্ষাকে সমুন্নত করতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ নেই। (১০) জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার এক বিশিষ্ট প্রক্রিয়ারূপে গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা

ভূমিকা—বিগত তিনটি শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণ থেকে একথা প্রতিপন্ন হয়েছে যে শিক্ষাকে জাতীয় লগ্নী (National investment) হিসেবে গ্রহণ না করতে পারলে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। তা ছাড়া শিক্ষাখাতে যে পরিমাণ অর্থের ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছিল উপযুক্ত শিক্ষা পরিশাসন ও সুসংহত শিক্ষা নীতির প্রয়োগের অভাবে প্রভূত অর্থ ও শক্তির অপচয় হয়েছে। গত ১৫।১৬ বৎসর ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে চলেছে শিক্ষা-পুনর্গঠনের এক বিরাট প্রচেষ্টা—কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে উহা সাফল্য-মণ্ডিত হয়নি বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাই চতুর্থ পরিকল্পনায় তিনটি পর্যায়ে শিক্ষার পুনর্গঠন কার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে—

(১) বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত গলদ আছে সত্বর সেগুলি দূর

করতে হবে। (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন বাঞ্ছনীয়। (৩) শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের সময় খেয়াল রাখতে হবে কি ভাবে বরাদ্দ অর্থের দ্বারা সমুচিত জাতীয় লগ্নী সম্ভব হতে পারে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষা-ব্যবস্থার **নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।**

(১) আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন :—চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে (৬-১১) নিম্ন প্রাথমিক পর্যায় অবশ্যই অবৈতনিক করা হবে।

(২) গণশিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সরকার সর্ব প্রকারে এই আন্দোলনকে সাহায্য করবেন।

(৩) স্ত্রী-শিক্ষার দ্রুত প্রসার এবং শিক্ষিত মহিলাদের জন্য বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর বুনিয়াদী বিদ্যালয় নির্বাচন করে বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কারুশিল্পের প্রবর্তন করে কর্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা এবং নাগরিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরগুলির শেষের দিকে বৃত্তিমুখী, কারিগরী ও পেশামুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে এবং এজন্য উপযুক্ত শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) পাঠক্রম নির্মাণ ও নূতন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগের উপর গবেষণা কার্য চালাতে হবে।

(৭) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থার প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন আছে বিদ্যালয়-শিক্ষাকে উন্নত করবার জন্যে।

(৮) ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নাগরিক যাতে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চতম শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে সে জন্য গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জলপানির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) শিক্ষা পরিচালনা ব্যয় হ্রাসের জন্য বিদ্যালয় গৃহ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষণাগার, খেলার মাঠ ও শিক্ষা-উপকরণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতন শিক্ষা স্তর পর্যন্ত সর্বত্র দুই বা ততোধিক শিফট্ (Shift) ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কারিগরী ও পেশামূলক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা না বাড়িয়ে বর্তমানে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে সেগুলিতে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশনের অনুমোদন ছাড়া কোন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা চলবে না। পল্লীর উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের সাথে সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক ছক

বরাদ্দ অর্থ কোটি টাকা হিসেবে

শিক্ষার খাত	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ (প্রস্তাবিত)
প্রাথমিক শিক্ষা	৮৫	৮৭	২০৯	৩২২
মাধ্যমিক	২০	৪৮	৮৮	২৪৩
বিশ্ববিদ্যালয়	১৪	৪৫	৮২	১৭৫
*শিক্ষক-শিক্ষণ	—	—	—	৯২
*কারিগরী শিক্ষা	—	—	১৪২	২৫৩
সামাজিক শিক্ষা	১৪	২৪	২৯	৬৪
সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও *সাধারণ শিক্ষা	—	৪	১০	৬১
	১৩৩	২০৮	৫৬০	১২১০

বিগত তিন পরিকল্পনায় শিক্ষার **প্রসার** এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের **লক্ষ্য মাত্রা** (target)

শিক্ষাস্তর	শিক্ষার প্রসার				লক্ষ্য মাত্রা
	১ম	২য়	৩য় (লক্ষ্য মাত্রা)	(সম্ভাব্য প্রসার)	৪র্থ (প্রস্তাবিত)
প্রাথমিক	(১৯৫০-৫১)	(১৯৬০-৫১)	(১৯৬৫-৬৬)		(১৯৭০-৭১)
(১ম—৫ম শ্রেণী)	১৯'১৫	৩৪'৯৯	৫০'২৯	৫১'৫০	৬৯'৫০
(৬-১১ বৎ) বয়ঃ গোষ্ঠির শতকরা হিসাব	৪২'৬%	৬২'২%	৭৬'৪%	৭৮'৫%	৯২'২%
নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ শ্রেণী—৮ম শ্রেণী)	৩'১২	৬'৭০	১০'১৬	১১'০০	১৯০০
(১১-১৪ বৎ) বয় গোষ্ঠির শতকরা হিসাব	১২'৭%	২২'৫%	২৯'৮%	৩২'২%	৪৭'৪%
মাধ্যমিক স্তর (৯ম শ্রেণী—১১শ শ্রেণী)	১'২২	২'৯৬	৪'৬১	৫'২৪	৯'০০
(১৪—১৭ বৎ) বয়ঃ গোষ্ঠির শতকরা হিসাব	৫'৮%	১১'৭%	১৫'৭%	১৭ ৮%	২২ ১%
বিশ্ববিদ্যালয় স্তর	০'৩০	০'৭৩	১'১০	১'১০	১'৬০
(১৭—২৩ বৎ) বয়ঃ গোষ্ঠির শতকরা হিসাব	'৭%	১'৫%	১'৯%	১'৯%	২'৪%
কারিগরী শিক্ষা					
ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করা	৫৯০০	২৫৮০০	৩৭৩৯০	৪৯৯০০	৬৮০০০
ডিগ্রী কোর্স "	৪১২০	১৩৮২০	১৯১৪০	২৪৭০০	৩০,০০০

*পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ ছিল না একক=দশ লক্ষ

অনুশীলনী

১। ভারতীয় শিক্ষার জীবনাদর্শ কি ?

২। হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলনীতি কি ছিল ?

৩। ভারতীয় জীবনে মুসলিম শিক্ষার প্রভাব কতটুকু ?

৪। এ দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?

৫। জাতীয় শিক্ষার কাঠামো সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?

৬। মাধ্যমিক শিক্ষার বিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। উচ্চ শিক্ষার প্রগতি ও প্রসারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৮। এ দেশের শিক্ষার পরিশাসন সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি ?

৯। ভারতবর্ষের স্ত্রী-শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমিকা কি ?

১০। শিক্ষা-ব্যবস্থার যে সামগ্রিক রূপটি শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) পরিকল্পনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১১। হিন্দু শিক্ষাবিধি পর্যালোচনা কর। আধুনিক শিক্ষার সাথে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় কি ? সে যুগে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রচলন না থাকলেও ভাল শিক্ষকের অভাব ছিল না কেন ?

১২। হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থার উৎকর্ষ বিচার কর।

১৩। ভারতীয় শিক্ষা-বাবস্থার মূল নীতির পরিবর্তনে মেকলের পরোক্ষ প্রভাব কতটুকু ? শিক্ষা বিষয়ে পরিশ্রুতি নীতি (Filtration theory) অনুসরণের বিষময় ফল কি ?

১৪। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে উডের ডেস্‌প্যাচকে এক যুগান্তরকারী দলিল বলা হয় কেন ?

১৫। কার্জন শিক্ষাবিদ্ ছিলেন, না জাঁদরেল শাসক ছিলেন ? তাঁর শিক্ষা নীতি বিশ্লেষণ করে তোমার উত্তরের যৌক্তিকতা প্রমাণ কর।

১৬। সংক্ষেপে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পরিচয় দাও।

১৭। প্রাথমিক শিক্ষার মূল সমস্যাগুলির উল্লেখ করে উহা সমাধানের পন্থা নির্ণয় কর।

১৮। স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৯। রাধাকিষণ কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি ভারতীয় শিক্ষার পুনর্গঠনে কতটুকু সাহায্য করেছে ?

২০। প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠনে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন ?

২১। শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় কেন ? শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

২২। কোঠারী কমিশন শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য কোন্ কোন্ নূতন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ?

২৩। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী শিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

University Questions

1. What are different types of Universities in West Bengal ? Give a brief account of their control and management. [B. A. 1965]

2. What progress in Secondary Education it contemplated in West Bengal in the Third Five Year Plan ? How far has it been made till now ? [B. A. 1965]

3. Give an account of the new pattern of Secondary Schools in India as outlined by the Secondary Education Commission (1952-53). Do you think multipurpose schools will be able to improve the Secondary Education in our country? Give reasons for your answer. [B. A. 1965]

4. What are the defects of the present System of University Education? Suggest remedies for improvement. [B. A. 1966]

5. Give a short history of technical education in your State with reference to different types of institutions. [B. A. 1966]

6. Describe any two of the following educational institutions of ancient India: Ashrama, Tol, Parisad and compare them with their present forms, if any. [C. U. B. T. 1965]

7. What has been the contribution of missionary enterprise in Bengal in the first half of the last century in any of the following fields. [C. U. B. T. 1965]

(a) The growth of Vernaculars
(b) The Spread of English education
(c) The education of Women.

8. Discuss the various influences that have mainly determined the present system of education in India. [C. U. B. T. 1965]

What are the problems of University education in West Bengal? Discuss how far they are going to be solved by the establishment of new Universities. [C. U. B. T. 1965]

9. Describe some of the most important rituals connected with education in ancient India and point out the significance of each. [C. U. B. T. 1965]

10. State and critically comment on the resemblances between Brahmanical and Buddist systems of education. [C. U. B T. 1965]

11. Give a general review of the development of primary education in India between 1854 to 1902. [C. U. B. T. 1965]

12. Give a brief survey of post-independence development in secondary education in India and comment on the effectiveness of the more important changes introduced. [C. U. B. T. 1965]

13, What were the provisions made for educational development in Two Five Year Plans (1651—1961) ? What were the results achieved? [C. U. B. T. 1965]

14. Buddism developed a system of education in India which was a rival of the Brahmanic system though in many ways similar to it.—Disuss. [C. U. B T. 1966]

15. The education despatch of 1854 laid the foundation of State edcational system.—Discuss.

In what way did the despatch of 1859 supplement the former? [C. U. B. T. 1966]

ভারতীয়

শিক্ষা-সমস্যার গতি-প্রকৃতি

দ্বিতীয় খণ্ড

[শিক্ষা-সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ কি, সমস্যার উদ্ভব হয় কিরূপে, সমস্যার জন্য দায়ী কে ও সমস্যার গুরুত্ব কতটুকু সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তথ্যের সমাবেশ, এবং ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যার বিশেষ বিশেষ দিক এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয়]

SYLLABUS

Problems of :—

(1) Finance

(2) Accommodation & equipment

(3) Control & management

(4) Curricular & Co-curricular activities

(5) Teaching personnel

(6) Tests & Examinations

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যার গোড়ার কথা

সমস্যার স্বরূপ—জীবন পরিবর্তনশীল। বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে মানুষ যখনই কোন সংঘাতমূলক অথবা অভাব জনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তখনই উহার সমাধানের জন্য সম্ভাব্য প্রচেষ্টার ত্রুটি করেনি। যে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাত থেকে জীবনে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলির মূল সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে সমস্যা সমাধান সহজতর হয়। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করলে একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রগতিশীল মতবাদকে সমাজ সহজে স্বীকার করে নিতে চায় না বলেই প্রাচীনের সাথে নবীনের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে এক সময় চাহিদার তুলনায় বস্তুর পরিমান ছিল কম কিন্তু পরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং শিল্প-বাণিজ্যে তার প্রয়োগ থেকে বস্তুর উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। শক্তিশালী ও স্বার্থান্বেষী মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও কম বুদ্ধিমান মানুষের উপর আধিপত্য চালায়। ধনবল ও জনবল সংগ্রহ করে ক্ষমতায় আসীন রাজন্যবর্গ, জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষমতা বলে সমাজের অপর লোকদের শাসন ও শোষণ করতে থাকে। ধনবল, জনবল ও বিদ্যাবল সব কিছু থেকেই সমাজের বৃহত্তর অংশ দু'হাজার শতাব্দী ধরে বঞ্চিত ছিল। তারপর আরম্ভ হয় গণ জাগরণের যুগ। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে নানাবিধ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতাশীল দল নিজেদের স্বার্থকে আঁকড়ে থাকতে চায় আর জন সাধারণের জাগ্রত চেতনা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আমরণ সংগ্রামে ব্রতী হয়। জীবনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এই অবিরাম সংগ্রামের মধ্যেই প্রকাশমান।

গণ জাগরণ

শিক্ষা-সমস্যার স্বরূপ—শিক্ষাক্ষেত্রেও এই অবিরাম সংগ্রামের পরিচয় রয়েছে শিক্ষার ইতিহাসে। শিক্ষা যে মানুষের জন্মগত অধিকার এই তত্ত্ব জন জাগরণের পর স্বীকৃত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দল সহজে জন সাধারণের হাতে শিক্ষার মত বিরাট শক্তির চাবিকাঠি তুলে দিতে রাজী নহেন তাই বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ ও নানাবিধ জিনিষের অভাব শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়। সমস্যাই নূতন চিন্তার খোরাক জোগায়। মানুষের জীবনের অনন্ত চাহিদা ও উদগ্র অভাববোধ থেকেই মানুষের জীবনের পরিবর্তন শীলতার উদ্ভব হয়েছে।

পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের অভাববোধ, চাহিদা, উপভোগ ও তার প্রতিক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়েছে। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষাধারার ক্রম-বিবর্তনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মানুষের জীবন এবং তার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নয় বলে তাতে পূর্ণতা আনবার জন্য তার অন্তরে রয়েছে অনন্ত ব্যগ্রতা। এই ব্যগ্রতা আরও বেশী হয় যখন জীবন সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠে। বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় সমস্যার মধ্যে রয়েছে সৃজনধর্মী শক্তির বীজ। বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সমস্যা-সঙ্কুল জীবনের অভাব বোধের ব্যাগ্রতা সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির জয় যাত্রার পথে মানুষকে কর্মে ব্রতী করে তুলেছে। এ দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা আজ খুবই সমস্যা সঙ্কুল। দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার দ্রুত পরিবর্তন থেকে এই সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এ দেশ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন কার্যে ব্রতী হয়েছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি যেমন সম্পর্কযুক্ত তেমনি জাতীয় শিক্ষার উন্নতির সাথে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিও বিশেষ ভাবে যুক্ত। তবে কেহ যদি মনে করেন যে আজ আমরা যে সমস্ত শিক্ষা-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সেগুলির সমাধান হলেই আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি তবে আমরা ভ্রান্ত কারণ মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা তার যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয় সামাজিক বিবর্তনের সাথে। এই সামাজিক বিবর্তন নূতন নূতন অভাববোধ তথা নূতন সমস্যা নিয়ে আসে। সেই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভবপর হয়। উহা সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে না করতেই নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়, কারণ জীবনের সাথে সমস্যা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যাসঙ্কুল

শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমস্যার উদ্ভব হয় কিরূপে?

গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষ সমস্যা-সঙ্কুল ছিল না। নব-শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে একটি ব্যবহারিক কলা (Practical Art) এবং সেজন্য নব-শিক্ষা প্রবর্তনে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ। শিক্ষার তত্ত্ব নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে ও হচ্ছে কারণ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় খুব সহজ নয়। কেহ বলছেন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রস্তুতি পর্বই শিক্ষাকাল; কেহ বলেছেন শিশু জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি (growth) ও বিকাশই (Development) হচ্ছে শিক্ষা তাই শৈশবও কৈশরই শিক্ষা লাভের উপযুক্ত সময়। সর্ব দেশে সর্ব কালে

তাই শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত (১ বৎসর থেকে ২৪ বৎসর পর্যন্ত) সুদীর্ঘ সময়ই শিক্ষা লাভের সময় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই মতের বিরোধিতা করে অপর দল বলেন শিক্ষা কাল সমস্ত জীবন ব্যাপী। এই মতের সমর্থকেরা শিক্ষার ব্যাপক অর্থের কথা বলেছেন। ভাল ভাবে বিচার করলে দেখা যায় আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মতে শিক্ষার তত্ত্ব নিয়ে কোন সংঘর্ষ নেই কারণ **শিক্ষা একটি ব্যাপক ধারণা**। যে ব্যক্তি শিক্ষাকে যেরূপ দৃষ্টি কোন থেকে দেখেন তার কাছে শিক্ষার পরিধি ততটুকু। শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা, পরামর্শ দান, সব কিছুই শিক্ষার ব্যাপক অর্থের মধ্যে স্থান লাভ করেছে ফলে ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। শিক্ষা-সমস্যার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে **চারি প্রকার সমস্যার** সংস্পর্শে আসতে হয়। যথা (১) **সংঘাতমূলক সমস্যা** (২) **অভাবজাত সমস্যা** (৩) **পরিকল্পনা প্রস্তুতের সমস্যা** এবং (৪) **শিক্ষা পুনর্গঠন মূলক সমস্যা**।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমস্যার উদ্ভব

সংঘাত মূলক সমস্যা—প্রত্যেক দেশেই জীবন ধর্মের নানা মত ও নানা পথের সন্ধান পাওয়া যায়। নানা মতের উদ্ভব হয় জীবন দর্শন (Philosophy of life) থেকে আর নানা পথের সন্ধান আসে বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিবার জন্যে। প্রাচীনকালে ধর্মীয় আদর্শ সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিল তাই দর্শনই ধর্ম পথের নির্দেশ দিতে সমর্থ হয়েছিল। পরে জীবনের ব্যাপ্তির সাথে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে দর্শনের চিন্তা প্রসারিত হয়। শিক্ষাকে জীবনের সাথে এক করে দেখা হয়েছে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্ব প্রকার দর্শনের চিন্তাধারা একাকার হয়ে যায় নি। বরং সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির পথে নানা মতের সংঘর্ষ থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থার নব রূপায়ন সম্ভব হয়েছে।

ভাববাদী, জড়বাদী, প্রকৃতিবাদী ও প্রয়োগবাদী মতবাদের সংঘাত—ভাববাদীরা দৃশ্যমান জগতের পেছনে এক অদৃশ্যমান ভাবময় চরম সত্যকে স্বীকার করেছেন। এই চরম ও পরম সত্য চিরস্থায়ী ; নশ্বর জগৎ ভঙ্গুর কাজেই শিক্ষার লক্ষ্য হবে চরম ও পরম সত্যকে লাভ করা। মানুষের মধ্যে পরমাত্মার অংশ রয়েছে আত্মারূপে তাই জগত ও জীবনের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে জানাই প্রকৃত শিক্ষা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের গোড়াপত্তন হয়েছে এই দৃশ্যমান জড় জগৎকে চরম ও পরম সত্যরূপে গ্রহণ করে। জড়বাদী দার্শনিকদের মতে এই পার্থিব জীবনকে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্য মানব শিশুকে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তুলতে হবে। এদের মতবাদের প্রভাবে শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান

জড়বাদী দর্শনের চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত আবার এ দু'টি বিজ্ঞান শিক্ষার পাঠক্রম ও পদ্ধতি নির্ণয়ে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে থাকে। জড়বাদীদের মতে জীবন ব্যাপী শিক্ষায় শিশুর কর্ম দক্ষতার পরিপূর্ণ—বিকাশই শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত কিন্তু প্রয়োগবাদীরা বলেন জীবনের কোন পূর্ণতা নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের পরিবর্তনের সাথে জীবনের চাহিদার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই শিক্ষার কোন চরম ও পরম লক্ষ্য হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিবাদীরা প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে সার্থক করে তোলবার জন্যে বিশেষ আগ্রহী। শিক্ষার লক্ষ্যের এই সংঘাত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষার কোন সার্বজনীন লক্ষ্য নেই। জীবন সমস্যাই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে সমর্থ। ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে এ বিষয়টি ভাল করে বিচার করতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে যে কয়টি মতবাদ চালু আছে সেগুলির মধ্যে দু'টি প্রধান দল রয়েছে। একদল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক আর অপর দল ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের পক্ষপাতী। **ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদে** বিশ্বাসী শিক্ষাবিদেরা বলেন প্রত্যেক শিশুসহজাত প্রবৃত্তি, দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায়। শিশুর আত্মিক বিকাশকে সার্থক করে তুলতে হলে শিশুর জন্মগত শক্তিগুলির সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে শিশুর মানসিক শক্তিও কর্ম প্রবণতার বিকাশ লাভে বাধা দেওয়া চলবে না সমাজের কল্যাণে শিশুর আশা আকাঙ্খাকে বলি দেওয়া সঙ্গত নয়। **সমাজতান্ত্রিক মতবাদীরা** বলেন বৃহত্তর সমাজ কল্যাণের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মতবাদ দুটি পরস্পর বিরোধী হলেও উভয় মতবাদের মূল লক্ষ্য সমাজের প্রয়োজনে শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। বর্তমানে সামাজিক; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন থেকে শিক্ষার লক্ষ্য বিচার করা হয় না প্রত্যেকটি শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ দেবার জন্য আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের সংঘাত

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় ও শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তনে বিবাদমান মতবাদগুলির সমর্থকেরা নিজেদের মতবাদের বৈশিষ্ট্যকে বড় করে দেখেন, অপর মতবাদগুলিকে তারা আমল দিতে চান না। কোন মতবাদের গোড়ামী না থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে, পাঠক্রম নির্মাণে এবং শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তনে দেখা যাবে যে সকল মতবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে স্বাধীন ও মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃজন মূলক শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন।

গণতন্ত্রী ও ধনতন্ত্রী শিক্ষাদর্শের সংঘাত—শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে

নানা মুনির নানা মতের সংঘর্ষ রয়েছে; তার কারণ সামাজিক লক্ষ্য, অর্থনৈতিক লক্ষ্য, রাজনৈতিক লক্ষ্য, দার্শনিক লক্ষ্য ও দেশের সাংস্কৃতিক লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে লক্ষ্যের এক দেশিকতা থেকে শিক্ষার সংকীর্ণ লক্ষ্যের উদ্ভব হতে পারে। তা ছাড়া পুর্বে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করবার সময় সমাজেরও পুর্ণবয়স্ক মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহের চাহিদাকে বড় করে দেখা হয়েছিল বলে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল খুবই সংকীর্ণ। নানাপ্রকার দ্বন্দ্বও সংঘাত এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যাপকতর ধারণার (concept) সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় প্রভাব খুব বেশী। আধুনিক গণতন্ত্রের চাহিদা ও ধনতন্ত্রাশ্রয়ী শিল্পবিজ্ঞানের চাহিদা পরস্পর বিরোধী। আধুনিক শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও শিক্ষা সমার্থক। এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। নব শিক্ষায় শিক্ষার উদ্দেশ্যই (aims) শুধু বড় নয় শিক্ষার পরিবেশ (environment) এবং শিক্ষা পদ্ধতিরও (Methods) যথেষ্ট মূল্য আছে। পরস্পর বিরোধী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলিকে সংহত করে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে জীবনের নব-রূপায়ণই শিক্ষার সবচেয়ে বড় কাজ। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্যের উপর (investment capacity for education) শিক্ষালাভের সুযোগ নির্ভর করে; অবশ্য শিক্ষালাভের জন্য উপযুক্ত মানসিক শক্তি (Mental ability) থাকা দরকার। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকদের অর্থনৈতিক বৈষম্য কম তা ছাড়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিক রাষ্ট্রের খরচায় শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাই শিক্ষার কাঠামো এই দু'টি পরিবেশে সম্পূর্ণ আলাদা। গণতন্ত্রী সমাজ যদি ধনতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বৈসম্য থাকবেই। ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় সাধারণ বিদ্যালয়ের (Common School) কথা বলা হয়েছে, ধন বৈসম্য হেতু শিক্ষা বৈসম্যের অবকাশকে রোধ করবার জন্যে। গান্ধিজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় শাসন ও শোষণ মুক্ত সর্বোদয় সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। বর্তমানে এ দেশের অর্থনৈতিক পটভূমিকায় বুনিয়াদী শিক্ষা অনাথ ও দরিদ্র জন সাধারণের শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিরূপে গড়ে তুলতে হ'লে সর্ব প্রথম প্রাথমিক স্তরে একই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রবর্তন করতে হবে এবং বিত্তশালীর সন্তান সন্ততির জন্য বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেও সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এতে সমস্যা আছে প্রচুর কিন্তু সাধারণ শিক্ষা প্রথা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এ দেশের সামাজিক বিবর্তন ত্বরান্বিত হওয়ার কোন আশা নেই।

শিক্ষালাভে ধন-বৈসম্যের প্রভাব

পাঠক্রম নির্ণয়ে সংঘাত—গতানুগতিক পাঠক্রম ও আধুনিক কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। যারা জ্ঞানলাভের উপর জোর দেন তারা গতানুগতিক পুঁথিসর্বস্ব পাঠক্রম আঁকড়ে থাকতে চান। অবশ্য বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষায় 'যেন তেন প্রকারেণ' প্রথম শ্রেণীর ছাপ (first class) পেতে হবে। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা এখনও তর্কের খাতিরেই যেন আমরা বলে থাকি এবং প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের প্রবর্তন করি শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাইরের ঠাট বজায় রাখার জন্য। ভারতবর্ষের নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়াশুনার চাপ (pressure of bookish knowledge) দেখলে বিষয়টি বুঝতে দেরী হয় না। মাধ্যমিক স্তরে একটি কারুশিল্পকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়েছে কিন্তু ক'জন শিক্ষার্থী বিষয়টিকে সযত্নে অনুসরণ করে সেটি পাঠক্রম নির্মাণকারীদের জানা দরকার। শিক্ষা-তত্ত্বের খাতিরে আমরা পাঠক্রম নির্মাণ করতে চাই কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখনও আমরা গতানুগতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করতে চাই না।

গতানুগতিক পাঠক্রম ও আধুনিক পাঠক্রম

প্রজেক্ট মেথড ও ওয়ার্কসপ মেথড নব-শিক্ষায় বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে কিন্তু এদেশে যারা শিক্ষকতা করেন তারা গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতি ছেড়ে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে মোটেই উৎসাহী নহে। এমন কি সদ্য শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত নবীন শিক্ষক বা শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সমর্থন পান নি বরং তাদের বিরাগ ভাজন হয়েছেন। ভাববাদীরা মনে করেন শিক্ষাক্ষেত্রে ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ধর্মবোধের মূল্য বেশী সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচীতে ঐ বিষয়গুলির স্থান সর্বাগ্রে। বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, যে বিদ্যা ব্যক্তি ও সমাজের পার্থিব কল্যাণ সাধন করে তাহাই পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতিবাদীরা শরীর চর্চা ও ইন্দ্রিয়গুলির উপযুক্ত ব্যবহারের উপর জোর দেন। প্রয়োগবাদীদের মতে সক্রিয়তার মধ্যে শিশু যাতে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায় পাঠক্রমে সেরূপ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও পাঠক্রম

শিক্ষা-ব্যবস্থা যতই উন্নত হচ্ছে শিক্ষার স্তর ভেদ ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তর (১৪+পর্যন্ত), মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য, পদ্ধতি ও শিক্ষায় ফলশ্রুতি পৃথক হওয়াতে তিনটি স্তরেই স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। আবার উচ্চ শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার যোগসূত্র রক্ষিত না হ'লে সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যাবে। জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিকাশের সাথে সমগ্র জীবনের যেমন একটি স্বাভাবিক সংযোগ সূত্র রয়েছে বিভিন্ন স্তরের

স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা স্তরের পাঠক্রম ও ধারাবাহিক শিক্ষার পাঠক্রম

স্বয়ং সম্পূর্ণ পাঠক্রমের সাথে সমগ্র শিক্ষার পাঠক্রমের তেমনি একটা স্বাভাবিক ও সুসংহত সংযোগ রেখে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে বালিকাদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, মাতৃ-কলা (Mother craft) ইত্যাদি বিশেষ কয়েকটি বিষয় পাঠক্রমে যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। বালকদের জন্য সামরিক শিক্ষা, শারীর শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা মাধ্যমিক পাঠক্রমে যুক্ত করতে হবে। পাঠক্রম নির্ণয়ের সমস্যা সমাধান কল্পে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার।

পদ্ধতি—নব শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী প্যাটার্নে রূপান্তরিত করে তোতাপাখি-বুলি-পদ্ধতির স্থলে কর্মভিত্তিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা খুবই সমস্যা-সঙ্কুল। এর কারণ প্রাচীন শিক্ষকেরা যে ভাবে শিক্ষা দিতে অভ্যস্থ তার পরিবর্তে তারা সহজে নূতন পদ্ধতি আয়ত্ব করে উহা প্রয়োগ করতে যত্নশীল নহেন। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা-উপকরণের অভাব ও গতানুগতিক জ্ঞানমূলক পাঠের প্রতি অভিভাবকদের সমর্থন থাকায় নীতিগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্তিত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পুঁথিগত শিক্ষাই এখনও চালু আছে।

ব্যক্তিগত পাঠ

শ্রেণীগত পাঠে অনেক সুবিধা থাকা সত্বেও শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যয় বহুল বলে ডালটন প্ল্যান বা মরিসন প্ল্যান এদেশে প্রবর্তন করা সম্ভব না হলেও এদেশের বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার জন্য ব্যক্তিগত পাঠের ব্যবস্থা শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে রাখিতে হবে!

শ্রেণী শিক্ষার ত্রুটি সংশোধন

শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা থাকে নিশ্চেষ্ট। হার্বর্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সাক্রিয় করবার চেষ্টা সীমাবদ্ধ। শিক্ষক সেখানেও বেশী সক্রিয়। এই ত্রুটি দূর করবার জন্য মাধ্যমিক স্তরে ওয়ার্কসপ পদ্ধতি ও উচ্চ শিক্ষাস্তরে সম্মেলন পদ্ধতির প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। এতে নানা সমস্যা আছে কিন্তু শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষার উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি ও উপযুক্ত পদ্ধতির প্রবর্তন অবশ্যই করতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যম—শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে এ দেশে বিবিধ প্রকার শিক্ষা-সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে প্রাচ্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে মতদ্বৈধতা যখন দেখা দেয় তখন এ দেশের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষার মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করা হবে এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ তর্কজালের সৃষ্টি হয়। মেকলের মিনিট (Macaulay's minute) এই সমস্যার সাময়িক সমাধান করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনাকে ভারতীয় শিক্ষায় প্রবর্তন করবার সুযোগ দেয়। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই ব্যবস্থা থেকে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ইংরেজীর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিস্তার এ দেশে জাতীয়তা বোধের জন্ম দিলেও জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় (National Education System) কখনও বিদেশী ভাষাকে এ দেশের শিক্ষার (প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত) মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। এখন শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দেশে বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এবং এর সমাধানের জন্য শিক্ষা কমিশন (কোঠারী কমিশন) বিস্তৃত সুপারিশ করেছেন।

জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যম

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে ভাষা শিক্ষা—শিক্ষার মাধ্যম ও বিভিন্ন স্তরে ভাষা-শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে অনেকে তাকে পৃথক করে দেখতে পারেন না। দুটি সমস্যা সম্পর্ক যুক্ত হলেও ওদের পৃথক সত্তা আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মানের সাথে সমতা রক্ষার জন্য এবং শিশুকে তার পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবে আত্ম প্রকাশ করবার জন্য প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা এবং মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা, জাতীয় ভাষা ও একটি বিদেশী ভাষা অধ্যয়ন করতে হয়। এ ছাড়া যারা মানবতা বিজ্ঞান বিভাগে (Humanities) ভাষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চান তারা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে একটি সাংস্কৃতিক ভাষা (classical language) ও আর একটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে পারেন। তবে ভাষা-শিক্ষা নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষার মান এবং জাতীয় শিক্ষার আদর্শের মধ্যে নিহিত। এদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞান, বাস্তু বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আরও কিছুদিন এই সমস্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাকে রাখতে হবে পাঠাগারের ভাষা (Library language) রূপে।

বিভিন্ন স্তরে ভাষাশিক্ষার গুরুত্বের পরিমাণ

আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চ মানের পাঠ্য পুস্তক রচনা আর একটি গুরুতর সমস্যা। সরকারী সাহায্য বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও এরূপ অন্যান্য সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা এবং অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা বা ভাল ইংরেজী বা অন্য বিদেশী ভাষার পাঠ্য পুস্তক আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা লেখকদের পক্ষে সম্ভব নয় আবার সরকার যদি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে এই কার্যে ব্রতী হন তাহলে আরও সমস্যার সৃষ্টি হবে।

ভারতীয় ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা

পরীক্ষা ব্যবস্থা—পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়ে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে দু'টি বিবাদমান দল আছে। প্রথম দল জ্ঞান অন্বেষণ ও তার পরীক্ষা গ্রহণ গতানুগতিক রচনা পদ্ধতির পরীক্ষা ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন আর দ্বিতীয় দল স্ব ভিত্তিক অভীক্ষা প্রয়োগের পক্ষপাতী। উভয় প্রকার পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে

অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মূল সমস্যা দেখা দেয় শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষার ফলশ্রুতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কার্যকরী পন্থা নির্ণয় করতে গিয়ে।

পরিশাসনমূলক সংঘাত—শিক্ষা-পরিশাসনে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনা নিয়ে অনেক সময় মতদ্বৈধ হয়ে থাকে। রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যেও অনেক সময় সংঘর্ষ দেখা দেয় প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ও প্রাথমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ নিয়ে। মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, পাঠক্রম রচনা ও বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য স্কুলকোড (School code) প্রস্তুতের সময় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মতদ্বৈত দেখা দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন ও ঐ আইনের প্রয়োগ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতদ্বৈত হওয়াও বিচিত্র নয়। বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও সরকারী সাহায্য বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অনেক সময় মতানৈক্য হয় এবং এই সমস্ত মতানৈক্য থেকে শিক্ষা পরিশাসনে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। শিক্ষা পরিচালনা এবং শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে সমস্যার উদ্ভব হয় যদি পরিচালক এবং নিয়ন্ত্রণকারী নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যান বা এই গুরুত্ব পুর্ণ কাজে খামখেয়ালীর পরিচয় দেন।

(২) **অভাবজাত সমস্যা**—ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার শতকরা ৮০টি সমস্যাই অভাবজাত। অর্থের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয় গৃহের ও আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষা-উপকরণ ও পুঁথি-পুস্তকের অভাব, পরীক্ষণাগার ও গ্রন্থাগারের অভাব, খেলার মাঠ ও খেলার উপকরণের অভাব শিক্ষালয় সংগঠনকারীদের ও শিক্ষা-পরিশাসকদের বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তোলে। পুর্বে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল ধনী ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য বেশী অর্থ, সাজসরঞ্জাম বা শিক্ষার পরিবেশের ব্যাপকতার প্রয়োজন ছিল না তাই বদান্য জন সাধারণের অর্থ সাহায্য, ছাত্র-বেতন এবং সামান্য সরকারী সাহায্য নিয়েই শিক্ষা-ব্যবস্থা কোনরূপে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে জন সাধারণের দাবীতে ও সহযোগিতায় শিক্ষার প্রসার হয় দ্রুত কিন্তু প্রয়োজন অনুরূপ জন সম্পদ ও বস্তু সম্পদ পাওয়া যায় নি। তা ছাড়া বিশেষ জাতীয় সম্পদের অভাবের পেছনে বিশেষ বিশেষ কারণ রয়েছে; আমরা উপযুক্ত স্থলে এ বিষয়গুলি আলোচনা করব।

(৩) **শিক্ষাপরিকল্পনা প্রস্তুতের সমস্যা**—শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বিচার করতে হবে। বিরাট দেশের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবার জন্য শিক্ষার বিভিন্ন মান ও বিচিত্র শিক্ষা-

ব্যবস্থাকে সংহত করে জাতীয় শিক্ষার সুঠাম রূপ দেওয়া খুব সহজ নয়। বিভিন্ন ভাষাভাষি ও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে গড়ে ওঠা সম-মান-সমন্বিত (Standard) শিক্ষা এবং সকল নাগরিকের প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া অনুন্নত শ্রেণী ও আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক শিক্ষা, শিক্ষায় অনগ্রসর রাজ্যের জন্য বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিল্পপ্রধান রাজ্য ও কৃষিপ্রধান রাজ্যের শিক্ষার বিভিন্ন চাহিদা, সহর ও পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং নারী ও পুরুষের জন্য বিশেষ শিক্ষার কথা ভেবে শিক্ষা-পরিকল্পনায় সব কিছুরই সুযোগ দিতে হবে। দেশে সত্যকার পরিসংখ্যানের অভাব হেতু সকল দেশবাসীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ও কর্ম সংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। অথচ শিক্ষার প্রসার ও কর্ম সংস্থান ব্যবস্থার মধ্যে যদি কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করা না যায় তবে সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে।

(৫) **শিক্ষা পুনর্গঠনমূলক সমস্যা**—শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করতে গেলে শিক্ষা পুনর্গঠনমূলক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়টি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবমুখী হলে পুনর্গঠন সমস্যা কম হয় কিন্তু পরিকল্পনার সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংযোগ যদি খুব কম থাকে এবং শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন অনুরূপ না হয় তবে পুনর্গঠন সমস্যার জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনার রূপদানে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়।

শিক্ষাসমস্যার জন্য দায়ী কে ?—শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যারা যুক্ত আছেন তারাই শিক্ষা-সমস্যার জন্য দায়ী। শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত ভাবে নিম্নলিখিত দল শিক্ষা-সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে (১) ছাত্রদল (২) শিক্ষক সম্প্রদায় (৩) শিক্ষা-পরিশাসন সংস্থা সমূহ (৪) সরকার ও (৫) অভিভাবকবৃন্দ। এখন দেখতে হবে কোন দল কোন বিষয়ের জন্য কতটুকু দায়ী। ছাত্রদল পরিবেশের বিবিধ আকর্ষণকে অবহেলা করে পাঠে মনোনিবেশ করতে অপরাগ হয়। শিক্ষার্থীর বুদ্ধি প্রক্ষোভ ও কর্মপ্রবণতার বিচারের অপেক্ষা না রেখে জোর করে কিছু চাপাতে গেলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গ, পাঠপ্রস্তুতির অভাব, শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় ও অনুন্নয় ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়।

শিক্ষক সম্প্রদায়ের কম বেতন, সামাজিক মর্যাদার অভাব, একঘেয়ে কাজ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর নব-শিক্ষা-প্রবর্তনে কর্তৃপক্ষের বাধা, শিক্ষক-শিক্ষণের আসন সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ইত্যাদি কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা-পরিশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি শিক্ষার অগ্রগতিকে প্রতি পদেই ব্যাহত

করছে। সরকারী দপ্তরের লাল ফিতা এবং স্থানীয় সংস্থার কর্মচারীদের অযোগ্যতা শিক্ষার কর্মসূচীকে সমস্যা কণ্টকিত করে তুলেছে। বিদেশী সরকার শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয়কে অপব্যয় বিবেচনায় জন সাধারণের দাবী মেটাতে যতটুকু বরাদ্দ না করলে নয় ততটুকুই করতেন। আপদকালীন অবস্থায় শিক্ষা-খাতে বরাদ্দ অর্থ শাসনকার্য পরিচালনার অন্যান্য খাতে খরচ করা হোত। বিদেশী সরকার তার প্রয়োজনে এ দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তুলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা গণতন্ত্রী স্বদেশী সরকারকে ভাবতে হচ্ছে জন সাধারণের চাপে কিন্তু সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে জাতীয়ভাবোধ তেমন জাগরিত না হওয়াতে সরকারী কর্মচারীরা শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন না। তা ছাড়া মাথাভারী সরকারী শিক্ষা-পরিশাসন ব্যবস্থা শিক্ষার অগ্রগতির পথে এক বিরাট বাধা স্বরূপ।

অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও নিজ সন্তানের প্রতি অহেতুক স্নেহ অনেক সময় শিক্ষা-সমস্যার সৃষ্টি করে। আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে অভিভাবকদের যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন তা এদেশে পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা ও কর্মপ্রবণতার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের ছেলেমেয়েকে অর্থকরী পেশা গ্রহণের সুযোগ দেবার জন্য অন্যায় ভাবে সুযোগ লাভের চেষ্টা করেন এতে গরীবের যোগ্য সন্তান সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় আর এর ফলে নানা প্রকার শিক্ষা-সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা-সমস্যার গুরুত্ব কতটুকু—স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করছেন। শিক্ষা-পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনার এক বিশিষ্ট অংশ। দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক খুব নিবিড়। **শিক্ষা-সমস্যা জাতীয় অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করে কারণ শিক্ষাই বিপ্লবের আলোকবর্তিকা।** জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় সংহতি, জাতীয় উন্নতি, জাতীয় প্রগতি ও শক্তির আধার। দেশের জীবনাদর্শ, সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার জাতীয় শিক্ষার মধ্যে বিধৃত। তাই জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির পথে যে বাধা রয়েছে তা জাতির অগ্রগতিকে প্রতি পদে ব্যাহত করছে। শিক্ষা-সমস্যার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব কোঠারী কমিশনে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে শুধু এই কথা বলতে চাই যে জাতীয় শিক্ষা-সমস্যার উপর গত ২০ বৎসর ধরে গুরুত্ব না দেওয়াতেই দেশে হাজার রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে।

জাতি ও জাতীয় শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির জীবনে নব জাগরণের বার্তা নিয়ে আসে। গণতন্ত্রী ভারতে

শিক্ষা-সমস্যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী কারণ এ দেশের শতকরা ২০ জন নাগরিকও আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন নয় অথচ দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসেবে জন সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই দেশের বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন। সমস্ত ভারতবাসী শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত এরা নিজেদের ভালমন্দ ভাল করে বুঝতে পারবে না। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারা কিরূপে প্রগতিশীল রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হবে? জন সাধারণকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলভোগের অধিকারী করতে হলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে সর্ব প্রকার শিক্ষালাভের সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। এই সুযোগ দিতে গিয়ে আমাদের বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এই সমস্যাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সাথে সর্বাঙ্গীণ জাতীয় উন্নতি বিশেষ ভাবে যুক্ত।

জাতীয় উন্নতির সাথে শিক্ষার সম্পর্ক

এ দেশীয় শিক্ষা-সমস্যার বিশেষ বিশেষ দিক—ভারতবর্ষের শিক্ষা-সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অন্যান্য দেশের শিক্ষা সমস্যার সাথে অনেক বিষয়ে এ দেশের শিক্ষা-সমস্যার বিশেষ মিল রয়েছে কিন্তু সমস্যাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

(১) গতানুগতিক শিক্ষা ও নব শিক্ষার সংঘাত।
(২) শিক্ষাখাতে অর্থের অভাব।
(৩) শিক্ষা-ব্যবস্থা ও কর্ম নিয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগের অভাব।
(৪) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।
(৫) ত্রুটিপূর্ণ সরকারী শিক্ষানীতি।

এদেশের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকার ও জন সাধারণের কোনরূপ সমর্থন না পেয়ে বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ইংরেজ প্রবর্তিত গতানুগতিক পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুসরণে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় এবং চাকুরী জীবনে উন্নতি করা যায়। মুখস্থ বিদ্যার জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে পারলে শিক্ষার্থীর পক্ষে এখনও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সহজ। কিন্তু নব শিক্ষা প্রবর্তনে বহুবিধ সমস্যা। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে। দেশের জনমত এখনও নব শিক্ষার অনুকূলে নয় কারণ এদেশে শিক্ষার অভাবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে উঠতে বিশেষ বিলম্ব হবে; অথচ শিক্ষা পুনর্গঠন করতে গিয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক নব শিক্ষার প্রবর্তন অপরিহার্য।

গতানুগতিক শিক্ষা ও নব শিক্ষার সংঘাত

সব দেশেই শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে দেবার একটা রীতি আছে কিন্তু

ভারতবর্ষে শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের মাত্র ২ শতাংশ বা ৩ শতাংশ ব্যয় করা হয়। দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে শিক্ষার জন্যে অর্থের যোগান দেওয়া খুবই কষ্টকর। তা ছাড়া শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করেও মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবক যখন তার ছেলেমেয়েদের জন্য কোন রূপ বৃত্তির সংস্থান বা চাকুরী যোগাড় করতে পারেন না তখন শিক্ষার জন্য ব্যয় সংসারের একটা বাড়তি খরচ বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষাখাতে প্রয়োজন অনুরূপ অর্থের যোগান না থাকাতে বিবিধ শিক্ষা-কমিশন ও কমিটির সুপারিশগুলিকে কার্যে রূপায়িত করা যায়নি এবং এখনও যাচ্ছে না ফলে ভারতবর্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে আছে।

শিক্ষখাতে অর্থের অভাব

কেরাণী তৈরীর জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ইংরেজ এদেশে প্রবর্তন করছিল তার প্রয়োজন এখন সীমাবদ্ধ তাই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহস ও যোগ্যতার সাথে অংশ গ্রহণ করবার জন্য নাগরিকদের সর্ববিধ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। **মাধ্যমিক স্তরের একমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থাই এদেশের শিক্ষিত বেকার-সমস্যার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।** মানবতা-বিজ্ঞানের স্থলে কারিগরী বা বাস্তু বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিলেই এ সমস্যার সমাধান হবে না। শিক্ষা শুধু শিক্ষিত ব্যক্তির ভূষণ হলে চলবে না শিক্ষা হবে নাগরিকের শক্তির আধার। দেশের মানব শক্তির (Human resources) সম্পূর্ণ উৎপাদকতা (Productivity) বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে কর্ম-নিয়োগ ব্যবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। শিক্ষিত বেকার-জীবন জাতীয় শক্তির অপচয়ের বড় নিদর্শন। শিক্ষা-পরিকল্পনাকে বাস্তবমুখী করতে হবে যাতে দেশের বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের পুর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং সমস্ত শিক্ষিত (প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত নাগরিকের উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও কর্ম-সংস্থান

এ দেশের পণ্ডিতেরা ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয়। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাদের কাম্য ছিল। 'বুনো রামদাসের' দেশে বেতন-বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের কর্ম-বিরতি এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ইংরেজ আমল থেকেই সর্ব স্তরের শিক্ষকদের বেতনের হার খুব কম ছিল। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিছু সংখ্যক আদর্শবাদী শিক্ষক স্বাধীনতা লাভের পুর্ব পর্যন্ত বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তারপর বিভিন্ন পরিকল্পনায় ও শিল্প-বাণিজ্যে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ভাল চাকুরী যোগাড় করতে সমর্থ হওয়াতে শিক্ষকতায় এলেন সব অযোগ্য ও অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তি। শিক্ষকদের বেতনের হার অত্যন্ত কম এবং শিক্ষকদের সামাজিক

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব কেন ?

মর্যাদার খুব অভাব এই দু'টি কারণই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। এদেশের মত এত কম বেতন খুব কম দেশেই শিক্ষকদের দেওয়া হয়। তাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষকের একান্ত অভাব। শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা এদেশে সম্প্রতি প্রসার লাভ করেছে নব-শিক্ষা প্রসারের তাগিদে। গত ৪০ বৎসর ধরে শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থা শম্বুক গতিতে অগ্রসর হয়েছে। সর্ব প্রকার শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নহেন। যোগ্য ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব শিক্ষা-সমস্যাকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সরকারী আইন প্রণয়ন থেকে আইনের প্রয়োগ পর্যন্ত সর্ব স্তরেই নানাবিধ ত্রুটি রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং আবশ্যিক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের শম্বুক গতি থেকে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, কারিগরী শিক্ষার আইন ইত্যাদিও বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। সবচেয়ে বেশী ত্রুটি ধরা পড়ে সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের কার্যক্রমের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন সামান্য। সেই বেতন ডাকযোগে শিক্ষকদের কাছে পৌছিতে ৩।৪ মাস সময় লাগে। সরকারী সাহায্যের বিল-পাশ করতে অহেতুক বিলম্ব হয় তার ফলে ৬।৮ মাস অন্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মীরা সরকারী সাহায্য থেকে দেয় অর্থ পেয়ে থাকেন। বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কার্যবিধি বিশেষ ত্রুটি পূর্ণ। তাছাড়া সরকার যেখানে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন বা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেখানে হাজার রকম ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। ত্রুটিপূর্ণ সরকারী নীতি এ দেশের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের পথে বিশেষ অন্তরায়।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা আইন ও সরকারী শিক্ষানীতি

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা-সমস্যার বিশেষ দিক

প্রাক্-প্রাথমিক স্তর—প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-সমস্যার যে তিনটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হচ্ছে ;

(১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নামে মুনাফা শিকারীদের ব্যবসায়।
(২) শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার অভাব।
(৩) উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদ পরিবেশের অভাব।

এর পূর্বে শিক্ষা-সমস্যার আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষার মান এবং শিক্ষার প্রয়োজনও হবে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকুরী করেন সেখানে শিশুদের রক্ষনাবেক্ষণের একটা ভাল ব্যবস্থা চাই। মধ্যবিত্ত পরিবারের এই চাহিদার সুযোগ নিয়ে মুনফা শিকারীরা

নার্শারী স্কুল খুলে বাইরের ঠাট বজায় রেখেছেন কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ ও যোগ্য শিক্ষিকার অভাবে এই বিদ্যালয়গুলি অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছে। অভিভাবকেরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও শিশুদের সত্যকার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দিতে পারেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, প্রসার ও উন্নয়নের পথে **চারটি সমস্যা** বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুরুত্বের পর্যায় ক্রমে নিয়ে তাদের উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) প্রাথমিক শিক্ষার পরিশাসন

(২) প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন

(৩) শিক্ষকের স্বল্প বেতন ও তাঁদের সামাজিক মর্যাদার অভাব

(৪) প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থের যোগান।

স্থানীয় সংস্থার উপর প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে রাজ্য সরকার এতাবৎ কাল পর্যন্ত খবরদারী করে এসেছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরকার, স্থানীয়-সংস্থা ও জন সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। কোঠারী কমিশনে ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যেমন জাতীয় সংগঠনের বিশিষ্ট অংশ তেমনি অপচয় ও অনুন্নয়ন নিরোধও জাতীয় অপব্যয় বন্ধ করার বড় নজির।

প্রাথমিক শিক্ষকদের স্বল্প বেতন ও সামাজিক মর্যাদার অভাব ভারতবর্ষের জাতীয় কলঙ্ক। জাতীয় আয়-বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দের হার নির্ভর করে, কাজেই সরকারের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন আর বেশী দেওয়া সম্ভব না হ'লে শিক্ষা-কর আদায় করে জীবন যাত্রা নির্বাহের নিম্নতম মান রক্ষিত হয় এরূপ বেতনের ব্যবস্থা স্থানীয় সংস্থাকে অবশ্যই করতে হবে অন্যথায় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন সুদূর পরাহত।

অর্থের অভাবেই বিগত দেড়শ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি বিশেষ ভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। অর্থের অভাবে যাতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা বাতিল হয়ে না যায় সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অর্থের যোগান দেবার জন্য শিক্ষাকর আদায় এবং শুধু প্রাথমিক শিক্ষা খাতেই উহা খরচ করবার মত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও ঐ সম্পর্কে নির্দ্দেশ-নামা সরকারী দপ্তর থেকে জারী করতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে **দুটি বড় সমস্যা** রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে শিল্পের মাধ্যমে কর্মভিত্তিক বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন আর

দ্বিতীয়টি হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করে তোলা। ভাষাই পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যম। গতানুগতিক শিক্ষায় কয়েকটি বিষয়ের পুঁথিগত জ্ঞান আহরণ করা শিশুদের পক্ষে সহজ ছিল মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে—আর শিক্ষকেরা ভাষার মাধ্যমে পুঁথিগত জ্ঞানদান কার্য সহজেই সমাপ্ত করতে পারতেন বেতের সদ্ব্যবহার করে। শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে অনুবন্ধ প্রণালীতে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া বেশ শ্রমসাধ্য। বুনিয়াদী শিক্ষকদের বেতন এত কম যে যারা সত্যকার বুনিয়াদী শিক্ষক হবার যোগ্য তারা বুনিয়াদী শিক্ষক হতে রাজী নহেন আর্থিক অনটন ও সামাজিক মর্যাদার অভাবে। শিল্প কার্যে একটু দক্ষতা না থাকলে বুনিয়াদী শিক্ষক বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করতে পারবেন না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে যে কর্ম ভিত্তিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে (১ম শ্রেণী—৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) চলতি খরচের জন্য স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। তবে এই প্রচেষ্টায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পূর্ণ সহযোগিতা চাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা—মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখী পাঠক্রম গৃহীত হলেও কার্যকালে দেশের শতকরা ৮০ জন বালক বালিকাকে মানবতাবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই তিনটি শিক্ষাধারার যে কোন একটি বেছে নিতে হয় অন্য কোন শিক্ষাধারা-অনুসরণের সুযোগ না থাকায়। এর মধ্যে **বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ অথচ জাতিগঠনে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।** পরীক্ষণাগার পাঠ্যপুস্তক, পাঠাগার এবং শিক্ষা-উপকরণের অভাবেই দ্রুত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হেতু বিজ্ঞানের স্নাতকগণ সহজেই ভাল কাজ যোগাড় করতে সক্ষম হন ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে বিজ্ঞান শিক্ষক পাওয়া যায় না বললেই হয়।

দ্বিতীয় সমস্যা **শিক্ষা নির্দেশনা** নিয়ে। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক প্রগতিপত্র ও নির্দেশনা পরিমাপ-পত্র (guidance Schedule) বিচার করে নির্দেশনা শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-নির্দেশনা জ্ঞাপক রিপোর্ট পেশ করেন। প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষার্থীদের কার পক্ষে কোন শিক্ষাধারা উপযুক্ত হবে তা স্থির করেন। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে পরামর্শ দান (counselling) কার্যও নিদের্শনা শিক্ষককে করতে হয়। কিন্তু কার্যকালে উচ্চ-কোটির অভিভাবকেরা প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সদস্যদের প্রভাবিত করে নিজেদের অযোগ্য সন্তানদের জন্য বিজ্ঞান, ও কারিগরী শাখায় স্থান করে দেন। গরীবের যোগ্য সন্তানেরা ঐ আসনগুলি হারিয়ে মানবতা-বিজ্ঞান শাখায় অধ্যয়ন করতে বাধ্য হয় এবং উত্তর জীবনে বিজ্ঞানের অবদান থেকে বঞ্চিত থাকে। অযোগ্য শিক্ষার্থীরা (ধনীর দুলাল) বিদেশের সস্তা ডিগ্রী যোগাড়

করে রাষ্ট্র ও সমাজ ও শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পদ লাভ করে। কার্যকালে অযোগ্যতা প্রকাশ পায় কিন্তু ক্ষয় ক্ষতি ভোগ করতে হয় সমগ্র জাতিকে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির সাথে কারিগরী শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা ও পেশা শিক্ষার সংযোগ স্থাপন অবশ্য করণীয়।

উচ্চ শিক্ষা—উচ্চ শিক্ষার অন্যান্য সমস্যার মধ্যে **উচ্চ শিক্ষার মানের (standard) দ্রুত নিম্নগামিতা** সব চাইতে চিন্তার বিষয়। গত ২০ বৎসরে অনেকগুলি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনোলজী, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন কম বলে প্রথম শ্রেণীর (First class) ছেলেমেয়েরা অধ্যাপক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন নি। যে কয়জন যোগ্য লোক পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছিলেন তাদের অনেকে ভাল বেতন ও পদোন্নতির জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। এই সব পদে যে সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে তাদের প্রভাব পড়েছে ছাত্র সমাজের উপর। তা ছাড়া দলীয় রাজনীতির পাকচক্রে পড়ে অনেক প্রতিভাবান শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে। অধ্যাপনা ও পরীক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা তথা সামগ্রিক শিক্ষার মান দ্রুত নিম্নগামী হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের উপর জাতীয় উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকেরাই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করে থাকেন তাই কোঠারী কমিশন উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের কার্যসূচী গ্রহণের জন্য জোর সুপারিশ করেছেন।

কারিগরী শিক্ষা, বৃত্তি শিক্ষা ও পেশা শিক্ষা—কারিগরী শিক্ষার অন্যান্য সমস্যার মধ্যে উপযুক্ত **ওয়ার্কসপে হাতে কলমে শিক্ষার** সীমাবদ্ধ সুযোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত ১০ বৎসরে বহু পলিটেকনিক, কারিগরী বিদ্যালয়, শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষনবিশী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিন্তু উন্নত ধরণে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই নগন্য। হাতে কলমে শিক্ষা (Practical training) এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগমূলক পর্যায়টি এ দেশে তেমন প্রচলিত নেই। সত্বর এই ব্যবস্থা চালু করবার জন্যে এ জাতীয় শিক্ষার কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে।

বৃত্তি শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও সুপরিকল্পনার অভাব আছে। বৃত্তি শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত ও বৃত্তি শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে এ দেশে কোন গবেষণা হয় নি। শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থানের সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপনের জন্য—মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের সাথে বৃত্তি শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রমের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। পেশা-শিক্ষা এদেশে খুবই নূতন। বৃটিশ আমলে ডাক্তারী ও ওকালতী ছাড়া অন্য কোন পেশা শিক্ষার প্রচলন ছিল না বললেই হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৃত্তি ও পেশা অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে সে সব বিষয়ে

পুঁথিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। চাকুরীতে থাকাকালীন বৃত্তি শিক্ষা ও পেশা শিক্ষার কিছু কিছু সুযোগ দিচ্ছেন বিভিন্ন পেশা-সংস্থা (Professional bodies), রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা খুবই অকিঞ্চিৎকর। পেশা শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত ও পেশা শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন সরকারের করণীয়; যোগ্য শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত পেশা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ এখনও দেওয়া হচ্ছে না স্বজন পোষণ নীতি বিভিন্ন স্টাফ কলেজের (staff college) কার্যক্রমকে বিশেষ ভাবে বিঘ্নিত করছে। কৃষি, যানবাহন, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থীর পেশা-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য।

সামাজিক-শিক্ষা—মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সামাজিক-শিক্ষার যে ব্যাপক কর্ম-সূচী প্রণয়ন করেছিলেন রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরগুলি তাকে যথাযথ অনুসরণ করেন নি। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সবচেয়ে **বড় অন্তরায় দুটি**। (১) রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্যের প্রভাব; (২) সরকারী অবহেলা। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের প্রাধান্য লাভের জন্য সামাজিক-শিক্ষা তথা গণ শিক্ষা আন্দোলনকে নিজেদের কর্ম-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে দলগত রাজনীতির দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করছে কিন্তু প্রকৃত সামাজিক শিক্ষার কর্ম সূচী বাতিল হয়ে গেছে।

শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই সরকারী অবহেলা রয়েছে। সামাজিক শিক্ষায় ইহা সহজেই ধরা পড়ে। এই বিভাগে যারা চাকুরী করেন তারা কোন রূপে নিজেদের চাকুরী রক্ষা করতেই ব্যস্ত। প্রকৃত পক্ষে সরকারী প্রচেষ্টার সাথে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সামাজিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার একেবারেই সম্ভব নয়।

ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যার গুরুত্ব পূর্ণ দিক—বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা সমস্যা আলোচনা শেষে ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যার নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আশা করি।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(১) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রয়োজন স্থলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন সংশোধন, শিক্ষা-কর ধার্য ও উহা আদায়ের ব্যবস্থা; সহর ও গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে প্রয়োজন মত বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রাথমিক স্তরে নব-শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জন সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় ও সরকারের বলিষ্ঠ কর্মপ্রয়াসে (৬ বৎ—১১ বৎ) শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই সম্ভব করতে হবে।

শিক্ষাখাতে অর্থের যোগান এদেশে খুবই কম। জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ও ও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুরূপ অর্থবরাদ্দ সরকারকে করতে হবে। রাজ্য সরকার থেকে অর্থ দেওয়া সম্ভব না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিল্পকার্য চালু করে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বাকী অর্থ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-কর বসিয়ে আদায় করতে হবে। অর্থের অভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা যাতে বানচাল না হয় জন সাধারণ ও সরকারকে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

শিক্ষাখাতে অর্থের যোগান

শিক্ষকতা এদেশে এখনও পেশা রূপে গড়ে ওঠে নি। শতকরা ৮০ জন শিক্ষক পেটের দায়ে শিক্ষকতা করেন। এদের না আছে উপযুক্ত শিক্ষা, এরা না পেয়েছেন প্রশিক্ষণ। **শিক্ষকতায় শিক্ষকের মন না থাকলে কোন শিক্ষা পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপায়িত হ'তে পারে না।** সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং শিক্ষকের পেশাকে অন্যান্য উন্নত পেশার সমগোত্রীয় করতে হ'লে শিক্ষকদের চাকুরীর সর্ত ভাল করতে হবে এবং যোগ্যতা ও দায়িত্ব হিসেবে শিক্ষকদের বেতনের হার ধার্য করতে হবে।

শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরীর সর্তের উন্নয়ন

এদেশের শিক্ষার মান নিম্নগামী বলে হা হুতাশ করে লাভ নেই। যাতে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং নব-শিক্ষা প্রবর্তনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাও করতে হবে। শিক্ষা খাতে খরচকে উন্নত ধরনের জাতীয় লগ্নী (High class National investment) হিসেবে বিবেচনা করে সরকার ও জন সাধারণকে এ কাজে ব্রতী হ'তে হবে। শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে কর্মসংস্থান কেন্দ্রের পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারলে জাতীয় লগ্নী ফলপ্রসূ হবে।

শিক্ষা খাতে ব্যয় উন্নত ধরণের জাতীয় লগ্নী

বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনোলজির শিক্ষার মান উন্নয়ণের জন্য কয়েকটি উন্নততর উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশে। এই সমস্ত উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উন্নত ধরণের স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হবে। এরাই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। উন্নত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার ব্যবস্থা করাও বিশেষ প্রয়োজন।

শিক্ষার মান উন্নয়নে উন্নততর উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা

শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণার এখন বিশেষ অভাব রয়েছে। সর্বপ্রকার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির জন্য শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত ধরণের গবেষণার একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগঠন

শিক্ষার ইতিহাস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে সরকার মিশনারী প্রতিষ্ঠান এবং বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় এদেশে সর্ববিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। গ্রামবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনে **প্রাথমিক বিদ্যালয়** স্থাপন করে থাকেন। ইংরেজ সরকার প্রতিটি জেলায় একটি করে **মডেল হাইস্কুল স্থাপন** করে ছিলেন, পরে **মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** প্রতিষ্ঠার প্রতি দেশের জমিদার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। ভারতের বর্ধিষ্ণু পল্লীতে সহজেই গড়ে ওঠে হাইস্কুল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার হেতু স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষক পেতে ও বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিদ্যালয় নির্মাণ ব্যয় যেমন দ্রুত বাড়তে থাকে স্নাতক শিক্ষকগণও তেমনি ক্রমবর্ধমান ভোগ্য বস্তুর উর্ধগতি দেখে নিম্ন বেতনের শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে থাকেন। তবুও প্রয়োজনের তাগিদে দেশ বিভাগের পর বিভিন্ন কলোনী ও পল্লীতে বহুবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে।

সহরে ও শিল্পাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি সংগ্রহ করা বিশেষ করে খেলার মাঠসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি সংগ্রহ খুবই সমস্যা-সঙ্কুল। এই ব্যাপারে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা খুব কম প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি ও খেলার মাঠের সমস্যা

সরকার সেই সব প্রতিষ্ঠানের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ-সাহায্য করতে চান যে গুলির নিজস্ব জমি আছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাসগৃহ সমস্যা সহরে খুবই বেশী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠানের কার্য আরম্ভ হয় তারপর পরিচালক সমিতি পল্লীর অধিবাসীদের নিকট, কর্পোরেশনের নিকট অর্থের জন্য আবেদন করেন। যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার সাথে ছাত্র বেতনের উদ্বৃত্ত আয়ের অর্থ জমি সংগ্রহে ও বাড়ী নির্মাণে ব্যয় করতে কৃতসংকল্প হন। কন্‌ট্রাক্টরের হাতে কাজের ভার দেওয়াতে অনেক অর্থের অপব্যয় হয়। আবার অনেক সময় জমির মালিকানা নিয়ে মামলা মোকদ্দমায় অনেক অর্থের অপব্যয় হয়ে থাকে।

আধুনিক বহুমুখী বিদ্যালয়ে পাঠাগার, গবেষণাগার, চারুকলার ঘর এবং

পাঠাগার গবেষণাগার, চারুকলার ঘর, পরীক্ষণাগার ইত্যাদির সমস্যা

ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠের জন্য পৃথক গৃহ, যাদুঘর, খেলাঘর, পাঠ-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনা গৃহ ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয়। অধিকাংশ স্কুলেই কয়েকটি শ্রেণী কক্ষ, প্রধান শিক্ষকের ঘর ও তৎসংলগ্ন আপিস ঘর, শিক্ষকদের বসবার ঘর ও পাঠাগার একই ঘরে কোণ-ঠাসাঠাসি করে জায়গা করা হয়েছে। সাধারণ কলেজগুলির অবস্থা ও তদনুরূপ।

আর্থিক অনটন এবং সহর পরিকল্পনার ত্রুটি থেকেই এই সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে। তা ছাড়া সরকারী সাহায্য লাভ ও সেই অর্থের সদ্ব্যবহার না হওয়ায় সমস্যা জটিলতর হয়েছে।

পল্লীগ্রামে জমির অভাব ততটা নেই তবে গৃহ নির্মাণ বেশ ব্যয় বহুল। গ্রাম্য দলাদলি এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। খেলার মাঠের সমস্যা শহরের তুলনায় গ্রামে অনেকটা কম হ'লেও ভাল খেলার মাঠ খুব কম প্রতিষ্ঠানেরই আছে।

পাঠাগার ও পরীক্ষণাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ; কিন্তু শতকরা ৯১টি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পাঠাগার অথবা পরীক্ষণাগার নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগঠকদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমাজ সেবার আদর্শের চাইতে রাজনৈতিক অধিকার লাভের তাগিদে তারা তাদের সংগঠনের কেন্দ্র বেছে নিয়েছেন। ফলে অনেক জন বহুল অঞ্চলে প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি আবার অনেক জন বিরল অঞ্চলে সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয় এমন কি মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেবার সময় বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যালয়ের বাড়ী ও সাজ-সরঞ্জামের উপর বেশী জোর দেন ফলে অযোগ্য শিক্ষক সম্প্রদায় নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় তারপর প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এ কথা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সত্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন রূপে একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খাড়া করবার পর মন্ত্রী বা আইন সভার সদস্যদের অনুগ্রহে প্রচুর সরকারী সাহায্য আদায় করে অনেকে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে নিয়েছেন মিথ্যা হিসাব দিয়ে। ফলে শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সে পরিমাণ সরকারী সাহায্যের সুযোগ দেশবাসী পান না।

সংগঠকদের কার্যক্রম বিশ্লেষণ

সহরে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া সহরের প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা দশটি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকেন বলে কোনটির প্রতি তাদের তেমন দরদ থাকে না। ফলে পরিচালক সমিতির দু'চার জন কৌশলী ব্যক্তি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনের মধ্য দিয়ে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, আর্থিক লাভ ও স্বজন পোষণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। পল্লীগ্রামে এখনও ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, কোন জোতদার বা পল্লীর কৃতি সন্তান শিল্পপতির খামখেয়ালীতেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংগঠন কার্য চলছে।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংগঠনে মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যবিধি ওদের প্রতিষ্ঠানের নির্দেশকে মেনে চলে। এ ছাড়া আজকাল কিছু ধনবান ও কৌশলী ব্যক্তি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংগঠন করে বেশ দু' পয়সা রোজগার করছেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

সংগঠনে সরকারের ভূমিকা খুবই অকিঞ্চিৎকর তাই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠনে, পরিচালনায়, নিয়ন্ত্রণে ও উন্নয়নে হাজার রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়—প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় স্নেহ, মমত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন। এখানে ধমক দিয়ে বা প্রহার করে বহির্জাত শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায় কিন্তু শিক্ষার্থীর সাগ্রহ আকর্ষণ যদি শিক্ষা প্রক্রিয়ায় না পাওয়া যায় তবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। কর্মভিত্তিক প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে তুলতে পারলে বিদ্যালয় পরিচালন কাজটি সহজতর হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যাবলী শিক্ষার্থীর আগ্রহ-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিকাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের জন্য প্রধান শিক্ষিকাকে সামুদয়িক জীবনের পটভূমিকায় বিদ্যালয় সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। সরকারের তরফ থেকে যাতে অযথা নির্দেশ বাক্য বর্ষিত হতে না থাকে সেজন্য প্রধান শিক্ষিকাকে সে বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে। পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়ে ও অপসঙ্গতি সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়—মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্র এখন বেশ বিস্তৃত হয়েছে। একটি বড় সংস্থার পরিচালকের (Director) যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার চেয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব কম নয়। শত শত তরুণ শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকটা নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার মধ্যে। বিদ্যালয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি করতে হবে। বিদ্যালয় হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার সমাজ যেখানে বাস করে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের পূর্ণতা আসে। বাস্তব জীবনে বৃহত্তর সমাজে শিক্ষার্থীরা যাতে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সেরূপ সুযোগ সুবিধা বিদ্যালয়কে দিতে হবে।

বিদ্যালয় পরিবেশ

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনধর্মী কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গতানুগতিক পুঁথিগত বিদ্যাকে এখনও বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি, তবে শিশুর জীবন বিকাশের অনুকূলে শিক্ষা পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজা হয়েছে। কর্ম, জ্ঞান ও অবসর বিনোদন এ তিনের ব্যবস্থা আছে শিক্ষা-ব্যবস্থায় কারণ সংসারে এসে শিক্ষার্থীকে কর্ম জীবনে অংশ গ্রহণ করতে হবে; জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হবে কর্মের সহায় আর অবসর বিনোদনের মধ্য দিয়ে হবে জীবনের স্ফূর্তি। জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য যে প্রস্তুতি তার সুরু হবে বিদ্যালয় পরিবেশে।

বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকেন। বিদ্যালয়ের

আর্থিক ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ, বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য শিক্ষক নিয়োগ, তাদের বরখাস্তকরণ ও বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্য এই সমিতি করে থাকেন। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির মধ্যে প্রধান শিক্ষক যেন একটি অপরিহার্য সেতু।

বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি ও প্রধান শিক্ষক

বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে আছেন। তিনি বিদ্যালয়ের সর্ব প্রকার কাজের জন্য দায়ী। পরিচালক সমিতির নির্দেশে বিদ্যালয় পরিচালনা করলেও তিনি তাঁর পদাধিকার বলে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন সেখানে হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার বিদ্যালয় সমিতির নেই। একজন সুযোগ্য প্রধান শিক্ষকের সুপরিচালনার উপর বিদ্যালয়ের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। তিনি একা কিছু করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর কর্মশক্তি, চিন্তাশীলতা, সেবাব্রত ও উদার মনোভাব বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার অপরিহার্য অঙ্গ।

উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রকৃত পরিচালক হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁকে অনেকগুলি বিষয়ে কড়া নজর রাখতে হয় কারণ বিদ্যালয়ের সাথে যে সমস্ত ব্যক্তি ও সংস্থা জড়িত তাঁরা বিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথেই যোগাযোগ স্থাপন স্থাপন করে থাকেন। তিনি একাধারে শিক্ষক, সংগঠক ও বিদ্যালয় পরিচালক। তাঁর কর্মক্ষমতা ও দূরদৃষ্টির উপর বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করে থাকেন। সরকার, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবকগণ ও শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে উপস্থিত হন। তা ছাড়া প্রধান শিক্ষককেই সহকারী শিক্ষকগণ, খেলার শিক্ষক, ভারতীয় জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অফিসার, গ্রন্থাগারিক, কোষাধ্যক্ষ, হিসাব রক্ষক, দপ্তরী, পিয়ন ইত্যাদি ব্যক্তিদের নিয়ে নানা সমস্যার ভেতর দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। সরকারী সাহায্য লাভ করতে হ'লে যে সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয় এবং যে ভাবে বিদ্যালয়ের খাতাপত্র ও রেকর্ড ইত্যাদি রাখতে হয় সেদিকেও প্রধান শিক্ষককে বিশেষ যত্ন নিতে হয়। বর্তমানে **শিক্ষাক্ষেত্রে এক চরম অরাজকতা** বিরাজ করছে। এই অরাজকতার পেছনে **পাঁচটি কারণ** বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে :—

প্রধান শিক্ষকই বিদ্যালয়ের প্রকৃত পরিচালক

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত প্রধান শিক্ষকের অভাব। বিদ্যালয়ের সংখ্যা পাঁচগুণ হয়েছে গত ২০ বৎসরের মধ্যে কিন্তু সেই পরিমাণ যোগ্যতা-

সম্পন্ন প্রধান শিক্ষক পাওয়া যায় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ট্রেইনিং কলেজের ডিগ্রী দিয়ে সব সময় প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার করা যায় না। বিদ্যালয় পরিচালনা অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট টেক্‌নিকের (Management technique) এর অন্যতম। সহরের উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয় পরিচালনাকে অনেকে কারখানা পরিচালনার সাথে তুলনা করেছেন। মানবতার দিক থেকে এবং আধুনিক শিক্ষার ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে প্রধান শিক্ষকের কাজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রধান শিক্ষকের বেতন যে কোন ম্যানেজারের বা ডিরেক্টরের এক চতুর্থাংশ। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরও অনেক কম বেতন পান। এ ছাড়া শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বলতে কিছুই নেই। আজকাল ভাল ছেলেরা শিক্ষকতা করতে আসতে চায় না মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রধান শিক্ষক ও সরকারী শিক্ষকগণ শিশুদের কাছে আদর্শপুরুষ হ'লেও অষ্টম মান বা নবম মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে তারা সমাজে শিক্ষকদের চাইতে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল সরকারী চাকুরে এমন কি কারখানার প্রথম শ্রেণীর শ্রমিকদের পর্যন্ত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে পায় তাই শতকরা ২।৪ জন আদর্শবাদী শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষকগণ কারও আদর্শ পুরুষ নহেন। সেই জন্য শিক্ষকদের প্রতি অন্তর্জাত শ্রদ্ধা বড় একটা থাকে না।

(২) প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের অভাব—প্রথম শ্রেণীর দরদী শিক্ষকের অভাব হেতু বিদ্যালয়ে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করে সর্বত্রই ব্যর্থ হ'তে হয়েছে। চারিদিকে বর্তমানে একটা আনাক্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বার্থপরতার প্রতিযোগিতা চলেছে। তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এসে পড়েছে। শিক্ষকগণ অন্ন সংস্থানের জন্য দু'বেলা উপশিক্ষকতা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের যেন কেনা গোলাম হয়ে গেছেন। এতে শিক্ষক সমাজের মধ্যে নানা প্রকার দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। তাই ছাত্র সমাজের দুর্নীতি দমন এক বৃহত্তম সমস্যা।

(৩) বিদ্যালয়ে ভর্তি, পরীক্ষা গ্রহণ, পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন, পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি সব বিষয়েই গলদ রয়েছে। যে সব ছাত্র যে শ্রেণীর বা যে শাখার (Stream) উপযুক্ত নয় বিদ্যালয় পরিচালনার খাতিরে প্রধান শিক্ষককে সেই সব অবাঞ্ছিত শিক্ষার্থীদের সেখানে স্থান দিতে হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ করবার যাদের যোগ্যতা নেই, এমন কি স্কুল ফাইনাল (School Final) পরীক্ষায় পাশ করবার যাদের ক্ষমতা নেই তারাও শিক্ষা ক্ষেত্রে কোথাও স্থান না পেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসে ভীড় করে। এরা কারণে অকারণে বিদ্যালয়ে ষ্ট্রাইক (Strike) করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে। প্রধান শিক্ষক অনেক সময় কঠোর হস্তে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করতে অপারগ হন কারণ এই সমস্ত দুর্ঘটনার পেছনে ক্ষমতা সম্পন্ন অনেক সার্থান্বেষী

ব্যক্তির হাত থাকে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে গোলযোগের সৃষ্টি করে থাকেন।

৪। অন্যায়কারী ছাত্রছাত্রীদের শাস্তিদান করা প্রধান শিক্ষকের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকলেও মামলা মোকদ্দমা, ও নিজের আত্মসম্মানের ভয়ে সে কার্য থেকে প্রায়ই তিনি বিরত থাকেন। অর্থদণ্ড করলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র বিক্রী করে উহা বিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে। খেলার মাঠে, এমনকি বিদ্যালয়ের নানাবিধ উৎসবের মধ্যে দলাদলির ভাব বর্তমান। প্রধান শিক্ষক এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অসহায়, কারণ ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষকদের অথবা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বার্থান্বেষী লোকদের প্ররোচনায়। তা ছাড়া উপরের শ্রেণীতে উন্নয়ন (Promotion), ছাত্রভর্তি, বিভিন্ন শাখার জন্য বা শ্রেণীর জন্য ছাত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। স্কুল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কাগজে কলমে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রধান শিক্ষক সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকতে বাধ্য হন। এমতাবস্থায় বিদ্যালয় পরিচালনা সমস্যাসঙ্কুল হবে এতে আর আশ্চর্য কি?

৫। প্রধান শিক্ষকের বহুবিধ কার্যাবলীর মধ্যে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, শিক্ষাকার্য পরিদর্শন ও পরামর্শদান, সময় তালিকা প্রণয়ন, ছাত্রভর্তি, প্রমোশন ও পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন অন্যতম। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষকদের আত্মম্ভরিতা ও তাঁদের উপশিক্ষকতার চাপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাকার্য, পরিদর্শন ও পরামর্শদান এবং সময় তালিকা প্রণয়নে নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে প্রধান শিক্ষক এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন না। তা ছাড়া ছাত্রভর্তি, প্রমোশন ও পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনে স্কুল কর্তৃপক্ষের অযথা হস্তক্ষেপে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরিণামে স্কুল ফাইন্যাল পাশের হার দ্রুত-গতিতে নিম্নাভিমুখী হয়। আধুনিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক অবস্থার প্রয়োজন বর্তমানে তার খুবই অভাব।

মহাবিদ্যালয়—মহাবিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা এত বেশী যে সুষ্ঠুভাবে মহাবিদ্যালয় পরিচালনা বিশেষ সমস্যাসঙ্কুল। গণতন্ত্রী ভারতবর্ষের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে থাকে এতে শিক্ষার্থীর সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোথাও ভাল হয়, কোথাও হয় বিঘ্নিত কিন্তু জ্ঞানার্জন কার্যটি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কলেজ পরিচালক সংসদের নির্দেশে অধ্যক্ষ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত আইন-কানুনের সাহায্য নিয়ে মহাবিদ্যালয় পরিচালনা কার্যে ব্রতী হন কিন্তু

শিক্ষার্থীদের সাথে কোন রূপ ব্যক্তিগত যোগাযোগ না থাকাতে যন্ত্রচালিতের মত প্রত্যেকটি কার্যেই তাকে এক নৈর্ব্যক্তিক পটভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। পূর্বে অধ্যাপকদের ব্যক্তিত্বের জোরে মহাবিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজতর ছিল কিন্তু বর্তমানে অধ্যাপকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের খুব অভাব রয়ে গেছে। তাই ছাত্র সংসদের সহযোগিতায় অনেক সময় অধ্যক্ষকে মহাবিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়।

বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পরিকচালনা বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারের ভূমিকা—সরকারী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলি সরকারী শিক্ষা-দপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীনে প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে। দুঃখের বিষয় গণতন্ত্রী দেশে গণতন্ত্র না হয়ে একনায়কতন্ত্রের প্রভাবই যেন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পরিলক্ষিত হয়।

মিশনারী মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলি মিশনের ঐতিহ্যকে রক্ষা করাকে বড় বলে মনে করেন। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকলেও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্তি প্রয়োগ নীতি পরিত্যক্ত হয়নি। এই সব প্রতিষ্ঠানে এখনও বহির্জাত শৃঙ্খলা রক্ষার সর্ব প্রকার চেষ্টা করা হয়।

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের বিদ্যালয় পরিচালক সমিতিতে একজন সরকারী প্রতিনিধি থাকেন সরকারী অর্থের সদ্ব্যবহার হয় কিনা তা লক্ষ্য করবার জন্য। এ ছাড়া সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয় ও বে-সরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালনার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই পরিচালক সমিতির নির্দেশে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংগঠনে ও নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকা—ধীরে ধীরে এদেশে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্য তালিকায় কর্তব্য ও কর্তৃত্ব দেশকালোপযোগী হয়ে এসেছে। আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কার্যাবলীকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১। বিদ্যালয়ের কার্যাবলী তদারক (Supervision)।

২। বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকল্পনার নির্দেশনা (Guidance)।

৩। বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনের নীতি নির্ধারণ (Direction)।

৪। বিদ্যালয় সংগঠন, পরিচালনা ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ (Control)।

এতদিন ধরে বিদ্যালয় পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয় সংগঠন, পরিচালনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ। পরিদর্শকেরা মনে করতেন যে সরকার পক্ষ থেকে তাঁরা হচ্ছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায় ও ছাত্রকুলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

তা ছাড়া বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে হিসাব রক্ষার ত্রুটি, বিদ্যালয় গৃহ ও অন্যান্য উপকরণের ত্রুটি তাঁদের চোখে বেশী করে পড়তো। বিদ্যালয়ের পঠন-

পাঠন বিষয়ে শিক্ষকদের কাজের ত্রুটি কোথায় এ বিষয়ে তাঁদের কড়া নজর ছিল। ক্রমে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিদর্শকদের কাজের চাপও বেড়ে যায়। বর্তমানে এই চাপ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে শুধু বিদ্যালয় অনুমোদন এবং গ্রাণ্ট্-ইন্-এড্ বিষয়ে তদারক করবার জন্য বৎসরে একবার করে এক একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করাও পরিদর্শকদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এখন আঞ্চলিক শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুত, নানা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা, বিভিন্ন খাতে অর্থমঞ্জুরী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মঞ্জুরী ইত্যাদি নানা বিষয়ের কাজের চাপ বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উপর এসে পড়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ, আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা বিষয়ে পরামর্শ দান, শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে তোলা এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে নব জাগরণের প্রবর্তন বিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা ইত্যাদি কার্যে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা-পরিচালন ব্যবস্থা এবং আধুনিক বিদ্যালয় সংগঠন বিষয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। এ ছাড়া সেবার মনোভাব ও সহযোগিতার মনোভাব এদের কাজের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। প্রশাসনিক কার্যের মধ্যে দেশগড়ার বিরাট দায়িত্ব বহন করতে হবে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের। এঁরা হবেন স্কুলকর্তৃপক্ষের ও শিক্ষকদের পরামর্শদাতা এবং ছাত্রদের নিকটতম বন্ধু।

বিদ্যালয় পরিচালনার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য প্রধান শিক্ষক করে থাকেন। বিদ্যালয় পরিদর্শকের সে কার্যে হস্তক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের সংগঠনী কাজ করেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এখানেও বিদ্যালয় পরিদর্শক শুধু পরামর্শদাতার কাজ করবেন। আঞ্চলিক শিক্ষা পরিকল্পনায় আধুনিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অনেক কিছু করণীয় আছে।

১। শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন সর্বাবস্থায় উন্নত ধরণের পরিদর্শন। গ্র্যাণ্ট-ইন্-এড্ ও বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেবার ব্যাপারে পরিদর্শন একান্ত অপরিহার্য। আধুনিক যুগে কোন দেশের তথা কোন অঞ্চলের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উন্নত ধরণের পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

শিক্ষা পরিশাসন ও নিয়ন্ত্রণ—'শিক্ষার কাঠামো' বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে **প্রাথমিক শিক্ষার** সংগঠন ও নিয়ন্ত্রনে স্থানীয় সংস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠক্রম রচনা, বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সরকারী সাহায্য দান বিষয়টি সরকারী শিক্ষা দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। **মাধ্যমিক শিক্ষা** নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের উপর দেওয়া হলেও বিদ্যালয় পরিদর্শন, শিক্ষার কাঠামো নির্মাণ ও সরকারী সাহায্যদানের ভিত্তিতে

মাধ্যমিক শিক্ষাকে সরকারী শিক্ষা দপ্তর বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। **মহাবিদ্যালয়ের** নিয়ন্ত্রণভার আইনতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নানাবিধ সরকারী সাহায্যের আওতায় মহাবিদ্যালয়ের সংগঠন, পরিচালন ও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। বে-সরকারী মহাবিদ্যালয়ের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সীমাবদ্ধ। **বিশ্ববিদ্যালয়ের, টেকনোলজীর ও ইন্‌ষ্টিটিউটের** (Institute) কার্যক্রম স্বয়ং শাসিত সিণ্ডিকেটের নির্দেশে সেনেট নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সাহায্য দানের পরিপ্রেক্ষিতে পরোক্ষ ভাবে দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। **কারিগরী শিক্ষা, বৃত্তি-শিক্ষা ও পেশা-শিক্ষা** প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী সাহায্য ছাড়া একেবারে অচল তাই এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ খুব বেশী; অবশ্য এ দেশে এ জাতীয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। **প্রাক্ স্নাতক শিক্ষক-শিক্ষণ** প্রতিষ্ঠান সরকারী নিয়ন্ত্রণে গড়ে উঠেছে কিন্তু **স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ** প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অথবা অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত। সেজন্য এ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে। তবে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বৃত্তি (Stipend) বা পাঠ কালীন ভাতা (deputation allowance) সরকার দিয়ে থাকেন বলে সর্ব প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্য চালিয়ে যেতে সক্ষম।

স্থান সংকুলান সমস্যা—দেশের যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সহরের প্রাক্ প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ভীড় কমাবার জন্য সকাল, দুপুরও সন্ধ্যায় তিনবার করে পালাক্রমে (in shifts) শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর সমাবেশকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাড়াটে বাড়ীতে চালু আছে সেখানে শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলান এক বিরাট সমস্যা। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে খেলার মাঠ, পরীক্ষণাগার, গ্রন্থাগার কিছু নেই বললেই হয়। অপরিসর শ্রেণী কক্ষে নব শিক্ষা প্রবর্তন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন জমির অভাব বেশী না থাকলেও গৃহ নির্মাণের অর্থের বিশেষ অভাব। তা ছাড়া বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক শিক্ষার উপযোগী শ্রেণী কক্ষ, সাজ-সরঞ্জাম এবং শিক্ষা-উপকরণের একান্ত অভাব শিক্ষা-সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

সাজ-সরঞ্জাম সমস্যা—গত ২০ বৎসর ধরে সর্ব প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভীড় পরিলক্ষিত হচ্ছে কারণ যে হারে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-

প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে এসেছে সে হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়েনি। আবার নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী ইত্যাদির মূল্য আকাশ-চুম্বী হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রয়োজন অনুরূপ সাজ-সরঞ্জামের জন্য অর্থের যোগান দিতে পারে না। বদান্য জন সাধারণের দানের পরিমান ক্রমেই কমে আসছে। জন সাধারণের চাপে বিদ্যালয় পরিদর্শক বা মহাবিদ্যালয় পরিদর্শক অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুরূপ সাজ-সরঞ্জামের অভাব জেনেও অনুমোদন দিতে বাধ্য হন। একবার অনুমোদন পেলে কর্তৃপক্ষ এ দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার সুযোগ পান না প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থের যোগান দিতে গিয়ে।

শিক্ষা-উপকরণ সমস্যা—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে বিদ্যার্জনের সময় জানা থেকে অজানায় এবং মূর্ত বস্তু থেকে অমূর্ত বস্তুতে যাবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। শিক্ষাবিদ্‌দের মতে শিশুর মনে অমূর্ত ধারণা সহজে স্পষ্ট হতে চায় না। তাই মূর্ত বস্তুর ভেতর দিয়ে অমূর্ত বস্তুতে যেতে হয়। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভাষা-শিক্ষা এবং অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা দেবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কীত চার্ট, মডেল, মানচিত্র, খেলনা ইত্যাদির সহযোগে শিক্ষা পদ্ধতিকে খুব উন্নত করা হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিক্ষা গ্রহণের সময় যত বেশী সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহা শিশুর ধারণার (concept) মধ্যে আসে, ধারণা তত স্পষ্ট হয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞান আহরণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য চোখ ও কান সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। কথায় বলে 'চোখে দেখে ও কানে শুনে শেখাটাই প্রথম শ্রেণীর শেখা।' শিশুর সামনে বিরাট বস্তু-জগৎ তার বিভিন্ন আবেদন নিয়ে উপস্থিত। শিশু প্রকৃতি (Nature) থেকেই তার প্রাথমিক ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করে তুলতে চায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফুল ও ফলের বাগানে নিয়ে শিশুদের উদ্ভিদ-বিদ্যা শিক্ষা দিলে বা মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়ে বা পল্লীতে যে সমস্ত পশু পক্ষী শিশুদের দেখান সম্ভব সেগুলি দেখিয়ে প্রাণী-বিদ্যার প্রাথমিক পরিচয় দিলে উহা বিশেষ কার্যকরী হয়। বস্তুর বিভিন্ন আকার, রং, ওজন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিশুরা যদি মূর্ত বস্তু নিয়ে প্রাথমিক ধারণা করতে শেখে তবে উহা সহজে তাদের আয়ত্বে আসে। বিজ্ঞান ও ভূগোলের শ্রেণী কক্ষে কিছু যন্ত্রপাতি, চার্ট, মডেল, ম্যাপ ইত্যাদি হাতে কলমে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বনিয়াদ খুব শক্ত হয়।

জ্ঞানার্জনের মূল নীতি

প্রাথমিক শিক্ষায় মূর্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

কতকগুলি বস্তু দেখলে বা কতকগুলি বস্তুজাত শব্দ শুনলেই প্রকৃত শিক্ষা

হয় না। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার এক বিশেষ সময়ে বিশেষ ভাবে দেখে শেখা ও শুনে শেখার বস্তুগুলিকে (audio-visual equipment) শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করতে হয়। এই বস্তুগুলি যাতে শিশুদের দর্শনেন্দ্রিয় ও কর্ণেন্দ্রিয়তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুগুলি সহজবোধ্য ও আকারে খুব সরল হলেই ভাল হয়। অপ্রয়োজনীয় অংশ, রং বা কারুকার্য যেন আসল বস্তুকে গ্রাস করে না ফেলে। বয়স, শ্রেণী, বিষয় বস্তুর প্রয়োজন ইত্যাদির কথা বিচার করে দেখে-শেখা ও শুনে-শেখার বস্তু নির্দ্ধারণ করতে হবে। বিদ্যালয়ের ও শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও এ-সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে। বেশীর ভাগ বস্তু যাতে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় প্রস্তুত করে নিতে পারেন সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সব বস্তু মূলতঃ দুই প্রকার:—(১) শিক্ষা কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও বস্তুনিচয় যথা ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ভূগোল, সঙ্গীত, রন্ধনকার্য, শিল্পকার্যের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং (২) শিক্ষাকার্যের সাহায্যকারী বস্তু সমূহ: যথা—ছবি, নক্সা, বিদ্যালয় ও যাদুঘরে সংগৃহীত বস্তুসমূহ।

দেখে শেখা ও শুনে শেখায় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ

বাংলাদেশের সাধারণ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হতে পারে এইরূপ একটি **audio-visual equipment এর তালিকা** নিম্নে দেওয়া হ'ল।

(ক) প্রত্যেক শ্রেণীতে এক বা একাধিক ব্ল্যাকবোর্ড ও চক (প্রয়োজন-স্থলে রঙ্গিন চক্ ও ছক-কাটা বোর্ড ব্যবহার করা যায়।)

(খ) ভূগোল শিক্ষার জন্য ম্যাপ, গ্লোব ও চার্ট।

(গ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মাটি, লতাপাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি।

(ঘ) জীব বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সরীসৃপ, ব্যাঙ, মাছ, মুরগী, হাঁস ও নানা-জাতীয় পাখী।

(ঙ) রসায়ণ বিজ্ঞানের জন্য বালি, পাথর, চক্, এ্যাসিড কাচের সরঞ্জাম

(চ) পদার্থবিদ্যার জন্য জল, বায়ু, বেলুন, চুম্বক, লৌহচূর্ণ, তামার তার, সীসা, পারদ ও ছোটখাট যন্ত্রপাতি।

(ছ) ইতিহাস পাঠের জন্য ম্যাপ, চার্ট, চিত্র, মডেল, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি।

(জ) সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সার্ভে-ম্যাপ, গ্রামের, সহরের, ও কলখানার ছবি, চার্ট ও মডেল ইত্যাদি।

(ঝ) এ ছাড়া ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, রেডিও স্লাইড-প্রজেক্টর ইত্যাদিও শিক্ষকগণ প্রয়োজন স্থলে ব্যবহার করতে পারেন।

এদেশে শিশু-শিক্ষায় ব্ল্যাকবোর্ড ও চক্ ছাড়া বিশেষ কোন শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করবার সামর্থ বা সুযোগ শতকরা ৯৫টি বিদ্যালয়ের নেই। বর্তমানে সরকারী সাহায্য থেকে ও জন সাধারণের দান থেকে ভুগোল শিক্ষার জন্যে

গ্লোব ও ম্যাপ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সস্তা দরে কিছু যন্ত্রপাতি সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। ম্যাপ, চার্ট ও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির সম্বন্ধেও অনেক ক্ষেত্রে ঐ কথা খাটে। অথচ আমরা জানি উন্নত দেশগুলি ছবি ও অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহারের সাহায্যে নানা বিষয়ে শিশুদের ধারণা কিরূপে স্পষ্টতর করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা-উপকরণ বিশেষ করে ছবি ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য বস্তু বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

প্রাথমিক স্তরে শিশুরা ক্রিয়া চঞ্চল ও কল্পনা প্রবণ থাকে। গল্প বলার সাথে চিত্র পরিবেশন করলে উহা শিশুর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষা-উপকরণের উপযোগিতা

মাধ্যমিক স্তরে অপরিচিত বিষয় ও বস্তুগুলি চিত্র বা অন্য কোন রূপ শিক্ষা-উপকরণের মাধ্যমে কিশোরদের ধারণাকে স্পষ্ট করে দিতে পারলে উহা সহজে ওদের আয়ত্ত হয়। মাধ্যমিক স্তরে এপিডায়াস্কোপের সাহায্যে বইয়ের পাতা, ছাপান ছবি, লেখ, রেখাচিত্র, ফটো ইত্যাদি সহজেই বড় করে পর্দায় দেখান যায়। স্লাইড্ প্রজেক্টারের সাহায্যে অনেক সুন্দর করে বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করা যায়। বর্তমানে উন্নত ধরণের শিক্ষায় চিত্র ও নানা প্রকার শিক্ষা উপকরণের বহুল প্রচলন দেখা যায়। প্রয়োজন স্থলে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সহযোগে চিত্র ও অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ অতি অল্প খরচে প্রস্তুত করতে পারেন বা সংগ্রহ করতে পারেন। অর্থের অভাবের জন্য শিক্ষা-উপকরণ ছাড়াই বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সমবেত চেষ্টায় এই অভাব মোচন করে শিক্ষাকে আধুনিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করলে শিক্ষা-উপকরণ, যন্ত্রমূলক শিক্ষা ও গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির অভাব প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনার জন্য নির্দেশনা কক্ষে যে সমস্ত সরঞ্জাম দরকার খুব কম বিদ্যালয়ই তা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য শিক্ষকদের যেমন শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া দরকার তেমনি উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যবহারের উপযোগী শিক্ষা-উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম, গৃহ ও গৃহসজ্জা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আর্থিক অভাব এবং আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতাই

শিক্ষা-উপকরণের অভাব

এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এবং বিদ্যালয় থেকে অর্থ সাহায্য পেলে শিক্ষকেরা অনেক রকম শিক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ার করতে পারেন।

বহুমুখী-বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের হাতেকলমে Practical

Training) শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যকরী করতে হ'লে উপযুক্ত পরীক্ষণাগার স্থাপন এবং উহার কার্য তদারক করবার জন্যে শিক্ষক, অধ্যাপক ও পরীক্ষণাগার সহায়কের (Laboratory Demonstrator) নিয়োগ অপরিহার্য। বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞান (General Science) পাঠ দিবার সময় পরীক্ষণাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তিন প্রকার বিজ্ঞান স্কুলপাঠ্য রয়েছে কাজেই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুরূপ পরীক্ষণাগার স্থাপন করতে হবে। একাদশ শ্রেণী সমন্বিত বিদ্যালয়ে এক বা একাধিক ধারা প্রবর্তন করবার সময় উপযুক্ত শিক্ষক, গ্রন্থাগার, পরক্ষীণাগার খেলার মাঠ ইত্যাদি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভাল পরীক্ষণাগার স্থাপন করিতে না পারলে মহাবিদ্যালয়কে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার অনুমোদন দেওয়া হয় না।

বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরীক্ষানাগারের অভাব

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পরীক্ষণাগার, গৃহ-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পৃথক ঘর ও সাজ-সরঞ্জাম এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য ওয়ার্কসপের (workshop) ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষণাগার স্থাপন করতে গিয়ে **চার প্রকার সমস্যার** সম্মুখীন হ'তে হয়।

(১) উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষক অথবা অধ্যাপক নিয়োগ।

(২) পরীক্ষণাগার স্থাপনের জমি সংগ্রহ।

(৩) পরীক্ষণাগার নির্মাণের জিনিসপত্র সংগ্রহ।

(৪) পরীক্ষণাগারের যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংরক্ষন।

আর সর্বোপরি বড় সমস্যা হচ্ছে এর জন্য অর্থ সংগ্রহের। এ বিষয় সরকারী সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা কম। তাই বদান্য জন সাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করা অপরিহার্য।

পল্লীগ্রামে জমি সংগ্রহ ততটা অসুবিধা জনক না হ'লেও বিজ্ঞান শিক্ষক পাওয়া বেশ কঠিন। বিজ্ঞান শিক্ষক পল্লীগ্রামে বেশীদিন থাকতে চায় না। তা ছাড়া যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদের কর্ম সংস্থানের নানা পথ খোলা আছে। পরীক্ষণাগারের মালপত্র ক্রয় করে নিয়ে এলেই পরীক্ষণাগার স্থাপন করা যায় না। দরদী বিজ্ঞান শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মকুশলতার উপর ভাল পরীক্ষণাগার গড়ে তোলা অনেকটা নির্ভর করে।

শিক্ষা-উপকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা শেষ করে আমরা একথাই বলতে চাই যে দেশের সর্ব প্রকার শিক্ষার নিম্নগামিতার জন্য শিক্ষা-উপকরণের অভাব বিশেষ ভাবে দায়ী। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে টেস্ট টিউবকে বোঝাবার কাল মহাবিদ্যালয়ে প্রায় শেষ হলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের

শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষার নিম্নগামিতা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শ্রেণী কক্ষে প্রায় সেই জাতীয় পাঠই দিতে হয় শিক্ষা-উপকরণের অভাবে। এ বিষয়ে শিল্পপতি ও সরকারকে অগ্রণী হতে হবে।

দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য বিদ্যালয় থেকেই বিজ্ঞানের, গৃহ বিজ্ঞানের ও কারিগরী বিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষা (Practical Training) বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন দিন দিন বেড়েই চলবে। তাই বিদ্যালয়ের পরীক্ষণাগার, কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাগৃহ (Workshop), গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কক্ষ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা করবার সময় এরূপ ভাবে উহা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে ঐগুলির সম্প্রসারণ সহজ সাধ্য হয় এবং ব্যয় বহুল না হয়।

গ্রন্থাগার সমস্যা—প্রকৃত পক্ষে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা না করতে পারলে শিক্ষার্থীদের পাঠের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া অসম্ভব। স্কুলে শুধু গ্রন্থাগার স্থাপন, পুস্তক ক্রয় বা গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করিলেই হবে না। গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে এবং গ্রন্থাগারে পাঠ (Study) বিদ্যালয়ের ও মহাবিদ্যালয়ের সময়-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুস্তকাগার নাই বললেই চলে কাজেই স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারিক নিয়োগের প্রশ্ন উঠে না। দু'চারটি আলমারিতে কিছু বই রাখা আছে এবং একজন শিক্ষককে তার অবসর সময়ে গ্রন্থাগারের কাজ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি উন্নত দেশ সমুহে গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষাবিদ্‌গণ কর্মকেন্দ্রিক শিশু বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক প্রচলনের বিরোধী হলেও গ্রন্থাগার স্থাপনে বিরোধী নহেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয় পর্যন্ত সর্ব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকা বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ

আদর্শ গ্রন্থাগার ও উহার সুষ্ঠু ব্যবহার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েরই জ্ঞান তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে যে স্তরের শিক্ষা ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় সেই স্তরের উপযোগী পুস্তকাদি যেন ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে প্রয়োজন অনুরূপ থাকে। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাতত্ত্বমূলক বই পৃথক করে রাখতে হবে প্রয়োজন স্থলে শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য। এ ছাড়া কিছু ভাল পাঠ্য পুস্তক ও প্রামাণিক গ্রন্থ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের জন্য গ্রন্থাগারে রাখা বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগারের ব্যবহার

পৃথক কক্ষে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। এই কক্ষের সংলগ্ন হলঘরে পাঠগৃহ (Reading room) থাকা বাঞ্ছনীয়। শিশুদের জন্য পাঠাগার স্থাপন করবার সময় মনে রাখতে হবে শিশুরা জ্ঞান অন্বেষণের জন্য পাঠাগারে যাবে কম। স্বাধীন ভাবে পড়ার আনন্দ থেকে পাঠাগারের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বাড়বে। এ সব গ্রন্থাগারকে চিত্র,

গ্রন্থাগার কক্ষ

মানচিত্র, মডেল ও মনীষীদের সদ্‌বাক্য দিয়ে সাজাতে হবে। গ্রন্থাগারের চেয়ার, টেবিল, সেল্‌ফ্‌ আলমারী প্রভৃতি শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী হওয়া চাই।

গ্রন্থাগার সমিতি থাকবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য। গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্বাধীন ভাবে গ্রন্থ পাঠ করতে করতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষা যাতে শিশুদের মনে জাগে সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। কেহ বলতে পারেন না কোন পুস্তক, কোন কাহিনী বা কোন তথ্য শিশুচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করবে এবং সেই আদর্শকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শিশু হয়ত শেষ পর্যন্ত বদ্ধ পরিকর হবে। গ্রন্থাগার পরিচালক যাতে শিশুদের গ্রন্থপাঠে নির্দেশনা দেবার যোগ্যতা অর্জন করেন সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের কাজ শ্রেণী-গ্রন্থাগারের মধ্যে কিছুটা ভাগ করে দিতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণী কক্ষে একটি আলমারীতে সেই শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের উপর লেখা কিছু বই থাকবে। কিছু ভাল পাঠ্য পুস্তক (Text books) অবশ্যই রাখতে হবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা

মহাবিদ্যালয়ের পাঠাগার যাতে কিশোর ও যুবকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে ও পাঠের আনন্দের খোরাক দিতে পারে সে দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

শারীর শিক্ষার সমস্যা—গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষায় শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের দিকেই শুধু নজর দেওয়া হয় আর চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক বিকাশে যত্নের কথাও উল্লেখ করা যায়। শারীরিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ যে তখন না হোত তা নয় তবে বিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ সে দিকে নজর দিতেন না কারণ পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হ'লে এগুলির বিশেষ প্রয়োজন হোত না। বর্তমানে শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশকেই বোঝান হয়েছে। সুস্থ দেহে সুস্থ মন বিরাজ করে। কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ। প্রকৃত পক্ষে যার স্বাস্থ্য নেই তিনি যত বড় জ্ঞানী ও গুণী হউন না কেন দেশ ও জাতির জন্য তাঁরা বড় একটা কিছু করতে পারেন না।

শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এখন সমস্যা হচ্ছে খেলাধূলার জন্য মাঠ এবং শারীর শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যায়ামাগার নিয়ে। অল্প পরিসর জায়গায় কয়েক তলা দালান তুলে অনেকগুলি শ্রেণীর পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা যায় খেলার মাঠ বা ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা করা যায় না। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বেশ বেড়ে যাচ্ছে অথচ শহরে জমির দাম এত বেশী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য খেলার মাঠের ব্যয় ভার প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। এক একটি পল্লীর পার্কগুলি খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া

খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগারের অভাব কেন

গত্যন্তর নেই। অথচ এতে পার্কগুলি নষ্ট হয়ে যায়। আজকাল মফঃস্বল শহরেও খেলার মাঠ পাওয়া শক্ত। কৃষিজাত পণ্যের দাম বাড়বার সাথে সাথে পল্লীগ্রামে জমির দাম দশগুণ হয়েছে। গরীব গ্রামবাসীদের পক্ষে কোন রকমে কাঁচাবাড়ীতে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাই বেশ ব্যয় সাধ্য হয়ে পড়েছে তার উপর আবার খেলার মাঠের সমস্যা। অবশ্য বদান্য জন সাধারণের দানে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়গুলির ছোটবড় খেলার মাঠ আছে। কিন্তু ভাল ব্যায়ামাগার নেই। আবার শহরের অনেকগুলি বিদ্যালয়ের ব্যায়ামাগার আছে কিন্তু খেলার মাঠ নেই অথচ শারীর শিক্ষা দিতে হলে এ দু'টি একান্ত অপরিহার্য। সরকার ও পৌর-প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সচেতন না হ'লে এ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা সংগঠনের জন্য শারীর শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের নিয়োগ এবং সম্ভব স্থলে উপযুক্ত ব্যায়ামবিদের নিয়োগ প্রয়োজন। শারীর শিক্ষার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক চাই নতুবা খেলার মাঠ বা ব্যায়ামাগার স্থাপন করলেই বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা প্রবর্তন করা যাবে না। এ ছাড়া শারীর শিক্ষা ও ব্যায়ামের জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে খেলাধূলার সামগ্রী ক্রয় করা এবং ঐগুলির উপযুক্ত ব্যবহারের দিকে খেলা-শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের নজর দিতে হবে।

শারীর শিক্ষার শিক্ষক

প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষাকেন্দ্রে উন্মুক্ত খেলাঘর, মাঠ ও ছায়াযুক্ত খেলাঘরের প্রয়োজন। এই স্তরে খেলার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সমস্ত খেলার মাঠ আকারে ছোট হবে কিন্তু মাঠটি সুন্দর ভাবে তৈয়ার করতে হবে কারণ কচি শিশুরা নরম পা নিয়ে আসবে এর উপর খেলা করতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ অপেক্ষাকৃত বড় হবে। এই দুই জাতীয় বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগারের প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও মহাবিদ্যালয়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হকি, টেনিস ইত্যাদি খেলার জন্য উপযুক্ত মাঠের বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পক্ষে পৃথক মাঠের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে এক একটি পল্লীর ৪।৫টি বিদ্যালয় মিলে একটি মাঠের ব্যবস্থা করতে পারে। অবশ্য ব্যায়ামাগার প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব থাকবে।

বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার খেলার মাঠের উপযোগিতা

ছাত্র কল্যাণমূলক সমস্যা

বিদ্যালয়-স্বাস্থ্যকেন্দ্র—প্রত্যেকটি আধুনিক বিদ্যালয়ে একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকা বাঞ্ছনীয়। আর্থিক দিক থেকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য চিকিৎসক নিয়োগ সম্ভব না হ'লে গ্রামের বা সহরের যে কোন

পল্লীর কয়েকটি বিদ্যালয় সমবায় পদ্ধতিতে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। একটি স্বাস্থ্য-শিক্ষা সমিতি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কার্য পরিচালনা করবেন। প্রধান শিক্ষক, খেলা-শিক্ষক, ডাক্তার ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা এই সমিতিতে থাকবেন। শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্রাদির সাহায্যে একটি বাৎসরিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিবেন স্বাস্থ্য-শিক্ষা সমিতি। মাঝে মাঝে ব্যায়াম ও নানাবিধ অঙ্গ সঞ্চালন সম্পর্কীত অনুষ্ঠানের (show) আয়োজন করলে শিক্ষার্থীরা কৃতী ব্যায়াম-বীরদের দৈহিক সৌষ্ঠব ও ব্যায়াম ক্রিয়া দেখে মুগ্ধ হয় এবং শারীর শিক্ষা লাভে আগ্রহান্বিত হয়। শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তখন একবার, দু' বৎসর পর একবার এবং বহিরনুষ্ঠিত শেষ পরীক্ষার পূর্বে একবার শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসম্পর্কীত রিপোর্টে শিক্ষক, অভিভাবক ও ডাক্তারের করণীয় অংশগুলির প্রতি যত্ন লওয়া হয়েছে কিনা সমিতি সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

বিদ্যালয় সমীক্ষাকেন্দ্র—অনগ্রসর শিক্ষার্থী ও ক্ষীণবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য সম্ভব স্থলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্যথায় একটি আঞ্চলিক বিদ্যালয় সমীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজন। অপসঙ্গতির জন্য যে সব শিক্ষার্থীর পড়াশুনায় ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে এই সব সমীক্ষাকেন্দ্রে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনস্থলে, বিশেষ অনগ্রসরতা নির্ধারক অভীক্ষা প্রয়োগ করে শিক্ষাসম্পর্কীত নির্দেশনার ব্যবস্থাও এই কেন্দ্র থেকে করা যেতে পারে। আমাদের মত গরীব দেশে সরকারী সাহায্য ছাড়া এই জাতীয় সমাক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব অথচ শিক্ষার অপচয় ও অনুন্নয়নের পরিমাণ কমাতে হলে যতগুলি কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বিদ্যালয় সমীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন তার মধ্যে অন্যতম।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা—আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় গৃহ, বিদ্যালয় এবং খেলার মাঠ ইত্যাদির পরিবেশের মূল্য স্বীকার করা হয়েছে। শিশুদের জীবনে প্রথম পাঁচ বৎসরের সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের মূল্য অপরিসীম। এ জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাক্-বুনিয়াদী, মন্টেনরী, কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি শিক্ষার প্রসার বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য বিদ্যালয় পরিবেশ ও গৃহ-পরিবেশের সমান মর্যাদা স্বীকৃত হয়।

বিদ্যালয় পরিবেশ ও গৃহ পরিবেশ

গৃহপরিবেশকে শিক্ষণীয় করে তুলতে হলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। সাধারণ গৃহে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক,

প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সম্পর্কে বিশেষ কোন লক্ষ্য রাখা হয় না এবং সম্ভবও নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুদের শরীরিক ও নৈতিক উন্নতি অথবা অবনতির বিষয় লক্ষ্য রাখা হয় কিন্তু সামাজিক বা প্রাক্ষোভিক বিকাশ সম্পর্কে লক্ষ্য রাখার অভিজ্ঞতা না থাকায় এ বিষয় দু'টি বিশেষ ভাবে অবহেলিত হয়। শিশুদের জীবনে এই দু'প্রকার বিকাশ থেকেই নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। বর্তমান যন্ত্র-যুগের নাগরিক সভ্যতায় এই আচরণগত ও প্রক্ষোভজাত সমস্যাগুলি বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। সমস্যাটি অঙ্কুরেই যদি লক্ষ্য করা যায় তবে উহা শিশুদের জীবনে বড় রকম বিপর্যয় আনতে পারে না। আধুনিক শিক্ষায় এই সমস্ত কারণে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

শিক্ষা পরিবেশকে উন্নত করতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা

এখন প্রশ্ন হল কি ভাবে এবং কখন শিক্ষকগণ ও অভিভাবকেরা সমবেত হতে পারেন? আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষক-অভিভাবক দিবসে (Parent-Teacher Day) এই মিলন সম্ভব। সাধারণতঃ বার্ষিক কোন উৎসবের অঙ্গ হিসেবে এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শিশুদের হাতের কাজের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হ'লে ভাল হয়। মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজ এবং অপরাহ্ণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। এই সম্মেলনে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে এবং অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বক্তাদের নিয়ে শিক্ষার কোন সমস্যার উপর সিমপোজিয়ামের (Symposium) আয়োজন করলে উভয় পক্ষ নিজেদের সমস্যাকে অপর পক্ষের নিকট উপস্থিত করতে পারেন। শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও চরিত্রগঠনে উভয়ের সমান দায়িত্ব রয়েছে। উভয় দলের সমবেত চেষ্টায় শিশুদের শিক্ষা জীবনের অনেক সমস্যার নিরসন সম্ভব।

সম্ভব স্থলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংযুক্ত-সমিতি গঠন করা যেতে পারে। এই সমিতির মারফৎ শিশুদের শিক্ষা জীবনের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত বিবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে। শিক্ষার্থীরা স্কুলে কি করে এ বিষয়ে অভিভাবকেরা এই সমিতির মারফৎ খবর পেতে পারেন; আবার শিক্ষার্থীরা গৃহে ও সমাজে কি করে এবং কিরূপ আচরণ করে সে সম্পর্কে শিক্ষকেরা সঠিক সংবাদ নিতে পারেন।

বর্তমানে শিক্ষা সম্পর্কে নির্দেশনাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। অভিভাবকের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষা-সম্পর্কিত ও বৃত্তি সম্পর্কিত নির্দেশনা বিশেষ কার্যকরী হয় না। এ-বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন।

ছাত্র সংসদ—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী সমাজ। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সমাজ গড়ে ওঠে।

বিদ্যালয়ে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা কয়েক বৎসর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমবেত হয় তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ছাত্র সংসদ গঠিত হয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংগঠন ও ছাত্র-কল্যাণমূলক কার্যাদি সংসদের কার্য তালিকার একটা বড় অংশ। এ ছাড়া বৎসরে ২।৩টি আনন্দানুষ্ঠান ও শিক্ষা-ভ্রমণের ব্যবস্থাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সম্পন্ন হতে পারে। গণতান্ত্রিক উপায়ে ছাত্র সংসদ গঠিত হবে প্রধান শিক্ষক অথবা অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে। সহ প্রধান শিক্ষক অথবা সহাধ্যক্ষ সংসদের কার্য পরিচালনায় ছাত্র প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতার ভুমিকা গ্রহণ করলে সংসদের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে নতুবা রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে ছাত্র সংসদের কার্যক্রম বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা এমন কি উহার পরিচালনা কার্যে এই সংসদ প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের সাথে সহযোগিতা করতে পারে। এ ছাড়া নির্দেশনাকেন্দ্র, বিদ্যালয়-ক্যান্টিন, খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার, পরীক্ষণাগার বিদ্যালয়-সংগ্রহশালা, ওয়ার্কশপ, গ্রন্থাগার, বয়েজ স্কাউট, এন. সি. সি (N. C. C.), হবি সেণ্টার (Hobby Centre) ইত্যাদি পরিচালনায় ছাত্র সংসদ সহযোগিতা করতে পারে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার দায়িত্ব রয়েছে ছাত্র সংসদের। ছাত্রসংসদের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ফলে অনেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের বিশেষ সুবিধা হয়।

ছাত্র কল্যাণ-কেন্দ্র—রাধাকিষণ কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশক্রমে মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ে ছাত্র-কল্যাণকেন্দ্র স্থাপন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। একজন শিক্ষক অথবা অধ্যাপকের সভাপতিত্বে কেন্দ্রের কার্য পরিচালিত হবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতায়। ভগ্নস্বাস্থ্য, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কল্যাণ সাধনই এই কেন্দ্রের প্রধান কার্য। সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র, পুঁথিপুস্তক ইত্যাদি সংগ্রহ করে উপযুক্ত প্রার্থীকে ঐরূপ সাহায্য দেওয়া কেন্দ্রের অন্যতম কার্যক্রম।

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠক্রম, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী ও শিক্ষা প্রক্রিয়া

পাঠক্রম—আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মতে পাঠক্রম পুস্তকের তালিকা বা পাঠ্য-বিষয়ের বিবরণ নয়। শিক্ষা যেখানে জীবনব্যাপী সেখানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় তার স্বরূপ নির্ণীত হ'তে পারে না। শুধু বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানও সম্ভব নয়। পরিবার, ধর্মায়তন, সমাজ, রাষ্ট্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে শিক্ষার বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা ভাবতে গিয়ে শিক্ষণীয় বিষয় এবং বস্তুর ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে। এই বিচিত্র পাঠক্রম নানাবিধ গ্রন্থে, কর্মে, কৌশলে ও ভাব-কল্পনায় পরিব্যাপ্ত।

পাঠক্রম কি ?

এই পাঠক্রম নিরূপণ করতে গেলে নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিগুলি লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনের সিদ্ধান্তের উপর পাঠক্রম অনেকটা নির্ভর করে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের পর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপকরণ হিসেবে পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ভাববাদীরা মনে করেন শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ধর্মবোধের মূল্য বেশী। সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ঐ বিষয়গুলির স্থান সর্বাগ্রে। বাস্তববাদীরা মনে করেন যে-বিদ্যা ব্যক্তি ও সমাজের পার্থিব কল্যাণ সাধন করে তাহাই পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতিবাদীরা শরীরচর্চা ও ইন্দ্রিয়গুলির উপযুক্ত ব্যবহারের উপর জোর দেন। এঁরা বলেন যে পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী না করিয়ে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে স্বরূপে ব্যক্ত করতে সাহায্য করাই হবে পাঠক্রমের লক্ষ্য। আধুনিক মানবতাবাদে শিশুর ব্যক্তি-সত্তার সম্যক বিকাশের জন্য সাধারণ ও কারিগরী এই দুই শ্রেণীর শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয় এবং প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু ও কর্ম কৌশলকে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। প্রয়োগবাদীদের কাছে শিক্ষার ব্যাপ্তি সমস্ত জীবন ব্যাপী। প্রকৃতি থেকে, সমাজ থেকে এবং বিচিত্র কর্ম থেকে শিশু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহাই শিশুর কাছে জীবন্ত বলে গৃহীত হয়। পাঠক্রমে পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন এরা সমর্থন করেন না। নানাবিধ সক্রিয়তার মধ্যে শিশু জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করুক ইহাই পাঠক্রম সম্পর্কে এদের বক্তব্য।

পাঠক্রম নির্ণয়ে বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব

পাঠক্রম শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানসম্মত হবে। শিশুর জন্মগত মানসিক ক্ষমতা, পরিবারগত রুচি ও আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পূর্ণ রূপ দানের জন্য পাঠক্রম নির্ণয় করতে হবে। মনোবিজ্ঞানী বলেন, প্রত্যেক শিশুর এক একটি পৃথক সত্তা আছে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিশুর পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেবার জন্য পাঠক্রম নির্ণয় করতে হবে।

শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে কোন বিষয় জোর করে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

পাঠক্রম **শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানসম্মত** হবে। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানের মতে শিশুকে সমাজের যোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তুলতে হবে। সকলের দৈহিক বা মানসিক সামর্থ্য সমান থাকে না, কিন্তু সমাজে বাস করতে হ'লে প্রত্যেককেই সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়; সমাজের কল্যাণের জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। পাঠক্রমে এমন সমস্ত বিষয় থাকবে যা তাকে উত্তর-জীবনে সুনাগরিক হ'তে সাহায্য করবে।

পাঠক্রম ধারাবাহিক হবে। প্রত্যক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা যতই উন্নত হচ্ছে শিক্ষার স্তরভেদ ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শিক্ষার্থীর বয়স হিসেবে ও যোগ্যতা হিসেবে এই প্রভেদ হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার পর মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ধারাবাহিক ভাবে চলেছে। এক একটি স্তরের জন্য পাঠক্রম রচিত হবার পর যদি সমস্ত স্তরগুলির সাথে উহা সুষ্ঠুভাবে সংযোজিত না হয় তাহলে সে পাঠক্রম শিশুর একক অভিজ্ঞতা-লাভের অন্তরায় হবে। এ জন্য বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনে বিভিন্ন স্তরের জন্য পাঠক্রম রচনার সুপারিশ করলেও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্তরের জন্য রচিত বিভিন্ন পাঠক্রমের মধ্যে স্তরের উর্ধ্বগতি হিসেবে সংগতি বিধান করে থাকেন।

শিশুর জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম—আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্থান সর্বাগ্রে। শিশু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জগৎ ও জীবনকে জানতে পারে। পাঠক্রম এমন হবে যাতে সহজেই শিশুরা বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র খুঁজে পায় এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভাবতে শেখে। বড়দের ক্ষুদ্র সংস্করণ না ভেবে শিশুকে শিশু হিসেবেই দেখতে হবে। তার প্রয়োজন থেকে তার পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম—শুধু শিশুদের নয় বড়দের জীবন ও কর্মকে আশ্রয় করে পাঠক্রম গড়ে ওঠে। শিশুরা কাজ করতে ভালবাসে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা খুবই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এই জাতীয় শিক্ষায় শিশুদের সুপ্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা তার সক্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। আধুনিক শিক্ষায় পাঠক্রম কর্মকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে

বৃত্তি বহুমুখী। পাঠক্রমে এমন সমস্ত বিষয় থাকবে যা শিশুর উত্তর-জীবনের বৃত্তির বা পেশার পরিচয় বহন করবে এবং তার ভবিষ্যতের বৃত্তির প্রতি আগ্রহ জাগাবে। সে যাতে তার আগ্রহ, রুচি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুযায়ী সহজেই ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন করে জীবনে কৃতকার্য হ'তে পারে পাঠক্রম রচনার সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বহুমুখী বৃত্তির চাহিদা মেটাবার জন্য পাঠক্রম এমন হবে যাতে শিক্ষার্থী তার আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারে। অবশ্য বিষয়-নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে নির্বাচিত বিষয়গুলি যেন শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিরোধী না হয়।

অবসর সময় বাজে কাজে নষ্ট না করে **যাতে রুচিকর ও মনোমত বিষয় চর্চা করতে পারে** পাঠক্রম রচনার সময় সে কথাও মনে রাখতে হবে। গঠনমূলক ও আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে অবসর সময় কাটাতে শিখলে জীবনের পক্ষে তা বিশেষ লাভজনক হবে।

জীবনের অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পাঠক্রমকে ভারাক্রান্ত করলে চলবে না। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তি বিকশিত হ'য়ে যাতে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় এবং ক্রমপরিবর্তনশীল জীবন-যাত্রার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার মত শিশুর মনোবল সৃষ্টি হয় সেদিকে পাঠক্রম রচয়িতাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। পরবর্তী জীবনে শিশু কোন্ বৃত্তি গ্রহণ করবে তার ইঙ্গিত ও নির্দেশনা পাঠক্রমে থাকবে।

পাঠক্রম রচনার গুরু দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবেন তাদের কাছে দেশ ও জাতি আশা করবে যে ঐ পাঠক্রম অনুসরণ করলে উহা দেশের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। পাঠক্রম রচনাকারীদের হ'তে হবে নিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন।

কোন বিশেষ দর্শন, বিজ্ঞান বা সমাজনীতির প্রতি বিশেষ আনুগত্য থাকলে এ কাজ তাঁরা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন না। প্রত্যেকটি মতবাদের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এই কার্য সম্পাদনে প্রগতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা যেমন ভাবতে হবে, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিও সমান নজর দিতে হবে। সমস্ত মতবাদের সামঞ্জস্য সম্ভব নয়, তবে পাঠক্রম রচনার সময় বিভিন্ন মতবাদ থেকে যতটুকু গ্রহণ করা সম্ভব তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট থাকে তবে কোন্ মতবাদ থেকে কতটুকু গ্রহণ করতে হবে সে সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। সব মতবাদ থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিয়ে সেগুলির সমন্বয় সাধন করে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম—পাঠক্রম যে কোন **শিক্ষা-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড**

স্বরূপ। পাঠক্রম অনুসরণের মধ্য দিয়ে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে সম্ভব করে তুলতে হবে। যে কোন স্তরের পাঠক্রম নির্ণয়ের সময় একটি ব্যাপক ধারণা নিয়ে আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম অন্য স্তরের পাঠক্রমের চাইতে অনেকটা আলাদা হবে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, শিশুরা কর্মচঞ্চল এবং ভাঙ্গন ও গড়নের খেলায় ওরা খুবই উৎসাহী। নাচ, গান, খেলা এবং একসঙ্গে কাজ করার মধ্যে মনের স্ফুর্তি যেমন রয়েছে, তেমনি এই প্রকার পাঠক্রমের মধ্যে রয়েছে ওদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ। শিশুদের কল্পনা আমাদের কল্পনা থেকে আলাদা। তারা মায়ের অনুকরণে পুতুলকে দুধ খাওয়ায়, পুতুলের বিয়ে দেয়, পুতুলের অসুখ করলে ডাক্তার ডাকে। কর্মেই শিশুদের আনন্দ। শিশুদের কর্ম ও খেলার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। শিশুরা যাতে যৌথ কর্ম সম্পাদন করে সহযোগিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি সামাজিক বৃত্তিগুলি আয়ত্ত করতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে জীবনের অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চলবে না। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তি যাতে বিকশিত হয় এবং যাতে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় সেদিকে পাঠক্রম রচয়িতাদের দৃষ্টি দিতে হবে। ক্রমপরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য শিশুদের মনোবল প্রস্তুতির সুযোগও দিতে হবে পাঠক্রমের মধ্যে। কাজেই দেখা যাচ্ছে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা খুব ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে শিশুদের সুপ্ত শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা কাজের মাধ্যমে সক্রিয় অভিজ্ঞতার রূপ নেয়। বর্তমান সমাজে বৃত্তি বহুমুখী। সেইজন্য মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং এই বহুমুখী বৃত্তির চাহিদা মেটাবার জন্য পাঠক্রমে এমন সমস্ত বিষয় থাকবে যা শিশুকে তার উত্তর-জীবনের বৃত্তি নির্বাচনে ও বৃত্তি শিক্ষায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থী যাতে তার আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারে এবং নির্বাচিত বিষয়গুলি যাতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিরোধী না হয়, সেদিকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম রচনাকারীদের লক্ষ্য রাখতে হবে। অবসর সময় বাজে কাজে নষ্ট না করে যাতে রুচিকর ও প্রিয় বস্তুর চর্চা করতে পারে পাঠক্রম রচনার সময় সে কথাও মনে রাখতে হবে। গঠনমূলক ও আনন্দদায়ক কাজের মধ্যে অবসর সময় কাটাতে শিখলে জীবনের পক্ষে তা বিশেষ লাভজনক হবে। প্রাথমিক স্তর থেকেই পাঠক্রমে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে সহজে মাধ্যমিক স্তরের বহুমুখী পাঠক্রম অনুসরণ করতে শিক্ষার্থীদের কোনরূপ অসুবিধা না হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম

বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষা জগতে যুগান্তর আনয়ন করেছে। পাঁচটি স্তরে বিভক্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর শিক্ষা-জীবনকে সমাজ জীবনের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য এই শিক্ষাকে করা হয়েছে কারুশিল্পকেন্দ্রিক ও সমাজভিত্তিক। গান্ধীজির মতে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ ব্যবস্থায় দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নিয়ে প্রত্যেকটি শিশুর স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠা। তিনি রাষ্ট্রনিরপেক্ষ শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজনে বুনিয়াদী শিক্ষাকে করেছেন কারুশিল্প-কেন্দ্রিক। শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তা থাকবে নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায়। শিশুরা পাঠ মুখস্থ করা অপেক্ষা শিল্পকর্মে আনন্দ পায়। আমাদের মত গরীব দেশে সর্ব সাধারণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রজেক্ট-মেথড চালু করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গান্ধীজীর মতে শিল্প কর্মের ভেতর শিশু যেমন তার সৃজনী ক্ষমতা পরিস্ফুট করবার সুযোগ পায় তেমনি তার সৃষ্ট শিল্প-কর্মের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক মূল্যবোধ থেকে তার মনে গভীর আত্মপ্রত্যয় জন্মে।

বুনিয়াদী পাঠক্রম

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচী নির্ণয় করবার সময় প্রাথমিক স্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের সাথে মিল রেখে এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা বলা যায়। এই সময় কিশোর-কিশোরীর জীবনে ভাবের এক জোয়ার আসে। তাদের জীবনে সৃজনমূলক শক্তিটি পুর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন রুচি ও কর্মপ্রবণতার খোরাক জোগাবার জন্য মাধ্যমিক পাঠ্যসূচী বহুমুখী হবে এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে এই পাঠ্যসূচী অনুসরণের সুযোগ দিতে হবে। শৈশবে কি, কে ও কোথায় এই প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য শিশুরা ব্যাগ্র হয়ে থাকে। কিন্তু কিশোর মন কেন, কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে ইত্যাদি প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য সদাই জিজ্ঞাসু থাকে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দেশ বিদেশ আবিষ্কারের নেশা এই সময় এদের পেয়ে বসে। কর্মে এরা আনন্দ পায় কিন্তু কর্মটি এদের রুচিমত হওয়া চাই। এই সময় বড় বড় আদর্শ এদের সামনে উপস্থিত করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীর সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীর মুলগত পার্থক্য থেকে যায় শিশুর ও কিশোরের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনের অভিজ্ঞতার পার্থক্যের জন্য। শিশু-জীবনের সামগ্রিক বিকাশের অনুকূলে হবে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচী আর নূতন সমাজ ব্যবস্থায় সুনাগরিকতা অর্জন ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য হবে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচী নিরূপণ।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম

মিশনারী প্রচেষ্টার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে এদেশে

আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশের স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন এদেশের নারী প্রগতিকে এগিয়ে দেয়। গত দু'টি অসহযোগ আন্দোলনের পর দেশবাসী সর্ব স্তরের মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এবার প্রশ্ন আসে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা ছেলেদের মত হবে, না মেয়েদের জীবনের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে স্ত্রী-শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত হবে। এ ছাড়া কোন্ স্তরে সহ-শিক্ষা সমীচীন, কোন্ স্তরে সহ-শিক্ষা অবৈজ্ঞানিক, সে সম্বন্ধেও সচেতন হ'তে হবে। হার্টগ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় স্ত্রী-শিক্ষার জন্য পৃথক পাঠক্রম না থাকাতে স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রসার হয়নি। এর পরবর্তী শিক্ষা কমিশনগুলি স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ আলাদা পাঠক্রমের সুপারিশ না করলেও একটা বিশেষ স্তরে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিশেষ পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বুদ্ধির দিক থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন—সাহিত্য, গান-বাজনা, নৃত্য-কলা, গৃহসজ্জা, রন্ধন-কার্য, গৃহ-সংগঠন ইত্যাদিতে মেয়েদের বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যদি জীবন বোধ এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় তবে বেশীর ভাগ মেয়েদের জন্য সুগৃহিণী হওয়ার শিক্ষা শিক্ষা-ব্যবস্থায় থাকা চাই। মুদালিয়র কমিশন যে বহুমুখী বিদ্যালয়ের সুপারিশ করেছেন তার সাতটি ধারার মধ্যে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science) ধারাটি শুধু মেয়েদের জন্য। প্রকৃত পক্ষে যারা সুগৃহিণী হতে চান তাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখার জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট। আর যারা চাকুরীতে যোগদান বা অন্য কোন বৃত্তি শিক্ষা করতে চান তারা সেই সব বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। বিদেশে মেয়েরা অফিসের চাকুরীতে, ধাত্রীবিদ্যায় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার কার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যে সব বৃত্তিতে মাতৃসুলভ মনোভাবের দরকার সেখানে মেয়েরা ভাল করেন, কাজেই সেই সব বৃত্তি শিক্ষায় মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ও পৃথক পাঠক্রম থাকা বাঞ্ছনীয়। নানাবিধ কারুশিল্পে ও সূচীশিল্পে মহিলাদের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য মেয়েরা যাতে বাড়ীর কাজকর্ম করেও শিক্ষার সুযোগ পান সেরূপ পাঠক্রম (curriculum) ও সময়-তালিকা (Routine) প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া সর্ব প্রকার সাধারণ শিক্ষায় ছেলেদের সাথে মেয়েদের সমান সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে।

মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরণের পাঠক্রম

পাঠক্রম সংস্কারের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধান—পাঠক্রম সংস্কারের সাথে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাবে যুক্ত। যে শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের অর্থনীতির চাহিদা মেট ত

পারে না সে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। শিক্ষার কাঠামো ও শিক্ষার লক্ষ্যের সাথেও পাঠক্রমের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ট। সে জন্য পাঠক্রম সংস্কার নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত। এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক দিক বিচার করে দেখা যায় যে শিক্ষা সংস্কারের প্রথম পর্ব হবে শিক্ষার কাঠামো ও শিক্ষার পাঠক্রমের আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ধীরে ধীরে করা চলবে না। তবে পরিবর্তন কয়েকটি পর্যায় ক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরাতন ব্যবস্থার সংস্কার না করে নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তনই যুক্তিযুক্ত। পাঠক্রম সমস্যা খুবই জটিল। সাহসে ভর করে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিয়ে। এই পরিবর্তন এক বিরাট সমাজ বিপ্লবের বাণী বহন করবে। এ জন্য প্রয়োজন মত অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করতে হবে।

ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যাগুলির মধ্যে পাঠক্রম সংস্কারের সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল অন্তঃসারশূন্য, পুঁথিসর্বস্ব এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এখনও ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা এই সমস্ত দোষমুক্ত হয় নি বরং সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ইংরেজ আমলের দাস মনোভাব বলবতী থাকায় পাঠক্রম সমস্যা বিশেষ জটিল আকার ধারণ করেছে। তবে আশার কথা এই যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অদম্য সাহসে ভর করে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা সুসংহত ও সামগ্রিক রূপদানের চেষ্টা করেছেন। জাতীয় ঐতিহ্য, সামাজিক সংগঠন ও দেশবাসীর জীবনবোধ ইংরেজদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। অবশ্য শিক্ষিত ভারতবাসীর একটি বড় অংশ পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত। তাই ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতীয় শিক্ষার সুসংহত ও সামগ্রিক রূপদানের জন্য একে জাতীয় শিক্ষা রূপে গড়ে তুলতে হবে এ জন্য শিক্ষার সর্ব স্তরেই পাঠক্রম সংস্কারের প্রয়োজন।

পাঠক্রম পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র গ্রাম, নগর ও শিল্পাঞ্চল। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গান্ধীজি পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করাতে আঞ্চলিক প্রয়োজন মত পাঠ্যসূচী রদবদল করতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক ও কর্মভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্তনে জগতের শিক্ষাবিদ্‌গণ একমত। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমসমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নত ধরণ হচ্ছে শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা। ডিউই প্রবর্তিত Activity curriculum মূলতঃ মনোবিজ্ঞানসম্মত কিন্তু গান্ধিজীর শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী পাঠক্রম মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্মত

প্রাথমিক শিক্ষা-পর্যায়

এবং উন্নত ভাববাদী দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া এই পাঠক্রমে শিশুর চাহিদা ও সমাজের প্রয়োজনকে যেমন মূল্য দেওয়া হয়েছে তেমনি অনুবন্ধ পদ্ধতি ও কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির প্রয়োগকে সার্থক করে তোলা হয়েছে এবং বিষয় বিভাজন-নীতির কুফল থেকে পাঠক্রমকে মুক্ত করা হয়েছে।

এতদিন এই স্তরে পুঁথিসর্বস্ব পাঠক্রম ছিল এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার ছাড়পত্র সংগ্রহই ছিল এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখনও এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। তবে পাঠক্রমের একমুখিতা দূর করবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা রুচি ও কর্মপ্রবণতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্নমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের চেষ্টা করা হচ্ছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ব্যাপকভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্তন করে একাধারে যেমন বিষয়-বিভাজন-নীতির কুফলকে রোধ করা হয়েছে, তেমনি শিল্পকেন্দ্রিক পাঠক্রমের অপ্রতুলতাকেও যথাযথ বিবেচনা করা হয়েছে। এই স্তরে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রবর্তন ইহার উদাহরণ। প্রকৃতি বিজ্ঞানের মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি আর সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হ'ল অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি। গতানুগতিক পাঠক্রমের ভাষামূলক রূপটিকে সরিয়ে দিয়ে এই স্তরে কর্মভিত্তিক পাঠক্রম রচিত হয়েছে। এই স্তরে ব্যবহারিক জীবনের কর্ম-শিক্ষার প্রয়োজন। সমাজে বৃত্তিজীবিদের স্থান সম্পর্কে ধারণা এবং ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করার জন্য আবশ্যিক ভাবে যে কোন শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার দুটি স্তর—(১) স্নাতক স্তর ও (২) স্নাতকোত্তর স্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠক্রম ছিল ইংরাজী ভাষার দক্ষতা লাভ ও কয়েকটি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মুখস্থ-বিদ্যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হোত এবং ব্যক্তিগত জীবনে খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে সমর্থ হোত বা সুযোগ পেত। চাকুরী লাভই এই জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল। আজও উচ্চ শিক্ষা সেই পর্যায়ে আছে। স্নাতক পর্যায়ে যাতে জ্ঞানের অনুশীলন হয় এবং শিক্ষার্থীদের বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তি ও কর্মক্ষমতা বাড়ে সে ভাবে পাঠক্রমকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা হচ্ছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর জ্ঞানের অনুশীলন, কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠা ও বাস্তব ক্ষেত্রে জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা সেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন এবং সেই বিষয়ে গবেষণা করার মনোভাব সৃষ্টি এর অন্তর্ভুক্ত। এর পরবর্তী ডি. ফিল, পি. এইচ-ডি. ও ডি. লিট, স্তরে উচ্চতর গবেষণায় শিক্ষার্থীরা আত্মনিয়োগ করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা—পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের

সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিশুর মানসিক ক্ষমতা ও প্রবণতার কথা বলেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি শিশুর ক্ষমতার বাইরে যে কাজ সে কাজে শিশুর আগ্রহ কম। সব সময় শিশু সে কাজ এড়িয়ে যায়। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করে তুলে জীবনের নানা সমস্যা সৃষ্টি করতে হবে বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে। পাঠ্য-বিষয়ের সাথে জীবনের সম্পর্ক খুব নিবিড় হওয়া চাই। আমরা জানি সভ্যতার অগ্রগতি মানেই সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্রমোন্নতি। উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার কাঠামো ও শিক্ষার বিষয়বস্তু এমন হবে যার লক্ষ্য হবে শিশুকে বাস্তব জীবনের সমস্যার সহিত পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার সমাধানের সত্যকার ইঙ্গিত দিয়ে যাওয়া। বর্তমানে শুধু বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তোলা যাবে না। শিক্ষা এখন জীবনব্যাপী। তাই শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় তার স্বরূপ নির্ণীত হোতে পারে না এবং তাতে শিশুদের আকৃষ্ট করা যায় না। শিশুরা কাজ করতে ভালবাসে। তাদের সৃজনমূলক মনোভাবের খোরাক থাকা চাই পাঠ্য বিষয়ে। শুধু বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তোলা যায় না বলে পরিবার, ধর্মায়তন, সমাজ, রাষ্ট্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রেডিও, গ্রন্থাগার ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর পাঠ্য বিষয়কে চিত্তচমৎকারী করে তুলতে হবে।

মনোবিজ্ঞানী বলেন, শিক্ষা-ব্যবস্থায় শুধু শিশুর মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের পন্থা অনুসরণ করলে হবে না। শিক্ষার্থীর দৈহিক, সামাজিক এবং অনুভূতিমূলক আচরণগুলির উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধূলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যৌথ কর্ম প্রচেষ্টা ইত্যাদি বহির্পাঠ্য বিষয় রূপে বিদ্যালয়ে গৃহীত হয়। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষার মধ্যে হবে শিক্ষার্থীর জীবনের প্রকাশ ও ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ। বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলির সাহায্যেই শিশুদের মধ্যে জীবনের আবেদন আনা যায়। এই বিষয়গুলির মধ্যে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনের অঙ্কুর থাকে। কে গায়ক হবে, কে খেলোয়াড় হবে, কে যোদ্ধা হবে, কে সমাজ-সেবক হবে, কে ইঞ্জিনীয়ার বা বড় সরকারী কর্মচারী হবে অনেক সময় তার প্রকাশ হয় বহির্পাঠক্রমিক বিষয়ে যোগদানের ভেতর দিয়ে। বর্তমানে এদের উন্নত কার্যকারিতা শক্তির পরিচয় পেয়ে শিক্ষাবিদ্‌গণ এগুলিকে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী আখ্যা দিয়েছেন।

পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক বিষয়ের সীমারেখা—মাত্র ৩০।৪০ বৎসর হয় নানাপ্রকার খেলা ও তারপর ধীরে ধীরে অনেকগুলি বহির্পাঠক্রমিক বিষয় বিদ্যায়তনের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত কার্য-কলাপকে বিদ্যা অর্জনের বিরোধী বলে মনে করতেন, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই তাঁরা উপলব্ধি করতে লাগলেন যে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য

ঐগুলি ত চাইই বরং আরও কিছু জীবনের স্পন্দনসম্বলিত বিষয় এদের সাথে যুক্ত হ'লে ভাল হয়।

পুঁথিসর্বস্ব পাঠক্রম যখন শিশুদের কাছে কোন মতেই শিক্ষার আবেদন নিয়ে আসতে পারলো না তখন শিক্ষাবিদেরা পাঠক্রম সংস্কারের কথা ভাবতে বসলেন। শিশু খেলা করতে ভালবাসে। কাজ ও খেলার মধ্যেই ওদের জীবনের চরম স্ফূর্তি। এ জন্য খেলাধূলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যাভিনয়, দেশভ্রমণ ও নানাবিধ যৌথ কর্ম প্রচেষ্টাকে বহির্পাঠক্রমিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রাচীনপন্থীরা এই জাতীয় বিষয়গুলিকে পাঠক্রমে স্থান দেন নি কারণ তাঁদের মনে পুঁথিগত বিদ্যাই বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত। এদের মতে বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। আধুনিক শিক্ষাবিদেরা এ মত স্বীকার করেন না। এদের মতে শিক্ষার মধ্যেই হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশ এবং পুর্ণ জীবন রূপায়নই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মের নূতন জোয়ার এল। ক্রমে ক্রমে কর্মকেন্দ্রিক ও শিল্পকর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন শিক্ষাবিদেরা। বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলি পাঠক্রমকে প্রাণবন্ত করে তুলতে লাগলো। শিক্ষা-বিদেরা সে জন্যে বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলির নাম দিলেন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে এগুলিকে পাঠক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিচার করা হয়।

সহপাঠক্রমিক বিষয়গুলির মধ্যে নিম্ন-লিখিত কার্যাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। মুক্ত পরিবেশে দলবদ্ধভাবে খেলাধূলা।
২। শিক্ষামুলক ও সংস্কৃতিমুলক অনুষ্ঠান।
৩। নাট্যাভিনয়, নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান ইত্যাদি।
৪। প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদির আয়োজন।
৫। সৃজনমুলক, কুটিরশিল্পমুলক ও প্রজেক্ট পদ্ধতির কার্যাবলী।
৬। সমাজকল্যাণমুলক কার্যাবলী।
৭। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি।
৮। এন. সি. সি ; গার্লস গাইড ও স্কাউটিং।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিষয়গুলি শিশুর দৈহিক, মানসিক ও ও আত্মিক বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। শৈশবে ও বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীর বিকাশোন্মুখ প্রক্ষোভগুলির প্রকাশের সুযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এগুলি প্রকাশের সুযোগ না পেলে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে নানা প্রকার মানসিক রোগাক্রান্ত হয়। শিক্ষার্থীর জীবনের নানা সম্ভাবনা এই সব কাজের মধ্যে ফুটে ওঠে। এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা জীবনের সাথে পরিচিত

হয়। এই কাজগুলির মধ্যে শিশুদের সৃজনী স্পৃহা মূর্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর সামাজিক চেতনা ও জীবনবোধ এই সমস্ত কাজ ও খেলার মধ্যে পরিস্ফুট হয়।

আধুনিক শিক্ষায় সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পাঠক্রমের পরিপূরক

আধুনিক শিক্ষাবিদেরা বলেন, সত্যকার সক্রিয়তার মধ্যে জীবনের বিকাশ। প্রকৃতপক্ষে সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া কোন জ্ঞানই অর্জন করা যায় না এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত না হলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীকে শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বৈজ্ঞানিক প্রণালী হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বহির্পাঠক্রমিক কার্যাবলীর শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় অপরিহার্য বলে গৃহীত হবার পর এগুলির নাম হয় সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায় না বলে বহিঃশ্রেণীগত (extra class) কাজ হিসেবে এগুলিকে গণ্য করা হয়।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী বিত্যায়তনে প্রবর্তিত হয়েছে শিক্ষার মৌলিক তত্ত্বগুলি সংস্কার করতে গিয়ে। হার্বার্ট, ফ্রয়েবল, পার্কার, ডিউই, কিলপ্যাট্রিক, কোলম্যান, মণ্টেসরী, সেসিল, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য বহির্পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক বিষয়গুলি নানা আকারে যুক্ত করেছেন আধুনিক পাঠক্রমে। তাঁদের মতে শিক্ষাতত্ত্বের মূল বক্তব্য হোল এই যে শিশু তার পরিবেশের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে উঠবে। পাঠক্রমে যে বিষয়গুলির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় সহ-পাঠক্রমিক বিষয় হিসেবে সেগুলিকে বিত্যায়তনে প্রবর্তন করতে হবে।

সহ-পাঠক্রমিক কাযাবলী সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্গণ

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পুর্ণ বিকাশের জন্য সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে। বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলি দ্বারাই বিত্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি সহজতর হয় এবং বিত্যালয়কে কর্মমুখর করে তোলা যায়।

মূলতঃ বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলি তিনটি কারণে শিশুদের বড় প্রিয় (১) এই কার্যকলাপের মধ্যে শিশুর অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের স্বাভাবিক পথ খোলা থাকে। (২) এই সমস্ত কার্যকলাপে শিশুরা আনন্দ পায় প্রচুর। শিক্ষা যা কিছু পায় তা পরোক্ষভাবে। কিন্তু পরোক্ষভাবে হলেও শিশুর ব্যক্তিসত্তা নানাবিধ কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। (৩) পাঠ্য বিষয় বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষার কোন ভীতি নেই। নিজের কৃতিত্বের জন্য যে প্রস্তুতি তাতে প্রচুর শেখবার বিষয় আছে কিন্তু পরীক্ষার চাপ না থাকাতে শিশুরা স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে সহ পাঠ-ক্রমিক কার্য কলাপে যোগ দিয়ে থাকে।

বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলি শিশুদের এত প্রিয় কেন?

এই সব কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনের স্বাভাবিক কর্ম প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই সমস্ত বহিপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মূল্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে কারও সন্দেহ থাকলো না। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মের নূতন জোয়ার এল। ক্রমে ক্রমে কর্মকেন্দ্রিক ও শিল্পকর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন শিক্ষাবিদেরা। বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলি পাঠক্রমকে প্রাণবন্ত করে তুলতে লাগলো। শিক্ষাবিদেরা সে জন্যে বহির্পাঠক্রমিক বিষয়গুলির নাম দিলেন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে এগুলিকে পাঠক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ-হিসেবে বিচার করা হয়।

বহিপাঠক্রমিক কার্যা-বলীকে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী বলে কেন?

পূর্বে শিক্ষা-ব্যবস্থায় খেলাধূলা, গান-বাজনা ইত্যাদি বিষয়কে বহিঃপাঠক্রমিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে ঐগুলির উপযোগিতা খুবই বেশী বলে ঐগুলিকে সহ-পাঠ-ক্রমিক কার্যাবলী হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অথচ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন সময়পঞ্জীতে সহ-পাঠ-ক্রমিক কার্যাবলীর স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। যে সমস্ত শিক্ষকের উপর সহ-পাঠ-ক্রমিক কার্যাবলীর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের জন্য উপযুক্ত অবসরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, তা ছাড়া এই বাড়তি কাজের জন্য এই সব শিক্ষককে অতিরিক্ত কোন বেতন দেওয়া হয় না। ফলে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তা ছাড়া যারা শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে নিয়েছেন তাদের মধ্যে সত্যকার শিল্পীর অভাব খুবই বেশী। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও ভাল খেলা-শিক্ষক একশতটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে একজন হয়ত পাওয়া যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ২।৪ জন এ্যামেচার শিল্পীর তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ইত্যাদি পরিচালিত হয়। সাহিত্য শিক্ষকের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশের। বক্তৃতা, বিতর্কসভা, সিমপোসিয়াম ইত্যাদির দায়িত্ব থাকে সেই সব শিক্ষকের উপর যারা উক্ত বিষয়ে আগ্রহশীল। কিন্তু বেশীদিন তাঁদের উৎসাহ থাকে না।

শিক্ষাব্যবস্থায় সহ-পাঠ-ক্রমিক কাযাবলীর প্রবর্তন

সহ-পাঠক্রমিক কায পরিচালনাকারী শিক্ষকের অভাব

শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাদি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উৎসাহ দেখা যায় খুব কম শিক্ষকের। যতদিন না বিদ্যালয়ে গণতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে চালু করা যাচ্ছে ততদিন সহজে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা আসা শক্ত। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর পরিচালনায় ছাত্রগণ

পরিচালনা করতে হলে চাই উন্নত ধরণের নেতৃত্ব। তাঁর ব্যবহার হবে মধুর এবং মনোভাব হবে খুবই উদার। প্রকৃত পক্ষে একজন শিক্ষকের নির্দেশে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত ভাবে সহ-পাঠক্রমিক কর্মে আত্মনিয়োগ করবে। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে হলে কাজটিকে ভালবাসা চাই। এই কাজের মধ্যেই ফুটে উঠবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তির নির্দেশনা।

পল্লী-বিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কাযাবলী

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী ব্যয়বহুল। পল্লীগ্রামের বহু বিদ্যালয়ে এগুলির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া শিক্ষক সমস্যাই সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তবে গ্রাম্য পরিবেশে খেলাধূলা ও গান-বাজনার ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে করা যায়।

সামুদায়িক জীবন—আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র সমাজ-রূপে গড়ে তুলতে খুবই আগ্রহী। কারণ একমাত্র সুন্দর এবং স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশেই শিশুর ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। পুবে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল এখন তাকে সরিয়ে দিতে হবে। বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীর জীবনে এক পরম সম্পদ। সে বিদ্যালয়ের জন্য গর্ব বোধ করে। বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি, ট্র্যাডিশন (tradition) ও কর্মের গতির সাথে তার জীবনের অগ্রগতি বিশেষভাবে যুক্ত। আজকাল মিশনারী বিদ্যালয়ে, রামকৃষ্ণ-মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে ও সরকারী বিদ্যালয়ে সামুদায়িক জীবন যাপনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অনেক আবাসিক বিদ্যালয়ে আদর্শ (ideal) সামুদায়িক জীবন (community living or corporate life) গড়ে তোলবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই সামুদায়িক জীবন যাত্রা ভবিষ্যতের বাস্তব সামাজিক জীবন যাত্রার প্রশিক্ষণের কাজ করে। গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষার অপসারণের পর জীবনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য যে শিক্ষা তার সত্যকার রূপ ফুটে উঠেছে শিক্ষার্থীদের সামুদায়িক জীবনের মধ্যে। বিদ্যালয়ে সামুদায়িক জীবনের প্রবর্তন করতে না পারলে আধুনিক শিক্ষাকে স্বরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব হবে না। একসঙ্গে বসবাস করলে বা একত্রে কোন কার্য সম্পাদন করলেই সামুদায়িক জীবন যাপন করা হয় না। সামুদায়িক জীবনের তিনটি উদ্দেশ্য এবং পাঁচটি পদ্ধতি ঠিকভাবে অনুসরন করা চাই।

আধুনিক শিক্ষায় সামুদয়িক জীবন

তিনটি উদ্দেশ্য :

১। আধুনিক জীবনের গতিবেগ এত বেশী যে একার পক্ষে সব কিছু করে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়, তাই সমবেত বাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২। কর্মক্ষেত্রে মানুষ এত বেশী ব্যস্ত যে ব্যক্তিগত সংসারের সব কিছু

পৃথক ভাবে করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় তাই সমবেত ভাবে কাজের আনন্দও যেমন বেশী কাজের ঝামেলাও তেমনি কম।

৩। সমাজতান্ত্রিক ধাচে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রবর্তনের তোড়জোড় চলছে তার বাস্তব প্রশিক্ষণ সম্ভব হবে শিক্ষার্থীদের সামুদায়িক জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে।

পাঁচটি পদ্ধতি :

১। সামুদায়িক জীবনযাত্রা গড়ে উঠবে সঙ্ঘশক্তিকে আশ্রয় করে।

২। সহযোগিতার ভিত্তিতে সমস্ত কার্য সম্পাদনে এগিয়ে যেতে হবে।

৩। গণতান্ত্রিক উপায়ে নেতা নির্বাচন ও কার্যকরী সংসদ গঠন করতে হবে কর্ম ধারা সুশৃঙ্খলভাবে চালিয়ে যাবার জন্য। এই সংসদের গঠন হবে পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ যে ১৯৬৪ সালে খাদ্যমন্ত্রী সে ১৯৬৫ সালে শিক্ষামন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হতে পারে। আর কাজের ত্রুটির জন্য মন্ত্রীত্বের পদ থেকে কাউকে সরিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে সে পদে বরণ করা যেতে পারে।

৪। দলগত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কর্মের উৎকর্ষ লাভ। সামুদায়িক জীবনে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার কোন স্থান থাকবে না।

৫। জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষ সকল সভ্যের সমান মর্যাদা স্বীকার করে যুগ্ম দায়িত্ব নিয়ে সামুদায়িক জীবনের কর্ম সম্পাদনে এগিয়ে যেতে হবে।

সামুদায়িক জীবনের পরিধি বহুবিস্তৃত। নিম্নলিখিত কার্যাবলী প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ে চালু করা যায় :

১। বিদ্যালয়ের তথা শ্রেণীশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গণতন্ত্রসম্মত উপায়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য মনিটর (monitor) এবং বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রসংসদ গঠন করা যেতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর মনিটর এবং অন্যান্য প্রতিনিধি এই সংসদের সদস্য হবেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য এই সংসদ উপ-সমিতি গঠন করতে পারে। এই উপ-সমিতিগুলি নিজ নিজ কার্য সমাধা করে সংসদের নিকট রিপোর্ট পেশ করবে।

২। আবাসিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-প্রতিনিধিদের নিয়ে ছাত্রাবাস-সমিতি গঠিত হবে। এই সমিতিতে খাদ্যমন্ত্রী, সরবরাহমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রভৃতি নির্বাচিত হবে এবং তারা নিজ নিজ কাজের জন্য সমিতির নিকট দায়ী থাকবে। মাসিক রিপোর্ট পেশ এদের অবশ্য করণীয়।

৩। খেলাধুলা সমিতি : প্রত্যেক শ্রেণীর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে খেলাধুলা সমিতি গঠিত হবে। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলি ইত্যাদি খেলার জন্য উপসমিতি গঠন করবে এই মূল সমিতি। উপ-সমিতিগুলি তাদের কাজের নির্দেশ পাবে মূল সমিতি থেকে এবং কর্ম সম্পাদনের পর উপসমিতি মূল-সমিতির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

৪। সাংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান সমিতি : প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পীদের নিয়ে এই সমিতি গঠিত হবে। অবশ্য এই সমিতির কার্য তদারক করবে মূল ছাত্র-সংসদ। নাটক অভিনয়, ভ্রমণের আয়োজন, পিক্‌নিকের ব্যবস্থা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার্য এই সংসদ করবে। প্রত্যেক সমিতিতে দু'একজন শিক্ষক প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত হবেন এই সমিতিগুলির কার্য তদারকের জন্য। তিনি আর্থিক দিকটার প্রতি নজর রাখবেন। মোট কথা সঙ্ঘশক্তিকে আশ্রয় করে সহযোগিতার ভিত্তিতে সামুদায়িক জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিভিন্ন কর্মের মধ্য দিয়ে।

নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ভাব খুব বেশী থাকে। ওরা নিজেদের গ্লাস, তোয়ালে, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব সচেতন। অবশ্য দলবদ্ধভাবে অনেকক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকবার ফলে এদের মধ্যে সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে। দলবদ্ধ ভাবে নাচ, গান, খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্যে এরা নূতন জীবনের আনন্দ পায়। সকলের সমবেত সাহায্য ও সহযোগিতায় আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা দেবার জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রকল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ কর্মধারা প্রবর্তন করতে হবে। সমাজ কল্যাণকর কাজের মধ্যে শিশু যাতে আনন্দ পায় এবং এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়, সে কথাও মনে রাখতে হবে।

সমাজকল্যাণমূলক কাজে সামাজিকতা শিক্ষা

শিশুরা কাজ করতে ভালবাসে। দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে করতে ওদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব দূর হয়। শিক্ষা জটিল আকার ধারণ করার পর প্রত্যক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গৃহ ছেড়ে শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন স্বভাবতই গৃহ ও সমাজ থেকে ওরা দূরে সরে আসে। গুরুগৃহে বা আবাসিক বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে সহজেই সামাজিক বৃত্তিগুলির বিকাশ হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ শিশু যখন সমাজে ফিরে আসে তখন সমাজে ও পরিবারে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তাই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশু যাতে বিদ্যালয়ে অবস্থান কালেই সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে পারে সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কাজের মধ্যে সামাজিক মনোভাব গঠন

সমাজ একটা গতিশীল ও প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠান। পুরাতনকে ভেঙ্গে নূতনকিছু গড়ার প্রেরণা ও আদর্শ শিশুরা বিদ্যালয়েই পেয়ে থাকে, বিদ্যালয় রূপ সমাজে অবস্থানকালে সমাজের নানা সমস্যার সাথে তারা পরিচিত হয়। যারা আজ বিদ্যালয়ের ছাত্র ভবিষ্যতের সমাজ তারাই গড়ে তুলবে। গণতন্ত্রী

বিদ্যালয়েই শিশু প্রথম সামাজিক চেতনা লাভ করে

রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিশুদিগকে বিদ্যালয়েই নানা জাতীয়কর্মের মাধ্যমে সুনাগরিকতা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ, ডিউই, গান্ধিজী ইত্যাদি শিক্ষাবিদ্দের মতে বিদ্যালয়-পরিবেশটিকে সামাজিক আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তাই বর্তমানে শিক্ষার পদ্ধতি, লক্ষ্য ও পাঠক্রম এমন ভাবে সমাজমুখী করে তোলা হয়েছে যে বিদ্যালয় পরিবেশটি সমাজধর্মী হয়ে উঠেছে। সঙ্ঘশক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা, অন্তর্জাত শৃঙ্খলা, সদাশয়তা, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কার্যাবলী ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুদের আয়ত্ত করতে হবে।

সামাজিকবোধ গড়ে তুলতে শিক্ষাবিদ্দের নির্দেশ

সুনাগরিকতা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়-সমাজকে গণতন্ত্রী সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ছাত্রসংসদ গঠনের সময় গণতন্ত্র-সম্মত উপায়ে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। সংসদের কাজ করতে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্জাত শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠবে। সমাজে নানা বৃত্তিজীবির নিজ নিজ কাজ আছে এবং রাষ্ট্র এই সমস্ত কাজকে সুসংবদ্ধ করে। ছাত্রসংসদ বিদ্যালয়ের সামাজিক কাজগুলি সম্পন্ন করবার জন্য কতকগুলি উপ-সমিতি গঠন করতে পারে। প্রত্যেক উপ-সমিতি নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে মূল ছাত্রসংসদকে রিপোর্ট দেবে। একদল দলবদ্ধভাবে ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে, একদল খেলাধূলার ব্যবস্থা করবে, অপরদল নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, ইত্যাদি। অবশ্য সকল দলের কার্যেই বিদ্যালয়ের যে কোন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

সুনাগরিকতা শিক্ষায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

শিশুদের সামাজিক অভিজ্ঞতা অল্প, তাই বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নানাবিধ সামাজিক কার্যে শিক্ষকগণ যদি শিশুদের সহযোগী হন তবে খুবই ভাল। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সুসংবদ্ধ করার দায়িত্ব যেমন ছাত্রসংসদের তেমনি প্রধান শিক্ষকেরও। **এই সমস্ত সামাজিক বৃত্তির বিকাশ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়েও সম্ভব।** আগ্রহ ও প্রবণতাকে আশ্রয় করে সমাজধর্মী কাজের মধ্যে শিশুমনকে ব্যাপৃত রাখতে পারলে শিক্ষায় আগ্রহ তথা সামাজিক কর্মের প্রবণতা সহজে জন্মিতে পারে।

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সামাজিকবোধ

কর্মই জীবন এই ভাবটি শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনন্দ শিশুদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে প্রাণ-চঞ্চল করে তোলে। বিদ্যালয়টিকে একটি ক্ষুদ্র সমাজ হিসেবে গড়তে গেলে অনেকগুলি সামাজিক কার্যকে তালিকাভুক্ত করে নিতে হয়। **আবাসিক বিদ্যালয়ে এই সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে পরম**

সহায়ক। খেলাধূলা, গান-বাজনা, নাট্যানুষ্ঠান, মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন, বিদ্যলেয়ে কোন সম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনা ইত্যাদি কার্যের মধ্যে সামাজিক বৃত্তির বিকাশ সম্ভব হয়। এ ছাড়া আবাসিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসের জন্য বাজার করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, অসুস্থ ছাত্রদের শুশ্রূষা করা, সংবাদ পরিবেশন, সমবেত প্রার্থনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের সামাজিক বিকাশ সম্ভব হয়।

শিক্ষায় সামাজিকতা আধুনিক শিক্ষার নীতিগুলির অন্যতম। সামাজিক বৃত্তি সহজে শিশুদের জীবনে বিকশিত হয় না; এর জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ শিশুরা সেই সমাজের অংশীদার এবং সেই সমাজের ভবিষ্যৎ তাদের উপর নির্ভর করে। শিশুরা বিদ্যালয় পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ থেকে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুদের সামাজিকতাবোধ

কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলির বেশীর ভাগ এলোমেলো ভাবে তাদের মনে এসে জমা হয়। উপযুক্ত কর্মধারার অনুসরণে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যখন এই অভিজ্ঞতাগুলি শিশুর সামাজিক বোধ ও কর্তব্যকে পরিস্ফুট করে দেয় তখনই শিশুর জীবনে সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুরা সমাজ জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষকদের সহায়তায় কতকগুলি সামাজিক কার্য ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ও কার্যগুলিকে সুসম্পন্ন করতে গেলে আপনা থেকেই শিশু চিত্তে সামাজিক গুণগুলির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সম্ভব। এই **সামাজিক কার্য দু'প্রকারের—(১) জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী। (২) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অথবা সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী।**

সামাজিক কাজের মধ্যে সামাজিক বৃত্তির বিকাশ

জনকল্যাণমূলক কার্য সেবার আদর্শ থেকে উদ্ভূত। প্রথমে ছাত্র সংসদ ছাত্রকল্যাণমূলক কাজ থেকে আরম্ভ করে পরে বৃহত্তর সমাজসেবা ও জাতীয়-সেবামূলক কার্যে সক্রিয় ভাবে যোগদান করতে পারে। এই সেবা কার্যের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব, দলপ্রীতি, কর্তব্যপরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি সামাজিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সম্ভব হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে শিশুদের সুকুমারবৃত্তির বিকাশ সহজতর হয়। সেইসঙ্গে বৃহত্তর সমাজেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে গেলে যে সমস্ত সমস্যার ভেতর দিয়ে যেতে হয় সে সম্পর্কে শিশুরা অভিজ্ঞতা লাভ করে।

'দশে মিলি করি কাজ,
হারি জিতি নাহি লাজ',

এই মনোভাবকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করতে হবে।

পাঠক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতি—উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠক্রমের সাথে শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পর্ক বড় নিবিড়। পাঠক্রম নির্মাণকারীরা বড় বড় শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষা-পরিশাসক কিন্তু এই পাঠক্রমকে অবলম্বন করে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীর পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে গুরুত্ব পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হয় শিক্ষকদের। শিক্ষার্থী ও পাঠক্রমের মধ্যে সংযোগ সেতু রচনা করে শিক্ষা-পদ্ধতি। কোথাও শিক্ষক এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন আবার কোথাও শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং শিক্ষক পর্দার অন্তরালে থেকে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষা-পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগকে সম্ভব করে তোলেন।

আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগের সমস্যা—প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ছিল পাঠক্রম-কেন্দ্রিক এবং শিক্ষক-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রণালী, আর আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষক যতই জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হউন না কেন তাঁর পঠন-পাঠনে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কি ভাবে প্রভাবিত হবে সে কথা আমাদের বিবেচ্য। পাঠ পরিকল্পনা (Lesson plan) একটা নূতন কিছু নয়। কোন বিষয়ে পাঠ দিতে গেলে বা কোন বিষয়ে শিশুদের পরিচালনা করতে গেলে শিক্ষকদের একটা প্রস্তুতি-পর্বের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই প্রস্তুতি পর্বটি পাঠ পরিকল্পনায় স্তরে স্তরে সাজান থাকে।

পাঠ-টীকা কি ?

পাঠ-টীকা (Lesson note) থাকবে পাঠের নির্দেশিকা হিসেবে। এই পাঠ-টীকা প্রস্তুতের সময় শিক্ষিকাকে ভাবতে হয় তিনি কোন্ বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য কোন্ স্তরে কোন্ বিষয়ে, কি উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতে চান। এই বিষয়টির সাথে বার্ষিক পাঠক্রমের সামঞ্জস্য কোথায় এবং কোন্ বিষয়টির উপর কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে সে বিষয়েও শিক্ষিকাকে চিন্তা করতে হয়। কোন বিষয়ের উপর পাঠ-টিকা প্রস্তুত করবার সময় সমগ্র পাঠক্রমটি তথা বিষয়ক্রমিক পাঠক্রমটির কথা ভাবতে হয়। বর্তমানে শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় বলে অনুবন্ধ প্রণালী (Co-rrelation method) পাঠ-টীকায় একটি বড় অংশ গ্রহণ করে। তা ছাড়া কর্ম-চঞ্চল শিশুদের বিভিন্নমুখী বৃত্তির প্রবণতার কথাও পাঠ-টীকা প্রস্তুতের সময় বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হয়।

পাঠ-টীকা প্রস্তুতের প্রস্তুতি

বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীতে সমস্ত বিষয় হার্বার্টের পদ্ধতিতে শিক্ষা

দেওয়া সম্ভব নয়। তথ্যবহুল বিষয় ও সাহিত্য হার্বার্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া চলে কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গবেষণাগার-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজন স্থলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত ইত্যাদির তত্ত্বমূলক অংশ বক্তৃতা-পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শ্রেণী-পাঠ-পদ্ধতিকে (Class teaching) প্রাণবন্ত করে তোলবার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাস অথবা সম্মেলন-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

হার্বার্ট পদ্ধতির সীমারেখা

ট্রেইনিং কলেজগুলিতে হার্বার্ট-পদ্ধতিতে পাঠ-টীকা প্রস্তুত শিক্ষার্থীদের কাছে এক ভীতিপ্রদ কর্মের বোঝা। যে অবস্থার মধ্যে এই পাঠ টীকাপ্রস্তুত প্রণালী শিক্ষকশিক্ষিকাদের আয়ত্ত করতে হয়েছে সে অবস্থায় পাঠ-টীকার প্রতি কোন দরদ বা মমত্ববোধ না জন্মান স্বাভাবিক; তা ছাড়া প্রশিক্ষণ নিয়ে যখন শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে ফিরে যান তখন বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে এই প্রশিক্ষণকে শিক্ষকেরা কার্যকরী করে তুলতে পারেন না। পঠন-পাঠন ব্যবস্থা শিক্ষা-বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা গেলেও শতকরা একজন শিক্ষকের পক্ষে বিস্তৃত পাট-টীকা প্রস্তুত করে বিদ্যালয়ে পাঠ দেওয়া সম্ভব কিনা সে কথাও তর্কের বিষয়। পাঠ-টীকার যে প্রয়োজন না আছে তা নয়, তবে পাঠ-টীকা প্রস্তুত প্রণালী খুবই সহজ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন শ্রেণীতে কোন বিষয়ে পাঠ দিতে গেলে সেই দিনকার পাঠের সাথে পাঠক্রমের ধারাবাহিক পাঠগুলির মিল থাকা উচিত।

পাঠ-টীকার উন্নয়ন

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন প্রধান বিষয়-শিক্ষক (Head of the Subject) থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি নিম্নতম শ্রেণী থেকে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত সেই বিষয়ে পাঠ্যসূচী নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একজন শ্রেণী-শিক্ষক থাকলে ভাল হয়। একটি শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীর প্রগতির (Progress) দিকে তিনি লক্ষ্য রাখবেন। একটি শ্রেণীতে পাঠ্যবিষয়গুলির বাৎসরিক পাঠ-টীকার পরিকল্পনা তার নেতৃত্বে প্রস্তুত হবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমস্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও পাঠ-টীকাগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করবেন। শিক্ষকগণ বিস্তৃত পাঠ-টীকা প্রস্তুত না করে সংক্ষেপে পাঠ-টীকার প্রয়োজনীয় অংশগুলি পাঠ-টীকা বহিতে লিখে রাখবেন এবং উহা ব্যবহার করবেন।

শিক্ষার অর্থনীতি বিচার করে পরোক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পর ইউরোপে শ্রেণী-শিক্ষার (Class-Teaching) প্রবর্তন করা হয়েছে। গণতন্ত্রী দেশে সকলেই শিক্ষালাভের সমান সুযোগ পাবে, কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী-শিক্ষা প্রবর্তন না করলে আর্থিক অভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনা করা যাবে না। একটি শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক বা সামাজিক বিকাশের

শ্রেণীশিক্ষা অপরিহার্য কেন ?

মাপকাঠিতে প্রত্যেকটি শিশু আলাদা। অথচ প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এবং যোগ্য শিক্ষকের অপ্রতুলতার জন্য বিদ্যালয়ের ও কলেজীয় শিক্ষায় শ্রেণী-শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব নয়।

শ্রেণী-শিক্ষার দোষত্রুটী দূর করবার জন্য ডাল্টন প্ল্যানের অনুকরণে ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করা যায়। এই কক্ষগুলিতে প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সম্ভব হলে ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর প্রতি ব্যক্তিগত নজর রাখবার ব্যবস্থা করা যায়।

শ্রেণীতে ব্যক্তিগত নজর দেওয়া

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিগুলি মূলতঃ শিশুকেন্দ্রিক। মনোবিজ্ঞানের গবেষণাজাত তথ্যের উপর এগুলি নির্ভরশীল। কমবেশী সবগুলি পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সমস্ত পদ্ধতিতেই শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বয়স, বৌদ্ধিক ক্ষমতা, বিশেষ রুচি ও কর্মপ্রবণতা ইত্যাদির প্রতি নজর রেখে পদ্ধতিগুলি প্রবর্তিত হয়েছে। ইহাদের কয়েকটি শ্রেণী-শিক্ষাকে সমর্থন করে আর কয়েকটি শ্রেণী-শিক্ষার নানা অসুবিধার কথা চিন্তা করে শ্রেণী নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে, এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রজেক্ট মেথড্—এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, কর্মপ্রবণতা, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। পরিকল্পনার পর্যায়ে প্রজেক্ট সম্পাদনের ধারাটি নির্দ্ধারিত হয় এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই পদ্ধতিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় সামাজিক পরিবেশে। এতে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ ভাবে কাজ করে শিক্ষকের নির্দেশ নিয়ে। এতে এক দিকে শ্রেণী-শিক্ষার কুফল যেমন বিদূরিত হয়েছে তেমনি দলবদ্ধ ভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকায় একক শিক্ষার ব্যয়বাহুল্য ও একঘেয়েমীকে দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ডাল্টন প্ল্যান—শ্রেণী শিক্ষার নানা দোষ ত্রুটির কথা বিবেচনা করে এই পদ্ধতিতে শ্রেণী-শিক্ষা পরিকল্পনা ও বক্তৃতা পদ্ধতি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন ঘরে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকেন। তার ঘরে ঐ বিষয়ে পুঁথি-পুস্তক ও শিক্ষা-উপকরণ থাকে। কার্যভার চুক্তির (assignment by contract) সাহায্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলে। সপ্তাহের বা মাসের কাযভার শেষ না হলে নূতন কার্যভার দেওয়া হয় না। মাসের শেষে সম্মেলনে সব কিছু আলোচনা করবার সুযোগ আছে। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি—এই শিক্ষা পদ্ধতির মূলকথা হচ্ছে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা। প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা, কর্মে আনন্দ ও শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক ও প্রাক্ষেভিক বিকাশই এই পদ্ধতির মূলকথা।

ওয়ার্কসপ পদ্ধতি—ওয়ার্কসপ পদ্ধতি একজাতীয় প্রজেক্ট তবে এর সমাধান প্রধানতঃ বুদ্ধিমূলক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীগুলিতে ও মহাবিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে অনেক সুফল পাওয়া গিয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে সমস্যা সমাধানে অংশ গ্রহণ করে। এতে একাধারে ব্যক্তিগত ভাবে জ্ঞান অন্বেষণ, তথ্য সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এবং অপরদিকে দলবদ্ধ ভাবে কর্তব্য কর্মে নিষ্ঠার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ থাকে।

উইনেট্‌কা প্ল্যান—এই পদ্ধতিতে পাঠক্রমকে ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজন এই দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে (১) সাধারণ আবশ্যকীয় কার্যাবলী ও (২) যৌথ আবশ্যকীয় কার্যাবলীতে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী দিবসের অর্ধেকাংশ ব্যক্তিগত কর্মতালিকা অনুসরণ করে আর বাকী অর্ধেক অংশ যৌথভাবে সামাজিক কর্মতালিকায় অংশ গ্রহণ করে।

মরিসন প্ল্যান—মরিসন প্রচলিত শ্রেণী-শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পাঠক্রমের একক-বিভাজন-কার্যভার-বণ্টন-নীতি প্রয়োগ করেছেন।

ডেক্রলী মেথড্—বেলজিয়ামের শিক্ষাবিদ ডেক্রলী জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা (Education for life by living) ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাঁর প্রবর্তিত ডেক্রলী পদ্ধতিতে।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি—বুনিয়াদী শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় শিল্পের মাধ্যমে। ভাষা এখানে শিক্ষার মাধ্যম নয় শিল্পই শিক্ষার মাধ্যম। এতে শিশুর ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের আদর্শকে বড় করে দেখা হয়েছে। শিক্ষায় স্বাবলম্বন, শ্রমের মর্যাদা এবং সঙ্ঘশক্তি ও সহযোগিতা বুনিয়াদী শিক্ষার নূতন দিক। কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন রূপায়ণ বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির মূলকথা।

অনুবন্ধ প্রণালী—শিক্ষা-পদ্ধতিতে এই প্রণালীর প্রচলন নূতন নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এ পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ মাধ্যম সৃষ্টির পূর্বে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন-ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হোত। কোন বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে চরিত্র গঠন ও শাস্ত্র পাঠের দিকে নজর দেওয়া হোত। তারপর এক এক বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি খুব বেড়ে যায় এবং শিক্ষা বিষয়-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্ব স্তরেই বিষয়-শিক্ষার (subject teaching) উপর বিশেষ

ঝোঁক দেখা যায়। এতে ছাত্র মহলে কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা সাহিত্যিক মনোভাব সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিষয়-জ্ঞান হয়ত পাকা হয়, কিন্তু সেই বিষয়-জ্ঞানের (subject knowledge) বাস্তব ব্যবহার (practical application) সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা সচেতন থাকে না।

প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম প্রস্তুতের সময় বৈজ্ঞানিক নির্দেশ দেওয়া আছে যে এই দু'টি স্তরে বিষয়-বিভাজন নীতি মনোবিজ্ঞান সম্মত হবে না। এ জন্য অনেক শিক্ষাবিদ্ প্রাক্-প্রাথমিক ও নিম্ন-প্রাথমিক স্তরে একক-শিক্ষক-শ্রেণী (one teacher-class) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। বিষয়-জ্ঞান অপেক্ষা জীবনের অভিজ্ঞতা শিশুদের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয়। সে জন্য নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে বিষয়-বিভাজন নীতি থাকা সত্ত্বেও অনুবন্ধ প্রণালী প্রয়োগ করে বিষয়-বিভাজন নীতির ত্রুটি অনেকটা দূর করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়, এক বিষয় পড়াতে গিয়ে অন্য বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন—একটি ভাষা ভাল করে শিখলে অন্য ভাষা সহজে আয়ত্ত করা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যারা ইংরেজী ভাষায় ভাল তারা প্রায়শঃ মাতৃ-ভাষায় ভাল; যারা ইতিহাসে ভাল তারা রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ভাল। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা প্রায়শঃ অঙ্কে ভাল হয়। কারণ যেরূপ মানসিক ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে সেরূপ ক্ষমতা শিক্ষার্থীকে অঙ্ক শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলে। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে বিষয়গুলির ব্যবহারিক দিকটার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জন্মে। তা ছাড়া এতে শিক্ষণের সময় কম লাগে এবং বিষয়গুলির সাথে জীবনের কি সম্পর্ক সে ধারণাও স্পষ্ট হয়।

অনুবন্ধ প্রণালীর উপযোগিতা

জীবনের বিচিত্র চাহিদা মেটাবার জন্য বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারি, প্রত্যেক শিশুর একটি সাধারণ জ্ঞান ও কর্ম ক্ষমতা আয়ত্ত করা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ে পাঠ দেবার সুবিধার জন্য আমরা বিভিন্ন বিষয় আলাদা করে শিক্ষা দিয়ে থাকি। কিন্তু শিশুর কাছে আলাদা আলাদা বিষয়ের তেমন কোন আবেদন নেই, জীবনের বাস্তব রূপ ও সামগ্রিক ধারণা তার কাছে খুবই স্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শিশু তার গ্রামকে ভালবাসে। গ্রামকে সে ভাল করে জানতে চায়। আলাদা করে শিশুকে গ্রামের প্রকৃতি-বিজ্ঞান, গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস, গ্রামের হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, গ্রামের প্রাচীন সংস্কৃতি, গ্রামের ধর্মজীবন, গ্রামের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রতিভূ স্বরূপ ইউনিয়নবোর্ডের কার্যাবলী ইত্যাদি শিশুকে পৃথক

সামগ্রিক জীবনবোধ ও অনুবন্ধ প্রণালী

পৃথক বই থেকে মুখস্থ করানো হয়। পৃথক বিষয় মুখস্থ করতে শিশুর ভাল লাগে না। বিশেষ করে শিশুদের কাছে পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার আবেদন খুবই সীমাবদ্ধ। শিশুর সামনে সামগ্রিক জীবনের রূপটি অনুবন্ধ প্রণালীতে তুলে ধরতে হবে। এই অনুবন্ধ প্রণালীটি অভিনব নয়। প্রাচীন কালে গুরুগৃহে থেকে জীবনের সামগ্রিক রূপের সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হ'তেন। অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠক্রমের বিষয়-বিভাগকে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিচক্ষণ শিক্ষক একটি বিষয় পড়াবার সময় সেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয় আলোচনা করে থাকেন। বিষয়গুলির মধ্যে যে মৌলিক যোগসূত্র আছে সে সম্পর্কে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

শিক্ষা পদ্ধতিগুলির নিজস্ব ভালমন্দ দু'টি দিকই আছে। তা ছাড়া বিশেষ বিষয়ের জন্য পদ্ধতি আলাদা হয় অথবা বিশেষ বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং তাতে সুফল পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীগুলিতে ওয়ার্কসপ পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয়। আবার শিশু-শিক্ষায় তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি অপেক্ষা মনোবিজ্ঞানসম্মত শিশুকেন্দ্রিক বা কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির সুফল বেশী। তা ছাড়া শিক্ষাকে জীবনকেন্দ্রিক করতে গিয়ে প্রজেক্ট পদ্ধতি এবং শিক্ষায় স্বাবলম্বন ও শ্রমের মর্যাদা স্থাপন করতে গিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। কম বেশী সব কয়টি পদ্ধতিই মনোবিজ্ঞানসম্মত। এদের কতকগুলিতে শ্রেণী-শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, আর কতকগুলিতে শ্রেণী-নিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। উদাহরণ-স্বরূপ ডাল্টন প্ল্যান ও উইনেট্কা প্ল্যানের নাম করা যেতে পারে।

বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি উপযোগিতা

মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষায় স্বাবলম্বন ও শ্রমের প্রতি মর্যাদা জ্ঞান বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। সামুদায়িক জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। শারীরিক বিকাশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় খেলাধূলা ও নানাপ্রকার কর্মের মধ্য দিয়ে। মানসিক বিকাশের জন্য কারুশিল্পকে মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে এবং অনুবন্ধ প্রণালীর আশ্রয় নিয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। গ্রামে ভরা দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে জাতীয় শিক্ষার দ্রুত উন্নতির জন্য বুনিয়াদী পদ্ধতি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী এবং করণীয় বিষয়ও অনেকগুলি। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিগুলির আলোচনা থেকে **পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের তিনটি মূল সমস্যা** লক্ষ্য করা যায়।

(১) শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাকার্যে দরদ ও আগ্রহ না

থাকাতে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। বুনিয়াদী স্তরে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না বলে বুনিয়াদী পদ্ধতির প্রয়োগও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

(২) বেশীর ভাগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জ্ঞানমুখী শিক্ষাকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি বলে আঁকড়ে থাকেন কারণ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিদ্যালয়ের ভাগ্য নির্ভর করে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকেরা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনে আগ্রহী হলেও কার্যতঃ উহা সম্ভব হয় না।

(৩) আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতির সুযোগ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষণাগার ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ এবং প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা-উপকরণের সরবরাহ না থাকাতে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।

অনুশীলনী

১। ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার স্বরূপ কি ?

২। এদেশের শিক্ষা-সমস্যার কারণগুলি উল্লেখ কর।

৩। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে সংঘাত দেখা দেয় কেন ?

৪। পাঠক্রম নির্ণয়ের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর।

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৬। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংগঠনে ও নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকা কি ?

। 'শিক্ষার উন্নয়ন শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের উপর অনেকটা নির্ভরশীল' এ'কথা যুক্তিসহ বুঝিয়ে দাও।

৮। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা-উপকরণ যে অপরিহার্য তা ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

৯। উন্নত শিক্ষা-পরিবেশ বলতে কি বুঝ ?

১০। ছাত্রকল্যাণমূলক কার্যাবলী সংগঠনের অসুবিধা কোথায় ?

১১। পাঠক্রম নির্ণয়ের মূলনীতিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করবে কিরূপে ?

১২। পাঠক্রম সংস্কারের সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন্ কোন্ দিক বিশেষভাবে জড়িত ?

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাদান ও শিক্ষা-পরিমাপন

ভাষা শিক্ষা দেবার সমস্যা—গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব স্তরেই ভাষা-শিক্ষার উপর বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেবার রীতি ছিল। তাই ভাষাসর্বস্ব মাধ্যমিক শিক্ষা কিশোর-কিশোরীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনে সমর্থ ছিল না। বর্তমানে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও শিশুদের মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্য মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। অক্ষর ক্রমিক পদ্ধতির পরিবর্তে বাক্য ক্রমিক পদ্ধতির প্রচলন ভাষা-শিক্ষায় এনেছে শিশুর ঐকান্তিক আগ্রহ। প্রাথমিক স্তরে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হ'লেও মাতৃভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই স্তরে (১ম—৫ম শ্রেণী) কোন বিদেশী ভাষা শিশুকে শেখাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার মাধ্যমে ভাষার গঠনমূলক জ্ঞানের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে শিশুরা স্বাধীন ভাবে কিছু রচনা করতে শিখবে এবং ব্যাকরণের জ্ঞান লাভ করে উহার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জাতীয় ভাষা (হিন্দী) শিখতে আরম্ভ করবে এবং ৩ বৎসরের মধ্যে সরল হিন্দী শুদ্ধ ভাবে লিখতে ও বলতে পারবে। হিন্দী ভাষাকে আন্তর্রাজ্য যোগাযোগের ভাষা হিসেবে শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হবে। Basic English-এর সাহায্যে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ করে পরবর্তী শ্রেণীতে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাকে প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ের স্তরে দ্রুত নিয়ে যেতে হবে। এখন মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাষা-শিক্ষায় এদেশের শিক্ষার্থীদের দৈন্য এত বেশী কেন? এ সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় তাই সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হোল।

ভাষা-শিক্ষা দেবার জন্য ভাষাবিদ্ ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের বিশেষ অভাব রয়েছে। অনেকে মনে করেন যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা প্রাথমিক স্তরে এবং যারা স্নাতক হয়েছেন তারা মাধ্যমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষা দিতে সমর্থ। কিন্তু এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শতকরা ১০।১৫ জন শিক্ষক ভাষা-শিক্ষা দিতে সক্ষম বাকী সকলের ভাষা-শিক্ষার বিশেষ ত্রুটি আছে। এই সমস্ত শিক্ষকদের কাছে ভাষা শিক্ষা করতে হয় বলে শৈশবেই ভাষা-শিক্ষার বনিয়াদ কাঁচা থেকে যায়। পরবর্তী স্তরে সেই ত্রুটি শিক্ষার্থীদের

সারা জীবন বহন করে চলতে হয়। বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের এক হাজার শিক্ষিকার উপর একটি অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে যে মাত্র ১৩৭ জন শিক্ষিকার ভাষাজ্ঞান চলনসই বাকী শিক্ষিকাদের মাতৃভাষার ত্রুটি খুবই মারাত্মক অথচ এরাই কচি শিশুদের ভাষা-শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মাধ্যমিক স্তরের নীচের শ্রেণীগুলিতে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য শিক্ষকদের উপর মাতৃভাষা ও ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা দেবার ভার দেওয়া হয়। এর ভয়াবহ ফল মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষার মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এবং ইংরেজী ভাষার উত্তর পত্র দেখলেই অনুধাবন করা যায়। এ ছাড়া ভাষা-শিক্ষার জন্য ভাল পাঠ্যপুস্তক, অভিধান ও শিক্ষা-উপকরণের বিশেষ অভাব রয়েছে। ভাষা-শিক্ষার উন্নত পদ্ধতি খুব কম বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা প্রায় কোন বিদ্যালয়ে নেই। ব্যাকরণের উপর বেশী জোর দেওয়াতে ভাষা-শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ভীতি উৎপাদন করা হয়। ভাষা-শিক্ষার জন্য এক শ্রেণীতে ২০।২৫ জন শিক্ষার্থীর বেশী গ্রহণ করা চলবে না। যারা ভাষা-শিক্ষায় কাঁচা তাদের জন্য ৮।১০ জনের ছোট ছোট দলে টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করতে হবে।

মাধ্যমিক পাঠক্রমে বিভিন্ন ভাষার স্থান—শিশু প্রথমে মাতৃভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। পরে গৃহ ও বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা লিখতে ও পড়তে শিখে। এর পর বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে আঞ্চলিক ভাষা (Regional language), জাতীয় ভাষা (National language) ও বিদেশী ভাষা (Foreign language) শিক্ষা করে থাকে। এখন বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে কোন্ ভাষা কি ভাবে, কোন্ স্তর থেকে কি উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং পরীক্ষা গ্রহণের সাহায্যে কি ভাবে ভাষা-শিক্ষার মূল্যায়ন করা হবে তাই আমাদের বিবেচ্য।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার্থী সহজে সাবলীলভাবে সম্পূর্ণরূপে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে উচ্চতম শিক্ষাও পরিচালিত হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় ভাষা (Classical language), বিদেশী ভাষা (Foreign language) ও জাতীয় ভাষা (National language) ইত্যাদি শিখবার বিশেষ কারণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এতদিন আমাদের শিক্ষার কাঠামো এমন ছিল যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা না করলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হোত না। এখনও অনেকে বলে থাকেন ইংরেজী ভাষার জ্ঞান না থাকলে বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পৃথিবীর বহু উন্নত দেশের অধিবাসীরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা না করেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষাকে সম্ভব করে তুলেছেন। আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা অনায়াসে প্রবর্তন।যায় তবে তার পূর্বে আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন।

আন্তরাজ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য জাতীয় ভাষা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাষা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা দিতে হবে। এই ভাষায় সাধারণভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারার ক্ষমতা প্রত্যেকটি নাগরিকের থাকা বাঞ্ছনীয়। এ জন্য হিন্দী ভাষার প্রসার, প্রচার ও উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন।

ইংরেজী ভাষা এখনও এদেশে উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম। আন্তরাজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা এই ভাষার সাহায্যেই হয়ে থাকে। আঞ্চলিক ভাষা ধীরে ধীরে উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হ'লে এবং হিন্দী ভাষার প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের ফলে উহা আন্তরাজ্য ভাষার কার্য সম্পাদন করবার যোগ্যতা অর্জন করলে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেক ভারত সন্তানকে আবশ্যিক ভাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে হবে। ইংরেজী ভাষাকে অন্যান্য বিদেশী ভাষার মত মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে চলবে না। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে উন্নত দেশগুলি, যথা—ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী, রাশিয়া ইত্যাদি সকল দেশেই ইংরেজী ভাষাকে মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া প্রায় দেড় শত বৎসর ধরে এ দেশের বুদ্ধিজীবীরা ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করে এ দেশের শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন তার অবদান কম নয়। ইংরেজী-ভাষা অধ্যয়নে মধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপর একটু চাপ পড়লেও ইংরেজী ভাষাকে আবশ্যিক ভাষা হিসেবে মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর উন্নত দেশের ছেলেমেয়েরা কোথাও তিনটি, কোথাও পাঁচটি ভাষা শিক্ষা করে থাকে। সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ইংরেজী ভাষাকে আমাদের মাধ্যমিক স্তরে দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা রূপে গ্রহণ করতে হবে। তবে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন স্থলে ইংরেজী ও হিন্দী ভাষাকে সমান মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

দেশের সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে যে ভাষাগুলি আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সেগুলির মধ্যে সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাধ্যমিক স্তরে হাতের কাজ, বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় পাঠক্রমে ভাষা শিক্ষার চাপ খানিকটা কমিয়া দিতে হবে। সে জন্য ৯ম থেকে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য আঞ্চলিক ভাষা (Regional language) এবং ইংরেজী ভাষা (English language) আবশ্যিক বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজন নেই বলে শাস্ত্রীয় ভাষাগুলিকে (Classical languages) আবশ্যিক ভাষা হিসেবে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়নি। যারা বহুমুখী বিদ্যালয়ে মানবাদি-বিজ্ঞান শাখা (Humanity stream) বেছে নিয়ে শাস্ত্রীয় ভাষা শিক্ষা করতে চায় তারা

ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, ঐস্লামিক ভাষা বা আধুনিক ইউরোপীয় বা এশিয়ার উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে কোন একটি বেছে নিতে পারে।

আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে ভারত সরকার ১৪টি ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা (Regional Language) হিসেবে স্বীকার করেছেন। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করবার পর আঞ্চলিক ভাষাগুলির দ্রুত উন্নতি সম্ভব। এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষাগুলি U.P.S.C.-এর পরীক্ষার ভাষা ও রাজ্য সরকারের সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াতে আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের জন্য প্রচুর সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিনটি ভাষা আবশ্যিক পাঠক্রমের মধ্যে স্থান পাবে। তবে তিনটি ভাষা একই সঙ্গে আরম্ভ করা হবে না। তিনটি ভাষা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আবশ্যিক ভাষা হিসাবে থাকবে না এবং তিনটি ভাষার মানও একরূপ হবে না। ১ম শ্রেণী থেকে মাতৃভাষা শেখানো হবে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে হিন্দী ভাষা আরম্ভ করতে হবে এবং ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উহা আবশ্যিক ভাষা হিসেবে পাঠক্রমে স্থান পাবে। হিন্দী ভাষায় কৃতকার্য না হতে পারলে শিক্ষার্থীকে ৯ম শ্রেণীতে উন্নীত (Promoted) করা হবে না। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষা আরম্ভ করা হবে এবং ১১ম শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসেবে উহার পঠন পাঠন চলবে। ৯ম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা ও ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক ভাষারূপে গৃহীত হবে। এ ছাড়া তিন বৎসরের জন্য মানবাদি বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের একটি শাস্ত্রীয় ভাষা বা বিদেশী ভাষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যম—প্রাচীন কাল থেকে বৃটিশ যুগের প্রারম্ভিক পর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত, আরবী ও পার্শি ভাষা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ছিল। সরকারী ভাষা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে সরকারের প্রয়োজনে তাই এ দেশেও ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পর ইংরেজীকেই সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর আসে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে ভাষামূলক সংঘর্ষ। মেকলের মিনিটে (Maculay's minute) ইংরেজী ভাষাকেই উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ মেকলের মতকেই সমর্থন করেন। এর পর এদেশে শিক্ষার যে কাঠামো গড়ে ওঠে তাতে ইংরেজী ভাষা সগৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রসার ও দ্রুত উন্নয়ন সহজেই সম্ভবপর হয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর গণতন্ত্রী দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার নূতন কাঠামো প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ভারতবর্ষের ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব হয়েছে। গত ২০ বৎসর ধরে প্রাক্ স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পঠন-পাঠন ইংরেজী ও আঞ্চলিক দুই প্রকার

ভাষাতেই হয়েছে। পরীক্ষার উত্তর পত্রও ইংরেজী অথবা আঞ্চলিক ভাষাতে দেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। গত ১৯৪০ খৃঃ মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছিল আঞ্চলিক ভাষাকে। ১৯৬৭ খৃঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকার উচ্চ-শিক্ষা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রহণ করবার বিষয় বিবেচনা করছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে আঞ্চলিক ১৪টি ভাষা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা লাভ করেছে, তবে একটা সুপরিকল্পনা সহকারে আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশ সাধন করতে পারলে কলা, বিজ্ঞান, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক সমস্ত শিক্ষাই সহজে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব হবে। এ জন্য ১ম শ্রেণীর (First class) বিদেশী পুস্তকগুলিকে আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনোলজিগুলিকে। লেখকেরা ও অধ্যাপকেরা যাতে স্বাধীন ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ করে ১ম শ্রেণীর (First class) পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে পারেন সে জন্য তাঁদের সর্ব প্রকার সাহায্য দিতে হবে। অন্তবর্তী কালে মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরে ইরেজী আবশ্যিক ভাষারূপে গৃহীত হবে এবং স্নাতকোত্তর স্তরে উহা গ্রন্থাগারের ভাষা হিসেবে বিবেচিত হবে। ইংরেজীতেও প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া চলবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা—বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারের' যেমন অবস্থা এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের সেরূপ অবস্থা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষক ত দূরের কথা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞান শিক্ষকও স্কুলে পাওয়া যাচ্ছে না। মফঃস্বল কলেজে কোন বিজ্ঞান শিক্ষক একটানা দু' বৎসর থাকছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে ভাল চাকুরী না পাওয়া পর্যন্ত দু' এক বৎসর বিজ্ঞানের ছাত্রেরা শিক্ষকতা করেন। ফলে প্রতি বৎসরই নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। তা ছাড়া এই সব যুবক শিক্ষকদের শিক্ষকতায় একেবারেই আগ্রহ নেই। কিশোর-কিশোরীরা যে আবিষ্কারকের আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে বিজ্ঞানের শ্রেণী-কক্ষে ও পরীক্ষণাগারে আসে তার কোন খোরাকই তারা পায় না। শিক্ষক পাওয়া যায় না বলে নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ এ জাতীয় শিক্ষকের হাতে জাতীয় শিক্ষার এই গুরুতর বিষয়টি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তা ছাড়া বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ভাল পরীক্ষণাগার কম বিদ্যালয়েরই আছে। গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত কলেজে বিজ্ঞান পড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে দু' চারটি ছাড়া কোন কলেজের ভাল পরীক্ষণাগার নেই। পরীক্ষণাগারের সাজ-সরঞ্জামও প্রয়োজন অনুরূপ নেই। সহরের কলেজগুলিতে পালা ক্রমে তিনবার বিজ্ঞানের ক্লাস হচ্ছে। যন্ত্রপাতিগুলি অতিরিক্ত ব্যবহারে শীঘ্রই কাজের অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবে ঐগুলির অভাব সহজে পূরণ করতে পারছেন না। বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকগুলিও প্রথম শ্রেণীর নয়। অনেক পাঠ্য পুস্তক আবার নোটের আকারে লেখা। শিক্ষার্থীরা তোতাপাখির মত উহা মুখস্থ করে বিজ্ঞানে স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে আবার তারাই শিক্ষক হিসেবে বিজ্ঞানের পুঁথিগত জ্ঞান দান করেই কর্তব্য শেষ করছেন। শিক্ষার্থীর সৃজনী মনোভাবের পুর্ণ মর্যাদা না দেওয়াতে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ (Practical training) ত্রুটিপুর্ণ হওয়াতে বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

পাঠ্য পুস্তক রচনা—অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অধ্যাপকেরাই পাঠ্য পুস্তক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন। যে বিষয়ে লেখক পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে চান সে বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা বাঞ্ছনীয়। শুধু পাণ্ডিত্য থাকলেই হবে না যাদের জন্য পাঠ্য পুস্তক তিনি রচনা করেছেন তাদের মানসিক ক্ষমতা, সেই স্তরের পুর্ণ পাঠক্রম এবং যে বিদ্যা শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে তার প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কেও তাঁর সম্যক ধারণা থাকা চাই। রচনার সমৃদ্ধি নির্ভর করে প্রকাশভঙ্গি ও প্রাঞ্জল ভাষার উপর। উন্নত রচনা শৈলী ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পাঠ্য পুস্তককে করে সুখ পাঠ্য। সরকারের হাতে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনের একচেটিয়া অধিকার দিলে কি দুর্ভোগ অভি-ভাবকদের ভুগতে হয় 'কিশলয়' প্রকাশেই তার সাক্ষ্য রয়েছে। ব্যবসাদার প্রকাশকদের হাতে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের সুযোগ থাকায় পাঠ্য পুস্তকের দাম হয়েছে আকাশ-চুম্বী আর প্রতিপত্তিশালী প্রকাশকেরা তৃতীয় শ্রেণীর (3rd class) পাঠ্য পুস্তককে বাজারে চালু করে দিতে অদ্বিতীয়। ফলে গরীব অধ্যাপক বা শিক্ষকেরা প্রথম শ্রেণীর (1st class) পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে সমর্থ হ'লেও প্রকাশ করতে বা উহা বাজারে চালু করতে অসমর্থ। এটাই হচ্ছে পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের এখন মুল সমস্যা।

বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষ পাঠ্য পুস্তক প্রকাশে যে সমস্ত ত্রুটি ধরা পড়েছে তা খুবই মর্মান্তিক। শিশু সাহিত্যের সংখ্যা এদেশে নগণ্য। শিশুদের প্রাথমিক পুস্তকগুলি (Primer) নানা ত্রুটিপুর্ণ। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিশুদের জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি বা শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভেবে যদি পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে হয় তা হলে সরকার, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, স্থানীয় সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে এক যোগে বা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে এ কার্যে ব্রতী হ'তে হবে। পাঠ্য পুস্তক রচনায় লেখকদের স্বাধীনতা মোটেই খর্ব করা চলবে না বরং তাদের যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। পুস্তক অনুমোদনের পুর্বে টাইপ করা পাণ্ডুলিপি উপযুক্ত সংস্থার কাছে দাখিল করতে হবে। লেখকদের উপযুক্ত রয়ালটি (Royalty) দিয়ে বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা স্থানীয়

সংস্থাকে পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে পাঠ্য পুস্তকগুলিকে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে (First class standard) উন্নীত করবার জন্ম।

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন—পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের ভার সর্ব স্তরেই শিক্ষকগণের উপর থাকা বাঞ্ছনীয়। যখন বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি শিক্ষকদের এই গুরু দায়িত্বে স্বার্থের খাতিরে হস্তক্ষেপ করতে আসেন তখনই সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া 'বদলী পাঠ্য পুস্তক' নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকেরা যে মারাত্মক পন্থা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে ছাত্র সমাজের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে।

শিক্ষা নির্দেশনা

বহুমুখী শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা—বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। পূর্বে মহাবিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয় নির্বাচন করতে হোত। এখন অষ্টম শ্রেণীর পর নবম শ্রেণীতে উঠেই শিক্ষাধারা নির্বাচন করতে হচ্ছে। এই বয়সে শিক্ষার্থীর মনোভাব ও কর্ম প্রবণতা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। তা ছাড়া একবার একটি শিক্ষাধারা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী যদি বিফলকাম হয় তবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই বিষয় নির্বাচন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বৃত্তি বা পেশা নির্বাচনে সহায়তা করবে। শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক ও পারিবারিক অবস্থার কথা বিশেষ ভাবে বিচার করতে হয় তার ভবিষ্যৎ শিক্ষার কথা ভেবে। এ জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা-নির্দেশনা বিভাগ খোলা হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের প্রভাব শিক্ষা নির্দেশনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ম্লান করে দিচ্ছে।

শিক্ষা নির্দেশনার মূল সমস্যা কি?

শিক্ষা নির্দেশনা—বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষ ভাবে প্রসারিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সব ছেলেমেয়ের বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, কর্মপ্রবণতা বা কর্মের প্রতি আগ্রহ এক নয়। সামাজিক পরিবেশ, পরিবারের আর্থিক ক্ষমতা, পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সব মিলিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষার বিষয় পরিকল্পনা করতে হয়। বয়ঃসন্ধিকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে নূতন জীবনের স্বপ্ন নানা ভাব-কল্পনা ও কর্মের মধ্যে রূপ লাভ করে। এই সময় সৃজনী-ক্ষমতা, কল্পনা-প্রবণতা ও সমস্যা-সমাধান ক্ষমতার পূর্ণতম বিকাশ ঘটে। মানসিক ক্ষমতা এই সময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে কিশোর-কিশোরী জাগতিক ঘটনাকে বিচার করতে চায়। এই সময় আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষাসম্পর্কে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা

বয়ঃসন্ধির এই বহুমুখী চাহিদা মেটাবার জন্য সর্বার্থসাধক (Multipurpose) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকলেই এক জাতীয় পাঠ্যসূচী অনুসরণ করবে। নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'লে প্রচলিত সাতটি ধারা থেকে একটি ধারা বেছে নিতে হবে ; অবশ্য কোন বিদ্যালয়ের পক্ষে সাতটি ধারা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জীবনের কোন্ দিকের প্রতি ঝোঁক আছে এ বিষয়টি জানবার জন্য Interest inventary প্রস্তুত করা হয়েছে। আর কোন ছেলেমেয়েকে তার উপযুক্ত কোন শিক্ষার ধারা (Stream) নির্বাচনে সহায়তা করবার জন্য Guidance schedule প্রস্তুত করা হয়েছে। স্কুলে যিনি শিক্ষা সম্পর্কে নির্দেশনা (Educational Guidance) দিয়ে থাকেন তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত ভাবে পরীক্ষা করেন এবং Cumulative record card থেকে কিছু তথ্য নিয়ে এবং শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা জানবার জন্য যে অভীক্ষাগুলি প্রযুক্ত হয়েছে তার ফলাফল একত্র করে Guidance Schedule বা নির্দেশনাপত্র প্রস্তুত করেন। অবশ্য প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবকেরা এখনও তাঁদের ক্ষমতা নিয়ে বসে আছেন। Career Master প্রশিক্ষণ মাফিক Schedule প্রস্তুত করেন কিন্তু প্রয়োজনের সময় ইহা ব্যবহার করা হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকের ইচ্ছার মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষা সম্পর্কে এই নির্দেশনা একটা নূতন কিছু নয়। পূর্বে শিক্ষক ও অভিভাবকেরা মিলে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ঠিক করতেন। তখন বৃত্তি নির্বাচনে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা ও তার অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্যের উপর নজর দেওয়া হোত কিন্তু শিক্ষার্থীর আগ্রহ, কর্মপ্রবণতা এবং জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির কোন মূল্যই দেওয়া হোত না। পিতার যে বৃত্তি ছিল পুত্রকেও সেই বৃত্তি গ্রহণে নির্দেশ দেওয়া হোত। যে ডাক্তার হতে যাচ্ছে কারও হাত কেটে গেলে সেই রক্তপাত দেখে যদি সে মূর্ছা যায় ; যে উকিল হতে যাচ্ছে সে যদি গুছিয়ে কথা বলতে না পারে ; তবে ভবিষ্যৎ বৃত্তিতে তারা কিরূপ যোগ্যতা দেখাবে তা বেশ অনুমান করা যায়। বর্তমানে শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন, কৃষি, চিকিৎসা-বিজ্ঞান (পশুচিকিৎসা-সহ), হাঁস-মুরগী, পালন, শাকশব্জীর চাষ, দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি যে কোন কাজে হাজার রকমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। Job analysis এবং Job description থেকে এত বিভিন্ন রকম কাজের পরিচয় পাওয়া যায় যে সময় মত উপযুক্ত নির্দেশনা না পেলে অনেক শিক্ষার্থীর জীবনের সম্ভাবনা পূর্ণতর রূপ পায় না।

শিক্ষা নির্দেশনা

বৃত্তি নির্বাচনমূলক নির্দেশনাকে বলা হয় Vocational Guidance। আর শিক্ষাবিষয়ে নির্দেশনাকে বলা হয় Educational Guidance। অবশ্য

দুই প্রকার নির্দেশনা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনা বেশী কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা-সম্পর্কিত নির্দেশনায় বড় রকম ভুল হলে জীবনে তা সংশোধন করা খুব শক্ত। কাজেই নির্দেশনা-শিক্ষককে (Career Master) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা রাখতে হবে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, অভিভাবকের আর্থিক ক্ষমতা এবং শিক্ষার্থীর রুচি ও আগ্রহের প্রতি নজর রেখে শিক্ষা সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে হবে।

বৃত্তি নির্বাচনমূলক নির্দেশনা এবং শিক্ষা বিষয়ে নির্দেশনা

বৃত্তি নির্বাচনমূলক নির্দেশনা দেবার জন্য প্রত্যেক শিল্প-বাণিজ্য ও যানবাহন সংস্থার সাথে এবং কর্ম বিনিয়োগ (Employment Exchange) এর সাথে নির্দেশনা কেন্দ্র সংযুক্ত থাকলে ভাল হয়। Career Master বৃত্তি নির্বাচনমূলক নির্দেশনা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হবেন, তবে তাঁর পক্ষে *Job analysis* বা Job description জানা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক রাজ্য সরকার একটি করে Educational & Psychological Bureau স্থাপন করেছেন, আর Employment Exchange-এ একটি Vocational Guidance & Counselling বিভাগ খুলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার Educational & Vocational Guidance & Counselling সম্পর্কে Research কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। Director of Employment & Traning-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে Guidance & Counselling বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। এ বিষয়ে গবেষণা কার্য সবে সুরু হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি Guidance& Counselling বিভাগ ছাড়া শিক্ষা বা কর্ম-নিয়োগ বিভাগ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে পারে না, ভারতবর্ষেও শিল্পোন্নতির সাথে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

বৃত্তিনির্দেশনা ও শিক্ষা নির্দেশনায় সরকার

শিক্ষা-নির্দেশনা ও পরামর্শদান--নির্দেশনা (Guidance) এবং পরামর্শ দেওয়া (Counselling) এ দুটি' প্রক্রিয়াকে অনেকে একই পর্যায়ভুক্ত করে থাকেন। দু'টি কাজের উদ্দেশ্য একই। কিন্তু দু'টি কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এক নয়। বর্তমানে বৃত্তি-নির্বাচন তথা জীবিকা অর্জনের প্রশ্নটি খুবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কারণ জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিকই তার মানসিক ক্ষমতা, কর্মের প্রবণতা, আর্থিক সামর্থ্য এবং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীকে আশ্রয় করে বৃত্তি নির্বাচন তথা জীবিকা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে আগ্রহশীল। শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, কার্যের প্রতি আগ্রহ, বিশেষ কোন কর্মের প্রবণতা, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ও আর্থিক অবস্থা বিচার করে শিক্ষা-সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া হয় স্কুল ও কলেজ জীবনে। এই নির্দেশনা তিনটি স্তরে দেওয়া হয়ে থাকে—

প্রথম স্তর ঃ উচ্চ বুনিয়াদী ও জুনিয়র স্কুলের শিক্ষার পর শিক্ষার্থীর বিশেষ মানসিক ক্ষমতা (Special abilities) ও প্রবণতা (Aptitude) দেখে কোন্ ধারা (Stream) তার উপযুক্ত হবে সেরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়।

শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশনার তিনটি স্তর

এই স্তরে প্রয়োজন বোধে বৃত্তি নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে; তবে সাধারণ ক্ষেত্রে এই স্তরে বৃত্তি নির্দেশনা (Vocational guidance) বৈজ্ঞানিক হবে না। যে কোন বৃত্তিকে একটু বিস্তৃত এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। যেমন বয়ন শিল্পের অনুরাগ দেখে বয়ন শিল্পে প্রশিক্ষণের জন্য নির্দেশনা দিলেও শিক্ষার্থী রেশম, পাট, তুলা বা অন্য কোন বিশেষ শিল্পে যাবে কিনা সেরূপ নির্দেশ আরও ২।৩ বৎসর পর দেওয়া হবে। এই স্তরের নির্দেশনা মূলতঃ শিক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনা (Educational guidance)।

দ্বিতীয় স্তর ঃ একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে Guidance Corner এবং Guidance Bureau থেকে সংগৃহীত নানা প্রকার তথ্য শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করতে হবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পাঠ্য বিষয় (Future Study) নির্বাচন করার জন্য এবং ঐ জাতীয় শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ লাভের পরে কিরূপ বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ কতটুকু এবং ঐরূপ কাজ পাবার পর ভবিষ্যতে তার কতটুকু উন্নতি হ'তে পারে ইত্যাদি বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপার বিস্তৃত ভাবে শিক্ষার্থীর কাছে পরিবেশন করতে হবে।

তৃতীয় স্তর ঃ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা (Mental ability), আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রস্তুতে শিক্ষা-নির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তবে এই সময় শতকরা ৮০% জন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বৃত্তি-নির্দেশনার (Vocational guidance) বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

পরামর্শদান (Counseling) একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মধারা। উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তর থেকে এই কর্মধারা আরম্ভ করতে হয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষাসম্পর্কিত অসুবিধা দূরীকরণের পরামর্শ দেওয়া হয় ব্যক্তিগত ভাবে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পরামর্শদানের ব্যবস্থা করা হয়।

পরামর্শদান

পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করার পূর্বে (Cumulative record card) বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার অবস্থা বিবেচনা ও কর্মপ্রবণতার পরিচয় নিতে হয়। আর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তার ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। সারা বৎসর ধরেই পরামর্শ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষা বিষয়ে যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, তার কি করণীয় তা ঠিক করতে পারে না, তখনই পরামর্শদাতা

(Counseller) এগিয়ে আসেন। কিন্তু নির্দেশনা (Guidance) দিতে হয় প্রতিটি স্তরে, এমন কি সমস্ত শিক্ষাজীবন ধরে।

নির্দেশনা চক্র—নির্দেশনা-চক্র (Guidance Corner) শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনার একটি শক্তিশালী অঙ্গ। জীবনের কোনো বিশেষ দিকের প্রতি আগ্রহ জন্মানো এই নির্দেশনা-চক্র সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের যে স্থানটি সহজেই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন স্থান বেছে নিয়ে নির্দেশনা-চক্র স্থাপন করতে হবে। নির্দেশনা-শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-প্রতিনিধিদের সহায়তায় এই চক্রটি গড়ে তুলবে। এই চক্রটিকে একটি প্রদর্শনী বলে ভুল করলে চলবে না; যদিও এই চক্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষণীয় বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা। এতে নানা প্রকার চার্ট, মডেল, পরিসংখ্যান, চিত্র, সংবাদপত্রের ও নানাপ্রকার পত্রিকার প্রয়োজনীয় অংশ, ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে সুন্দর ভাবে সাজান থাকবে। যে সমস্ত বিষয়ের আবেদন চলে গেছে বা যে-সমস্ত তথ্যের তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সেগুলি সরিয়ে ফেলে সময় উপযোগী বিষয় ঐ স্থলে সংযোজন করা যেতে পারে।

নির্দেশনা চক্র

নির্দেশনা-চক্রের বিষয়গুলি সঞ্চয়ন করার দায়িত্ব শিক্ষক ও ছাত্রদের সম ভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ চক্রের একজন সম্পাদক থাকবেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় হবেন সভাপতি। এই চক্র স্থাপনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুরূপ অর্থ বরাদ্দ করবেন; নির্দেশনা-শিক্ষকই হবেন এই চক্রের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাঁকে সাধারণ কর্মতালিকা (Routine) থেকে তাঁর কিছু কাজের চাপ কমিয়ে দিতে হবে সংগঠনের জন্য। প্রতি সপ্তাহেই নূতন নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করতে হবে। প্রয়োজন স্থলে পুরাতন জিনিস দু'তিন মাস পর আবার এই চক্রে স্থাপন করা যায়। পুস্তক, পত্রিকা, সংবাদপত্রের বিশেষ অংশ, চার্ট, মডেল, ছবি এবং নানা প্রকার রেখাচিত্র সহজেই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রয়োজন হ'লে সপ্তাহে দু'একটি শিক্ষা-নির্দেশনা বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করতে হবে। জল খাবারের ঘণ্টার সময় নির্দেশনা-শিক্ষক বিষয়গুলির প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।

নির্দেশনা চক্রের সংগঠন

কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মান, কোন অপরিচিত বৃত্তি বা বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ জন্মান ইত্যাদি হচ্ছে নির্দেশনা-চক্র স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনার সাথে বৃত্তি বিষয়ক নির্দেশনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেইজন্য নির্দেশনা চক্রে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ-শিক্ষা-পরিকল্পনা তথা বৃত্তি নির্বাচনের সাহায্যকারী সংবাদ পরিবেশন করা হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,

নির্দেশনা চক্র সংগঠনের উদ্দেশ্য

কর্ম প্রতিষ্ঠান, চেম্বার অফ্ কমার্স, সরকারের প্রচার বিভাগ, গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভের জন্ত প্রধান শিক্ষক এবং নির্দেশন শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নানা জাতীয় বিষয় সংগ্রহ করে নির্দেশনা চক্রের সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন। সম্পাদক উপযুক্ত স্থানে সময় মত উহা নির্দেশনা-চক্রে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করবেন।

শিক্ষা নির্দেশনায় ধারাবাহিক প্রগতি পত্রের ব্যবহার—সাধারণ বিস্তালয় থেকে যে প্রগতি পত্র (Progressive Report) পূর্বে পাঠান হোত সেগুলি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারতো না। অধীত বিস্তার ফলাফল থেকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছু পরিচয় পাওয়া যেত। বর্তমানে শিক্ষাকে জীবনের সাথে এক করে দেখা হয়েছে। সেজন্ত শিক্ষার্থীর শারীরিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের বিস্তৃত পরিচয় পাবার জন্ত ধারাবাহিক সর্বাত্মক মন্তব্য লিপি (Cumulative Record Card) প্রবর্তিত হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রগতি পত্র সহজেই প্রস্তুত করা যেত কিন্তু সর্বাত্মক মন্তব্য লিপি প্রস্তুত একটি দুরূহ কাজ। এতে যে কোন শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারাবাহিক চিত্র পরিস্ফুট হওয়া চাই এবং ইহা প্রস্তুত করবার জন্ত বিষয়-শিক্ষক, শ্রেণী-শিক্ষক, খেলা-শিক্ষক, সহ-পাঠক্রমিক কার্য-পরিচালক, বিস্তালয়ের ডাক্তার ও প্রধান শিক্ষকের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। একে বৈজ্ঞানিক পরিমাপ পত্র হিসেবে ব্যবহার করবার জন্ত ইহা প্রস্তুতের জন্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ (Training) চাই, আর সর্বোপরি চাই শিশুদের প্রতি ভালবাসা এবং নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয়দের পূর্ণ সচেতনতা। এই সর্বাত্মক মন্তব্য লিপি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের চিত্র-রূপ হলে নির্দেশনা-শিক্ষক এই মন্তব্য লিপি থেকে শিক্ষার্থী সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। **সর্বাত্মক মন্তব্য লিপি মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত।** প্রথম অংশে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও কৌশল অর্জন সম্পর্কে ধারাবাহিক পরিসংখ্যান দেওয়া থাকে। পরিসংখ্যানের যাথার্থ্যতার উপর নির্ভর করে নির্দেশনা-শিক্ষক কিছুটা অগ্রসর হ'তে পারেন। দ্বিতীয় অংশে শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশ ও সহ-পাঠক্রমিক কার্য কলাপে যোগদানের পরিচয় রয়েছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোতে হ'লে শরীর-চর্চা ও খেলাধূলা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী নানা প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যে যোগদানের সম্পূর্ণ সুযোগ। এই অংশে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও বিশেষ কর্ম ক্ষমতা (Special abilities) বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। সহ-পাঠক্রমিক কার্যের প্রবণতা থেকে ভবিষ্যতের শিক্ষা-সম্পর্কিত নির্দেশ এমন কি বৃত্তি-সম্পর্কিত নির্দেশ দেওয়া যেতে

প্রগতিপত্রের প্রস্তুতি পর্ব

ধারাবাহিক সর্বাত্মক মন্তব্যলিপির বিশ্লেষণ

পারে। তৃতীয় অংশে থাকে শিক্ষার্থীর সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশের পরিচয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের বিকাশ ধারা রেটিং (Rating) করে মন্তব্য লিপিতে তোলা হয়। রেটিং এর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ (Training) প্রয়োজন। রেটিং-কে নৈর্ব্যক্তিক করতে হ'লে একই শ্রেণীর একই বিষয়ের রেটিং-এর দায়িত্ব কম পক্ষে তিন জন শিক্ষককে দিতে হয়।

শিক্ষা-সম্পর্কিত নির্দেশনা দেবার ব্যাপারে এই সর্বাত্মক মন্তব্য লিপির উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা যায় না। এর জন্য নির্দেশনা পত্র (Guidance schedule) প্রস্তুত করে নিতে হয়। নির্দেশনা পত্র প্রস্তুতের কাজে সর্বাত্মক মন্তব্য লিপি বিশেষ সহায়ক। নির্দেশনা পত্রও সব সময় নির্ভরযোগ্য নয় কারণ নূতন পরিবেশে অথবা হঠাৎ আর্থিক বিপর্যয়ে শিক্ষার্থী ইঙ্গিত পথে অগ্রসর হোতে পারে না। ভবিষ্যৎ শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সময় শিক্ষার্থীর আর্থিক সঙ্গতি ও পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষা-সম্পর্কিত নির্দেশনা ও বৃত্তি-সম্পর্কিত নির্দেশনায় সর্বাত্মক মন্তব্য লিপি একটি মূল্যবান তথ্যের কাজ করে।

নির্দেশনা-পত্রের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা পরিমাপন

পরীক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি—শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার যে বিরাট প্রভাব তার পেছনে আছে জ্ঞান অর্জন বা কৌশল শিক্ষা অপেক্ষা ডিগ্রীর মোহ। সমাজব্যবস্থা এমন যে সেখানে বিদ্যার দাম ডিগ্রীর চাইতে কম। ডিগ্রীর মোহ অর্থাৎ পাশ করবার প্রেরণা থেকে আসে পরীক্ষা-প্রস্তুতি। বর্তমানে রচনাধর্মী পরীক্ষা প্রচলিত থাকায় পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নিয়ে প্রয়োজন স্থলে উহা কণ্ঠস্থ করে যদি পরীক্ষা-গৃহে যাওয়া যায়, তবে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। শিক্ষা পদ্ধতিও এখন পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত। শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষা গতানুগতিক পদ্ধতিতে চলছে বলে শিক্ষক মহাশয়েরা বি. টি. পরীক্ষা নোট পড়ে পাশ করছেন। শতকরা ৯০ জন শিক্ষকের মূল পাঠ্য পুস্তকের সাথে সম্পর্ক খুবই সীমাবদ্ধ। এই যদি শিক্ষক-শিক্ষণের অবস্থা হয়, তবে তাদের পরিচালনায় বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক ও অন্যান্য পরীক্ষার জন্য ছাত্রেরা যে নোট পড়ে পাঠ তৈরী করবে এতে আর আশ্চর্য কি?

শিক্ষা-ব্যবস্থায় ডিগ্রীর মোহ

এখন আমাদের দেখা প্রয়োজন ছাত্র ও শিক্ষক মহলে এই হুবহু মুখস্থ (rote learning) করার প্রবৃত্তি কেন? কেন গুটিকতক সম্ভাব্য প্রশ্ন বেছে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছেন যে, যে সময়ের জন্য যে পরিমাণ পাঠ্য বস্তু আয়ত্ত করার কথা

তা শিক্ষার্থীর ক্ষমতার বাইরে। তা ছাড়া পরীক্ষার উত্তর পত্র দেখবার সময় উত্তরের বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ মূল্য না দিয়ে উত্তরের পরিমাণ ও সংখ্যার উপর জোর দেওয়া হয় পাশ করাবার জন্য। শিক্ষার্থীর কাছে সময় এত কম থাকে যে উপযুক্ত নির্দেশনা না থাকলে পাঠ্য বিষয় ঐ সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করা শক্ত। তা ছাড়া প্রশ্নপত্র করবার সময় কতকগুলি বাধাধরা প্রশ্নের উপর জোর দেওয়া হয়। যত দিন পর্যন্ত পাশের মোহ থাকবে, প্রশ্নপত্রে টাইপ (type) প্রশ্নের সংখ্যা থাকবে নোট পড়ে পাশ করার সীমানার মধ্যে এবং দু'বৎসর পর একটি মাত্র রচনাধর্মী শেষ পরীক্ষার ফলাফলের উপর শিক্ষার্থীর ভাগ্য নির্ণীত হবে ততদিন এ ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন অসম্ভব।

তোতাপাখি-মুখস্থের প্রয়োজনীয়তা কি ?

একটি শেষ পরীক্ষার উপর ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা প্রাপ্তি নির্ভর করে বলে শেষ পরীক্ষার উপর যথেষ্ট মূল্য দেওয়া হয়। এই পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীর মনের উপর খুব চাপ দেয়। পরীক্ষার ২।৩ মাস পূর্বে অহোরাত্র সংকীর্তনের পর কোন রকমে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তারা পরীক্ষা-গৃহে উপস্থিত হয়। দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর এ পরীক্ষার চাপ কম নহে। এই সব কারণে দিন দিন অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টাও বেশী হচ্ছে।

শেষ পরীক্ষার মূল্যায়ন

তা ছাড়া বড় বড় সহরে কোচিং ক্লাস জাতীয় Teaching shop-গুলি সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র তৈরী করে অদ্ভুত ভাবে পরীক্ষার বাজার দখল করে বসে। পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব থেকেই খুব আশাপ্রদ সম্ভাব্য প্রশ্নপত্রের জন্য শিক্ষার্থীর উৎসুক হয়ে বসে থাকে। এখন পরীক্ষা ক্ষেত্রে সমূহ অরাজকতা দেখা দিয়েছে। ছাত্রেরা না বুঝে ৭০%টি প্রশ্নের উত্তর দেয়। পরীক্ষকেরা স্বল্প সময়ে প্রচুর খাতা দেখেন। অনেক ক্ষেত্রে বহু পরীক্ষক ছাত্রছাত্রীদের ঢালাও ভাবে পাশের নম্বর দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চান। এতে উত্তর পত্রের যথাযথ বিচার সম্ভব নয়। এ ব্যবস্থায় ভাল ছেলেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সাধারণ ছেলেদের হয় বেশী সুবিধে। শিক্ষার মান নেমে যাবার এও একটা বড় কারণ। আমরা লক্ষ্য করেছি বর্তমানে পরীক্ষা ব্যবস্থাই সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পরীক্ষকের ব্যক্তিকতা দোষে দুষ্ট। কাজেই অনুরূপ কোন পরীক্ষার ফলাফলের সহিত উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের তুলনা সম্ভব নয়, পরীক্ষার জ্ঞানের যে পরিমাপ করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করা যায় না। এই ব্যবস্থায় পরীক্ষা করতে প্রচুর সময় লাগে এবং অর্থের অপব্যয় হয়। পরীক্ষার্থীদের ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া সত্বেও সময়ের অভাবে তারা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি খুব স্পষ্ট না হওয়াতে পরীক্ষক কি চান, উত্তর কতটুকু হবে তার কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না। নম্বর দেওয়া বিষয়ে সব পরীক্ষক একই

শিক্ষার মান নিম্নগামী

নীতি অবলম্বন করেন না, ফলে একই খাতা বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষা করলে নম্বরের বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি আগ্রহ জন্মে কিন্তু সত্যকার জ্ঞান লাভ বা কৌশল এতে আয়ত্ত হয় না, কারণ পরীক্ষায় পাশের পর ডিগ্রী পেয়ে শিক্ষার্থীরা আর জ্ঞানের অনুশীলন করে না, নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরে কিছুই ছেলেমেয়েরা জানে না বা জানবার প্রয়োজনও বোধ করে না। এই জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে পরীক্ষার প্রতি ভীতি, ঘৃণা এবং অহেতুক গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন অপেক্ষা পরীক্ষার মূল্য বেশী দিয়ে থাকে। প্রায় সমস্ত পরীক্ষাগুলি রচনাধর্মী।

গতানুগতিক পরীক্ষার প্রধান প্রধান ত্রুটি

রচনাধর্মী পরীক্ষার নিম্নলিখিত গুরুতর ত্রুটিগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। যাথার্থ্যের অভাব
২। নির্ভরযোগ্যতার অভাব
৩। প্রয়োগশীলতার অভাব
৪। সংব্যাখান ও তুলনীয়তার অভাব
৫। পরিমিততার অভাব।

এই ত্রুটিগুলির জন্য রচনাধর্মী পরীক্ষা বেশী মাত্রায় ব্যক্তিকতা দোষদুষ্ট। এই সব পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিকতার একান্ত অভাব এবং এতে পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষা পত্রগুলির বিচার নানাবিধ ত্রুটিপূর্ণ। বর্তমানে প্রচলিত বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষাকে কোন মতেই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

এই সাধারণী পরীক্ষাগুলি (Public Examinations) সাধারণতঃ সরকারী কর্তৃপক্ষ, স্কুলবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ ও বিশ্ববিদ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া চাকুরীতে নিয়োগ, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ও এই রূপ কতকগুলি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত পরীক্ষার কতকগুলি প্রবেশিকা পরীক্ষা আর কতকগুলি ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভের পরীক্ষা। জন সাধারণ মনে করেন যে এই শেষ পরীক্ষায় এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাতে শিক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সত্যকার পরিমাপ করা সম্ভব হয় কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এই পরীক্ষাকে শতকরা ৩০% ভাগ নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা চলে না। কারণ এই সব পরীক্ষায় chance factor, অর্থাৎ যাকে সাধারণ লোকে, ভাগ্যলিপি বলে তার প্রভাব অনেক বেশী। সাধারণী পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি এই যে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাটি পরীক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সাধারণী পরীক্ষার ত্রুটি

ভারত সরকার শাসন কার্যে লোক নিয়োগের জন্য যে সমস্ত সাধারণী পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন সেগুলির মান বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছিল কিন্তু দেখা গেল

যে সমস্ত স্তরের পরীক্ষার্থীর মান এত নেমে গেছে যে সাধারণ পরীক্ষার মান বাড়িয়ে বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। কলেজীয় শিক্ষার মান যে খুবই নিম্নগামী সে কথা ইউনিভারসিটি গ্রাণ্ট্ কমিশন স্বীকার করেছেন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের উন্নতির জন্য সুদীর্ঘ সুপারিশ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। মুদালিয়র কমিশন ও রাধাকৃষ্ণন কমিশন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য পঠন-পাঠনকে যেমন দায়ী করেছেন তেমনি পরীক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন কিছুর ধারণা করা, কৌশল আয়ত্ত করা, চিন্তা করা, অনুভব করা এবং ভাব প্রকাশ করার সুযোগ যে নেই তা বলতে চাই না। তবে একথা জোর করে বলব যে পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্য-সূচীর আয়তন এত বেশী এবং স্কুলে ও কলেজে পরীক্ষার চাপ এত বেশী যে তৈরী প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া শিক্ষার্থীর আর কোন সুযোগ থাকে না। অনেকে পাঠ্য বস্তু ভাল ভাবে শিখতে চান এবং অনেক শিক্ষক মানসিক শক্তির সামগ্রিক বিকাশের প্রতি জোর দিতে চান কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে বিশেষ কিছুই করতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার মূল্য অপেক্ষা ডিগ্রীর বাজার দর অনেক বেশী। এতদিন বি এ., এম এ. ইত্যাদি ডিগ্রীর দাম ছিল, সম্প্রতি বি. ই., এম বি. বি. এস., এম. এস. সি., এম. এস্. সি. (টেক্.) ও নানাবিধ কারিগরী বিদ্যার ডিগ্রী ও সার্টিফিকেটের বাজার দর বেশী। পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করবে এতে আর আশ্চর্য কি? তবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, পরীক্ষার যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য প্রচলিত পরীক্ষায় সিদ্ধ হলে অবস্থা এত শোচনীয় হোত না। পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গ্রাস করতে চলেছে। তাই একমাত্র মুখস্থ ক্ষমতার জোরে ডিগ্রী-লাভ করা সম্ভব হচ্ছে। এদেশে এখনও এমন আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি মনে করে পরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীরা সব কিছু আয়ত্ত করতে পারে, একথা যে কত ভ্রান্ত তা পাশকরা ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার বা শিক্ষকদের স্বীয় কর্মের অযোগ্যতা থেকেই প্রমাণিত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে বা সংগঠনী কোন কার্যে বা সৃজনাত্মক কার্যে পাশকরা কোন বিদ্যা কাজে লাগে না। তবে ডিগ্রীর জোরে চাকুরী পাওয়া যায় এবং শিক্ষিত বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। এমন কি ডিগ্রী লাভ করে অনেক সময় শিক্ষার্থীর আত্মসন্তুষ্টি হয় তাই ডিগ্রীর মোহে পরীক্ষা কেন্দ্রে এবং পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুত কারক স্কুল-কলেজের দরজায় শিক্ষার্থীর এত ভীড়।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত

উন্নত শিক্ষা প্রক্রিয়া পরীক্ষার সহায়ক—আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়

শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে সুন্দর ভাবে পরিচালনা করবার জন্য শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা করে থাকেন। এই পাঠটীকার মধ্যে শিক্ষা-পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া থাকে। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য পাঠটীকাকে খুব সংক্ষেপে ছোট নোট বইতে লেখা হয়। অবশ্য পদ্ধতিটির কার্যকারিতা নির্ভর করে শিক্ষক পাঠ পরিচালনায় কিরূপে উপস্থাপনের স্তরটি প্রয়োগ করে থাকেন। এ জন্য সমস্ত শিক্ষক যদি শিক্ষণ শিক্ষা-গ্রহণ করতে পারেন তবে খুব ভাল হয়। অগত্যা প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সকল শিক্ষককে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাঠ পরিচালনা বিষয়টি শিখে নিতে হবে। শিক্ষা-প্রক্রিয়া একটি উন্নত শিল্পকার্য। বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর চাহিদাকে সুসংহত করতে পারলে শিক্ষাকার্য উন্নত শিল্পকলার স্তরে উন্নীত হয়। প্রধান শিক্ষক আদর্শ শিক্ষক হ'লে খুবই ভাল, অন্যথায় বিদ্যালয়ের নামকরা শিক্ষকের নেতৃত্বে শিক্ষা-প্রক্রিয়া রূপ শিল্পটি অনুধাবন করা সমীচীন। শিক্ষা-পদ্ধতিগুলির প্রত্যেকটির ভাল ও মন্দ দু'টি দিক আছে। তা ছাড়া বিশেষ বিষয়ের জন্য এবং বিশেষ বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন শিক্ষা-পদ্ধতির ভাল মন্দ নির্ণয় করবার মাপকাঠি কি হবে? আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বলেন যে শিক্ষাদান (teaching) অর্থে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সুন্দর এবং সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া বোঝাবে না। শিক্ষা-প্রক্রিয়া সমাধা হয়ে যাবার পর দেখতে হবে শিক্ষার্থী কত সহজে ও সুন্দর ভাবে বিষয়টি আয়ত্ত করেছে বা কৌশলটি অভ্যাস করতে সমর্থ হয়েছে। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলাফল থেকেই শিক্ষা-পদ্ধতির গুণাগুণ বিবেচিত হবে। এ ছাড়া পাঠ-পরিকল্পনা, পাঠের উপস্থাপন, শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, হাতে কলমে শিক্ষা, পাঠাগার ও সংগ্রহশালা ইত্যাদির ব্যবহার সব মিলিয়ে শিক্ষক যে সুন্দর শিল্পকার্য সৃষ্টি করে থাকেন তার মধ্যেই পাঠের ফলাফল নিহিত থাকে। হার্বার্ট পদ্ধতিতে শ্রেণী-শিক্ষায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা-প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রশ্ন ও উত্তরের মূল্য যাচাই করা হয় শিক্ষা-পদ্ধতির মূল্যায়নের জন্য। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদির সাধারণ জ্ঞান দেওয়া হয়। সামুদায়িক জীবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়ে থাকে এবং শিল্পকার্যের মধ্যে তার বিদ্যানুশীলনের পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

পাঠ্য পরিচালন ও পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন

অধীত বিষয়ের বিচার

আধুনিক পাঠ প্রক্রিয়ায় বিদ্যার মূল্যায়ন—গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক জ্ঞানদান করতেন। তথ্য পরিবেশন, ভাব সম্প্রসারণ, ভাব সঙ্কোচন, কৌশল প্রদর্শন ইত্যাদি ছিল শিক্ষকের করণীয়। শিক্ষার্থীর কে কতটুকু গ্রহণ

করতে পারলো বা কার কতটুকু প্রয়োজন সে কথা শিক্ষকদের তখন ভাববার অবকাশ ছিল না কারণ শিশুদের ব্যক্তিসত্তা তখন স্বীকৃত হয়নি। তাই পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলাই ছিল শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য। যে শিক্ষক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভাল ফল করাতে পারতেন তিনি খ্যাতনামা শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হতেন। যে শিক্ষক ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন, যাঁর ভাষার মাধুরী ছিল বেশী আর যিনি ভাল পড়া আদায় করতে পারতেন তিনিই ছিলেন সুশিক্ষক। বর্তমানে শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পাঠক্রম সবই পরিবর্তিত হয়েছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখন শিক্ষা পদ্ধতি শুধু শ্রেণী পঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষকের দায়িত্ব বহু বিস্তৃত। তিনি শ্রেণীকক্ষে আছেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষার্থীদের সর্ব প্রকারে সাহায্য করবার জন্য এবং গ্রন্থাগারে, সংগ্রহশালায় ওয়ার্কশপে, পরীক্ষণাগারে ও খেলার মাঠে আছেন বন্ধু এবং নির্দেশক হিসাবে। এখন শিক্ষকের প্রধান কাজ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করা। এখন শিক্ষার পরিমাপ হয় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে।

পাঠপ্রক্রিয়ার (teaching) বিচার করবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির উপর জোর দিতে হবে।

(১) পাঠের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি—পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এবং জীবন ও জগৎকে জানবার অনুসন্ধিৎসার খোরাক যোগাবার জন্য শ্রেণী কক্ষের নানাবিধ উপকরণ ও শিক্ষা-উপকরণ সংগ্রহ করে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখতে হবে। শিক্ষকের বলবার ভঙ্গী, শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার, পাঠ্য বিষয় পরিবেশন ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষা-পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

(২) প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে পাঠ পরিচালনা করে উপযুক্ত প্রশ্নের সাহায্যে পাঠকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রশ্নের ভাষা সরল, অনাড়ম্বর ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুপরিকল্পিত পাঠটীকার সহায়তায় এবং সুচিন্তিত প্রশ্নের সাহায্যে পাঠ্য বিষয় পরিবেশন করে উন্নত পর্যায়ের পাঠ খুব কম শিক্ষক দিতে পারেন।

(৩) পাঠ উপস্থাপন—পাঠপ্রক্রিয়া একটি উন্নত শিল্প-সৃষ্টি। সুশিক্ষক মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি অনুসরণ করে নানা উপায়ে ও সুকৌশলে এই শিল্প সৃষ্টি করতে অগ্রসর হবেন। শিক্ষকের বলার ভঙ্গী, বিষয়-বস্তুর জ্ঞান, বিষয়ের উপর অধিকার উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্তের ব্যবহার এখানে বিচার করতে হবে।

(৪) হাতে কলমে সাহায্য—কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় কর্ম-স্থলে, পরীক্ষণাগারে, ওয়ার্কশপে ও খেলার মাঠে যত সুনিপুণ ভাবে হাতে কলমে কাজটি করে শিক্ষার্থীকে উহা যত সহজে অভ্যস্ত করাতে পারবেন ততই তাঁর শিক্ষা-প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে।

(৫) **পাঠ-প্রক্রিয়ার পরিমাপ হবে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি কতটুকু আয়ত্ত করেছে তার উপর।** সুশিক্ষক এই কার্য বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে করতে পারেন।

প্রশ্ন প্রস্তুত পদ্ধতি—উন্নত ধরণের প্রশ্ন প্রস্তুত বিষয়াত্মক পরীক্ষার বিশেষ সহায়ক। শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে পাঠদানে এবং সম্মেলন পদ্ধতিতে বিষয় উত্থাপন ও তার আলোচনার গতি-প্রকৃতির নির্দ্ধারণে উপযুক্ত প্রশ্ন বিশেষ সহায়ক। প্রশ্ন নির্বাচন ও প্রশ্ন উত্থাপন বিষয়টি প্রশ্ন নির্মাণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কাজেই **প্রশ্ন প্রস্তুতের সময়** নিম্নলিখিত **সাবধানতা** অবলম্বন বাঞ্ছনীয় :—

(১) প্রশ্নগুলি হবে স্বনির্ভর ও নিরপেক্ষ। (২) প্রশ্ন করবার সময় কোন কৌশল বা চাতুরীর আশ্রয় লওয়া সঙ্গত নয়। (৩) প্রশ্নের ভাষা সরল সহজবোধ্য এবং বিষয়ের প্রতি লক্ষ্যযুক্ত হওয়া উচিত। (৪) সাধারণ বিষয়গুলি দিয়ে প্রশ্ন পত্রকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। (৫) একই ধরণের বাধাধরা প্রশ্নগুলি (type questions) যত দূর সম্ভব ব্যবহার না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (৬) প্রশ্নের অর্থের জটিলতা ও দ্ব্যর্থক ভাব সর্বদা পরিত্যজ্য। (৭) প্রশ্নের বিষয়গুলি ব্যাপক হবে। (৮) একই প্রশ্নপত্রে পরস্পর নির্ভরশীল প্রশ্ন করা ঠিক নয়।

শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপ—আমাদের জানতে হবে স্কুল জীবনে শিক্ষার্থীর কোন্ কোন্ বিষয় কি উদ্দেশ্যে পরিমাপ করতে চাই। তা হ'লে সহজেই সেই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলবে। **শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ হয় পাঁচটি ধারায়,** অতএব পাঁচটি বিষয়ের পরিমাপ করা বিশেষ প্রয়োজন।

শারীরিক বিকাশ পরিমাপ করবার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রয়োজন। এ সময় খেলাধুলা, কাজকর্ম ও নানা প্রকার দৈহিক ক্ষমতার পরিচয় জ্ঞাপক কৌশলাদি শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করে। এগুলি শারীরিক বিকাশের পরিমাপের সুযোগ দেবে। দেহ সঞ্চালন, দৈহিক কর্মের ক্ষমতা, ক্রীড়া-কৌশল, খেলা-ধুলার যোগ্যতা ইত্যাদি খেলাধুলা শিক্ষক, ব্যায়াম শিক্ষক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রগতি পত্রে রেকর্ড করবেন। রেটিং ব্যবস্থা এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। এতকাল মানসিক ক্ষমতার বিচার করা হোত রচনাধর্মী পরীক্ষার মাধ্যমে। এখন রচনাধর্মী পরীক্ষার সাথে বিষয়ধর্মী অভীক্ষার (Objective tests) ব্যবহার করতে হবে। রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরগুলিকে স্ট্যাণ্ডার্ড স্কোর (Standard Score)-এ পর্যবসিত করে প্রগতি পত্রে রেকর্ড করতে হবে। তা হ'লে অঙ্কের নম্বর আর ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের নম্বরের বিরাট পার্থক্য থাকবে না। তা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখার (Stream) জন্য

শিক্ষার্থীদের নির্বাচনের সময় বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test) প্রয়োগ, ইণ্টারেষ্ট ইনভেণ্টি, (Interest inventry), অ্যাপটিটিউড টেস্ট (Aptitude test), ব্যক্তিত্ব-বিচারের অভীক্ষা (Personality test) ইত্যাদি প্রয়োগ করে গাইডেন্স সিডিউল (Guidance Schedule) তৈয়ার করতে হয়।

বিকাশের পরিমাপন

রেটিং সিসটেমে (Rating System) শিক্ষার্থীর সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ ও সংগঠনের যোগ্যতা বিচার করা হয়। শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশ নানাবিধ কাজ, উৎসব বা পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে রেটিং সিসটেমে বিচার করার রীতি গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া রচনাধর্মী পরীক্ষা ও বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য **নিম্নলিখিত চারটি পর্যায়ে** অনেক বিদ্যালয়ে **পরীক্ষা গৃহীত** হয়ে থাকে।

১ম পর্যায়—শ্রেণী কক্ষে পাঠ দেবার পর পুনরালোচনা করবার সময় শিক্ষক ছোট ছোট মৌখিক প্রশ্ন করে ছাত্রেরা বিষয়টি কতটুকু আয়ত্ত করেছে তা বুঝতে পারেন। বিষয়-শিক্ষক ছাত্রের সাপ্তাহিক বা মাসিক প্রগতির হিসাব রাখেন।

২য় পর্যায়—মাসিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষার বিষয়গুলি শ্রেণী কক্ষের আলোচনার উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করতে হবে এবং বার্ষিক নম্বরের ২৫% অংশ আসবে এই সব পরীক্ষা থেকে। এতে সারা বৎসর ফাঁকি দিয়ে শুধু বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফল করে উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। পরীক্ষাগুলি শ্রেণী কক্ষে পাঠদান কালেই লওয়া হবে, এর জন্য অহোরাত্র জেগে পরীক্ষা প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। এই সব পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে যে দিন পরীক্ষা হবে সেই দিন। এই ব্যবস্থা চালু হ'লে শিক্ষার্থীরা প্রতিদিনের অধীত বিদ্যার পুনরালোচনা করে রাখবে।

৩য় পর্যায়—বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর মোট নম্বরের ৫০% আর সারা বৎসরের কাজ ও পরীক্ষার নম্বর হবে ৫০%; এতে বার্ষিক পরীক্ষার ভীতিও কমবে আর শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের সঠিক পরিচয়ও অনেকটা পাওয়া যাবে।

৪র্থ পর্যায়—বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ৬০% নম্বর এবং বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ৪০% বণ্টন করলে বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার উপর অযথা গুরুত্ব দেওয়া হবে না। শিক্ষা সমাপ্তিতে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত বোর্ডের সম্মুখে শিক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষা (Vivavoci) দিতে হবে। এই সমস্ত নম্বরের রেকর্ড থাকবে প্রগতি পত্রে ব্যাঙ্কের লেজারের (Ledger a/c) হিসাবের মত। প্রগতি পত্র দেখে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয়ের মাত্রা—ভারতীয় শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা

করলে দেখা যায় যে বিদেশী সরকারের দ্বারা শিক্ষার কাঠামো পাশ্চাত্য ধরনে গড়ে তোলায় এদেশে শিক্ষার অপচয় হয়েছে প্রচুর। একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে শতকরা ৪০ জন শিক্ষার্থী ২।৩ বৎসর অধ্যয়ন করে। এর চাইতে মারাত্মক অপচয় হলো বাস্তব জীবনে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ব্যবহারের অনুপযোগিতা। এই অব্যবহার্য জ্ঞান অন্বেষণ ও কৌশল আয়ত্ত করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর যে অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপচয় হয় তা জাতীয় অপচয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

শিক্ষার অপচয়—জাতীয় অপচয়

পাঠশালায় যে সব ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয় তাদের শতকরা ২৫ জন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেয়। কৃষকেরা ও পল্লীর কারুশিল্পীরা ছেলেদের ২।৩ বৎসর পর স্কুল ছাড়িয়ে নিজেদের জাত ব্যবসায়ে লাগিয়ে দেয়। ফলে চর্চার অভাবে পাঠশালার ৭৫% জন শিক্ষার্থী পুনরায় নিরক্ষরের পর্যায়ে পড়ে। পাঠশালার শিক্ষা-ব্যবস্থা এত অনুন্নত যে ২০% জন ছেলেমেয়ে ২।৩ বৎসর একই শ্রেণীতে থেকে যায়। তা ছাড়া জীবনের সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন যোগাযোগ না থাকাতে মুখস্থ-করা বিদ্যা কোন কাজে লাগে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার অপচয়

নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত পাঠশালার চাইতে একটু উন্নত। এখানে জীবনের সাথে শিক্ষার একটু যোগাযোগ আছে, কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক এখনও শিক্ষণ-শিক্ষা লাভের সুযোগ পান নি তাই তাঁদের জানা আছে গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি। সেই পুরাতন তোতাপাখীর বুলি আওড়ান পদ্ধতিতে শিশুদের ব্যক্তিত্বের কোন রূপ বিকাশ হয় না। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে ৩।৪ বৎসরে যা শিক্ষা করে চর্চা ও প্রয়োগের অভাবে তার বেশীর ভাগ অংশেরই অপচয় হয়। বালিকারা বিবাহের পর প্রায়ই আর বিদ্যাচর্চা করে না, কালেভদ্রে কোন সময় হয়ত তাদের নাম সহি করতে হয়। সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এ অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষার অপচয়

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার অপচয় না হবার কথা, কিন্তু যারা উচ্চ বুনিয়াদী থেকে হাই স্কুলে ভর্তি হতে আসে তারা অনেকেই হাইস্কুলের ছাত্রদের সাথে তাল রেখে চলতে পারে না, বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী না না পড়াতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়া এদের পক্ষে কষ্টকর হয়। অনেকের ২।১ বৎসর নষ্ট হয়। তা ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয় হাইস্কুলের মত বেশী পড়ান হয় না কারণ এখানে শিল্প কার্যে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক বৃত্তি নির্বাচনে সকলে সুবিধা করতে পারে না। যারা পল্লীতে বৃত্তি নির্বাচন করে, বুনিয়াদী শিক্ষার ফলাফল থেকে তারা উপকৃত

উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষার অপচয়

হয়, কিন্তু যারা শহরে বা উপনগরীতে মিল ফ্যাক্টরীতে কর্ম সংস্থানের জন্য যায় তারা অনেক সময় ব্যর্থকাম হয় ইংরেজী না জানার জন্য। শিক্ষায় সামাজিক প্রয়োজনকে মূল্য না দেওয়াতে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার অপচয়

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করে যারা মিল ফ্যাক্টরীতে বা ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার অপচয় কম হয়, কিন্তু যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে নারাজ তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার অপচয় হয়, কারণ আপিসে পিয়নের কাজে বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে সেলস্‌ম্যানের (Salesman) কাজে তাদের অধীত বিদ্যা প্রায় কোন কাজেই লাগে না।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার অপচয়

যারা ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করে তাঁদের মধ্যে ১৫% এর বেশী আপিসে বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে চাকুরী যোগাড় করতে পারে না, বাকী ৮৫% শিক্ষার্থীর অধীত বিদ্যা কোন কাজে লাগে না। তা ছাড়া যারা হাইস্কুলে ভর্তি হয় তাদের প্রায় ২০% দশম শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয় কিন্তু পাশের হার ৫০% এর কাছাকাছি হওয়াতে ভর্তি ছাত্র সংখ্যার ১০% পরীক্ষায় পাশ করে সার্টিফিকেট পায়। বাকী ৯০% এর শিক্ষা বিশেষ কোন কাজে লাগে না, অন্ততঃ যে উদ্দেশ্য নিয়ে তারা হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল তা সফল হয় না। মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের পর অধীত বিদ্যা প্রায়ই কোন কাজে লাগে না। এখন ম্যাট্রিক পাশ মেয়েদের মধ্যে ২৫% চাকুরীর সন্ধানে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম পঞ্জীভুক্ত করে থাকেন। এঁদের মধ্যে হয়ত ৫% জন কর্মের সংস্থান করতে পারেন। বাকী ৯৫% জন বালিকার ম্যাট্রিকুলেশন পাশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অবশ্য আজকাল মেয়েদের কর্মে নিয়োগের জন্য নূতন নূতন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

বৎসর বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র সংখ্যার হার বেড়ে যাচ্ছে। এর জন্য অনেকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কারণ রয়েছে। এই কারণগুলি অপসারণ করতে না পারলে মাধ্যমিক শিক্ষার অপচয় বন্ধ করা যাবে না। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়-বস্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীর নাগালের বাইরে, তাই এই সমস্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেশী।

ডিগ্রীস্তরে শিক্ষার অপচয়

ডিগ্রী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণের সংখ্যা গড়ে ৫০% ছাড়িয়ে গেছে। আবার এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ৩।৪ বার চেষ্টা করেও ডিগ্রী পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে এই অপচয় খুবই ভয়াবহ। আবার ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে ৫% উপযুক্ত কাজ হয়ত পাচ্ছে, বাকী ১৫% থেকে ২৫% জন আছে Under-employed অবস্থায় অর্থাৎ তারা সমুচিত কর্মে নিযুক্ত

হ'তে পারেনি। বাকী ৭০% জন ডিগ্রীপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী বেকার জীবনের দুঃসহ জ্বালা ভোগ করছে। শুধু বিজ্ঞানের ছাত্র এবং কারিগরী বিভাগের ছাত্রদের অনেকে পাশ করার পরই কর্মে নিযুক্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে।

স্নাতকোত্তর কলা বিভাগে ৫% এর কম ছাত্রছাত্রী উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হবার সুযোগ পায়, বাকি ৯৫% ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের মত দুর্ভোগ ভোগ করে থাকে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের ছাত্রদের ভাল ভাল কাজের সুবিধা রয়েছে। ভাবলে দুঃখ হয়, একজন I. Sc. পাশ skilled worker একজন Double M. A.-এর চাইতে অনেক ক্ষেত্রে বেশী বেতন ও চাকুরীর অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছে। M. A. এবং M. Com. পাশ খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাদের অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগাবার সুযোগ পাচ্ছে।

স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার অপচয়

শিক্ষার প্রতিটি স্তরে যে পরিমাণ অপচয় হচ্ছে তা যেমন ভয়াবহ তেমনি জাতির অগ্রগতির পরিপন্থী। জাতীয় সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করতে বদ্ধপরিকর। প্ল্যানিং কমিশনের কাছে আমাদের আবেদন এই যে, দেশের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে দেশের কর্মনিয়োগ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রাখতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় যে Man-Power Planning-এর বিষয় সংযোজিত হয়েছে তার উপযুক্ত প্রয়োগ সম্ভব করতে হবে জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য।

অপচয় (Wastage) ও পরীক্ষা ব্যবস্থা—ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় অপচয়ের পরিমাণ এত বেশী যে সত্বর এর কোনরূপ প্রতিকার সম্ভব না হ'লে শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। বিভিন্ন স্তরে অপচয়ের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্যা অর্জনের পরিমাণ করা হয়ে থাকে কিন্তু পরীক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও মান নির্ণয় প্রথা (Marking) এত ত্রুটি পূর্ণ যে এতে পরীক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর যে অভিজ্ঞান (Certificate) দেওয়া হয় তা থেকে বিদ্যার পরিমাপের পরিচয় কমই পাওয়া যায়। জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের প্রয়োজন। আদর্শ শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় সে সুযোগ থাকে এবং তার বিচার পদ্ধতিও আলাদা। বিদ্যা পরিমাপের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ত্রুটি পূর্ণ হওয়ায় শিক্ষার সর্ব স্তরে অপচয়ের মাত্রাও খুব বেশী।

পরীক্ষার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুন্নয়নের (Stagnation) সম্পর্ক—গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বিদ্যা পরিমাপ করার রীতি ছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিদ্যার চেয়ে শিক্ষার্থীর মুখস্থ ক্ষমতার বিচারই করা হোত। যাদের এই ক্ষমতা কম তাদের কাছে পরীক্ষা একটা বিভীষিকা। তা ছাড়া মাধ্যমিক

স্তর থেকে উচ্চতম স্তরের পরীক্ষায় অধীত বিষয় ইংরেজী ভাষায় মুখস্থ করতে হোত বলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নয়নের মাত্রা এত বেশী ছিল। একমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার উপর ও অঙ্কশাস্ত্রের উপর বিশেষ জোর দেবার প্রথা ছিল তাই যাদের ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা কম বা অঙ্কের প্রতি প্রবণতা নেই বললেই হয় তাদের ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। শিশু শ্রেণীতে লিখিত পরীক্ষায় (Written test) অনেক শিশু বিশেষ পটু নয় বলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। বাধ্যতামূলক ভাবে বিদেশী ভাষা শিক্ষা সর্ব স্তরের পরীক্ষায় অনুন্নয়নের পরিমাণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করেছে। রচনাধর্মী পরীক্ষার জন্যেও অনুন্নয়নের মাত্রাধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রগতি পত্র—শিশুকেন্দ্রীক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর ধারাবাহিক প্রগতি পত্র (Cumulative Record Card) রাখার ব্যবস্থা আছে। এই ধারাবাহিক প্রগতি পত্রে শিক্ষার্থীর সারা বৎসরের অগ্রগতির পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে। কিরূপে প্রগতি পত্র নিখুঁত ভাবে রাখা যায় তার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পূর্বে যে প্রগতি পত্র (Progress Report) রাখা হোত তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল। সেই প্রগতি পত্র দেখে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি (Progress) কতটুকু হয়েছে তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যেত না। পরীক্ষার নম্বর দেখে শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ শিক্ষার্থী বিষয়টি কতটুকু আয়ত্ত করেছে, প্রশ্ন কিভাবে করা হয়েছিল এবং কি ভাবে নম্বর দেওয়া হয়েছে তার সঠিক পরিচয় না পাওয়া গেলে পরীক্ষার নম্বরগুলি মূল্যহীন। এত দিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে এই মূল্যহীন রেকর্ড রাখা হোত অতীব যত্ন সহকারে এবং এই নম্বর-সম্বলিত প্রগতি পত্র দেয়ে অভিভাবকদের জানিয়ে দেওয়া হতো তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় অনগ্রসরতা বা অগ্রসরতার পরিমাণ কতটুকু।

প্রগতিপত্র ও তার সংস্কার

প্রগতি পত্র প্রস্তুতের জন্য শিক্ষকদের কাজ করতে হবে যৌথ ভাবে। তাঁদের হ'তে হবে নিরপেক্ষ। যন্ত্রচালিতের মত বা নেহাৎ দায় এড়াবার মনোভাব নিয়ে প্রগতি পত্র প্রস্তুত করলে উহা শিক্ষার্থীর অগ্রগতির খাঁটি চিত্রের পরিচয় বহন করবে না, কাজেই সেই রেকর্ড অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানে বা উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে নির্দেশনা দিলে ভুলই করা হবে। বিদ্যালয়ের রেকর্ডের মূল্য অপরিসীম। শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের সচিত্র রূপ ধরা পড়ে ধারাবাহিক প্রগতি পত্রে। এ কথা মনে রেখে শিক্ষার্থীর শিক্ষাসম্পর্কিত রেকর্ড রাখার বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের কার্যালয়কে ও শিক্ষকদের নির্দেশ দেবেন।

প্রগতিপত্র প্রস্তুত

উপরের শ্রেণীতে উন্নীত করা বেশ সমস্যাসঙ্কুল ব্যাপার কারণ পূর্বে যে একটি মাত্র বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীকে উপরের

শ্রেণীতে উন্নীত (Promotion to higher Class) করার প্রথা চালু ছিল তা খুবই ত্রুটি পূর্ণ। এখন শ্রেণী-উন্নয়ন ব্যাপারে সারা বৎসরের কাজ এবং বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়া যাণ্মাসিক পরীক্ষা ও সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফলাফলকে বিবেচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিচার ছাড়া শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের কথাও ভাবতে হয়। প্রধান প্রধান বিষয়ে ভাল ফল করলে উপরের শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। অপ্রধান বিষয়গুলি উপরের শ্রেণীতে গিয়ে প্রথম তিন মাসের মধ্যে ঠিক করে নিতে পারে। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যদি একেবারেই আশাপ্রদ না হয় তবে এক-বৎসর নীচের শ্রেণীতে রেখে দেওয়া যায়। অঙ্ক, ইংরেজী ও মাতৃভাষায় মোটামুটি ভাল করলে কোন শিক্ষার্থীকে নীচের ক্লাসে রেখে দেওয়া উচিত নয়। কোন শিক্ষার্থীকেই পর পর দু'বছর একই শ্রেণীতে রাখা চলবে না।

উপরের শ্রেণীতে উন্নীত করা

অভীক্ষা—গতানুগতিক ও প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় যাথার্থ্য, নির্ভর-যোগ্যতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, তুলনীয়তা, পরিমিততা প্রভৃতি গুণগুলির একান্ত অভাব। অপর পক্ষে ইহা ব্যক্তিকতা দোষে এমনই দুষ্ট যে এই পরীক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান (Knowledge), বিদ্যা (Learning), কৌশল (Skill) বা মানসিক বিকাশের (Mental development) প্রকৃত পরিমাপক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অযোগ্য। আধুনিক অভীক্ষাগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মে প্রস্তুত প্রশ্নপত্র। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা এগুলি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই অভীক্ষাগুলি প্রস্তুতের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তর আছে। অভীক্ষাগুলিকে সর্ব প্রকারে নৈর্ব্যক্তিক করা হয়েছে। পরিসংখ্যানের সাহায্যে এই অভীক্ষাগুলির বিভিন্ন গুণাবলী বিচার করা হয়ে থাকে। এই অভীক্ষাগুলি আবার নানা জাতীয় হ'তে পারে।

গতানুগতিক প্রশ্নপত্র ও আধুনিক অভীক্ষা

নিম্নে **কয়েকটি অভীক্ষার নমুনা** দেওয়া হোল। [উত্তর সহ]

(১) বহু-নির্বাচন অভীক্ষা (Multiple Choice Test)—[অনেকগুলি সম্ভাব্য প্রশ্নের মধ্য থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিতে হয়।]

ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে শিল্প-উন্নত রাজ্য কোনটি?

(ক) বোম্বাই ✓ (খ) কেরালা (গ) বিহার (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ

(২) মিলকরণ অভীক্ষা (Matching Test) [গুচ্ছ দু'টির বিষয় অভীক্ষায় এলোমেলো করে সাজান থাকে।]

১ম গুচ্ছ		২য় গুচ্ছ
পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ	—	১৫২৬
সিপাহী বিদ্রোহ হয়	—	১৮৫৭
পলাসী যুদ্ধ হয়	—	১৭৫৭

(৩) সম্পূর্ণ করণ অভীক্ষা (Completion test) [শূন্যস্থান পূরণ]

ক। ভারতের বুকে [কোহিমায়] সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উড্ডান হয়।

খ। [অক্সিজেন]—ও [হাইড্রোজেন)—মিলে জল হয়।

(৪) সত্যমিথ্যা অভীক্ষা (True False) [ঠিক উত্তরে √ দেওয়া]

ক। জলের চেয়ে বরফ হাল্কা নয় সত্য মিথ্যা √

খ। 0° ডিগ্রী তাপে জল জমে সত্য √ মিথ্যা

(৫) উপমান অভীক্ষা (Analogy Test) [উপমান বসাতে হয়]
মায়ের সাথে সন্তানের যে সম্বন্ধ পৃথিবীর সাথে (চন্দ্রের)—সে সম্বন্ধ।

আধুনিক অভীক্ষাগুলি সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশ্ন পত্রগুলি সংশোধনের জন্য। গতানুগতিক পরীক্ষার ব্যক্তিকতা দোষ দূর করে অভীক্ষাগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক করার জন্য সর্ব প্রকার বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করা হয়। অভীক্ষাগুলি নৈর্ব্যক্তিক হ'লে পরীক্ষকের গুরুত্ব কমে যায় এবং ঐগুলির যাথার্থ্য, নির্ভরযোগ্যতা, তুলনীয়তা, সংব্যাখ্যান, পরিমিততা ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি গুণগুলি আধুনিক পরীক্ষা গ্রহণ-প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। পরীক্ষা ব্যবস্থা নৈর্ব্যক্তিক হ'লে যে কোন লোকই উত্তর পত্র পরীক্ষা করুন না কেন তিনি একই প্রকার নম্বর দিতে বাধ্য, কারণ আধুনিক অভীক্ষাগুলির সঙ্গে উত্তর (Key) দেওয়া থাকে। পরীক্ষার উত্তর পত্র দেখা সহজ হয় এবং অল্প সময়ে প্রচুর উত্তর পত্র দেখা যায়। উত্তর পত্র পরীক্ষার সময় পরীক্ষককে অযথা ভাবতে হয় না। এই অভীক্ষাগুলি রচনাধর্মী প্রশ্ন পত্র অপেক্ষা অনেক উন্নত, কারণ প্রশ্নগুলি এমন ভাবে করা হয় যাতে প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে দ্বিমত না থাকে। অনেকগুলি প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে বলে সমগ্র পাঠ্য বিষয় থেকে নানাবিধ প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়। এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে বেছে বেছে কয়েকটি সম্ভাব্য প্রশ্ন তৈয়ারী করে পরীক্ষা-কেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হবে না। ফাঁকি দিয়ে পাশ করার পথ এতে নেই।

আধুনিক অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক অভীক্ষাগুলি দোষমুক্ত নয়। এ সমস্ত অভীক্ষা বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকেরাই প্রস্তুত করতে পারেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষে মান-নির্ণীত অভীক্ষা (Standardised test) প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব। অভীক্ষাগুলি গতানুগতিক প্রশ্ন পত্রের তুলনায় ব্যয়বহুল এবং শ্রমসাধ্যও বটে। এক একটি অভীক্ষা একটা ছোট পুস্তিকার মতো। তার মুদ্রণ ব্যয় সাধারণ

বিদ্যালয় বহন করিতে পারে না। নানা কারণে সাধারণ বিদ্যালয়ে এগুলির ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অনুমানের উপর ভিত্তি করেও অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শিক্ষার্থীরা নম্বর পায়। অনেক মনোবিজ্ঞানী বিচার করে দেখেছেন যে অভীক্ষাগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকতা দোষ থেকে মুক্ত নয়। আবার একথাও প্রমাণ করা হয়েছে যে অভীক্ষাগুলির সাহায্যে মনের যে শক্তির পরিমাপ করার কথা; অনেক সময় তার অতিরিক্ত কিছুর পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই অভীক্ষাগুলির দ্বারা জ্ঞান (knowledge) বা বিদ্যার (learning) পরিমাপ সম্ভব কিন্তু কোন বিষয়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ, কল্পনা সৃষ্টি, সাহিত্যে রস সৃষ্টি ও রসোপলব্ধি, সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির বিচার আধুনিক অভীক্ষার সাহায্যে সম্ভব নয়।

মাননির্ণীত অভীক্ষার ত্রুটিসমূহ

মাননির্ণীত আধুনিক অভীক্ষার প্রস্তুত-প্রণালী—কোন্ বিষয়ের উপর অভীক্ষা প্রস্তুত করতে হবে এবং কোন্ মানের শিক্ষার্থীদের উপর কি উদ্দেশ্যে উহা প্রযুক্ত হবে, অভীক্ষা প্রস্তুতকারককে তা জানতে হবে। উক্ত মানের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বিষয়টি কি ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং শ্রেণী কক্ষে উহা কি ভাবে এবং কতটুকু আলোচনা হয়ে থাকে সে বিষয়ে পড়াশুনা ও অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

যে বিষয়ের উপর অভীক্ষা প্রস্তুত করতে হবে তার নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা প্রকার অভীক্ষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রটি তৈরী করতে হবে। যতগুলি প্রশ্ন রাখবার ইচ্ছা প্রায় তার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রশ্ন তৈরী করতে হবে।

১ম স্তর

তারপর যে মানের জন্য অভীক্ষাটি প্রস্তুত হয়েছে সেই মানের প্রতিনিধি-মূলক (representative group) দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হবে। যেগুলি খুব সোজা বা খুব কঠিন বলে বিবেচিত হবে সেগুলি বাদ দেওয়া হবে। প্রয়োজন মত প্রশ্নগুলি নিয়ে অভীক্ষা প্রস্তুত করার পর যে মানের জন্য অভীক্ষা প্রস্তুত হয়েছে সেই মানের সত্যকার প্রতিনিধিমূলক দলের (random sample) উপর উহা প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির মান (norms) নির্ণীত হবে।

২য় স্তর

অনেক সময় অভীক্ষাটির উপযোগিতা লক্ষ্য করবার জন্য এড্ হক্ অভীক্ষা (Ad hoc test) প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই এড্ হক্ অভীক্ষা শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা প্রস্তুত করতে পারেন। অবশ্য প্রথম প্রথম বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নির্দেশ নিলে ভাল হয়। এড্ হক্ অভীক্ষায় মান নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় না। অবশ্য একথা ঠিক, আধুনিক অভীক্ষার অনেকগুলি গুণই এই জাতীয় অভীক্ষায় থাকে না।

এড্ হক অভীক্ষা

অভীক্ষাটির মান নির্ণীত হবার পর পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে নির্ভরযোগ্যতা ও যাথার্থ্যের মান নির্ণয় করা হয়।

অভীক্ষাটির মান নির্ণয়ের পূর্বে অভীক্ষার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলির কোন্‌টির জন্ম কত নম্বর দিতে হবে তা প্রশ্নের দুরূহতা (difficulty values) বার করে ঠিক করতে হয়। প্রশ্নগুলিকে সহজতর থেকে কঠিনতর পর্যায়ে সাজাতে হবে। উত্তর করবার জন্ম যে সময় দেওয়া হবে অভীক্ষাটি প্রস্তুতের সময় এবং প্রাথমিক প্রয়োগের সময় সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

৩য় স্তর

অভীক্ষাটি কি ভাবে পরীক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং পরীক্ষার্থী-দের কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে সে নির্দেশ (direction) স্পষ্ট ভাষায় অভীক্ষাটিতে লিখে দিতে হবে। অভীক্ষা প্রস্তুতের পর কয়েকবার প্রয়োগ করে উহার উত্তর পত্র (Key) তৈরী করতে হবে। উত্তর পত্র ছাড়া অভীক্ষার কোন মূল্য নেই। উহা অভীক্ষার সঙ্গে থাকবে।

৪র্থ স্তর

অভীক্ষাটি প্রস্তুত হবার পর পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে উহাকে যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক, কার্যকরী ও সহজ প্রযোজ্য করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান-সম্মত মানযুক্ত বা মান-নির্ণীত অভীক্ষা (Standardised test) প্রস্তুত প্রণালী শ্রমসাধ্য, সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকেরাই ইহা প্রস্তুত করতে সমর্থ।

৫ম স্তর

আধুনিক অভীক্ষার গুণাবলী—শিক্ষাবিদ্‌ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে বৈজ্ঞানিক অভীক্ষার **নিম্নলিখিত গুণগুলি** থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাথার্থ্য (Validity)—অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণের সত্যকার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সাধিত হ'লে অভীক্ষাটির যাথার্থ্য আছে বুঝতে হবে। এই যাথার্থ্য শতকরা মান দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ভূগোল পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য একটা স্তরের শিক্ষার্থীর ভৌগোলিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কতটুকু হয়েছে তা বিচার করা। প্রশ্ন পত্রের উত্তরে বাংলা-দেশের প্রাকৃতিক পরিচয় দিতে গিয়ে কোন ছাত্র কাব্যাকারে যদি কিছু বর্ণনা করে, বা বর্ণনায় প্রচুর বানান ভুল করে অথবা ভাষার ত্রুটির জন্ম ভৌগোলিক বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও উহা গুছিয়ে লিখতে না পারে তবে প্রশ্নের উত্তর দেখে তাকে কত নম্বর দেওয়া হবে তা আমাদের নিকট সমস্যার বিষয়। অপর ছাত্রটি একটি মানচিত্রে সমস্ত বিষয় দিয়েছে কিন্তু সব কিছু গুছিয়ে লিখতে পারে নি। মানচিত্রে বিষয় বস্তু ঠিক মত বসাতে পারে নি কিন্তু মানচিত্রটিতে চারুকলাসম্মত রং ও তুলির ব্যবহার করা হয়েছে, মডেলগুলিও শিল্পরুচির পরিচয় বহন করছে। এক্ষেত্রে আমরা ছাত্রের শিল্প রুচির পরীক্ষা করতে চাই না

চাই ভৌগোলিক জ্ঞান পরীক্ষা করতে। পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র এমন হওয়া চাই যাতে পরীক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে যে ভাবে কোন বিষয় জানতে চান শিক্ষার্থী যেন সে প্রশ্নের সে উত্তরটি ঠিক সে ভাবে দিতে পারে। সব সময় ১০০% যাথার্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। তা না হোক, অন্ততঃ শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ যাথার্থ্য থাকলেই উক্ত অভীক্ষা বৈজ্ঞানিক হয়েছে এবং উহার উত্তরটিও যথাযথ পাবার ৯০% আশা থাকে।

নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)—রচনাধর্মী পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা গুণটি নেই বললেই চলে। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তিকতা-দোষদুষ্ট। এই বিষয়টি নিয়ে ব্যালার্ড, উড, স্টার্চ প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ অনেক গবেষণা করেছেন। পরীক্ষকের পদটি যে বিচারকের পদ এ কথাটি অনেকেই ভুলে যান। পরীক্ষার উত্তর পত্রের উত্তর দেখবার সময় প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে এ সম্বন্ধে শুধু শিক্ষার্থীদের নয় পরীক্ষকদের মধ্যেও মতদ্বৈধ রয়েছে। কারণ প্রশ্নটি অনেক সময় বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করে। পরীক্ষক তাঁর নিজস্ব ধারণা, সংস্কার, রুচি, বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে পরীক্ষার উত্তর পত্র বিচার করেন। এই উত্তর পত্র বিচার করবার সময় তাঁর মানসিক অবস্থা বিশেষ ভাবে তাঁকে প্রভাবিত করে। পরীক্ষকের শারীরিক অবস্থাও এর জন্য দায়ী। তা ছাড়া পরীক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি সব সময় এক রূপ থাকে না কাজেই একই প্রশ্নপত্রের ২।৩ বার পরীক্ষা দিলেও উত্তর পত্র আলাদা হবে, উপরন্তু একই খাতা বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষা করে পৃথক পৃথক নম্বর দিয়ে থাকেন। নম্বরের পার্থক্য ৩০% থেকে ৯০% পর্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়। বৈজ্ঞানিক অভীক্ষায় নির্ভর-যোগ্যতা একটি বড় গুণ। অর্থাৎ প্রশ্নটি যতবারই সেই ছাত্রদলের সামনে উপস্থিত করা হউক ফলাফল প্রায় একই হবে।

নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)—বৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে নির্ভর-যোগ্যতা ও যাথার্থ্য গুণে বিভূষিত করবার জন্য নৈর্ব্যক্তিক করা হয়েছে। এই অভীক্ষাগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত যে এগুলি ব্যক্তিকতা-দোষদুষ্ট হ'তে পারে না। প্রশ্ন পত্রের সাথে উত্তর (Key) দেওয়া থাকে। যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যিনি আলোচ্য বিষয়টি অধ্যয়ন করেছেন তিনিই আধুনিক অভীক্ষার উত্তর পত্রগুলি অনায়াসে পরীক্ষা করতে পারেন। সকল পরীক্ষক ঠিক উত্তরের জন্য এক নম্বর দিতে বাধ্য থাকেন। অল্প সময়ে উত্তর পত্রগুলি পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রশ্ন পত্র (অভীক্ষা) নৈর্ব্যক্তিক হওয়াতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত স্বভাব ও রুচি মত নম্বর দেওয়ার সুযোগ থাকে না।

তুলনীয়তা (Comparability)—আধুনিক অভীক্ষাগুলিকে মান-নির্ণীত (standardised) করে লওয়া হওয়া হয়। ইহা যত্ন ও পরিশ্রমসাধ্য এবং

এ জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন করান হয়। একই বিষয়ের উপর সেই স্তরের উপযোগী দু'টি অভীক্ষা প্রস্তুত করার পর ঐ দু'টি অভীক্ষা প্রয়োগ ও গ্রহণের ফলাফল বেশ সন্তোষ জনক। একই বিষয়ের উপর একটা বিশেষ স্তরের উপযোগী করে দু'টি অভীক্ষা প্রস্তুত করবার পর দু'টি ফলের উপর ঐ দু'টি অভীক্ষা প্রয়োগ করে তুলনামূলক মান রক্ষা করা যায়।

সংব্যাখ্যান (Interpretation)—আধুনিক অভিক্ষাগুলির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। একটি অভীক্ষার প্রয়োগের সংব্যাখ্যান দ্বারা তার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়।

পরিমিততা (Economy)—শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ এবং যে বিষয়ে অভীক্ষা প্রস্তুত করা হবে সেই বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আধুনিক অভীক্ষা প্রস্তুত করতে সমর্থ। পরীক্ষার্থীর দিক থেকে উহার উত্তর দিতে পরিশ্রম যেমন কম সময়ও তেমনি কম লাগে।

প্রয়োগশীলতা (Administrability)—গতানুগতিক প্রশ্নপত্রগুলি সাধারণ শিক্ষক অল্প সময়ে করতে পারেন এবং অনেক ছাত্রের উপর সহজে উহা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষা প্রস্তুত সময়সাপেক্ষ। ইহার জন্য তুলনামূলক ভাবে বেশী অর্থ লাগে এবং বিশেষজ্ঞ ছাড়া অভীক্ষা প্রস্তুত সম্ভব নয়। তবে জ্ঞান, কৌশল ও মানসিক বিকাশের প্রকৃত পরিমাপক যন্ত্র (measuring instrument) হিসেবে আধুনিক অভীক্ষাগুলিকে নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। অভীক্ষা প্রস্তুত-কারক অভীক্ষার প্রয়োগশীলতার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নির্দেশ অভীক্ষার মধ্যেই দিয়ে থাকেন।

University Questions (Chapter I to IV)

1. Discuss the problems of secondary education with reference to finance, accommodation and teaching personnel. [C. U. 1966]
2. What are the language problems of secondary education ? Discuss with special reference to schools in your state. [C. U. 1966]
3. What are the causes of indiscipline in an average Secondary school in West Bengal ? Suggest remedies for improvement. [C. U. '66]
4. Discuss the problems of language teaching in Primary Schools of West Bengal. [C. U. '65]
5. What tests and examinations would you suggest English for the promotion of education and evalution of children of primary stage. [C. U. 1965]
6. Offer your own views regarding the position of English in nprimary curriculum. [C. U. 1964]
7. Trace the origin and development of Local administration of education in India. How far it has been effective promoting primary education in India. [C U '64]
8. Write an essay on Guidance in Secondary Education. [C. U. 1 64]
9. Set forth your own views regarding the control and administration of secondary education in India. [C. U. 1964]
10. The present system of external examination has been characterised as one of the worst features of Indian education. How far do you agree to the statement ? What changes would you suggest for improving the system ? [C. U. 1963]
11. Write a critique on the present curriculem for Higher secondary education in your state. [C. U. 1963]

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষক-শিক্ষণ

শিক্ষক-শিক্ষণের ঐতিহাসিক দিক—প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় পৃথকভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন শিক্ষা-ব্যবস্থা উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাই গুরুর পদ অলঙ্কৃত করতেন, এমন কি ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবিদ্যা ও বৈশ্যের ব্যবসা-শিক্ষাদান কার্য ব্রাহ্মণগণই করতেন। পরবর্তী যুগে গ্রামের পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা পাঠশালায় পণ্ডিতের কাজ করতেন। বৌদ্ধযুগে শ্রমণগণ গণশিক্ষার ভার নিয়েছিলেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব ছিল অধ্যাপকবৃন্দের উপর। মুসলমানযুগে মোল্লা ও মৌলভীরা মক্তবে ও মাদ্রাসায় শিক্ষাকার্য পরিচালনা করতেন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষণশিক্ষা

শিক্ষা সে যুগে ধর্মাশ্রয়ী ছিল, তাই শিক্ষক ও ধর্ম-উপদেষ্টা পুরোহিত বা যাজকেরাই হ'তেন। জন্মগত অধিকার এবং আচরণগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বলে এঁরা শিক্ষকতার কাজ ভাল ভাবেই করতেন। ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী ঔপনিবেশিকদের আগমনের পূর্বে এদেশের প্রাথমিক, এমন কি টোলের উচ্চতম শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্দার পোড়ো (Monitor) বা ছাত্র-শিক্ষক প্রথা চালু ছিল। সাধারণতঃ একজন পণ্ডিতই একটি পাঠশালা পরিচালনা করতেন। একার পক্ষে সমস্ত শ্রেণীর কাজ দেখা সম্ভব ছিল না তাই উপরের শ্রেণীর যোগ্য ছাত্রদের উপর পণ্ডিত মহাশয় নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পড়া আদায়ের ভার দিতেন।

বেল সাহেব মাদ্রাজের মিশনারী স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু করে বিশেষ সুবিধা লাভ করেন। Monitorial system হিসেবে এই Pupil-Teacher system বিলেতে চালু হয় এবং ব্রিটেনের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যয় সঙ্কোচনে এই ব্যবস্থা বিশেষ সাহায্য করে। মনিটোরিয়াল সিস্টেম প্রকৃত-পক্ষে শিক্ষক-শিক্ষণ নয়, তবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পণ্ডিত মহাশয়েরা অনেক সময় যোগ্য শিক্ষক তৈরি করতে পারতেন।

সর্দার পোড়ো বা মনিটোরিয়াল সিস্টেম

উড সাহেবের ডেস্প্যাচে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় স্তরের শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। ১৮৫৯ খ্রীঃ গ্র্যাণ্ট ইন্-এড্ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে নিয়ম ও সর্ত স্কুলগুলির উপর আরোপ করা হয় তাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতনই গ্র্যাণ্ট হিসেবে দেওয়ার কথা আছে। এই ব্যবস্থা চালু হবার পর এদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল খোলা হয়। ১৮৮১-১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এক শতের বেশী নর্মাল স্কুল

উডের ডেস্প্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের কথা

(Normal School) স্থাপিত হয়। এ সব নর্মাল স্কুলে পাঠশালার পাঠ্য বস্তুকে শিক্ষকদের ভাল করে আয়ত্ত করানো হোত। আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠক্রমে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ দেবার কোন ব্যবস্থা এদেশে ছিল না। নর্মাল স্কুলে শুধু বিষয় বস্তুর জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া হোত। শিক্ষায় শিশুর স্থান যে সবার পুরোভাগে এ বিষয়ে শিক্ষকদের সচেতন করে তোলা হচ্ছে মাত্র বিগত ২০।২৫ বৎসর ধরে। এর পুর্বে প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বি. টি. পাশ হ'লেই চলত। স্বাধীনতা লাভের পুর্বে শতকরা ১০ জন শিক্ষকও শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষা কমিশন স্নাতক শিক্ষকদের ও অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থপারিশ করেন।

১৯০৪ সালের শিক্ষা-কমিশনে শিক্ষক-শিক্ষণের স্থপারিশ

এ ভাবে শিক্ষক-শিক্ষণে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রীর প্রবর্তন হয়। স্নাতক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সময় এক বৎসর বলে ধার্য করা হয়। এদের পাঠক্রমে শিক্ষার মুল নীতি, বিভিন্ন বিষয়ের (Subject) শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রাক্ স্নাতকদের শিক্ষক-শিক্ষণের কালকে দু'বছর করা হয়েছে। স্কুলপাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানদান এই স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্বপুর্ণ অংশ। স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যান্য প্রশিক্ষণ রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

শিক্ষণশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ

বর্তমানে ভারতবর্ষের **শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছ'টি শ্রেণীতে** ভাগ করা যায় :—

১। প্রাক্ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকাদের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র।

২। নর্মাল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র।

৩। হাইস্কুলের প্রাক্ স্নাতক শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র।

৪। স্নাতোকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র।

৫। বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র (যেমন গানের শিক্ষক, খেলার শিক্ষক, বিকলাঙ্গদের শিক্ষক ইত্যাদি)।

৬। মহিলাদের বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র (চারুশিল্প ও কারুশিল্পের জন্য)।

প্রথম প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সমাজের দ্বারা স্বীকৃত হ'লেও সরকার থেকে এ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠনের বিশেষ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সরকার এই জাতীয় কোন কোন শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। নর্মাল ও প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলি সরকারী সাহায্য ও উপযুক্ত তদারকের অভাবে ধ্বংসের পথে

এগিয়ে চলেছে। তবে আশার কথা এই যে নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের শিক্ষক-শিক্ষণ দেবার জন্য নূতন নূতন শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র, গড়ে উঠছে সরকারের সাগ্রহ প্রচেষ্টায়। মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকার থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রাক্-স্নাতকদের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা বেতনের স্কেল (Scale) পাচ্ছেন বলে বি. টি. বা বি. এড্ পড়বার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে খুবই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। প্রতি বৎসর প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হ'তে না পেরে হাজার হাজার শিক্ষক মনঃক্ষুন্ন হচ্ছেন। এ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা পুর্বের তুলনায় ৬ গুণ হয়েছে, তবুও প্রয়োজনের তুলনায় এগুলির সংখ্যা অল্প। তবে আশার কথা এই যে এদিকে সরকারের ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ বিষয়গুলি শিক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা খুবই বেশী, কিন্তু উপযুক্ত অধ্যাপক না পাওয়াতে এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খোলা যাচ্ছে না। মহিলাদের হাতের কাজ শিক্ষা দেবার জন্য সর্ব প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মহিলারা শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য এগিয়ে এসেছেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্রের সংখ্যা ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে যত জন শিক্ষক শিক্ষিকা স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৬৭ সালে ভর্তি হয়েছেন তার প্রায় ২০ গুণ। এ সত্ত্বে প্রতি বৎসর সর্বভারতে ৩০ হাজার শিক্ষক বি. টি. বা বি. এড্ পড়বার সুযোগ পাচ্ছেন না।

স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার

পুর্বে পাঠশালার শিক্ষকদের জন্য যে সমস্ত গুরু ট্রেইনিং স্কুল বা নর্মাল স্কুল ছিল সেগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। তা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করায় বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে কাজ করবার জন্য স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। কর্মরত শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যাপকদের রিফ্রেসার কোর্সের (Refresher Course) ব্যবস্থা করবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ

মহাকেন্দ্র (State Board of Teacher Education) গড়ে তুলতে হবে।

এ ছাড়া অনেক দিনের অভিজ্ঞ স্নাতক ও প্রাক্-স্নাতক এই দুই শ্রেণীর শিক্ষকদের জন্য (যারা শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার বয়সের সীমা পেরিয়ে গেছেন) স্বল্পকালীন (৩ মাস বা ৪ মাস) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পুজাবকাশ ও গ্রীষ্মাবকাশে এ জাতীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেবার জন্তে বিশেষ বিশেষ স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করা যেতে পারে। বিভিন্ন ট্রেইনিং কলেজ থেকে অল্প কয়েক দিনের জন্য অধ্যাপকদের এই সমস্ত ক্যাম্পে গ্রহণ করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বনামধন্য প্রবীণ শিক্ষকদের ৩।৪ মাসের পার্টটাইম (Part-time) অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করলে এই ক্যাম্পগুলির অধ্যাপক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কোঠারী কমিশন প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাক্-স্নাতক শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অধ্যাপকদের শিক্ষাগত মান উন্নয়ন, পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস ও কেন্দ্রগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন বাঞ্ছনীয়।

স্বল্প-কালীন প্রশিক্ষণ

শিক্ষক-শিক্ষণের নব রূপায়ণ—শিক্ষক শিক্ষণের দায়িত্ব সরকারের। তাই স্বাধীনতা লাভের পর উপযুক্ত শিক্ষক বেছে নিয়ে তাঁদের ভাল ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষাতত্ত্বের নানা সমস্যার উপর গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। শিক্ষকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে গবেষকেরা বলেছেন, যত দিন পর্যন্ত না সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তত দিন পর্যন্ত প্রভূত টাকা দিলেও শিক্ষা কার্যে শিক্ষকের মনকে প্রস্তুত করা যাচ্ছে না।

শিক্ষক-শিক্ষণ সরকারের দায়িত্ব

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠন করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে শিক্ষক-শিক্ষণের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্রের পাঠ্যসূচী ও কার্যক্রম নির্ণয় করতে হবে। যাতে উপযুক্ত অধ্যাপক এই সব শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন সেরূপ ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। শিক্ষকতাকে একটি প্রয়োজনীয় জাতীয় পেশা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষকতাকে জাতীয় পেশা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

কর্মোদ্যম, সহনশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণগুলি শিক্ষককে লোকপ্রিয় হোতে বিশেষ সাহায্য করে। শিক্ষককে অধৈর্য ও নিরাশাবাদী

হ'লে চলবে না। শিক্ষক হবেন চিন্তায়, কাজে ও আচরণে প্রগতিশীল। শিক্ষকের উদার মনোভাব, দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি তাঁর কর্ম ক্ষমতাকে উন্নত করে। যে কোন প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শিক্ষক জীবনে অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

শিক্ষক জীবনের প্রস্তুতি অপরিহার্য

আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান খুবই উন্নত। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষা পরিচালনায় সরকার এবং শিক্ষাবিদ্‌দের যে দায়িত্ব রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্ব বহন করিতে হয় শিক্ষকদের সেই শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষা পরিচালনাকে কার্যকরী করবার জন্য। কারখানায় যন্ত্রের সাথে তাল রেখে শিল্প পরিকল্পনা ও শিল্প পরিচালনার কথা ভাবতে হয়, আর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর মানসিক ক্ষমতা, সামাজিক বৃত্তি নির্বাচন এবং মানব জাতির সামগ্রিক উন্নতির দিকে তাকিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা করতে করতে হয়। শিক্ষার সামগ্রিক রূপের ধারণা শিক্ষকদের থাকা চাই। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল শক্তি শিক্ষকের ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও সেবা প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। অন্যান্য সকলের মত শিক্ষক চাকুরী করলেও এই চাকুরীর মধ্যে সমাজ সেবা তথা শিক্ষায় সেবার মনোভাব থাকা চাই। যে শিক্ষকের তা নেই খুব বিদ্বান ও অভিজ্ঞ হ'লেও তিনি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক হ'তে পারেন না। শিক্ষকেরা প্রাচীন যুগে ছিলেন শিক্ষার্থীদের আদর্শ ব্যক্তি। আজ জীবনের কর্ম-ধারা নানা দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লেও সমাজ সেবার আদর্শ শিক্ষার্থীরা লাভ করে শিক্ষকদের কাছ থেকেই।

আধুনিক শিক্ষক-শিক্ষণ উন্নত বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত

শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা—শিক্ষকের যোগ্যতার দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। এর মধ্যে **তিনটি বিষয়** বিশেষ প্রণিধান যোগ্য :—

(১) যে বিষয় শিক্ষক শিক্ষা দিতে যাবেন সে বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য।

(২) যাদের শিক্ষা দেন তাদের ভাল করে জানা।

(৩) শিক্ষা পদ্ধতির সম্যক ধারণা এবং উহা প্রয়োগের দক্ষতা।

তিনটি গুণের একটির অভাব হ'লেও শিক্ষক যোগ্য শিক্ষক পদবাচ্য নহেন। নহেন।

ভাল শিক্ষক কতকগুলি জন্মগত ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তিনি তাঁর সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। বাঁধাধরা পদ্ধতিতে ভাল শিক্ষকেরা শিক্ষাদানে অভ্যস্ত হতে চান না। প্রকৃত পক্ষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালিত হ'লেও শিক্ষা-দান (Teaching) একটি বিশিষ্ট কলা। ইহা শিক্ষকের বিষয়ের জ্ঞান, জীবনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতা, অনুসঙ্গ প্রণালী ব্যবহারের ক্ষমতা, নিজের বক্তব্য ভাল করে বুঝিয়ে

বলার ক্ষমতা, প্রয়োজন স্থলে শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজের উপর এবং সর্বোপরি শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর বেশী করে নির্ভর করে। শিক্ষক-শিক্ষণ লাভের পর আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকদের ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হয়, তাঁরা শিশুদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেন, শিক্ষা সমস্যা-গুলির বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজে বার করেন। বর্তমানে সরকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ বিদ্যালয় পরিচালনার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন। গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের অনুমোদন ইত্যাদি ব্যাপারে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিষয় ভাল ভাবে বিচার করা হয়। গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহরের ব্যবসাদারী বিদ্যালয় ছাড়া) পরিচালনা করা অসম্ভব। কাজেই বর্তমানে প্রত্যেক বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে চান। কিন্তু যোগ্য শিক্ষকের বিশেষ অভাব রয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সহজে মেলে না কেন?—শিক্ষকতাকে এদেশে এখনও একটি সামাজিক বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। একই বিদ্যার অধিকারী হয়েও শিক্ষকগণ অন্যান্য সরকারী ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের তুলনায় অনেক কম বেতন পান। বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন না। যাঁরা করেন তাঁরা বেকার অবস্থায় বসে থাকেন বলে করেন এবং সুযোগ পেলেই ছেড়ে দেন। এই সব শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষক-শিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। মোটামুটি হিসাবে ১০% জন মাধ্যমিক শিক্ষক, ৫০% জন বুনিয়াদী শিক্ষক, ২০% জন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষকশিক্ষণ পেয়েও অন্যত্র ভাল কাজ পেয়ে শিক্ষা বিভাগ ত্যাগ করে চলে যান আর ৫% শিক্ষক মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ পেয়ে থাকেন। কার্যক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা থেকে এদের বাদ দিতে হয়। অনেক প্রতিভাবান শিক্ষক স্বেচ্ছায় শিক্ষক-শিক্ষণ লাভের সুযোগ নিতে চান না। এদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও শতকরা ২ জনের বেশী হবে। ১৯৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণের কেন্দ্র ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে জন সাধারণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাপে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের (Teachers' Trainning College) সংখ্যা পূর্বের তুলনায় ৬ গুণ হলেও প্রতি বৎসর শিক্ষণ-শিক্ষালাভের জন্য যে আবেদন পত্র পাওয়া যায় তার ৭৫% জন শিক্ষক-শিক্ষিকার আসন এখনও ট্রেইনিং কলেজগুলিতে নেই। ৭৫% জন শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা আছে শিক্ষক-শিক্ষণ লাভের এবং শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'লে এদের চাকুরীর স্থায়িত্ব হবে এবং বেতনও এরা কিছু বেশী পাবেন। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবের অছিলায় এখনও প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় নি। এ জন্য সরকারকে

দায়ী করা চলে। এতে শিক্ষকেরা (যাঁরা বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছেন) কতকগুলো সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন আর শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছে এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাদান (teaching) থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অনেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাতে চান না কারণ তাঁরা জানেন যে শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'বার পর সুযোগ পেলেই তাঁরা অন্যত্র চলে যাবেন। আবার অনেকে মনে করেন শিক্ষক-শিক্ষণে শিক্ষকের ব্যক্তিগত লাভ, বিদ্যালয়ের এতে কোন সুবিধা নেই। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের সংখ্যা এত কম যে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠাতে গেলে বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীগুলির অধ্যাপনা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক প্রধান শিক্ষকের বয়স ৪৫ বৎসরের বেশী; তাঁরা ট্রেইনিং কলেজে ভর্তি হতে পারেন না; তাই অন্যান্য শিক্ষকদের তাঁরা শিক্ষক শিক্ষণের জন্য পাঠাতে রাজী নহেন। আবার অনেক শিক্ষক শিক্ষক-শিক্ষণ লাভের জন্য ভর্তি হয়ে ভাল চাকুরী পেলে প্রশিক্ষণের মাঝখানেই ছেড়ে দেন। এর ফলে এক বৎসরের জন্য ট্রেনিং কলেজে ঐ সমস্ত শিক্ষকদের আসনগুলো শূন্য থাকে।

উচ্চ মাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের উপরের তিন শ্রেণীর—কৃষিকার্য, বিজ্ঞান, কারিগরী-বিদ্যা, চারুকলা ও গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শাখার শিক্ষকেরা প্রায় কেহই শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন। এ সমস্ত শিক্ষা ধারার (stream) জন্য শিক্ষকই পাওয়া যায় না। এর উপর প্রশিক্ষণের চাপ থাকলে কেহ আর বিদ্যালয়ে কাজ করতে আসবেন না। তবে এই সব শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দিলে এবং চাকুরীর ব্যবস্থা আকর্ষণীয় করলে এঁরা স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অনগ্রসরতা—মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণের অগ্রগতি লক্ষ্য করার মত কিন্তু প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। গত ২০।২১ বৎসর ধরে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে বেসরকারী প্রচেষ্টায়। ১৯৫৯ সাল থেকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন বিভিন্ন রাজ্যে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই প্রচেষ্টা সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ। গত ১০ বৎসরে বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণের প্রসার ভালই হয়েছে। সেবাব্রতী মন না নিয়ে শুধু চাকুরীর খাতিরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এসে অনেকেই ফিরে গেছেন। যেখানে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা খুবই সীমাবদ্ধ সেখানে এই শিক্ষক-শিক্ষণ লাভ করে, এবং

বুনিয়াদী

সরকারী অর্থ ধ্বংস করে যদি ৩০% জন শিক্ষক-শিক্ষা বিভাগ ছেড়ে দেন তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বুনিয়াদী শিক্ষক বেশী সংখ্যক পাওয়া যাবে কি করে?

ইংরেজ আমলে প্রচলিত গুরুট্রেইনিং স্কুলগুলি প্রায় ধ্বংসের পথে অথচ এগুলির স্থলে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এখনও প্রয়োজন অনুরূপ গড়ে ওঠে নি। প্রশিক্ষণ না পেলে প্রাথমিক শিক্ষকেরা স্কেলমাফিক (according to scale) বেতন পান না অথচ তাঁদের জন্য সরকার এখনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গঠিত শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রয়োজন অনুরূপ গড়ে তুলতে পারেন নি। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাই সবচেয়ে অবহেলিত অথচ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের ভাল করে শিক্ষক-শিক্ষণ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাথমিক

কারুশিল্প শিক্ষায় অভিজ্ঞ শিক্ষকের খুব চাহিদা কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান না থাকাতে কারুশিল্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটির মোটেই প্রসার হয় নি।

কারুশিল্প

শিক্ষক-শিক্ষণ বর্তমানে একটি জাতীয় সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। শিক্ষাদান বৃত্তিতে আকৃষ্ট করবার জন্য শিক্ষকদের বেতনের হার (প্রায় ২½ গুণ) বাড়ান হয়েছে। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও আরও কতকগুলি সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন না হওয়াতে শিক্ষকেরা নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষক নির্বাচন, ও তাঁদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা—বর্তমানে ভারতবর্ষে ২৫০০০ হাজারের বেশী মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে এইসব বিদ্যালয়ের মধ্যে শতকরা ৬০টি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের বিশেষ অভাব। ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য শতকরা ৫৫টি বিদ্যালয়ে মাত্র ৪।৫ জন শিক্ষক আছেন। এর মধ্যে মাত্র ২ জন বিজ্ঞান শিক্ষক। অনার্স নিয়ে পাশ করেছেন এমন শিক্ষক প্রতি ১৪টি বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন পাওয়া যায়। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়-শিক্ষকের (Subject teacher) যোগান খুবই সীমাবদ্ধ। কলা বিভাগে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি ও অঙ্কশাস্ত্রে ১ম শ্রেণীর শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। আবার পল্লীগ্রামে ৬ মাস এক বৎসরের জন্য শিক্ষক পাওয়া গেলেও স্থায়ীভাবে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব

(১) শিক্ষকতাকে এদেশে এখনও একটি পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। একই বিদ্যার অধিকারী হয়েও শিক্ষকগণ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের তুলনায় অনেক কম বেতন পান। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য শিক্ষকদিগকে বাধ্য করে উপ-শিক্ষকতা গ্রহণ করবার জন্য টাকার মূল্য ১৩ পয়সা তাই ১০০ টাকার মূল্য ১৩ টাকা। ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষকদের গড় বেতন ১০০ টাকা। কাজেই শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন ভাল ছাত্রই সাগ্রহে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহন করবে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন না। যাঁরা করেন তাঁরা সমাজের অন্য কোন কাজে যোগ্যতা দেখাতে পারেন নি বা ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা সরকারী দপ্তরে চাকুরীতে বহাল করে দেবার কোন আত্মীয় স্বজন তাদের নেই অর্থাৎ খুঁটির জোর নেই।

শিক্ষকতা এদেশে এখনও বৃত্তি হিসেবে গৃহীত হয় নি

(২) বেকার অবস্থায় বসে আছে বলে কেহ শিক্ষকতা গ্রহণ করেন আর সুযোগ পেলেই ছেড়ে দেন। পরিসংখ্যান থেকে আরও দেখা যায় যে সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ১০% জন মাধ্যমিক শিক্ষক, ২০% জন প্রাথমিক শিক্ষক এবং ৩০% জন বুনিয়াদী শিক্ষক শেষ পর্যন্ত শিক্ষকতা বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকেন না। অনেক প্রাথমিক শিক্ষক ভারত সরকারের কার্যালয়ে পিয়নের চাকুরী পেয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দেন, সরকারী বা বে-সরকারী আপিসে বহু কেরাণী আছেন যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পেয়ে বেকার থাকাকালীন কিছু দিনের জন্য শিক্ষকতা করছেন। কলেজের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর পদ গ্রহণ করেছেন এরূপ অধ্যাপকের সংখ্যাও কম নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে অর্থের অভাব হেতু সুযোগ পেলেই শিক্ষকেরা শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য বৃত্তিতে যোগদান করেন।

শিক্ষকেরা শিক্ষকতা বৃত্তি ছেড়ে চলে যান কেন ?

(৩) **বর্তমানে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বলে কিছু নেই**। উৎসবে, পার্বনে কেহ শিক্ষককে নিমন্ত্রণ করিতে যান না। বিবাহ ব্যাপারে শিক্ষকদের স্থান অন্যান্য বৃত্তিজীবিদের সর্বনিম্নে। **মহিলারা শিক্ষকের স্ত্রী হওয়াকে চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করেন**। শিক্ষকদের যে সামাজিক মর্যাদা নেই এ বিষয়টি শিক্ষকদের ছেলে মেয়েরা সহজেই বুঝতে পারে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর ছেলেমেয়েরা পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করে না। **সব চাইতে দুঃখের কথা এই যে ছাত্রেরা শিক্ষকদের বড় করুণার চোখে দেখে।**

(৪) শিক্ষকতার চাকুরীর সর্ত মোটেই আকর্ষণীয় নয়। বর্তমানে প্রভিডেন্ট ফণ্ড ছাড়া এদের জন্য আর কোন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা (Social security) নেই। অবশ্য কয়েকটি রাজ্য সরকার পেন্‌সন, গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফণ্ড—এই তিন জাতীয় সুযোগ বৃদ্ধ শিক্ষকদের দিতে সম্মত হয়েছেন।

(৫) **শিক্ষকতা চাকুরী গ্রহণ করবার পর অধিকাংশ শিক্ষকের জীবনের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না।** শতকরা ৫জন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন বাকী শতকরা ৯৫ জন যে সহকারী শিক্ষকের কাজ নিয়ে শিক্ষকতা বৃত্তিতে প্রবেশ করেন সারাজীবন ধরেই সেই ঘানি টেনে যান। সরকারী বিদ্যালয় ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে বেতনের একটা স্কেল (Scale) আছে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে বেতনের কোন স্কেল নেই। দুঃখের বিষয় দেশের ২৫০০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০০০০ হাজারের বেশী স্কুল সরকারী বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় নয়। এই সব কথা বিবেচনা করতে গেলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ যে কতদূর সমস্যাসঙ্কুল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

অনেকে মনে করবেন যেখানে কেহ শিক্ষকতা বৃত্তি সহজে গ্রহণ করতে চান না সেখানে শিক্ষক নিয়োগে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করতে (Selection) আবার সমস্যা কোথায়? বিষয়টি অন্যদিক থেকে বিচার করতে হবে। গত একশত বৎসর ধরে একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা চালু থাকায় দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা খুব বেশী। স্পেশাল ক্যাডারের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময় বহু এম, এ. এবং বি. এ. পাশ প্রার্থীর দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছিল। ঐ সমস্ত আবেদনকারীর অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে এখনও পল্লীগ্রামে কাজ করছেন। কিন্তু কাজে আনন্দ (Job satisfaction) ক'জন শিক্ষকের আছে তা বিবেচ্য। শহরাঞ্চলে একজন সরকারী শিক্ষকের পদে ইনটারভিউ (interview) দেবার সময় ২০।২৫ জন শিক্ষককে হাজির থাকতে দেখা যায়। কলিকাতা সহরে কর্পোরেশন স্কুলে অনেক ডবল এম. এ. সহকারী শিক্ষিকার কাজ করেছেন। কাজেই শিক্ষক বাছাই করবার অবকাশ সর্বত্র সমান না হ'লেও বেশ রয়েছে। শিক্ষক বাচাই করা কাজটি বেশ শক্ত। ইহা দুরূহ কাজ, কারণ ১৫মি. আলাপ আলোচনা করে বা নানাবিধ পরীক্ষা করে শিক্ষকের ক্ষমতা সম্বন্ধে সত্যকার পরিচয় পাওয়া শক্ত। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ও ফলাফল দেখে শিক্ষকের গুণপনার আন্দাজ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অবশ্য যে সমস্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন চেষ্টা করলে প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা কার্য চালিয়ে যেতে পারেন। শিক্ষকের গুণপণার যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে খুব কম ক্ষেত্রেই তা বিচার করা সম্ভব হয় শিক্ষক নিয়োগের সময় শিক্ষক নির্বাচন কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে।

শিক্ষক নির্বাচন করা

এর পর আসে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার কথা। অনেক প্রতিভাবান শিক্ষক স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ নিতে চান না। তবে চাপে পড়লে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। ১৯৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণের কেন্দ্র

ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে জনসাধারণের দাবীতে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাপে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আবেদনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩০ জন বা তার কিছু বেশী প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পাচ্ছেন।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

এম. এ, এম. এসসি ও অনার্স গ্রাজুয়েটদের প্রশিক্ষণের দাবী অগ্রগণ্য। এদের সুযোগ দেবার পর খুব কম সংখ্যক সাধারণ স্নাতক প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। প্রশিক্ষণ লাভ করলে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকেরা বেতনের স্কেল পাবেন এবং মাসিক বেতনের পরিমাণ বাড়বে কিন্তু বিদ্যালয় ও সমাজ সামগ্রিক ভাবে অনেক বেশী উপকৃত হবেন। প্রশিক্ষণের এই অবস্থার জন্য বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে না। গ্রামের বিদ্যালয় গুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাকী প্রায় সমস্ত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বঞ্চিত।

এদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ (Short term course) দেওয়া উচিত গ্রীষ্মাবকাশের সময়। ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের-পর শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং বেতনও সেই পরিমাণ দেওয়া কর্তব্য। শিক্ষকদের চাকুরীর সর্ত ভাল করতে হবে এবং শিক্ষাগত মান ও শিক্ষাদান কার্যের অভিজ্ঞতাকে পুর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। উপযুক্ত বেতন দিলে এবং চাকুরীর সর্ত ভাল করলে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, চারুকলা, বাণিজ্য, ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যাবে। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ সর্ব স্তরের শিক্ষকদের জন্যই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

প্রশিক্ষণ কি করে বাধ্যতামূলক করা যায় ?

স্বাধীনতা লাভের পর **শিক্ষক-শিক্ষণ যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা** অনুভূত হয়। তবে নিরাশ হতে হয় এই ভেবে যে পরাধীন ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণের যে মান ও পদ্ধতি ছিল আজও তা বদলায় নি বা এ সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণাও হয় নি। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ শিক্ষা বিজ্ঞান আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে শিক্ষকের কাজ এখন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা বাস্তুবিদের (Specialist Doctor বা Engineer) কাজের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে শিক্ষার তথা শিক্ষকের মর্যাদা সমাজে এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি।

শিক্ষক-শিক্ষণের তত্ত্বের দিক বাদ দিলে হবে না, তবে তত্ত্বটিকে যাতে ব্যবহারিক দিক থেকে কাজে লাগান যায় সে দিকে নজর দিতে হবে এবং

এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে গবেষণা চালাতে হবে। তা ছাড়া পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পুর্ণ সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক দিক

শিক্ষকদের বিষয় বস্তু জ্ঞান ভাল থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণ কলেজে শিক্ষকেরা বিষয় বস্তুকে আয়ত্ত করেন পরীক্ষা পাশের জন্য। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে বিষয় বস্তুর পাঠ দিতে হবে শিক্ষার্থীদের সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান দানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য। প্রয়োজন স্থলে শিক্ষক শিক্ষণ কাল এক বছর থেকে বাড়িয়ে দু'বছর করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের শিক্ষাগত মান উন্নত করতে হবে এবং নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর গবেষণা করবার সুযোগ দিতে হবে।

শিক্ষকদের বিষয় বস্তুর জ্ঞান

সর্ব স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ—সর্ব স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য সরকারকে অবহিত হ'তে হবে। শিক্ষকতা পেশার উন্নয়নের জন্যে শিক্ষক-শিক্ষণকে করতে হবে অবৈতনিক ও আবশ্যিক। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির দ্রুত প্রসার কর্তব্য। প্রয়োজনস্থলে বি. এ. পরীক্ষায় যাদের শিক্ষাতত্ত্ব (Education) ছিল তাদেরও ২।৩ মাস হাতেকলমে শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত পরিচয় করিয়ে এবং স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের (Short Training)-এর ব্যবস্থা করে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সর্ব স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব সরকারের

নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলির দ্রুত প্রসার এবং নূতন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন সেদিকে সরকার নির্দেশ দিবেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভবিষ্যৎ নাগরিক গঠন করার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে শিক্ষক-শিক্ষণের আমুল পরিবর্তন প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের পাঠ্যসূচী ও কার্যক্রম ঠিক করতে হবে। যাতে উপযুক্ত অধ্যাপক এই সব শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন সেরূপ ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে এবং শিক্ষকতা-বৃত্তিকে একটি প্রয়োজনীয় জাতীয় বৃত্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

চারু ও কারুশিল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ—বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবার পর প্রত্যেকটি পাঠশালায় ২।৩ জন কারুশিল্পে পারদর্শী শিক্ষিকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত (বুনিয়াদী পদ্ধতিতে) শিক্ষকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। আবার চারুকলা শিক্ষিকার (Art and Craft Teachers) অভাব সব চাইতে বেশী। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ

কারুশিল্প শিক্ষিকার অভাব কেন?

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষাকে [প্রথম স্তর ৬—১১] সম্পূর্ণ রূপে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষারূপে প্রবর্তিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কারুকলা শি'ক্ষকার অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রায় অচল। এ ছাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এবং নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কারুকলা শিক্ষিকার বিশেষ প্রয়োজন। অথচ কারুকলা শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। এই সব কেন্দ্রেও প্রশিক্ষণ দেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এতদিন পর্যন্ত শুধু পুঁথিগত শিক্ষা চালু থাকায় কারুশিল্পের শিক্ষিকাদের কোন চাকুরী জুটতো না। তা ছাড়া এই জাতীয় শিক্ষিকাদের সামাজিক মর্যাদাও খুব একটা বেশী ছিল না। তাই হঠাৎ করে উদ্ভূত কারুশিল্প-শিক্ষক যোগানের সমস্যা নব-শিক্ষা ব্যবস্থাকে (New Education) প্রায় অচল করে দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষককে শিক্ষক-শিক্ষণ দিয়েও কারুশিল্প শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা যায় না। কারণ কারুশিল্পের প্রতি বিশেষ ঝোক (aptitude) থাকা চাই। শিক্ষনের সাথে অনুশীলন বড় একটা অংশ গ্রহণ করে। তা ছাড়া অনুশীলনের সময় যে পরিমাণ কাঁচামালের প্রয়োজন অনেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তার যোগান দিতে পারে না। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে শিল্পোৎপাদিত মাল বাজারে বিক্রয় করাও বেশ সমস্যার বিষয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং কারুশিল্পের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত গৃহ ও সাজ-সরঞ্জামে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কাজেই সরকারের পক্ষ থেকে এই সকল শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

কারুশিল্প প্রশিক্ষণ সমস্যাসঙ্কুল কেন?

বুনিয়াদী শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করতে গেলে বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করতে হবে। আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় আবাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকগণ বিদ্যালয় সংলগ্ন শিক্ষক-পল্লীতে বাস করবেন। শিক্ষকের জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীদের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ পুঁথিগত, সামাজিক জীবনের সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হবে শিল্প বা কৃষি-কর্ম এবং উক্ত কর্মটি ঐ অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের উপজীবিকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। উক্ত শিল্প কর্ম ছাড়া অন্যান্য চারু ও কারু শিল্পকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে জীবনের জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠক্রমে কর্ম, জ্ঞান, চিন্তার সমন্বয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

বুনিয়াদী শিক্ষা আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিগুলির অন্যতম হ'লেও শিক্ষকের কাজের গুরুত্ব এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেকটা বেশী। বুনিয়াদী

বিদ্যালয়ের তথা বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা, মননশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতার উপর। এদেশে শিক্ষকতাকে এখনও কেহ বড় একটা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন না। পল্লীগ্রামের বেশীর ভাগ শিক্ষক চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৃত্তি হিসেবে নিয়ে অবসর সময়টা শিক্ষকতা কার্যে (পাঠশালার পণ্ডিতি) নিয়োগ করেন। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই কারণ প্রাথমিক শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হয় তাতে একটি লোকের কোন রকমে ভরণপোষণ চলতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই গড়ে ৬।৭ জন পোষ্য আছেন কাজেই শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ বৃত্তি তাঁকে অবলম্বন করতে হয় জীবিকা নির্বাহের জন্য। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কাজও (যেমন কৃষি, কুটির শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য) করতে পারেন তবে শিক্ষকতা কাজটিকে মুখ্য বৃত্তি হিসেবে নিতে হবে। শিক্ষকতাকে মোটেই অবহেলা করলে চলবে না। বিদ্যালয় থেকে সংসারযাত্রা নির্বাহের সম্পূর্ণ অর্থ দেওয়া সম্ভব নয় কারণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা উৎপাদিত মালের বিক্রয় জাত অর্থ থেকে যে আয় হবে তা থেকে শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ২৫।৩০ ভাগ পর্যন্ত আসতে পারে। বাকী অর্থ আসবে শিক্ষা-কর থেকে। সরকার বা পৌরসভা উক্ত কর আদায় করে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী বা পৌরসভার সাহায্য (Grant-in-aid) হিসেবে দেবেন। ভারতবর্ষ অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনীতি -সমন্বিত তাই বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ১০০ টাকার বেশী দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ এই অর্থের দ্বারা প্রথম শ্রেণীর কেন তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকদেরও আকৃষ্ট করা যায় না। তাই শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে নিয়ে ও কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যে বেশ কিছুটা সময় শিক্ষকদের দিতে হবে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষক হবেন একজন আদর্শ নাগরিক।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক

সাধারণ পাঠশালাকে কর্মকেন্দ্রিক করে বুনিয়াদী ছাঁচে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু পাঠশালার শিক্ষকদের ৬ মাস বা ১ বৎসরের প্রশিক্ষণ (Training) দিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক রূপে গড়ে তোলা খুব শক্ত। বিশেষ করে যাঁরা গত ২০।২৫ বৎসর ধরে গতানুগতিক পদ্ধতিতে পাঠশালায় পড়িয়ে অভ্যস্থ, তাঁদের কাছে শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে অনুবদ্ধ প্রণালীতে পাঠ দেওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। তা হ'লেও হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ, সেমিনার (Seminar) ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়ে উহা অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষকদের নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করতে সাহায্য করতে হবে। প্রশিক্ষণ-ব্যয় সম্পূর্ণ রূপে সরকারকে বহন করতে হবে। তবে বর্তমানে প্রচলিত

প্রাচীন শিক্ষকদের বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে অভ্যস্থ করে তোলা

স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতিতে বুনিয়াদী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিলে ব্যর্থ হ'তে হবে। হার্বাটের পঞ্চসোপান বা ত্রিসোপান পদ্ধতি সর্ব বিষয়ের জন্য প্রয়োগ করলে চলবে না। **বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির মূল তত্ত্বটিকে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে বাস্তব করে তুলতে হবে।**

প্রশিক্ষণের জন্য নূতন শিক্ষক শিক্ষিকা বাছাই করবার সময় বিশেষ সতর্ক হ'তে হবে। নিম্নলিখিত **গুণগুলি বুনিয়াদী শিক্ষকের অবশ্যই থাকা চাই।**

নূতন বুনিয়াদী শিক্ষক নির্বাচনে সতর্কতা

(১) শিক্ষক সমাজ সেবার আদর্শ সম্পর্কে সচেতন এবং সমাজ সেবা কার্যে আগ্রহী হবেন। ছাত্র জীবনে এই আদর্শকে তিনি কতটুকু কার্যে রূপায়িত করেছেন তা জানাবার চেষ্টা করতে হবে। (২ শিক্ষক সর্বোদয় দর্শনে বিশ্বাসী হবেন। (৩) তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংগঠনে আগ্রহী হবেন। (৪) তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব সম্পন্ন হ'তে হবে। (৫) তাঁর যে কোন চারুশিল্প বা কারুশিল্পের দক্ষতা থাকা চাই। (৬) তিনি কর্মময় জীবনের আদর্শে বিশ্বাসী হবেন। (৭) তিনি কর্মের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে পাঠ দিতে সমর্থ হবেন। উক্ত গুণ সমন্বিত শিক্ষক সব সময় পাওয়া যায় না। তবে প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের উক্ত আদর্শে বিশ্বাসী ও কর্মে দক্ষ করে তুলতে হবে।

অনুশীলনী

(১ম অধ্যায়—পঞ্চম অধ্যায়)

১। শিক্ষা ব্যবস্থায় সমস্যার উদ্ভব হয় কিরূপে ?

২। শিক্ষা সমস্যার জন্য দায়ী কে ? কারণ সহ উল্লেখ কর—

৩। শিক্ষিত বেকার সমস্যার শিক্ষাগত কারণ কি ? ইহার প্রতিকারের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনায় কি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ?

৪। ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির আলোচনা কর।

৫। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগের মূল সমস্যা কোথায় ?

৬। মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন ভাষার স্থান নির্ণয় কর।

৭। সর্ব স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা নির্দেশনা অপরিহার্য কেন ? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা নির্দেশনা দেবার একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত কর।

৮। রচনাধর্মী পরীক্ষা ও আধুনিক অভীক্ষার প্রয়োগ—এই বিষয় দুটির ভাল ও মন্দ দিকের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৯। পাঠক্রিয়ার বিচার করবার মাপকাঠি কি ?

১০। সর্ব স্তরের শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়নের চিত্র অঙ্কন কর।

১১। শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের'—বিষয়টি আলোচনা কর।

১২। স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ এত সমস্যা সঙ্কুল কেন ?

১৩। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কিরূপে প্রবর্তন করা যায় ?

১৪। গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থার সাথে শিক্ষায় অনুন্নয়ন ও অপচয়ের সম্পর্ক কি ? কিরূপে এই অপচয় রোধ করা যায় ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিক দিক

ভূমিকা—এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে কোম্পানী আমলের গোড়ার দিকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা সরকার থেকে পাওয়া গিয়েছিল এদেশে প্রাচ্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করবার জন্য। বেসরকারী প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়। সরকার পক্ষ থেকে কতকগুলি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয় এবং উপযুক্ত বিদ্যালয়গুলিকে সরকার পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য (Grant-in-Aid) দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের চণ্ডী-মণ্ডপে গ্রামবাসীদের সাহায্য দ্বারাই চলছিল। পরে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষা-কর সংগৃহীত হ'তে থাকে জমিদারের খাজনা আদায়ের সাথে। প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব এসে পড়ে পৌর সভার উপর। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার ধীরে ধীরে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করতে থাকেন। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও সরকারী সাহায্যের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাত থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের হাতে চলে যাওয়ায় সরকার ঐ খাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়ের মোটা অংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে প্রতি-শ্রুত হন। এর পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির পরিচালনা, নূতন প্রজেক্ট গ্রহণ, গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগার স্থাপন ইত্যাদি খাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য আসতে থাকে ঐ কমিশনের তহবিল থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরী কমিশন ঐ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেয়ে থাকেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদগুলি রাজ্য সরকারের নিকট অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন তা ছাড়া পর্ষদের নিজস্ব কিছু আয়ের সংস্থান আছে। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে পর্ষদ অর্থ সাহায্য (Grant-in-aid) দিয়ে থাকে। সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের রিপোর্টের উপর এই অর্থ সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। সরকারী বিদ্যালয়ের সমস্ত আয় ও ব্যয়ের দায়িত্ব সরকারের। সরকারী কলেজগুলি সম্পর্কেও এ কথা সত্য। শিক্ষার পরিশাসন ব্যয়, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যয়, ছাত্রদের জলপানির ব্যয় ও বিশেষ জাতীয় শিক্ষার ব্যয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে আসে। তবে কারিগরী শিক্ষা,

শিক্ষার আয় ব্যয়ের ঐতিহাসিক দিক

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পরিচালনা বিজ্ঞান শিক্ষার (Management traning) বেশীর ভাগ অর্থ আসে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে।

স্বাধীনতা লাভের পর সার্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে। এ জন্য জাতীয় সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতদ্‌সত্বেও ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে ১৫ কোটি (৬ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়ে) প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। অর্থের অভাবে ইহার অল্প অংশই কার্যকরী হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে নিম্নলিখিত খাতে শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়ে থাকে।

১। বদান্য জনসাধারণের দান। ২। ছাত্র বেতন ইত্যাদি। ৩। পৌর-সভা, জেলাবোর্ড ইত্যাদির অর্থ সাহায্য। ৪। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য। ৫। রাজ্য সরকারের অর্থ সাহায্য।

শিক্ষা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে তাই শিক্ষার ব্যয় ভার দিনের পর দিন বেড়ে যাওয়ায় রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হ'তে হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় ভার ধীরে ধীরে রাজ্য সরকারের উপর চাপছে তাই শিক্ষার এই খাতে ব্যয় করবার অর্থ শিক্ষা-কর হিসেবে আদায় করতে সরকার বাধ্য হচ্ছেন। মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষার ব্যয় ভার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজ্যসরকারকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এত ব্যয় ভার বহন করেও সর্ব প্রকার শিক্ষার গড় ব্যয় শিক্ষার্থীর মাথাপিছু ১১ টাকার বেশী হচ্ছে না। সর্ব প্রকার শিক্ষার গড় যেখানে মাথাপিছু ১১ টাকা সেখানে

শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয়

উচ্চ শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় মিটিয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বাৎসরিক প্রায় এক টাকা খরচ হচ্ছে। এই খরচে কিরূপ প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। তবে আশার কথা এই যে গত (১৯৫০-৫১) খ্রীঃ মাথাপিছু ব্যয় ছিল ৩ ৪০ টা. (১৯৬০-৬১) খ্রীঃ উহা বেড়ে হয় ৮ টাকা এবং (১৯৬৫-৬৬) খ্রীঃ ; ১১ টাকা হয়েছে।

বিগত দশ বৎসরে শিক্ষাখাতে আয়ের তুলনামূলক হিসেব

আমরা গত দশ বৎসরে শিক্ষাখাতে আয়ের তুলনামূলক হিসাব থেকে একথা প্রতিপন্ন করতে চাই যে শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে আর বদান্য জনসাধারণের দান ও ছাত্র বেতন থেকে আয়ের মাত্রা কমে যাচ্ছে।

নিম্নে শিক্ষাখাতে আয়ের হিসেব * দেওয়া হোল।

শিক্ষার খাতে	(১৯৫৫—৫৬)		(১৯৬৫—৬৬)	
	আয়	শতকরা হার	আয়	শতকরা হার
১। বদান্য জন সাধারণের দান	৯˙৬	৯˙৬%	৩৪˙০	৬˙২%
২। ছাত্র বেতন ইত্যাদি	২০˙০	২০%	৮০˙০	১৪˙৫%
৩। পৌরসভা ও জেলাবোর্ডের সাহায্য	৮˙৬	৮˙৬%	৩৬˙০	৬˙৫%
৪। রাজ্য সরকারের সাহায্য	৫৬˙৫	৫৬˙৫%	৩৬০˙০	৬৫˙৫%
৫। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য	৫˙৩	৫˙৩%	৪০˙০	৭˙৩%
মোট	১০০˙০০	১০০˙০%	৫৫০˙০	১০০%

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিক্ষা-ব্যবস্থার আথিকদিকের গুরুত্ব—দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য সুরু হয়েছে। জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করে জাতীয় উৎপাদকতা (Productivity) বৃদ্ধি করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ছোট বড় অনেক প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আবার নূতন প্রকল্পের (Project) কাজ হয়ত শীঘ্রই আরম্ভ হবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে নাগরিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। নাগরিকদের প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযুক্ত না করলে ইহা সম্ভব নয়। শিক্ষা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন। এই উন্নয়নের জন্য শিক্ষার পুনর্গঠন অপরিহার্য। গত ২০ বৎসর ধরে নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে এই পুনর্গঠন কার্য এগিয়ে চলেছে। আথিক অভাব হেতু শিক্ষা পরিকল্পনায় কাজ প্রতি পদেই ব্যাহত হচ্ছে এবং জাতীয় উন্নতিও পিছিয়ে যাচ্ছে। এদেশে শিক্ষা পরিকল্পনায় অর্থ ব্যয়কে জাতীয় লগ্নী হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। পরিকল্পনার মাত্র ৬ শতাংশ অর্থ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ ৭˙৫ শতাংশ ধরা হয়েছে। আবার এদেশের জাতীয় আয় এত কম যে (১৯৬৫-৬৬) খ্রীঃ জাতীয় আয়ের ২˙৮১ শতাংশ ব্যয় করা সত্বেও শিক্ষা খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হয়েছে খুবই সামান্য। (১৯৬৫-৬৬) খ্রীঃ সর্ব প্রকার শিক্ষা খাতে মাথাপিছু ব্যয় ছিল ১১ টাকা। মাথাপিছু এই সামান্য অর্থ ব্যয় করে কোনপ্রকার উন্নত ধরণের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (৬ থেকে ১৪ পর্যন্ত বালক বালিকাদের জন্য) প্রবর্তন করতে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষা পরিকল্পনা তথা সামগ্রিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নের

* আয়ের হিসেব কোটি টাকায়

জন্য আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে। পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থের দ্বারা শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের চেষ্টাকে সীমিত রাখলে ১০০ বৎসরের মধ্যেও শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য স্থানীয় সংস্থাকেই শিক্ষা-কর আদায় করে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে হবে। সরকারকে এই মহতী কার্যে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করে চলতি খরচের খানিকটা অংশ কারুশিল্পোৎপাদিত মাল বিক্রয় করে সংগ্রহ করতে হবে। গ্রামবাসীদের জমি দান, গৃহদান ও শ্রমদানের উপর বিদ্যালয়ের জমি ও বাড়ী নির্ভর করছে। পালাক্রমে শিক্ষকদের দু'বার বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য চালাতে হবে অবশ্য এ জন্য তাঁদের কিছু ভাতা দেওয়া হবে। বর্তমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিনে এই ভাতা প্রাথমিক শিক্ষকদের আয়ের একটা মোটা অংশ হবে এবং অল্প খরচে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্ভব হবে।

গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সর্বস্তরের শিক্ষার সমান সুযোগ দিতে হবে। এ জন্য গরীব ও মেধাবী শিশুদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জলপানির আশু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া শিক্ষার অপচয় দূর করার জন্য শিক্ষাখাতে অর্থের ব্যবহার এমন করতে হবে যে উহা যেন জাতীয় লগ্নীর মর্যাদা লাভ করতে পারে। এ জন্য কর্মসংস্থানের সাথে শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিশেষ করে মাধ্যমিক, কারিগরী ও পেশা শিক্ষার সুষ্ঠু যোগাযোগ রাখতে হবে।

এদেশের জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী বলে ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৭% অংশ আর ২০ থেকে ৬৯ নাগরিকদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ জন। শতকরা পঞ্চাশ জনের মধ্যে শতকরা ১০ জন বৃদ্ধ ও অবসর প্রাপ্ত তাই মোট জন-সংখ্যার শতকরা ৪০ জন নাগরিককে শতকরা ২৭ জনের শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করতে হয়। আবার এদের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা এত বেশী যে শিক্ষা খাতে ব্যয় করবার মত কোন অর্থ অধিকাংশ নাগরিকের থাকে না। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা পারিবারিক খাদ্য বাজেটের টাকা কেটে সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন কারণ শিক্ষা ছাড়া এই সমস্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কোন পৈতৃক সম্পদ নেই বললেই চলে।

পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা-ব্যবস্থা অর্থাভাবে খুবই অনুন্নত। পল্লীবাসীদের আয় এত কম যে শিক্ষা বাবদ খরচ করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে। কৃষিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করতে হ'লে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। কৃষি পণ্যের উপর কর বসিয়ে পল্লী অঞ্চলের শিক্ষার ব্যয় অনেকাংশে মেটান সম্ভব। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদকতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদকতা

বৃদ্ধি পেলে দেশ খাদ্য সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও ভোগ্য বস্তুতে সচ্ছল হয়ে উঠবে। উপযুক্ত শিক্ষার ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হবে উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদকতা (Productivity) বৃদ্ধি হেতু জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অতি অল্প দিনের মধ্যে ঐ ব্যয় জাতীয় লগ্নীর (National investment) মর্যাদা লাভ করবে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার ব্যয়-ভারের অগ্রাধিকার নিরূপণ—

গণতন্ত্রী সরকারের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভারের সমস্ত দায়িত্বই সরকারের। তবে সরকারের আর্থিক সামর্থ্য সীমাবদ্ধ বলে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যয় ভার বহনের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে নিম্নের পর্যায় ক্রমে শিক্ষার ব্যয়-ভারের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(১) আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (৬ থেকে ১১ পর্যন্ত) যাতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সম্পন্ন হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে একযোগে কাজ করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, গবেষণা ও শিক্ষার মান নির্ণয় খাতে খরচ কেন্দ্রীয় সরকারের এবং শিক্ষার চলতি খরচের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার। বিদ্যালয় গৃহ ও তার শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব স্থানীয় জন সাধারণের। এ ছাড়া শিল্পসংস্থা, কৃষিসংস্থা ও যানবাহন সংস্থাকে তাদের শ্রমিকদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়-ভার বহন করতে হবে। শিক্ষা-কর আদায়ের দায়িত্ব পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির হ'লেও যারা কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবে রাজ্য সরকার তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন ও চলতি ব্যয়-ভার অভিভাবকদের বহন করতে হবে। সরকারের তরফ থেকে পাঠাগার, পরীক্ষণাগার, শারীর শিক্ষা ও শিশু-সমীক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের (Specialist teacher) ব্যয়ভার সরকারকে বহন করতে হবে। তা ছাড়া এই স্তরের ছাত্র-কল্যাণমূলক কার্যের ব্যয়-ভার ও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ ব্যয়-ভারের শতকরা ৫০ ভাগ সরকার বহন করলে ভাল হয়। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ব্যয়ের মাত্রা কমাবার জন্য সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর্যায়ে নিয়ে এলে ঐ খাতে বাড়তি অর্থ উপযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিকে গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ হিসেবে দেওয়া যায়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের সম্পূর্ণ ব্যয়-ভার সরকারকে বহন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার মান রক্ষা, শিক্ষা পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গবেষণার ব্যয়ভার বহন করবেন।

(৩) বৃত্তি-শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও পেশা শিক্ষার ব্যয়ভারের বেশী অংশ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। বিভিন্ন পেশা সংস্থা, শিল্প, কৃষি ও যানবাহন সংস্থাকে এদের শ্রমিক ও টেকনিশিয়ানদের (Technician) শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের ব্যয় বহন করতে হবে। পরিচালনা বিজ্ঞান (Management Training) ও শ্রমিক-শিক্ষার (Workers' Education) ব্যয় আংশিক কেন্দ্রীয় সরকারের আংশিক শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ও কৃষি-সংস্থার বহন করার কথা।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার চলতি ব্যয় ভার রাজ্য সরকারকে এবং উন্নয়ন-মূলক ব্যয় ও গবেষণার ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে।

(৫) এ ছাড়া সামাজিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ও বিকলাঙ্গদের শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় ভার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে যুগ্ম-ভাবে বহন করতে হবে।

(৬) শিক্ষা-পরিশাসন, শিক্ষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষা-পুনর্গঠন ব্যয় যুগ্মভাবে উভয় সরকারকে বহন করতে হবে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আর্থিক সমস্যা

প্রাক্ প্রাথমিক স্তর—এই স্তরের শিক্ষার ব্যয় সাধারণ ভারতবাসীর আর্থিক সঙ্গতির বাইরে। উচ্চ-কোটি ও উচ্চ মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য এই ব্যয় ভার বহন করতে পারেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের স্বামী স্ত্রী যেখানে চাকুরী করেন সেখানে নিরুপায় হয়ে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি করিয়ে দেন। এই স্তরের শিক্ষার বিশেষ মুল্য রয়েছে কিন্তু যেখানে এখনও এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ও অবৈতনিক করে তোলা যায়নি সেখানে প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের বিরাট ব্যয় ভার সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই সরকার এই স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ ও গবেষণার ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত আছেন। এর ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য প্রায় ব্যর্থ হ'তে চলেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর—এই স্তরের বিষয় বিস্তৃত ভাবে তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন বিষয়টিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি রূপে বিচার করে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার স্থানীয় সংস্থা ও জন সাধারণকে একযোগে কাজ করতে হবে। অযথা ব্যয়ের মাত্রা কমিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে যাতে দেশের এই বিপ্লবাত্মক কার্যটি সম্পন্ন করা যায় সে জন্য অকৃপণ ভাবে সরকারকে অর্থ, শক্তি ও সদিচ্ছা নিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন সংস্থাচালিত বিদ্যালয়গুলিকে

সাধারণ বিদ্যালয়ের (Common school) পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এই সব প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গবেষণা এবং প্রাথমিক স্তরের জন্য শিশু সাহিত্য ও শিশুদের উপযোগী বিজ্ঞানের কথা, দেশের কথা ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি কার্য করলে দেশের একটা বড় অভাব সহজেই দূর হ'তে পারে।

মাধ্যমিক স্তর—মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র বেতন এই স্তরের শিক্ষার ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ। অভিভাবকেরা এই ব্যয়-ভার বহন করে থাকেন। তবে বর্তমানে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হওয়াতে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেক অভিভাবকের পক্ষে পুত্রকন্যাদের বেতন দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া এই স্তরে পাঠ্য পুস্তকের দামও খুব বেশী। এই স্তরে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তিত হওয়াতে বিদ্যালয় পরিচালন ব্যয়ও বেশ বেড়ে গেছে। তাই রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য (Grant-in-aid) না পেলে পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি অচল হয়ে পড়বে। যে সমস্ত বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পায় নি সেগুলির পক্ষে শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া সম্ভব নয় আর বর্ধিত হারে বেতন দিতে না পারলে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে না ফলে শিক্ষার মান হবে নিম্নগামী। অর্থাভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠাগার, খেলার মাঠ, পরীক্ষণাগার ইত্যাদি ভাল ভাবে গড়ে তোলা যায়নি। অথচ এগুলি গড়ে তুলতে না পারলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন অসম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তর—এই স্তরে ছাত্রবেতন, পরীক্ষার দক্ষিণা ইত্যাদি মিলিয়ে ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ সংগৃহীত হয়। বাকী অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন। গবেষণার সম্পূর্ণ খরচ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে যুগ্মভাবে বহন করতে হবে। এ ছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনার কার্য বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রহণ করতে হবে এবং সরকার এর ব্যয়ভার বহন করবেন। বৃত্তি-শিক্ষা, পেশা-শিক্ষা ও কারিগরী-শিক্ষা—এ জাতীয় শিক্ষার ব্যয় ভার আংশিকভাবে ছাত্রবেতন থেকে আসবে কিন্তু বেশী অংশ সরকারকে বহন করতে হবে। এ ছাড়া আদিবাসীর শিক্ষা, অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষা, পরিচালনা-বিজ্ঞান শিক্ষা ও শ্রমিক-শিক্ষার বিরাট ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের যোগান—

পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে পাঁচটি বিভিন্ন উৎস থেকে শিক্ষাখাতে অর্থ সংগৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাহায্য থেকে এই খাতে আসে শতকরা ৭২ ভাগ বাকী অর্থ ছাত্র বেতন, বদান্য জন সাধারণের দান ও স্থানীয়

সংস্থা ও পৌরসভার আর্থিক সাহায্য থেকে সংগৃহীত হয়। জন সাধারণের দানের মাত্রা গত ১৫ বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ থেকে শতকরা ৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ছাত্র বেতনের আয়ের পরিমাণ ঐ সময়ের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগে নেমে এসেছে। ধীরে ধীরে শিক্ষার ব্যয়-ভার সরকারী সাহায্যের উপর বেশী করে নির্ভরশীল হচ্ছে অথচ জাতীয় আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়াতে সরকারের পক্ষে শিক্ষাখাতে প্রয়োজন অনুরূপ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই **নিম্নলিখিত উপায়ে শিক্ষাখাতে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।**

১। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা-কর (Education cess) স্থাপন ও উহা আদয়ের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। জমির খাজনার সাথে এই কর আদায় করা সহজ।

২। কৃষিজাত পণ্যের উপর কর ধার্য করে তার বেশী অংশ কৃষি-শিক্ষা ও পল্লীঅঞ্চলের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে।

৩। শিল্পজাত মাল উৎপাদনের উপর কর ধার্য করে শিল্প-শিক্ষা ও শ্রমিক-শিক্ষার জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়।

৪। উচ্চ শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়তে পারেন। আদায়ীকৃত অর্থ থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা, বৃত্তি-শিক্ষা, পেশাশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ঋণ দিতে পারেন। এই সমস্ত শিক্ষার্থী কর্মসংস্থানের পর সুদ সহ ঐ ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

৫। অভিভাবকদের আয়ের শতাংশের (Percentage) অনুপাতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে ছাত্র-বেতন ধার্য করা যেতে পারে। এতে ছাত্র-বেতন থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়বে।

৬। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাঙ্ক, ও অর্থদানকারী সংস্থা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যাতে ঋণ পেতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থার প্রতি সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৭। প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীদের দ্বারা উৎপাদিত কারুশিল্পজাত মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে বিদ্যালয়ের চলতি খরচের অনেকটা সংকুলান হয়।

৮। এ ছাড়া নানা প্রকার প্রদর্শনী খেলা (Charity match) অভিনয় ও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী, লটারী ইত্যাদির সাহায্যে প্রচুর অর্থের যোগান দেওয়া যায় শিক্ষাখাতে যদি সরকার পক্ষ থেকে উক্ত বিষয়গুলি সুপরিকল্পনার সাহায্যে পরিচালনা করা যায়।

৯। শিক্ষা-দপ্তরের নির্দেশে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ,

জমির ফসল তোলা, শিল্প-বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্থায় শিক্ষাণবিশীর কাজ করে পয়সা রোজগার করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে পারে।

১০। শিক্ষা সম্পর্কে নানা প্রকার বিদেশী সাহায্য (Foreign educational Grants এবং বিদেশী ঋণ (Foreign educational loan) থেকে শিক্ষা খাতে অর্থের যোগান দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক অপচয় নিবারণ—প্রাক্‌প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের সংগঠনকারী ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের আয়ের একটা মোটা অংশ লভ্যাংশ হিসেবে নিয়ে থাকেন। আইন করে এই জাতীয় ব্যবসা বন্ধ করতে হবে এবং এদেশের উপযোগী প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কাছ থেকে মোটা ছাত্র-বেতন নিয়ে যারা প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ঠাট্ বজায় রেখেছেন তাদের এই ব্যবসাদারী মনোভাব যাতে দূর হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে লক্ষ টাকা খরচ করে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনাকে বাতিল করে দিয়ে এদেশের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করতে হবে। কণ্ট্রাক্টরদের হাতে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ ছেড়ে না দিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তদারকে ঐ কার্য সমাধা করাই বাঞ্ছনীয় নতুবা অর্থের প্রচুর অপচয় হবে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্য পুস্তকগুলি যাতে সস্তা দরে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনোলজিগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে। সব স্তরে শিক্ষা-পরিশাসন ব্যয় কমাতে হবে। একই কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থার উপর দিয়ে শিক্ষাখাতে খরচের মাত্রা বাড়ালে চলবে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য ব্যয়ের তালিকা—শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের অগ্রাধিকার হিসেবে নিম্নলিখিত ব্যয় অপরিহার্য—

১। শিক্ষকদের বেতন শিক্ষাখাতে ব্যয়ের একটা বড় অংশ। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশে সর্ব স্তরের শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতন দিতে হবে। বেতন ছাড়া সরকারী কর্মচারীদের মত অন্যান্য সুবিধা (benefits) এবং ভাতা (allowance) শিক্ষকদের দিতে হবে।

২। সর্বপ্রকার শিক্ষায় প্রত্যেকটি নাগরিক যাতে সমান সুযোগ পায় তার জন্য শিক্ষার সর্ব স্তরে প্রয়োজন অনুরূপ জলপাণির (Scholarship) ব্যবস্থা করতে হবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও পেশা-শিক্ষায় শিক্ষা-ঋণের (Educational loan) ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩। সর্ব স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর গবেষণা এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে মৌলিক গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি ও যানবাহনের উপরও গবেষণা কার্য চালাতে হবে উপযুক্ত সংস্থার মারফৎ। সরকার এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করবেন।

৪। সর্বপ্রকার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মত সর্তসাপেক্ষ অর্থ সাহায্য (Grant-in-aid) একক ভাবে বা যুগ্ম ভাবে দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারকে। এ ছাড়া বিদ্যালয়গৃহ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষণাগার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য সর্তসাপেক্ষ এককালীন অর্থ সাহায্য (lump grant) উভয় সরকারকে করতে হবে প্রয়োজনের তাগিদে।

৫। এ ছাড়া শিক্ষা-পরিশাসন ব্যয়, শিক্ষা-পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার সাহায্যে শিক্ষার পুনর্গঠন ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে।

তবে শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয় করবার সময় মনে রাখতে হবে যে উদ্দেশ্যে যে টাকা শিক্ষাখাতে সংগৃহীত হয়েছে সেই বিষয়ে সেই টাকা ব্যয় করতে হবে। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে ব্যয়ের অগ্রাধিকার হিসেবে শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় আয় ও শিক্ষা খাতে ব্যয়—আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে ছাত্রের মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় কত কম। গত ২০ বৎসরে জাতীয় আয়ের শতকরা কত অংশ শিক্ষা-খাতে ব্যয় করা হয়েছে নিম্নে তার হিসাব দেওয়া হোল—

শিক্ষা খাতে ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব

(১৯৫০-৫১)	(১৯৫৫-৫৬)	(১৯৬০-৬১)	(১৯৬৫-৬৬)
১.২৩%	১.৯১%	২.৪৩%	২.৮১%

কিন্তু উন্নত দেশগুলি তাদের জাতীয় আয়ের বেশ কিছু অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। ইংলণ্ড করে ৫.৩%, আমেরিকা করে ৬.২%, জাপান করে ৫.২% এবং রাশিয়া করে ৭%; এমন কি উন্নতিকামী অন্যান্য দেশগুলি ৪.৫% অংশের কম শিক্ষাখাতে ব্যয় করে না। যদিও জাতীয় আয়ের খুব অল্প অংশই শিক্ষা খাতে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে তবুও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষা খাতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণও উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। জাতীয় আয় অতি সামান্য বলে সরকারের পক্ষে শিক্ষা খাতে আরও বেশী অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের আওতায় যে আমলা তান্ত্রিক সরকার কাজ করছে তার পরিচালনায় শিক্ষার পরিশাসন (Administration) ব্যয় অত্যধিক। সরকারী অর্থের অর্ধেক অপচয় হয় অসাধু কণ্ট্রাক্টারদের মারফৎ সরকারী অর্থে বিদ্যালয় গৃহ, আসবাব পত্র ইত্যাদি তৈয়ার করতে গিয়ে।

আমরা লক্ষ্য করেছি আমেরিকা, রাশিয়া ও গ্রেটব্রিটেনের মত উন্নত দেশগুলি শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ থেকে ৭ অংশ ব্যয় করে থাকে। ঐ সমস্ত দেশের জাতীয় আয় আমাদের দেশের চাইতে অনেক বেশী এবং জনসংখ্যাও তুলনামূলক ভাবে কম। সে জন্য দেখতে পাই আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় ১৯০০ টাকার বেশী, রাশিয়ার ১৫৫০ টাকা বৃটেনের ১১০০ টাকা, জাপানের ৬০০ টাকা আর ভারতবর্ষের মাত্র ১১ টাকা।

শিক্ষাখাতে আয়ের পরিমাণ বাড়তে না পারলে শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক খরচের পরিমাণ বাড়ান যায় না। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর বদান্য জনসাধারণের অর্থ সাহায্য খুব দ্রুত কমে আসছে। দিনের পরে দিন পণ্য মূল্য এমন আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে যে সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। পণ্যদ্রব্যের মহার্ঘতার জন্য সর্ব স্তরের শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতন দিতে হচ্ছে। এখনও শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য পেশা অবলম্বনকারীদের তুলনায় অর্ধেকের কম। এতদসত্ত্বেও শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষা খাতে আয় এত অল্প কেন?

শিক্ষা পরিকল্পনার আর্থিক দিক—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৩৩ কোটি, ২য় পরিকল্পনায় ২০৮ কোটি, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪১৮ কোটি টাকা আর ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় উহা ১২১০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। মূল পরিকল্পনাগুলির বরাদ্দ অর্থের তুলনায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমান যে বেশ কম তা নিম্নের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাবে।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পরিকল্পনার শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ

	মোট বরাদ্দ অর্থ	শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ	শতকরা হিসাব
১ম পরিকল্পনা	২০৬৮	১৩৩	৬·৪%
২য় পরিকল্পনা	৪৮০০	২০৮	৫·০%
৩য় পরিকল্পনা	৮৬৩১	৪১৮	৬·৯%
৪র্থ পরিকল্পনা	১৬০০০	১২১০	৭·৫%

বর্তমানে মূল পরিকল্পনার শতকরা ৭·৫% এর মত ব্যয় করে শিক্ষাখাতে চাহিদার শতকরা ৩০% মেটান যাচ্ছে না। তাই নূতন শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষা গ্রহণ করবার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে কিছু উৎপাদন করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুকালে শিক্ষার্থীরা যাতে কিছু আয় করে শিক্ষার ব্যয় ভার খানিকটা বহন করতে পারে সেদিকে ও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির অর্থ জাতীয় লগ্নী বৃদ্ধি—কোম্পানী আমল থেকে আমরা দেখে আসছি ভারতবর্ষের শিক্ষা সমস্যার সাথে আর্থিক সমস্যা

* হিসেব কোটি টাকায় ধরা হয়েছে।

ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ১৯৬১ খৃঃ জুনমাসে ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগের সচিবদের সভায় শিক্ষার ব্যয়ভার সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। অর্থের অভাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নি। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিষয়টি আবার বিবেচিত হ'তে পারে। শিক্ষা খাতে কোম্পানীর বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার বিষয়ে মস্ত বড় শিক্ষার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। শিক্ষার ইতিহাস পাঠ করবার সময় লক্ষ্য করেছি অনেক কমিশন বা কমিটির ভাল ভাল সুপারিশ সরকার গ্রহণ করতে পারেন নি অর্থের অভাবে। শিক্ষা খাতে অর্থ শুধু খরচ হয়, আয়ের কোন ব্যবস্থা এতে নেই। তাই এত সমস্যা। কিন্তু দূরদৃষ্টি নিয়ে শিক্ষাখাতে খরচকে জাতীয় স্বার্থে অর্থলগ্নী (Investment for national interest) বলে বিবেচনা করলে শিক্ষাখাতে অর্থবিনিয়োগের নীতি পরিবর্তিত হ'তে পারে। ব্রিটিশ আমলে যতটুকু অর্থ ব্যয় হয়েছে তার পেছনে ছিল জন সাধারণের দাবী। অবশ্য সরকার নিজের প্রয়োজনে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বৎসরের পর বৎসর। পরাধীন দেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় ছিল সকলের নীচে, কারণ দেশের সামগ্রিক উন্নতি হয় বিদেশী সরকার তা চান নি। কিন্তু ইহা খুবই পরিতাপের বিষয় এই যে স্বাধীন ভারতে জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এখনও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় নি; এমন কি সমগ্র বাজেট প্রণয়নে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের শতাংশ (Percentage) এখনও খুব কম। আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা করে শিক্ষা খাতে প্রচুর টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়। এই টাকা কমিয়ে দেওয়ার অর্থ শিক্ষার মানকে অবনমিত করা। কারণ বর্তমান চড়তি বাজারে অল্প বেতনে ভাল শিক্ষক পাওয়া যাবে না এবং ভাল ছেলে আকৃষ্ট করার মত বেতন না দিলে বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা শিক্ষা বিভাগে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কলেজে বা স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করতে আসবে না।

শিক্ষাখাতে ব্যয়

কোন সুপরিকল্পনা না থাকায় অর্থ আদায় এবং সেই অর্থ শিক্ষার প্রয়োজনে সব সময় ঠিক মত ব্যয় হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারতবর্ষে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় পরিচালনায় খরচের কথা ভাল করে না ভেবে স্কুলগৃহ, পরীক্ষণাগার ইত্যাদি নির্মাণের জন্য চুন, বালি ও ইট কিনতেই প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেল। আসল শিক্ষা সংস্কারের কাজে ব্যয় করার মত অর্থ আর সরকারের হাতে থাকলো না। এগুলিকে শিক্ষাখাতে প্রকৃত ব্যয় বলা যায় না। সরকারের নজর দেওয়া উচিত শিক্ষা পরিচালনার খরচের দিকে। জন সাধারণ জমিদান ও

সরকারী ব্যবস্থায় শিক্ষাখাতে প্রাপ্ত অর্থের অপব্যয়

শ্রমদান করে এবং অন্যান্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করতে পারে। বর্তমানে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে যে সমস্ত বিদ্যালয় চলে তার একটি বিদ্যালয়ের খরচের টাকা দিয়ে ৬।৭ টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। গ্রাণ্ট-ইন-এড্ ব্যবস্থা চালু রেখে শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এতে প্রচুর অর্থ শিক্ষার উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা সম্ভব হয়।

কোন দেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজের উপর দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে। অর্থের অভাব এই অজুহাতে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যের কোনরূপ ক্ষতি হ'তে দেওয়া উচিত নয়। পৃথিবীর উন্নতিকামী দেশগুলির উন্নতি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির উপর অনেক খানি নির্ভরশীল। দেশের নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার বিস্তার যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে। অর্থের অভাব হ'লে শিক্ষাকর আদায় করে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হবে। কঠোর হস্তে কর আদায় করা উচিত কারণ করদাতাগণই আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উপকৃত হবেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার সামগ্রিক দিকে বিচার করা হয়েছে কিন্তু শিক্ষাখাতে ব্যয়ের মাত্রা এত কম যে শিক্ষাক্ষেত্রে যত সত্বর আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তা এতে সম্ভব নয়। অর্থের অভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা পিছিয়ে থাকবে সেই পুরাতন নীতি এখনও আঁকড়ে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। গান্ধিজী শিক্ষার, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার, এই বিপুল ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তাই ভারতবর্ষের মত গরীব দেশের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষাপরিচালকেরা গান্ধিজীর প্রায় সব বিষয় মেনে নিয়েছেন শুধু শিক্ষা সম্পর্কে আয় ও ব্যয়ের দিকটা মেনে নিতে পারেন নি। প্রয়োজন স্থলে রদলবদল করে গান্ধিজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করলে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা অর্থের অভাবে বন্ধ থাকবে না। উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা খাতে প্রচুর ব্যয় করা হয় কারণ ঐ সমস্ত দেশে শিক্ষা খাতে ব্যয়কে জাতীয় লগ্নী (National investmant) হিসেবে বিচার করা হয়; ভারতবর্ষকেও সেই পথ অনুসরণ করতে হবে।

শিক্ষাখাতে বিপুল ব্যয়

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠনের অসুবিধাগুলি উল্লেখকর।

২। শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অবদান কি?

৩। 'সাম্প্রদায়িক জীবন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ'—আলোচনা কর।

৪। গতানুগতিক শিক্ষায় পরীক্ষার প্রভাব কি?

৫। পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বাধুনিক মতবাদগুলি উল্লেখ কর।

৬। 'উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন প্রয়োজন'—এ মতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৭। এদেশের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা এত অনগ্রসর হবার কারণ কি ?

৮। 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অবিচার করা হয়েছে'—কথাটি বুঝিয়ে বল।

৯। শিক্ষাখাতে অর্থ ব্যয়কে জাতীয় লগ্নী বলা হয় কেন ?

University Questions

1. What is the place of school building in the educational programme? What principles would you follow in the educational planning of a school building in different stages of instruction? [B. Ed. 1960 Viswavarati]

2. What is the place of library in a good school? How as a Headmaster will you organise it so that it may be utilized properly? [C. U. B. T. 1956]

3. What are the qualifications and functions of a Headmaster? Why should he be consulted in the selection of teachers. [C. U. B. T. 1955]

4. How would you ensure parent teacher co-operation in the education of the school pupil? [C. U. B T. 1954]

5. What are the basic principles which would guide us in curriculum construction? [B. T. 1955 & 58 B. A. (Hons.) 1959]

6. Why are craft and creative activites forming part of school curricula? Indicate the educational value of knowledge correleted to normal activites of children. [B. A. 1957]

7. Describe critically the principles that should operate in the choice of school studies. [B. A. 1960]

8. Describe the utility of extra-curricular activities in educational institutions. [B. A. 1959]

9. Why are extra curricular activites now generally called co-curricular. Cite some types of such pursuits that can be introduced in our schools. [B. A. 1960]

10. How would you organise extra curricular activities in your school with a view to the training of character? Give a proper scheme. [B. T. 1954]

11. Discuss the psychological significance of audio visual education? Make a list of simple forms of audio-visual aids which can be used in schools without much difficulty or expense. [B. T. 1950, 53 & 55]

12. Discuss the techniques of questions and answers regarding class room instructions. [B. T, 1956]

13. Why is class as a teaching unit challanged to-day? Describe some methods which help individual instruction. [B. T. 1959]

14. 'The New Type Examination is not an unmixed blessing'—Discuss. [B. Ed. 1961]

15. Critically examine the influence of Public Examination on teaching. [B. A. 1961 & 62]

16. Write an essay on the *reforms of examinations.*

17. What are the categories of teachers Training Institutions of West Bengal? What progress has been made in teacher edcation under Five year Plans? [B. A. 1965]

18. Discuss the problems of language teaching in primary schools of West Bengal. [B. A. 1965]

19. What are the problems of the present system of secondary school examinations in West Bengal? Offer suggestions for improvement.

20. Set forth your views about an ideal curriculum for primary education. [B A. 1968]

21. Discuss the problems connected with the recruitment, selection and training of teaching personnel for our secondary schools. [B. A. 1964]

22. 'In the early stages the curriculum should he thought of in terms of activities rather than subjects.' Do you agree? Give reasons for your answer. [B. A. 1961]

23. 'A rationally conceived curriculum must be the resultant of these two factors: The nature of the child and the requirements of the community.' Give an outline of such a curriculum. [B. T. '58]

24. What do you mean by Cumulative Record Card? What are its uses? Write out a specimen of Cumulative Record Card. [B. T. '48]

25. Why examinations are called necessary evils? What are your suggestion for the improvement of the present system of Examination?

26. Enumerate the psychological characteristics of play as distinguished from work. What do you understand by play way in education. [B. A. 1966]

27. 'The aim of instruction is not the production of many sided knowledge but of a many sided interest'—Elucidate. [B. A. 1966]

28. What are the different needs of the adolescent? How far are they provided in our Secondary Schools? [B. A. 1966]

29. Write an essay on the reform of examination. [B. A. 1964]

30. What are New type tests? What are their merits and demerits? [B. A. 1963]

31. Indicate clearly the necessity of Educational methods and techniques in class room teaching. [B. T. 1953, 1954]

32. What different means of exposition can be adopted for teaching young children. Explain in some details. [B. T. 1948]

33. Bring out the implications of Project method of teaching and explain clearly how the curriculum may be organised on the basis of Project. [B. A. 1968]

34. Give a critical estimate of Dalton plan as an organination of school work stating possibilities for its adoption in your school. [B. A. 1964]

ভারতীয়

শিক্ষা-সমস্যার গতি-প্রকৃতি

তৃতীয় খণ্ড

এদেশের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ ও সেগুলির প্রতিকারের নির্দেশনা এই খণ্ডের আলোচ্য বিষয়।

SYLLABUS

Problems relating to Primary education :—

Problems of Free & Compulsory Primary education.

Basic education.

English in Primary curriculum.

Teaching Personnel, test and examination in Primary education.

Aims, methods, contents of nursery and infant education. Necessity of infant education—importance of early years. Problems of nursery & infant education—properly trained teachers—social consciousness, attitude of parents etc. Special problems of big cities—industrial areas etc. Maladjustment and guidance. Historical development in our country and comparison with other countries, present day position, future plans.

Problems relating Secondary Education :—

Aims of Secondary Education—its nature, methods, contents—Needs of adolescence—individual difference—requirements of the country—employment opportunities. Guidance in secondary school, plan of secondary education—secondary and primary education—secondary and vocational education—secondary and higher education—upgrading and diversification of higher secondary education—history-back ground—needs—comparison with other countries. Present day position - special difficulties and problems, Five year ylans, future plans.

Problems relating to Technical, Vocation and professional education :—

Aims—relation with general education, individual aptitude—requirement of the country, planned economy. Co-ordination between education and employment, short history, present day position. Special problems and future plans of the following :—

(a) Technical education (b) Legal education (c) Medical education (d) Engineering education (e) Educations (f) Agriculture (g) Art and craft (h) Other vocation & professions.

Problems relating to education for handicapped :—

State responsibility. Present day position and future plans. Education and rehabititation, comparison with some other countries, special problems, methods, present position and future needs of each of the following :

(a) Mentally handicapped—deficient and retarded children (b) Blind children (c) deaf & mute children (d) cripled children (e) Other forms of handicap.

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক—ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ৫ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে শিশুর জন্য কোন প্রকার প্রত্যক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা (formal education) এদেশে ছিল না। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে শিশু-জীবনের পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হোত। পারিবারিক পরিবেশে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের সুযোগ ছিল। গ্রামেভরা ভারতের শতকরা ৯৯টি শিশু প্রাকৃতিক পল্লী পরিবেশেই গড়ে উঠতো। পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু নানা বাধানিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকলেও প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ভাগ্যে ঐ জাতীয় বিড়ম্বনার গ্লানি ছিল না। এই বয়সে মায়ের কোল থেকে শিশু বঞ্চিত ছিল না কারণ মায়েরা তখন চাকুরী ক্ষেত্রে আসেন নি। মায়েরা যখন চাকুরী ও ব্যবসার খাতিরে গৃহ পরিবেশের বাইরে আসতে বাধ্য হন তখনই শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সস্নেহ পরিচর্যার প্রয়োজন গভীর ভাবে অনুভূত হয়। তাই এদেশের নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল সহরে ও শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পাশ্চাত্য দেশ বিগত তিন শতাব্দী ধরে শিল্প বাণিজ্যে অনেক উন্নত হয়েছে; ফলে জীবন যাত্রার মান বেড়ে যাওয়ায় একা স্বামীর পক্ষে সংসারের সমস্ত খরচ যোগান অসম্ভব হয়ে উঠে। মহিলাদের জীবন সংগ্রামে যোগ দিতে হয় পুরুষের সহ-কর্মী হিসেবে। শিশুরা মাতৃকোল থেকে বঞ্চিত হয়। জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক এই শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হ'লে রাষ্ট্র এবং শিক্ষাবিদদের ভাবিয়ে তোলে শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে। পাশ্চাত্য দেশে শিশু-শিক্ষার পরিপূর্ণ রূপটি বিগত চার শত বৎসর ধরে বির্বর্তিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। আমরা **সংক্ষেপে কয়েক জন শিক্ষাবিদের শিশু-শিক্ষা সাধনার কথা উল্লেখ করতে চাই।**

পাশ্চাত্য দেশে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা

রুশো—রুশোর মতে শিশু-শিক্ষায় শিশুর জন্মগত মানসিক ও শারীরিক **শক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। শিশুর জন্মের পর তার জীবতত্ত্বমূলক প্রকৃতি অবিকৃত ও বিশুদ্ধ থাকে। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি প্রনোদিত মানুষের সমাজের সংস্পর্শে এসে ক্রমে উহা কলুষিত হ'তে থাকে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুর আদিম প্রকৃতির (nature) বিকাশের সুযোগ থাকা দরকার। তাকে**

প্রচলিত পুঁথিগত পাঠক্রম থেকে কিছু শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই। জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই তার শিক্ষা সুরু হবে। তাকে কোন সদ্‌গুণ বা সদ্ অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হবে না। শিশু তার আপন প্রকৃতির বিকাশে প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠবে। এই শিক্ষাকে নেতিবাচক শিক্ষা (Negative education) বলা হয়েছে। তাঁর মতে এই নেতিবাচক শিক্ষায় সত্যকার শিক্ষার কোন প্রকার অপচয় হয় না ; এই সময় শিশু হয়ত পাঠক্রম নির্দ্ধারিত কোন জ্ঞান আয়ত্ব করে না, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের জন্য তার মন ও ইন্দ্রিয়গুলি পুষ্ট ও সুগোঠিত হয়ে ওঠে।

কমেনিয়াস বলেন যে শিশু-শিক্ষা পদ্ধতিকে বাস্তব ভিত্তিক করতে হবে। তিনি বাস্তবাদী দার্শনিকদের মুখপাত্র হিসেবে এ জাতীয় শিক্ষার অমূর্ত বস্তুর জ্ঞানদানের বিরোধিতা করেন।

রবার্টওয়েন—নিজে শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করে শিশু শিক্ষায় পৃথক পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এ কথা প্রমাণ করেন যে বড়দের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে শিশু-শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। শিশুর প্রয়োজনকে এখানে বড় করে দেখতে হবে সমাজের প্রয়োজনকে বড় করে দেখলে চলবে না।

পেসতালৎসী—শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা পেসতালৎসী সর্ব প্রথম না বললেও তিনিই শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সার্থক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সমর্থ হন। তার শিক্ষা-ব্যবস্থা মূলতঃ শিশু মনোবিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল। তিনি বলেন পরীক্ষণের (Experiment) সাহায্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার মুল্যায়ন যাচাই করে নিতে হবে। পরীক্ষণের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে ভাষা শিক্ষা, পুঁথিগত অমূর্ত বস্তুর বিদ্যা মুখস্থ করে আয়ত্ব করা বা নীতি শিক্ষার মধ্যে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সে যুগে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করার রীতি ছিল। যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপুর্ণ পরিবেশে শিশু-শিক্ষা-ব্যবস্থা তৎকালে প্রচলিত ছিল, তিনি তার বিরুদ্ধে নব-শিক্ষার (New Education) আন্দোলন আরম্ভ করেন। তার মতে শিশু-মনোস্তত্বভিত্তিক সুশিক্ষা শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন সাধন করেই সীমিত হবে না, সমাজের পুনর্গঠন ও উহার নৈতিক মানের উন্নয়ন ব্যবস্থাও শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকবে।

প্রকৃত শিক্ষা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিশুর মানসিক শক্তি, আগ্রহ, রুচি ও কর্ম প্রবণতাই তাকে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার প্রতি আগ্রহান্বিত করে তোলে। শিশুরা যখন শিক্ষকের তাড়না ও শাসন থেকে মুক্ত হবে তখন গৃহের সস্নেহ সহযোগিতার আদর্শ বিদ্যালয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে। তিনি ভাবকে মূর্ত বস্তুর মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে প্রয়াসী ; কারণ শিশুর কাছে বিমূর্ত ভাব সত্যকার জীবনের আবেদন নিয়ে আসতে পারে না। বাস্তব পরিবেশে এবং

মূর্ত বস্তু ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে হবে। তিনি শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্যেই শিক্ষার পূর্ণতা দেখতে পান নি। তিনি চেয়েছিলেন যে শিশু স্বাবলম্বী হবে এবং শিশুর অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণাঙ্গ হবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁর শিশু-শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি শিল্প শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন।

হার্বার্ট—হার্বার্ট ছিলেন পেসতালৎসীর শিষ্য। তিনিও গতানুগতিক শিশু-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অপেক্ষা জ্ঞান অর্জনকেই উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থা বলে মনে করেন। হার্বার্ট বলেন যে, পুরাতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা নূতন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করি ; কাজেই শিশু-শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।

ফ্রয়েবল—ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে পেসতালৎসী সর্বপ্রথম রুশোর বিপ্লবাত্মক শিক্ষানীতিকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব রূপ দান করেন। তবে তিনিও অনেকটা ভাবপ্রবণ শিক্ষক ছিলেন। শিশুদের সাথে একা বসবাস করে তিনি শিশুদের ভাল করে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু শিশু বিদ্যালয়ে সুশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে সমর্থ হন নি। শিক্ষা যে শিশুকেন্দ্রিক হবে এবং প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশই যে শিশুর সর্বাঙ্গীণ ও সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব এ সম্বন্ধে রুশো, পেসতালৎসী ও ফ্রয়েবল এক মত। প্রকৃত-পক্ষে শিক্ষা সম্পর্কে পেসতালৎসীর পরীক্ষাগুলিকে অবলম্বন করেই ফ্রয়েবল শিক্ষার মূল সূত্রগুলির রূপ দিয়েছেন। মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন তত্ত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন অবরোহ প্রণালীর দ্বারা। পেসতালৎসী শিক্ষক-শিক্ষণের সময় কাগজ, পোষ্টকার্ড, কাঠ ও অন্যান্য জিনিষের সাহায্যে কিছু করতে দিয়ে শিশুর সৃজনী-শক্তির পরিচয় পান এবং শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় শিশুর কর্মচঞ্চল মন ও তার ব্যবহারের পথ লক্ষ্য করেন। বীলহার্ডগ্রামে তিনি পরীক্ষামূলক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর দুই শিষ্য ল্যাঙ্গেথাল্ ও মিডনেডর্ক এখানে তাঁর সাথে যুক্ত হন। শিশুদের সমস্ত শক্তির সুসমঞ্জস বিকাশ ছিল এই বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার মূল নীতি। আত্ম বিকাশ (Self development) ও স্বাধীন বিকাশ (Free development)—এই দু'টি মূল নীতি কতকগুলি কাজের মধ্য দিয়ে অনুসৃত হ'তে থাকে। একমাত্র খেলা ও স্বাধীনভাবে নির্বাচিত কাজের মধ্য দিয়েই স্বাভাবিক ভাবে শিশুর আত্মিক বিকাশ সম্ভব। এই জাতীয় শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ ও শিক্ষা-উপকরণ চাই। তাঁর মতে শিক্ষিকারা বাগানের মালিনীর মত শিশুরূপী চারা গাছগুলির যত্ন করবেন। তিনি বলেন যে তাঁর বিদ্যালয়ে শিশুরা বনের ফুল, ফল, পাখি, পোকা, গাছ, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেগুলি নিয়ে খেলা করবে। কাদা, কাঠ, কাঠের গুড়ো, বালি, জল, তুলো ইত্যাদি সংগ্রহ করে দুর্গ, প্রাসাদ, নদীর বাঁধ, খোয়ার,

ময়দার কল, পল্লীগৃহ, বন, উপবন ইত্যাদি অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বিষয়গুলি তৈয়ার করে আনন্দ পায়। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বস্তু, ব্যক্তি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাথে তারা পরিচিত হ'ত পারে।' পরিণত বয়সে তিনি শান্ত অরণ্য-ভূমিতে অবস্থিত ব্ল্যাকেনবুর্গ গ্রামে একটি শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই শান্ত পরিবেশে ভ্রমণ কালে Kinder Garten অর্থাৎ শিশু-উদ্যান নামটি তার মনে হঠাৎ উদিত হয়। ঐ বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয় কিণ্ডার গার্টেন। এই ভাবে কিণ্ডারগার্টেন (K. G.) স্কুলের জন্ম হয় এবং এখানে বস্তু-ভিত্তিক পাঠ (object lesson) প্রবর্তিত হয়। ফ্রয়েবল কতকগুলি উপহার (gifts) ও কার্যবিধি (occupations) উদ্ভাবন করে সেগুলিকে যথাক্রমে শিক্ষা ও উপকরণ ও শিক্ষা-প্রক্রিয়া রূপে ব্যবহার করেন।

ম্যাডাম মণ্টেসরী—ডাঃ মণ্টেসরী ছিলেন একজন স্বনামধন্য মানসিক ব্যধির চিকিৎসক। ডাঃ সেগুইর (Dr. Seguin) প্রবর্তিত যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি ক্ষীণ বুদ্ধি (feeble minded) ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন গবেষণায় ব্রতী হন। শিক্ষামূলক সরঞ্জামের ব্যবহারের দ্বারা ক্ষীণ-বুদ্ধি শিশুদের শিক্ষণের উৎকর্ষ দেখে তিনি শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং পরে তাঁর প্রবর্তিত শিশু-শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষা-উপকরণের গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নানা ভাবে শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা সতেজ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর শিক্ষামূলক সরঞ্জাম (Didactic Apparatus) শিশুদিগকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ (observation & experiment) কার্যে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফ্রয়েবল শিশুর আত্মিক বিকাশের জন্য বস্তুভিত্তিক পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু মণ্টেসরী চেয়েছিলেন শিশুর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি, সৌন্দর্যবোধ এবং বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ তাঁর বস্তুভিত্তিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে। শিক্ষামূলক সরঞ্জাম তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাণ স্বরূপ। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কতকগুলি সরঞ্জাম ইন্দ্রিয় চর্চামূলক আর কতকগুলি বুদ্ধি-বিকাশমূলক। তিনি শিশু-শিক্ষায় শিক্ষপ্রদ পরিবেশের যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। মণ্টেসরী স্কুলের পরিচালিকা (Governess) পরোক্ষভাবে শিশুদের শিক্ষা-প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে থাকেন।

ডিউই—রুশো মনে করতেন সামাজিক পরিবেশ শিশু-শিক্ষার পরিপন্থী কিন্তু ডিউই এর মতে একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই উন্নত ধরণের শিশু-শিক্ষা সম্ভব। তিনি তাঁর Experimental school-এ নানাবিধ কর্মভিত্তিক পাঠের (activity programme) মধ্য দিয়ে নূতন শিশু শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, ঔৎসুক্য, সৃজনী প্রতিভা, কর্মপ্রীতি ও সমস্যা সমাধানের আনন্দকে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন নানাবিধ কার্যক্রমকে (project) আশ্রয় করে। তাঁর মতে বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, পারিবারিক

পরিবেশ সব কিছুই শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ। এই সমস্ত পরিবেশে শিশুর জীবন প্রক্রিয়ার নানাবিধ সংঘাত ও সংযোগ ঘটবে। সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শিশু নিজেই উহার সমাধানে এগিয়ে যাবে। সমস্যা দেখা দিলেই শিশুর মন কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে উহা সমাধানের জন্য। অভ্যস্থ আচরণে বাধা পেলেই শিশু সক্রিয় হয়; তাই শিশু-শিক্ষায় সক্রিয়তার মূল্য খুব বেশী। ডিউই বলেন বর্তমান জীবনের প্রয়োজনে নূতন পথের সন্ধান শিশুকে প্রতি নিয়তই করতে হয় সমস্যা সমাধানের জন্য। এই ভাবে শিশু-জীবনে অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন সম্ভব হয়। ইহাই প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষণ-পদ্ধতিমূলক-শিক্ষা প্রক্রিয়া। আমরা লক্ষ্য করেছি যে সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই শিশু-শিক্ষা বাস্তবধর্মী (pragmatic) হয়ে ওঠে। এজন্য ডিউই-এর মতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সক্রিয়তাই আধুনিক শিশু-শিক্ষার মূল নীতি।

রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ কর্মকেন্দ্রিক শিশু-শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আশ্রমের শিশুরা ব্যক্তিগত জীবনে স্বাবলম্বী ও ব্যবহারিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের শিক্ষা লাভ করত নানা প্রকার কাজ ও খেলার মধ্য দিয়ে। সৌন্দর্যবোধ, সুরুচি ও সু-অভ্যাসমূলক এবং সাংস্কৃতিমূলক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে গুরুদেব শিশুদের মনুষ্যত্বের বিকাশকে সম্ভব করে তুলে ছিলেন। তিনি শিশুদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনকে শিক্ষার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিশু-শিক্ষায় সহৃদয় শিক্ষকের নেতৃত্বকে তিনি স্বীকার করেছেন।

গান্ধিজী—গান্ধিজী মনে করেন পাঠশালার মধ্যে শিশু-শিক্ষা-ব্যবস্থা আবদ্ধ থাকবে না। গৃহ, খেলার মাঠ, আত্মীয় স্বজনের বাড়ী, ধর্মস্থান ইত্যাদি স্বাভাবিক পরিবেশে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সমস্ত স্বাভাবিক পরিবেশকে শিশুর শিক্ষা-উপযোগী করে তোলা। পেসতালৎসীর মত তিনিও শিশুর স্বাবলম্বনের চেষ্টার মধ্যে শিশু-শিক্ষার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে লক্ষ্য করেছেন। কারুশিল্পের মাধ্যমে শিশুর আত্মপ্রত্যয় জন্মে এবং অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষক শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশের সাথে শিশুকে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলতেন **'আমি চাই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর হাতের নিপুণতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও আত্মার বিকাশ'**। গান্ধিজীর মতে শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা প্রাক্-বুনিয়াদী শিশু-শিক্ষায় অপরিহার্য।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—শিশু-শিক্ষা বলতে ৫ বৎসরের বেশী যাদের বয়স তাদের বোঝানো হয়েছে। নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন কথা দু'টি আমাদের দেশে নূতন। এদেশের শিশুদের মাতা-পিতাদের শতকরা

২১১ জন নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার খবর রাখেন কিনা সন্দেহ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ছোটবড় কয়েকটি সহরে চালু হয়েছে ও হচ্ছে। পল্লীগ্রামের অভিভাবকেরা এখনও অনেকে কিণ্ডারগার্টেন বা নার্শারী স্কুল দেখেন নি। পাঁচ বৎসরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয়ের যে প্রয়োজন আছে এ কথা এখনও অনেকে ভাবেন না। শিশুর জীবনে এই পাঁচটি বৎসর বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। শিশু-মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে যে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বিশেষ কার্যকরী, যে সমস্ত অভিজ্ঞতা শিশুর ব্যক্তি সত্তার সংলক্ষণ (traits of personality) গড়তে সাহায্য করে তা শৈশবের আচরণ এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সংযোগের ফলেই সম্ভব হয়ে থাকে। নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেনেই ইহা সম্ভব।

নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শৈশবের গুরুত্ব—মানব শিশুর জীবনে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে শৈশব (১ বৎ—৫ বৎ) দীর্ঘস্থায়ী। শিশুর জীবনে বৃদ্ধি ও বিকাশ Growth & development) ধারাবাহিক ভাবে চলে। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা শিশুর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রয়েড ও তার অনুবর্তীদের মতে শৈশবের এই পাঁচ বৎসরে শিশুর ব্যক্তি সত্তার ভিত গড়ে ওঠে। এই সময় শিশুর শারীরিক বিকাশ অপেক্ষা প্রাক্ষোভিক বিকাশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এর উপরই শিশুর ব্যক্তিত্বের কাঠামো প্রস্তুত হয়। অবশ্য শিশুর মানসিক বিকাশ ৩ বৎসর থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে বেশ দ্রুত হয়। প্রাক্ষোভিক বিকাশ স্বাভাবিক না হ'লে শিশুর মনে নানা রূপ কমপ্লেক্স (complex) সৃষ্টি হ'তে পারে। শৈশবের অপসঙ্গতি কৈশোরে বা যৌবনে গুরুতর আকার ধারণ করে। শৈশবে শিশু মনে যে অহংভাব (Ego consciousness) বলবতী হয়ে ওঠে তার জন্য সুষ্ঠু প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। শিশুর সামাজিক চাহিদা ও আত্ম-বিকাশের চাহিদার সমন্বয় সম্ভব হ'তে পারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে। মনে রাখতে হবে শিশুর আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে পরম সহায়ক। এই সময় শিশুর কৌতুহল বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসার মত তাকে সদা কর্মচঞ্চল করে রাখে। শৈশবে শিশুরা পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ থেকে নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতি এবং অভ্যাসগুলি অনুকরণ করে থাকে। তা ছাড়া শৈশবের স্নেহ-ভালবাসা, ভয় ও ক্রোধকে কেন্দ্র করেই শিশুর ব্যক্তি সত্তা স্বরূপে ব্যক্ত হয়। শৈশবের অপসঙ্গতির ভায়বহ পরিণতিকে রোধ করবার জন্য শিশু-শিক্ষায় সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘস্থায়ী শৈশবের গুরুত্ব থেকেই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর জগৎ বয়স্ক মানুষের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের কর্ম, চিন্তা, কল্পনা ও শৃঙ্খলা অভিনব। আমরা গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে আপাত দৃষ্টিতে শিশুদের কার্যাবলীতে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হ'লেও প্রকৃত পক্ষে তারা তাদের কাজের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করে। তাদের স্বাভাবিক চিন্তা দৃঢ়সম্বন্ধযুক্ত না হ'লেও সৃষ্টি-ধর্মী কাজ বা যৌথ খেলা পরিচালনায় তা বেশ সাহায্য করে। জন্মের সময় শিশুর কোন সামাজিক চেতনা থাকে না। শারীরিক, মানসিক ও প্রক্ষোভিক বিকাশের সাথে তার সামাজিক চেতনাও বৃদ্ধি পায়। প্রথমে তাদের ন্যায়অন্যায় বোধ থাকে না। কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে ন্যায়-অন্যায় বোধ জন্মে। সদ্-অভ্যাস সৃষ্টির উপযুক্ত সময় হচ্ছে শৈশব। এ সময় শিশু খুব অনুকরণপ্রিয় থাকে। শৈশবে শিশুদের পরিবেশটিকে সুন্দর ও মধুর করে গড়ে তুলতে হবে। দেখা গেছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ে উঠবার জন্য শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া এ সময় শিশুর আত্মবিকাশে বাধা জন্মিলে পরবর্তী জীবনে উহার ফল খুব খারাপ হয়। শৈশবে শিশু যদি কোন মানসিক আঘাত পায় তা হ'লে পরবর্তী জীবনে উহা তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে জীবনকে বিষময় করে তুলতে পারে। শৈশব কাল শিশুদের দৈহিক ও মানসিক সত্তা গঠনের উপযুক্ত সময়। কোন বাধাধরা পাঠ্যতালিকা এদের পক্ষে উপযোগী নয়। এদের জীবনের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়েছে। এই স্তরে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকে, সর্ব প্রকারে তার প্রাকৃতিক বিকাশে (natural growth) সাহায্য করা। এই সময় খেলা ভিত্তিক পরোক্ষ শিক্ষা (Play way in education) ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে কোন প্রকার শিক্ষা প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ প্রস্তুত করতে হবে যে শিশু তার স্বাভাবিক বিকাশের আন্তরিক (Internal) প্রেরণায় বেড়ে উঠবে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে তাকে সাহায্য করবে। শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশকে সম্ভব করবার জন্যই প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

শৈশবের শিশু প্রকৃতি

শিক্ষা পদ্ধতি—প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকে নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত সরকার তথা রাজ্য সরকার এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও এ সম্বন্ধে কোন আইন-প্রণয়ন করেন নি বা শিক্ষা পরিচালনার জন্য কোন প্রকার অর্থ সাহায্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ করেন নি। সরকারী সহযোগিতা ছাড়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই উন্নত হ'তে

পারে না যদিও শিক্ষাসম্পর্কীত প্রারম্ভিক কার্য জন সাধারণ ও শিক্ষাবিদেরা করে থাকেন। মনোবিজ্ঞানীরা নানা প্রকার গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালের পুর্বে শিশুদের কোন প্রকার নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা (formal education) দেওয়া সম্ভব নয় কারণ মনের সাবালকত্ব (maturity) তখনও আসে না এবং কোন প্রকার সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে প্রযোজ্য হ'তে পারে না। এখন প্রশ্ন হ'ল কোন সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে না পারলে এই স্তরের জন্য পাঠক্রম প্রস্তুত করার প্রয়োজন কি? এবং কি ভাবে সেই পাঠক্রম প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হবে?

এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যায় যে এই স্তরের পাঠক্রম যদি প্রস্তুত হয় তবে উহা অন্যান্য স্তরের পাঠক্রমের চাইতে আলাদা হবে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে শিশুরা কর্মচঞ্চল এবং ভাঙ্গন ও গড়নের খেলায় ওরা খুবই উৎসাহী। নাচ, গান, খেলা ও এক সঙ্গে কাজ করার মধ্যে মনের স্ফূর্তি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ওদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ। শিশুরা খুবই অনুকরণ-প্রিয় কাজেই শিশু-শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত করবার সময় শিশু-শিক্ষার পরিবেশের কথাও মনে রাখতে হবে। তা ছাড়া শিশুদের সন্ধানী মন ও নূতনকে জানার আগ্রহের খোরাক দেবার জন্য গৃহের বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নূতন জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রসিদ্ধ তিনজন শিক্ষাবিদ পেসতালৎসী, ফ্রয়েবল ও মণ্টেসরী শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে নূতন পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। এঁদের তিনজনের প্রবর্তিত শিশু-শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থেকে এই স্তরে পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। খেলাই হবে এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যম। শিশুজীবনের সক্রিয়তা খেলার মধ্যে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। খেলার সাজসরঞ্জামগুলিকে শিক্ষাপ্রদ করতে পারলেই প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত করা যায়। শিশুদের কল্পনা আমাদের কল্পনা থেকে আলাদা। তারা মায়ের অনুকরণে পুতুলকে দুধ খাওয়ায়, পুতুলের বিয়ে দেয়, পুতুলের অসুখ করলে ডাক্তার ডাকে। এমনও দেখা গেছে যে একটা কাঠি বা বাঁশের টুকরোকে ছেলে বা মেয়ে কল্পনা করে খেলার ছলে শিশুরা অনেক সুন্দর ভাবভঙ্গী করে। কমেনিয়াস শিশুদের জন্য চিত্রসমন্বিত পুস্তক রচনা করেছিলেন। পেস্‌তালৎসী তাঁর বিদ্যালয়ে বস্তুমূলক পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফ্রয়েবল প্রাকৃতিক প্ররিবেশে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। মণ্টেসরী কতকগুলি খেলার সরঞ্জাম তৈরী করেছিলেন তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য।

শিক্ষার পরিবেশ—রুশো থেকে ডিউই, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ মুক্ত পরিবেশে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সমাজে শিশুকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সামাজিক পরিবেশেই শিশু শিক্ষার

পাঠক্রমকে কার্যকরী করা বাঞ্ছনীয়। এ জন্য শিশু বিদ্যালয়টিকে একটি ক্ষুদ্র সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা ও সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় শিশুরা হাতে-কলমে শিক্ষা করবে। কর্মে শিশুদের আনন্দ। শিশুরা যাতে যৌথ কর্ম সম্পাদন করে সহযোগিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি সামাজিক বৃত্তি-গুলির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিজ গৃহে শিশুকে মানুষ করলে কেহ হয়ত বেশী আদর পায় কেহ হয়ত পায় গালমন্দ বা অনাদর। শিশুর নানাবিধ প্রক্ষোভিক বিকাশ উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া হয় না। খেলার সাথী তার বড় সম্পদ। প্রাকৃতিক পরিবেশে, খেলা করা, কাজ করা, ইত্যাদির মধ্যে শিশুর স্বাভাবিক প্রাক্ষোভিক বিকাশ সম্ভব।

পাঠক্রম—মনোবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে কোন প্রকার শিক্ষা প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ প্রস্তুত করতে হবে যে শিশু তার স্বাভাবিক বিকাশের আন্তরিক (internal) প্রেরণায় বেড়ে উঠবে। উপযুক্ত পরিবেশ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে তাকে সাহায্য করবে। শিশুকে ভবিষ্যতে যে সমস্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে হবে নার্শারী স্কুলের পাঠক্রমে তার স্থান সর্বাগ্রে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনে চলা।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম মেনে চলা

অঙ্গসঞ্চালন, শরীর মার্জনা করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, পোষাক পরা ও সময় মত স্নানাহার ইত্যাদির অভ্যাস যৌথভাবে বিদ্যালয়ে ৩।৪ ঘণ্টা থাকার সময় গঠিত হবে। এজন্য সময় নির্ঘণ্টে নিয়ম মত কাজের নির্দেশ দেওয়া হবে। এতে নিয়ম শৃঙ্খলা ও কর্তব্যবোধ ইত্যাদির নৈতিক বিকাশ সম্ভব হবে।

শৈশবে শিশুদের নূতনকে জানবার আগ্রহ বেশী থাকে। নানা স্থানে

নূতনকে জানবার আগ্রহ

ভ্রমণের (ফুলবাগানে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে, চিড়িয়াখানায়, নদীর ধারে, মাঠের ধারে) ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষিকা শিশুদের আগ্রহ-মূলক প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিয়ে তাদের জানাবার আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তুলবেন।

নার্শারী স্কুল সংলগ্ন একটি বাগান থাকা বাঞ্ছনীয়। সেখানে শিশুদের নিজেদের ফুলের গাছ থাকবে। ওরা ঐ গাছটির যত্ন করবে আবার সমবেত-

নানাপ্রকার শিক্ষা-উপকরণ

ভাবে বাগানের কাজও করবে। গাছে ফুল ফুটলে ওরা কর্মের আনন্দ উপলব্ধি করবে। এ ছাড়া এই বিদ্যালয়ের একটি কোণে বালি, কাঠের গুঁড়ো, প্লাষ্টিসিন, জল, মাটি, কাদা ইত্যাদি থাকবে। শিশুরা ঐগুলির সাহায্যে পুতুল, খেলনা, ঘরবাড়ী ও নানাবিধ প্রকৃতিক পরিবেশ রচনা করবে।

নানা জাতীয় খেলনা তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম থাকবে যেগুলি ব্যবহার করে ওরা ওদের সৃজন-মূলক মনোভাবকে পরিতৃপ্ত করতে পারে।

সৃজনমূলক কাজ

নৃত্য, গান, অভিনয়, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুমনের শিল্পরুচি ও শিল্পকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। নার্শারী স্কুলের শিক্ষিকাদের নৃত্য, গান ও অভিনয়ে পারদর্শিতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পরুচির উন্মেষক কাজ

শিশুমনের বিভিন্ন প্রক্ষোভ যাতে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের সুযোগ পায় তার জন্য পাঠক্রমে যৌথকর্ম, অভিনয়, ভ্রমণ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

প্রক্ষোভের সঙ্গতি বিধান

সর্বোপরি যে সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা সামাজিক পরিবেশে লাভ করবার ব্যবস্থা এতে থাকবে। স্বার্থত্যাগ, কর্তব্যবোধ, আত্মনির্ভরতা, স্বাবলম্বী মনোভাব, শ্রমশীলতা, দায়িত্ববোধ, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি গুণাবলী ব্যক্তিগত ও সমাজগত ব্যক্তিসত্তা গঠনের বিশেষ সহায়ক। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ রূপায়ণের ভিতর দিয়ে শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

সামাজিক পরিবেশে শিক্ষা

শৈশবে খেলার মূল্যায়ন—প্রচলিত পুঁথিসর্বস্ব নিষ্ক্রিয় শিক্ষায় শিশুর এক স্বাভাবিক বিরাগ আছে; এর কারণ পুঁথির বিষয় বেশীর ভাগই তার অভিজ্ঞতার বাইরে। মুখস্থ করে উহা তাকে আয়ত্ত করতে হয়। শিশুর জীবন সক্রিয় ও প্রাণচঞ্চল তাই রুশো, মণ্টেসরী, ফ্রয়েবল, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী সকলেই শিশু-শিক্ষায় (infant education) দলবদ্ধ ভাবে কাজ ও খেলার প্রচুর ব্যবস্থার কথা বলেছেন। শিশু-শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খেলাচ্ছলে পড়া (play way in education) ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

খেলায় রত শিশুকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে গভীর মনোযোগের সাথে সে হয়ত কোন সৃজনমূলক কাজ করছে নয়ত কোন শিল্পকর্মে নিযুক্ত আছে। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা শিশুকে করে তুলছে আত্মসংযমী। খেলা ও কাজের মধ্যে শিশু নানা কৌশল ও সামাজিক নীতিশিক্ষা করে থাকে এবং এর মধ্য দিয়েই শিশু জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিশুর মনন ও কল্পন খেলার মধ্যে রূপ লাভ করে। অবদমিত শিশু-কল্পনা খেলার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। খেলা বা কাজ নির্বাচনে শিশুর স্বাধীনতা থাকবে। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশুরা খেলা ও কাজের পার্থক্য ভুলে যায়। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে

খেলায় অন্তর্জাত শৃঙ্খলা

শিশুরা খেলা ও কাজের সক্রিয় পন্থাকেই বড় করে দেখে, খেলা ও কাজের উদ্দেশ্যকে বড় করে দেখে না। তা ছাড়া দলবদ্ধ ভাবে কাজের আনন্দও কম নয়। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম প্রস্তুতের সময় একথা মনে রাখতে হবে যে শিশুরা যদি স্বাধীন ভাবে এবং দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে পারে তবে কাজ ও খেলার মধ্যে শিশু সমান আনন্দ পায়।

শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবলই প্রথমে প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাচ্ছলে শিক্ষা-ব্যবস্থা (Play way in education) প্রবর্তন করেন। আধুনিক শিশু-শিক্ষায় সহ-পাঠক্রমিক কাজগুলিকে খেলার ছাঁচে ঢেলে শিশুদের আনন্দের খোরাক দিতে হবে। প্রকৃত পক্ষে খেলা ও কর্মই শিশুর জীবন ; তাই প্রাক্-প্রাথমিক পাঠক্রমে খেলার স্থান সর্বাগ্রে।

খেলাচ্ছলে শিক্ষা

সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা—নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ভাব খুব বেশী থাকে। ওরা নিজেদের থালা, গ্লাস, তোয়ালে, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব সচেতন। অবশ্য দলবদ্ধ ভাবে অনেকক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকবার ফলে ওদের মধ্যে সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে। দলবদ্ধ ভাবে নাচ, গান, খেলাধুলা ইত্যাদির মধ্যে ওরা নূতন জীবনের আনন্দ পায়।

নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব

বিদ্যালয়কে একটি ক্ষুদ্র সমাজে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে আধুনিক শিক্ষাবিদ্দের। প্রত্যেকটি শিশুই সমাজের এক একটি অংশ। সকলের সমবেত সাহায্য ও সহযোগিতায় আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা দেবার জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রকল্যাণ ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মধারা প্রবর্তন করতে হবে। সমাজকল্যাণকর কাজের মধ্যে শিশু যাতে আনন্দ পায় এবং সেই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় সে কথাও মনে রাখতে হবে। শিশুরা কাজ করতে ভালবাসে। দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে করতে ওদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব দূর হয়। শিক্ষা জটিল আকার ধারণ করবার পর প্রত্যক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গৃহ ছেড়ে শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন স্বভাবতই গৃহ ও সমাজ থেকে ওরা দূরে চলে আসে। গুরুগৃহে বা আবাসিক বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে সহজেই সামাজিক বৃত্তিগুলির বিকাশ হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ শিশু যখন সমাজে ফিরে আসে তখন সমাজে ও পরিবারে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তাই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু যাতে বিদ্যালয়ে অবস্থান কালেই সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করতে পারে সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

সমাজ একটা গতিশীল ও প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠান। পুরাতনকে ভেঙ্গে নূতন কিছু গড়ার প্রেরণা ও আদর্শ শিশুরা বিস্তালয়েই পেয়ে থাকে। বিস্তালয় রূপ সমাজে অবস্থান কালে সমাজের নানা সমস্তার সাথে তাঁরা পরিচিত হয়। যারা আজ বিস্তালয়ের ছাত্র ভবিষ্যতের সমাজ তারাই গড়ে তুলবে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিশুদিগকে বিস্তালয়েই নানা জাতীয় কর্মের মাধ্যমে সুনাগরিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

সু-নাগরিকতা শিক্ষা

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান—আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু এগিয়ে এসেছে শিক্ষার পুরোভাগে। শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে আছেন পর্দার আড়ালে নেপথ্যে বা শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের একান্ত আপন জনের মত। তবুও শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কমে নি বরং বেড়েই চলেছে। বর্তমানে শিক্ষকের দায়িত্ব বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকের দায়িত্ব সমাজের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কার্য অপেক্ষা মোটেই কম নহে। এক কথায় এই বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষকের কাজ টেক্‌নিক্যাল কাজগুলির মধ্যে অন্যতম। পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করে জ্ঞান দান করা হ'ত বা কয়েকটি কৌশল দেখিয়ে দিলেই চলতো। এখন বক্তৃতার যুগ ফুরিয়েছে। এখন শিক্ষক শিক্ষাদান করেন না, প্রত্যক্ষ কাজের ভেতর দিয়ে যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে তিনি তাতে সাহায্য করেন। আধুনিক শিক্ষক একজন সুপরিকল্পক হবেন। শিক্ষার্থীরা যে কার্য বা প্রজেক্ট সম্পাদন করতে চায় প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক সে বিষয় শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ যাতে সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয় শিক্ষক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন; প্রয়োজন স্থলে শিক্ষককে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই বিকাশ লাভে কোন বিঘ্ন ঘটতে দেখলে তার কারণ নির্দেশ করা, অভিভাবকদের সে বিষয়ে অবহিত করান এবং শিক্ষকের ক্ষমতার মধ্যে যদি সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা সম্ভব হয় তবে সানন্দে ও সাগ্রহে সাহায্য করা শিক্ষকের কর্তব্য।

গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে শিক্ষার্থী যাতে উপযুক্ত নাগরিক হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষকের সক্রিয় দৃষ্টি থাকবে। শুধু শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই তাঁর দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পাঠাগার, খেলার মাঠ, সামাজিক অনুষ্ঠান-কেন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর পাশে থাকবেন বন্ধু হিসেবে। শিক্ষার্থীর জীবন দর্শন শিক্ষকের জীবন দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হ'তে পারে, সে জন্য শিক্ষকের নিজের জীবন দর্শন ও জীবন যাত্রা সম্পর্কে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তাই বলে সকলেই স্বামী বিবেকানন্দ বা নেতাজী হবেন অথবা অশ্বিনী দত্ত বা

নাগরিকতা শিক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব

বিদ্যাসাগরের মত সুশিক্ষক হবেন তা নয় এবং সমস্ত শিক্ষকের পক্ষে তা হওয়া সম্ভবও নয়। তবে শিশু যাতে কর্মকেন্দ্রিক আধুনিক বিদ্যালয়ে জীবন দর্শন গড়ে তুলতে পারে তার জন্য শিক্ষকের অনেক কিছুই করণীয় থাকে। শিশু-শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও শিক্ষকই নেতৃস্থানীন ব্যক্তি। শিশুদের জীবন গঠনে তিনি পরম সহায়ক।

শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষকের সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়, শুধু শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান থাকলেই চলবে না, বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যে সমস্ত বিষয় স্থান পেয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কৌতূহল, জ্ঞানস্পৃহা, কর্মপ্রবণতা ইত্যাদিকে তৃপ্ত করবার জন্য শিক্ষককে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। মনোবিজ্ঞান বিশেষতঃ শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা খুব স্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের নিয়ে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ সামুদায়িক জীবনের পরিবেশ সৃষ্টি করার অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষক আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে কার্যকরী ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব, মধুর ব্যবহার ও সদাশয়তা শিক্ষার্থীর মনকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করে। দৈহিক সুশ্রীতা শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণ না হ'লেও বিকলাঙ্গ শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা ভোগ করেন। শিক্ষকের সদাচরণ, পরিচ্ছদ ও পোষাক এবং সদ অভ্যাসগুলি শিক্ষার্থীর জীবনের উপর বিশেষ রেখাপাত করে। কর্মোদ্যম, সহনশীলতা কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণগুলি লোকপ্রিয় হ'তে বিশেষ সাহায্য করে। শিক্ষককে অধৈর্য ও নিরাশাবাদী হ'লে চলবে না। তিনি হবেন চিন্তায়, কাজে ও আচরণে প্রগতিশীল। শিক্ষকের উদার মনোভাব, দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধি তাঁর কর্মক্ষমতাকে উন্নত করে।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে শিশুর শারীরিক, মানসিক সামাজিক বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এই স্তরে কোন প্রকার পুঁথিগত বিদ্যার প্রচলন করা হয় নি। ইন্দ্রিয়গুলির শিক্ষা, সদাচরণ শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস এবং সামাজিক ভাবে আর দশটি ছেলেমেয়ের সাথে বসবাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর শারীরিক, মানসিকও সামাজিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সহজ করা যায়। শিশুরা এখানে

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের কর্তব্য

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিশুর শারীরিক মানসিক ও সামাজিক বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এই স্তরে কোন প্রকার পুঁথিগত বিদ্যার প্রচলন হয় নি। ইন্দ্রিয়গুলির শিক্ষা, সদাচরণ শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস এবং সামাজিক ভাবে আর দশটি ছেলে মেয়ের সাথে বসবাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর শারিরিক, মানসিক ও সামাজিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সহজ করা যায়।
শিশুরা এখানে কাজ করে, খেলা করে এবং খেলার মাধ্যমে জীবন-বোধ

লাভ করে। শিক্ষককে এইসব বিদ্যালয়ে হ'তে হবে শিশুদের খেলার সাথী এবং কর্মের পরিচালক। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষক শিশু শিক্ষা পরিবেশের এক বিশিষ্ট অংশ।

ফ্রয়েবল-প্রবর্তিত **কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের** শিক্ষিকারা বাগানের মালিনীর মত শিশুরূপী চারাগাছগুলির যত্ন করবেন। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠবে কিন্তু এদের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ সাধনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে শিক্ষিকাদের। **মণ্টেসরী-প্রবর্তিত প্রাক্‌ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে** শিক্ষিকাদের পরিচালিকা বলা হয়। সাধারণ ভাবে দেখলে দেখা যায় যে, কাজ এদের বেশ সহজ কিন্তু এদের উপর যে গুরুদায়িত্ব দেওয়া আছে তা বিবেচনা করলে এদের কাজ কঠিন বলেই মনে হবে। যদিও পদে পদে শিশুদের চাঞ্চল্য ও চপলতা দমন করতে হয় না, সব সময় ছেলেমেয়েদের তদারকের ঝামেলা পোহাতে হয় না তবুও পরিচালিকার কাজ বেশ গুরুত্বপুর্ণ। শিক্ষিকাকে ভাল করে জানতে হবে শিশু-মনোবিজ্ঞান। তাঁকে হ'তে হবে মায়ের মত স্নেহশীলা অথচ শিক্ষিকার মত কতব্যে কঠোর। প্রত্যেক শিশুর দিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টি অবশ্যই রাখতে হবে।

মণ্টেসরী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা—যে দু'জন প্রাক্‌-বিদ্যালয় শিক্ষায় নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন তাঁরা দু'জনেই Experimental School পরিচালনা করে শিশু-শিক্ষার সত্যকার রূপ আবিষ্কার করেছেন। ফ্রয়েবল যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তার নাম তিনি দিয়েছেন কিণ্ডারগার্টেন' কিণ্ডারগার্টেন শব্দের মানে 'শিশু-উদ্যান'। শিশুর জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে তিনি উদ্যানের ফুলগুলির বিকাশের সাথে তুলনা করেছেন আর শিক্ষয়িত্রীদের বলেছেন গভার্নেস্‌, মানে—পরিচালিকা। শিশুদের খেলা ও গানকে ফ্রয়েবল তাঁর শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ হিসেবে নিয়েছেন। কাজ করতে শিশুরা আনন্দ পায়। আপাততঃ মনে হয় শিশুর কাজের কোন শৃঙ্খলা নেই, কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শিশুদের একটি নিজস্ব সৃজনী মনোভাব আছে। তারা সেভাবে তাদের খেলনাগুলিকে সাজায় ও কাজের ক্রম ঠিক করে নেয়। ফ্রয়েবল খেলার কৌশল ও খেলার সাজসরঞ্জামগুলিকে বয়সের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দিয়েছেন। স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে ও আনন্দে জগৎকে জানবার আগ্রহ নিয়ে শিশু প্রশ্ন করে এটা কি, ওটা কি, এটা কোথায়, ওটা কোথায় ইত্যাদি। শিশু নিজের মনে নানা ছবি, নানা স্মৃতি, নিজের মনের মত করে সাজায়। প্রকৃতির সাথে শিশুর আছে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ফ্রয়েবল বলেন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশ থেকে শিশু তার জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করে। সেজন্য শিশুশিক্ষায় প্রাকৃতিক পরিবেশকে তিনি বেছে নিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি প্রতীকের

ফ্রয়েবলের অবদান

ব্যবস্থা করেছেন। আনন্দময় পরিবেশে এবং মৌলিক আবিষ্কারের মধ্যে ফ্রয়েবেল শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী।

শিশুর মানসিক বিকাশের স্তর হিসেবে জগতের মৌলিক নিয়মগুলিকে প্রতীকের সাহায্যে ছয়টি উপহার (Gifts) ও বহুসংখ্যক হাতের কাজে রূপ দিয়েছেন। এগুলি শিশুর চিত্তকে স্বাভাবিক ভাবে আকর্ষণ করে। কিণ্ডার-গার্টেনের শিশুরা কতকগুলি উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। শিশুরা ক্রমে ক্রমে নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করবার শিক্ষাও লাভ করে। ফ্রয়েবেল তাঁর শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থায় ছবি, ছড়া, গান (মায়ের গান ও খেলার গান) ও নাচের প্রবর্তন করেছেন। চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও কর্মানন্দের মাধ্যমে শিশুচিত্তের আনন্দঘন রূপটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়।

ছ'টি উপহার

মণ্টেসরী এক নূতন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে প্রত্যেক শিশু তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার পথে অগ্রসর হবে। মণ্টেসরী-শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিকার দায়িত্ব খুব বেশী। মণ্টেসরী বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিশু বিদ্যালয় অপেক্ষা স্বাভাবিক শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়, কারণ এখানে পরিচালিকাকে প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি ব্যক্তিগত নজর দিতে হয়। দৌড়াদৌড়ি করা, নাচা, গান গাওয়া ও ছবি আঁকার মধ্যে শিশুর কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। শৃঙ্খলা মানে চুপ করে বসে থাকা নয়। সমবেত ভাবে বা একক ভাবে নিজ নিজ কাজ করে যাওয়ার মধ্যে একটা অন্তঃশীলা শৃঙ্খলা আছে। এই শৃঙ্খলা শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশের পরম সহায়ক। এই শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়াতে শিশুদের মধ্যে আচরণগত ও স্বভাবজাত অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। দেখা গেছে শিশু সাধারণতঃ সদা প্রফুল্ল কিন্তু তার কোন কাজে বাধা দিলে সে হাতের কাছে যা পায় তাই ভেঙ্গে ফেলে। মণ্টেসরী মনে করেন শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি অনুসারে তাকে নূতন নূতন কাজ ও খেলা দিতে হবে। শিশুকে স্বাধীন ভাবে বাড়তে দিতে হবে। স্বাধীন মনোভাবের মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মমর্যাদা ও সামাজিক চেতনা জাগে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিশুরা মনের মত কাজ বা খেলা পেলে তাতে মগ্ন হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়গুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারলে শিশুর চলন, বলন ও ব্যবহার সুন্দর হয়। নিজেদের ছোটখাটো কাজ করতে পারলে শিশুরা খুব খুশী হয় এবং এতে তাদের স্বাবলম্বী মনোভাব গড়ে ওঠে।

মণ্টেসরীর অবদান

মণ্টেসরী শিক্ষা ব্যবস্থার মূলকথা হ'ল শিশুর সমগ্র সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ।

শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ থাকবে শিশু বিদ্যামন্দিরে ও শিশুর অন্যান্য পরিবেশে।

এজন্য তিনি তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির স্থান দিয়াছেন :—

(১) গৃহকর্ম ও অত্যাবশ্যক কাজ শিক্ষা, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির পরিচালন শিক্ষা, (৩) পেশী ও অঙ্গসঞ্চালন শিক্ষা, (৪) ভাষার গঠন ও লেখন শিক্ষা, (৫) সঙ্গীত, অঙ্কন, শিল্প-কর্ম ও উদ্যান-কর্মের মধ্যে রুচি শিক্ষা ও প্রকৃতি পরিচয়, (৬) নৈতিক শিক্ষা, (৭) ধর্মশিক্ষা।

অতএব দেখা যায়, **কর্মের ও খেলার মাধ্যমে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশই ফ্রয়েবল ও মণ্টেসরী প্রবর্তিত শিক্ষার মূলকথা।**

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয় সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণের সহায়তায় শিশুর কর্মানন্দে শিক্ষিকাদের অংশ গ্রহণ করতে হবে। শহরের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা শক্ত। সেজন্য নানাবিধ যান্ত্রিক খেলা, রং, তুলি, বাজনা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে শিশু বিদ্যামন্দিরে। শিক্ষা-উপকরণের বেশীরভাগ শিক্ষিকাদের প্রস্তুত করে নিতে হবে। কোন একজন শিক্ষিকা চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী আবার কোন বিদ্যালয়ে হয়ত কোন শিক্ষিকা পুতুল গড়ায় পারদর্শিনী। এক্ষেত্রে কতকগুলি প্রাক্-শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক সাথে শিক্ষার উপকরণ তৈয়ার করবার সময় বিশেষজ্ঞ শিল্পীর সাহায্য নিলে বিশেষ সুবিধা হ'তে পারে। এতে শিক্ষা-উপকরণগুলির মান উন্নত হয়। শিশুর কাছে সব সময়ই উন্নত মানের (High standard) সামগ্রী উপস্থিত করতে হবে। পল্লীগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুর শিক্ষা দিতে হবে গ্রামে তৈরী খেলনা ও বাদ্যযন্ত্রগুলির সাহায্যে।

শিক্ষা-উপকরণ

নার্শারী-স্কুলের জনপ্রিয়তা—কলিকাতার কতকগুলি বিশিষ্ট পল্লীর ভেতর দিয়ে যাবার সময় অনেকগুলি নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। এ দেখে অনেকের ধারণা হ'তে পারে, এই জাতীয় প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা খুবই সহজ এবং ইহা বেশ লাভজনক ব্যবসা। প্রকৃত পক্ষে ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

এর পাঁচটি কারণ—(১) মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। এসব বিদ্যালয়ে যে সব ছেলেমেয়েরা পড়ে তাদের ৫০% জনের মা চাকুরে। শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে তিনি নিশ্চিন্তে কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেন।

(২) শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে মায়েরা বেশী সচেতন। পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেমেয়েরা নার্শারী স্কুলে পড়ে, অতএব আর যা কিছু হোক না কেন ছেলেমেয়েকে নার্শারী স্কুলে দিতে হবে।

(৩) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই সব স্থলে ছেলেমেয়েরা সহজেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয় এবং অনেক সৎ অভ্যাস এরা আয়ত্ত করে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

(৪) মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর জীবনে প্রথম পাঁচ বৎসরের মূল্য খুব বেশী। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি স্ব স্ব রূপ লাভ করে। শিশুকে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে রাখতে পারলে শিশুর মানসিক, সামাজিক, প্রক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়। বাড়ীতে মা-বাবা বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে শিশু যে আদর ও সংরক্ষণ পেয়ে থাকে, নার্শারী স্কুলে তা পায় না। সেখানে শিশুরা নিজেদের টুকিটাকি কাজ নিজেরা করে। এতে জীবনে স্বাবলম্বী হবার মনোভাব সহজেই গড়ে ওঠে এইসব বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়গুলিকে শিশুমন্দির বললে ঠিক হয়। তাই শিক্ষিত মা-বাবা শিশুদের প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবার জন্য এত আগ্রহী।

(৫) বর্তমানে সহরে ও নগরের উপকণ্ঠে শিশুরা যেরূপ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থাকে তার চাইতে নিঃসন্দেহে নার্শারী স্কুলের পরিবেশ অনেক ভাল। যেখানে স্বামীস্ত্রী উভয়েই চাকুরী করেন সেখানে শিশুদের নার্শারী স্কুলে রাখা ভাল। ঝি বা চাকরের কাছে রাখলে অনেক সময় পাড়ার দুষ্ট ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশে শিশুরা সহজে বিপথগামী হয়। সামাজিক পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী হ'লে শিশুরা নানাবিধ মানসিক রোগাক্রান্ত হয়; এর ফলে অনেক সময় তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হয়ে যায়। অনেক পিতামাতা ভাল ভাবে জানেন না কিরূপে বৈজ্ঞানিক ভাবে শিশুদের গড়ে তুলতে হয়। যতক্ষণ এরা বিদ্যালয়ে থাকে ততক্ষণ সমবয়সী বন্ধুদের সাথে হেসে খেলে, গান গেয়ে বেশ কাটিয়ে দেয়। এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় যে সব বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসৃত হয় তাতে শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক প্রক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় ত্রুটি—মণ্টেসরী ও ফ্রয়েবল প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে যে নীতি ও নিয়ম নির্ধারণ করে গিয়েছেন তা খুবই বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় সেরূপ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাব রয়েছে। এখনও নার্শারী স্কুলগুলি ফ্যাসানের সীমা ছাড়িয়ে প্রকৃত পক্ষে শিশুমন্দির হিসেবে গড়ে উঠেনি। তা ছাড়া বিদেশ থেকে এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা শিক্ষিকারা বা বিদ্যালয়-পরিচালিকারা নিয়ে এসেছেন সেগুলিকে দেশীয় সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। ফলে শিক্ষা ব্যাপারে সৃজনমূলক মনোভাবের স্ফুরণ না হয়ে অনুকরণের প্রবনতা শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। অনেকে আবার ব্যবসাদারী মনোভাব নিয়ে এসব বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। উপযুক্ত শিক্ষিকা বা পরিচালিকা

প্রায় ক্ষেত্রেই নিয়োগ করা হয় নি। অভিভাবকদের চোখে ধুলো দেবার জন্য বাইরের ঠাট্ বেশ বজায় আছে। প্রকৃত নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপন করা বেশ কঠিন কাজ। তার কারণ এ সমস্ত স্কুলের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে একদিকে যেমন প্রচুর পয়সা চাই, তেমনি অপরদিকে পরিচালকের সৃজনমূলক মন থাকা চাই। শিশুর জীবনের সাথে শিক্ষিকাকে বিশেষ ভাবে পরিচিত হতে হবে। এসব স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিকা পাওয়া যায় না। সাধারণ বি. টি. পাশ শিক্ষিকারাই এসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে থাকেন। এখানে চাকুরীর মনোভাবের চাইতে সেবার মনোভাব বেশী প্রয়োজন। শিশুরা শিক্ষিকাদের আদর্শের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত নার্শারীস্কুলগুলি পরিদর্শন করে আমাদের ধারণা হয়েছে, খুব কম সংখ্যক শিক্ষিকা দরদ দিয়ে নার্শারী স্কুলে জীবনের স্পর্শ আনতে পেরেছেন। তাছাড়া নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সরকার থেকে এ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। সরকারী নিয়ন্ত্রণ না থাকতে বেশীর ভাগ নার্শারী স্কুল প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না হয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

ভারতের **জন সাধারণের শিক্ষার অনগ্রসরতা** সর্ব প্রকার শিক্ষা প্রসারের পথে এক বিরাট বাধা। শতকরা একজন অভিভাবকও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। শতকরা ২।৩ জন অভিভাবক ছাড়া বাকী সকলের পক্ষে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহন করা সম্ভবও নয়। জন সাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে এবং সরকারী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই স্তরের শিক্ষার ব্যয়ভার কমিয়ে আনতে হবে।

সামাজিক শিক্ষার অনগ্রসরতার সহিত প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বষ্ঠু সামাজিক শিক্ষা, নানাবিধ প্রদর্শনী ও শিক্ষা প্রসারমূলক প্রচার কার্য দ্বারা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে পিতামাতাকে সচেতন করে তুলতে হবে।

নব শিক্ষা সম্পর্কে জন সাধারণের ভুল ধারণা—অনেকে বলেন যে যে দেশের অভিভাবক ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না সে দেশে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা তাদের কাছে বিলাসিতার নামান্তর। বিদ্যালয় বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে, সেখানে নাচ, গান, ছবি আঁকা, নানা প্রকার খেলনা তৈরী ও খেলাধুলার স্থান কোথায়? আর প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ ক্রমে যদি ঐ বিষয়গুলি স্থান লাভ করে তবে শিক্ষা বহির্ভূত ঐ বিষয়গুলির জন্য এত খরচ করা বিলাসিতা বৈকি! তাই আমাদের দেশের অভিভাবকদের খুশী করবার জন্য নার্শারী ও কিণ্ডারগর্টেন স্কুলেও পড়াশুনার প্রতি খুব চাপ দেওয়া হয় ফলে এ জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

শিক্ষিকার অভাব—শিক্ষকতা এদেশে একটি সম্মানজনক পেশা হিসেবে গৃহীত হয়নি। তাই শিক্ষার সর্বস্তরেই শিক্ষকের অভাব। প্রাক্, প্রাথমিক শিক্ষিকাদের অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া চাই। অথচ এদেশে এ জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও বিশেষ উন্নত নয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের হ'তে হবে মায়ের মত স্নেহশীলা অথচ স্বীয় কর্তব্যে কঠোর। নার্শারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিচালকদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি এখানে বড় নয় বড় হচ্ছে শিক্ষা ঠাট্ বজায় রাখা ; তাহলেই বিদ্যা-ব্যবসা ভাল চলবে।

আর্থিক সমস্যা এই বিদ্যালয়গুলির বড় সমস্যা। ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে খরচবহুল নার্শারী বিদ্যালয়ের প্রসার প্রায় অসম্ভব। সরকারী বা মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ সাহায্য পেলে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব। বিদ্যালয়গুলিকে জন সাধারণের ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্য উপযুক্ত গবেষণা কার্য সরকার পক্ষ থেকে চালাতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা অবৈতনিক ও বৃত্তিযুক্ত করতে হবে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা অন্যান্য শিক্ষাস্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এর পাঠক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মাধ্যম শিক্ষা-উপকরণ, বিদ্যালয়ে সময়ের ব্যাপ্তি এমনকি শিক্ষিকার প্রস্তুতি সব কিছুই আলাদা। উক্ত বিষয়গুলি আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। এখন **তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ** করতে চাই।

(১) এই স্তরের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার জন্য উহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে সুষ্ঠু ও সবল করে তোলা। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশে তাকে রাখতে হবে ততক্ষণ যতক্ষণই পর্যন্ত সে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রদ পরিবেশে আনন্দ পায়। শিক্ষিকারা স্নেহশীলা মায়ের মত যদি ওদের আদর যত্ন করা, খাওয়ান ও ঘুম পাড়ানোর মধ্যে আনন্দ পান তবেই শিশুরা পরমানন্দে নার্শারী স্কুলে হেসে খেলে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠবে।

আনন্দ পরিবেশন

(২) বর্তমানে শিক্ষা-উপকরণের প্রতি অনেক শিক্ষাবিদ বিশেষ জোর না দিলেও সকল শিক্ষাবিদই বস্তু ভিত্তিক শিক্ষায় শিশুকে স্বাভাবিক ভাবে বালি, কাদা, কাগজ, কালি, রং, তুলি, কাঠ ও খড় দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত বস্তু নির্মাণ করবার এবং ঐগুলি ভেঙ্গেচুরে আবার নূতন কিছু গড়বার সুযোগ দিতে এক মত। পোষা জীব-জন্তু ও গাছপালার সাহচর্য ওদের জীবনে বিশেষ

প্রয়োজন। নদী, বন, পর্বত, মাঠ, ঘাট, ইত্যাদি সব সময়ই ওদের আকর্ষণ করে। তাই সম্ভব স্থলে শিশুদের এই সমস্ত পরিবেশের সাথে বাস্তব পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ঋতুরাই নিয়ে আসে শিশুদের প্রাণের আবেদন তাই শিশুদের নাচগানের মধ্যে ঋতুরঙ্গের প্রকাশকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে।

সৃজনমূলক কাজ

(৩) গৃহ, সমাজ ও বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে একটা সহজ ও স্বাভাবিক যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারলে শিশু-শিক্ষার পরিবেশ পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। শিশু তার ব্যক্তি সত্তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে সমাজে যাতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সেরূপ ব্যবস্থা রাখতে হবে এই স্তরের শিক্ষা পরিকল্পনায়।

গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজের সহজ সংযোগ

সহরে ও শিল্পাঞ্চলে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রসার—প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন হ'তে চলেছে স্বাধীনতা লাভের পর। অবশ্য এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন এদেশে প্রকৃত পক্ষে শিল্প-বিপ্লব সুরু হয়। সহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে জীবন যাত্রার মান উন্নত বলে সহধর্মিনী হয়েছেন সহকর্মিনী। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার এবং মহিলাদের পুরুষদের সমতুল্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হওয়াতে এখন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক কাজে মহিলাদের গৃহের বাইরে এসে অনেকক্ষণ থাকতে হচ্ছে।

সহধর্মিনীরা সহকর্মিনী

একান্নবর্তী পরিবার আজ দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে। গ্রামের মেয়েরাও চাকুরীস্থলে এসে সমবেত হচ্ছেন তাই শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন এতটা জরুরী হয়ে পড়েছে। সহরে স্বামী-স্ত্রীর সংসারে উভয়েই যখন কর্মস্থলে চলে যেতে বাধ্য হন তখন শিশুরা থাকে ঝি চাকরের তত্ত্বাবধানে কারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে 'আয়া' নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। আবার উচ্চকোটির যে পরিবারের মেয়েরা বাইরে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিমূলক কাজে ব্যস্ত থাকেন তারা তাদের সন্তানদের জন্যে আয়া নিয়োগ করেন। উভয় স্থলেই শিশুরা দিবাভাগের বহু সময় মাতাপিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাছাড়া একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচজনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেরূপ বালখিল্য শিশু-সমাজ সমাজ সৃষ্টির সুযোগ এদেশে ছিল, এখন আর তা সম্ভব নয়। কৃষি সভ্যতার পীঠস্থান হিসেবে ভারতের পল্লী প্রকৃতিতে শিশুদের স্বাভাবিক জীবনের বিকাশ ও বৃদ্ধির যে সুযোগ ছিল পরিবর্তিত অবস্থায় সহরে ও শিল্পাঞ্চলে তার অভাব রয়েছে।

নূতন পরিবেশে শিশু সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

এই অভাব পূরণের জন্যই সহর ও শিল্পাঞ্চলে দ্রুত নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার অত্যন্ত জরুরী। সহরে ও ঘন বসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চলে গৃহে শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়; তা ছাড়া শিশুদের জন্য মুক্তঅঙ্গন, ছোট বাগান ও আলোহাওয়াযুক্ত ভাল ঘরের ব্যবস্থা করা ব্যক্তিগত ভাবে সাধারণ সহরবাসীদের পক্ষে অসম্ভব। অস্বাস্থ্যকর রাস্তাঘাটে ও দোকান-বাজারে ঘুরে বেড়িয়ে শিশুদের মধ্যে নানা প্রকার অপসঙ্গতি দেখা দেয় অবশ্য মূল কারণ মাতা পিতার স্নেহ-পরিবেশের অভাব এবং তথাকথিত বিদ্যালয়ের নিরানন্দময় পরিবেশে বাধ্যতামূলক ভাবে দীর্ঘ সময় অবস্থান। মাতাপিতা যেখানে উদয়াস্ত জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত সেখানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষার জন্য প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন অপরিহার্য।

এদেশে নার্শারী ও কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি মুনাফা শিকারী শিশু শিক্ষার মত পবিত্র সেবাকার্যকে ব্যবসায় হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছে সহরে ও শিল্পাঞ্চলে। অনত্র এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি।

ব্যাঙের ছাতার মত সহরের ও শিল্পাঞ্চলের অলিতে গলিতে নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেনের নামে কতকগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বেশ চালু আছে। আধুনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নামগন্ধও যেখানে নেই। ভাড়াটে বাড়ীতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরের ঠাট্ ঠিকই বজায় আছে কিন্তু বিদ্যালয়গুলিতে না আছে ভাল বিদ্যালয় কক্ষ, ছোট বাগান, খেলার মাঠ ও মুক্ত অঙ্গন; না আছে, কোনরূপ শিক্ষা উপকরণ। যে শিক্ষিকারা শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন তাদের মধ্যে শিশু-শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষিকার বিশেষ অভাব। মুনাফা শিকারীরা শিক্ষিতা মহিলাদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে এই সমস্ত শিক্ষিকাদের পরিচালিত করছেন নিজেদের খেয়াল খুসী মত। শিশুদের সমবেত কাজকর্ম বা খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা এখানে নেই বললেই চলে। তাই এদেশের সহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার দ্রুত হ'লেও এতে শিশু সংরক্ষণ ও শিশু শিক্ষার সমস্যা সমাধান না হয়ে বরং শিশুদের মধ্যে নানা প্রকার অপসঙ্গতির প্রসার হচ্ছে।

এদেশের নার্শারী শিক্ষার মূল গলদ

শৈশবের অসামঞ্জস্যতার কারণ ও তার প্রতিকার—শিশুদের জীবনে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য বা অপসঙ্গতি দেখা যায় তার মূল কারণ শিশুর চাহিদার অতৃপ্তি। এই **চাহিদা তিন প্রকারের যথা জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা ও সামাজিক চাহিদা।** শারীরিক সুস্থতার জন্য জৈবিক চাহিদার তৃপ্তি প্রয়োজন। শৈশবে শারীরিক বৃদ্ধির বেগ বেশী থাকে তাই সব সময় পিতামাতাকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও খেলার

আর্ঠের চাহিদাকে যথাসম্ভব মেটান সম্ভব হয়েছে কিনা। মানসিক চাহিদাগুলি সংখ্যায় যেমন অনেক এদের শক্তিও তেমন বেশী। এগুলি অতৃপ্ত থাকলে আচরণগত অসামঞ্জস্য দেখা দেয় এবং পরে নানাবিধ কমপ্লেক্স (Complex) থেকে মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। শৈশবের সামাজিক চাহিদার অতৃপ্তি থেকে শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়। শিশুর আত্ম সচেতনতা সামাজিক পরিবেশেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। শিশু যখন দেখে যে স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে তার মানসিক বা সামাজিক চাহিদা তৃপ্ত হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে, তখন সে উহা পরিতৃপ্ত করবার মানসে অসামাজিক পন্থা অনুসরণ করে। অনেক সময় এরূপ অসামাজিক ও অস্বাভাবিক আচরণ থেকে তার মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তারপর দেখা দেয় শিশু জীবনে নানা প্রকার অসঙ্গতি।

চাহিদার অতৃপ্তি

প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব কতকগুলি চাহিদা থাকে। এই সমস্ত ব্যক্তিগত চাহিদা ও সামাজিক জীবনে উদ্ভূত চাহিদার নিবৃত্তি প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় না। ফলে শিশুদের জীবনে অপ্রীতিকর প্রক্ষোভের আবির্ভাব হয়। দিবা স্বপ্ন, অলীক চিন্তা, অযথা ভীতি ইত্যাদি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভের নমুনা। এগুলির বাহিক প্রকাশ হয় অন্যায় ক্রোধ, দুর্নীতিপরায়ণ মনোভাব এবং অশ্লীল কথনও লেখনের মধ্যে। এ ছাড়া অসংলগ্ন কথা এবং কথা ও কাজের মধ্যে কোন সঙ্গত মিল না দেখেও বোঝা যায় শিশু কোন প্রকার অপসঙ্গতির কবলে পড়েছে। পড়েছে। প্রাক্ প্রাথমিক শিশুদের মধ্যে অপসঙ্গতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় শিশুদের ভীরুতা, আক্রমণ ধর্মিতা, অযথা মিথ্যা ভাষণ, অকারণ চুরি, নেতি-মনোভাব ও ক্লাস পালানোর মধ্যে।

অতৃপ্ত চাহিদা থেকে অপসঙ্গতি

শিশুর মনের গভীরে অপসঙ্গতির যে কারণ রয়েছে তা ধরবার জন্য কতকগুলি ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণকারী পরীক্ষা (Projective test) আবিষ্কৃত হয়েছে। Rorchch test, Free Association test, Play therapy ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতির সাহায্যে অসামঞ্জস্যতা বা অপসঙ্গতির কারণ অনুসন্ধান করা যায়। শিশু মনের গভীরে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে খেলাচ্ছলে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয়

যে মৌলিক চাহিদার জন্য শিশু জীবনে অপসঙ্গতির উদ্ভব হয়েছে সেই চাহিদার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে পারলেই অপসঙ্গতির নিরাময় সম্ভব। সুষম খাদ্যের যোগান এবং ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে পারলে শারীরিক চাহিদার তৃপ্তি হয়। গৃহে ও বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর ও শিক্ষাপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং সেখানে শিশুর জানার আগ্রহ ও কৌতূহল

তৃপ্তির স্বাভাবিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশু জীবনে প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতি-বিধান সব চাইতে বড় সমস্যা। পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহ-পরিবেশ থেকে বঞ্চিত থাকলে প্রায়শঃ প্রক্ষোভমূলক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এগুলিকে দূর করবার জন্য প্রক্ষোভের তৃপ্তির স্বাভাবিক পথ সৃষ্টি করতে হবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়ে অথবা নানাবিধ খেলার মাধ্যমে শিশুর অতৃপ্ত বাসনা কামনাকে তৃপ্ত করবার ব্যবস্থা করে। শিশু চায় নিজের কাজের পরিচিতি এবং আত্ম-স্বীকৃতি। কর্মকেন্দ্রিক প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক চাহিদার তৃপ্তির ব্যবস্থা করে শিশুদের অপসঙ্গতির মাত্রা কমান সম্ভব। তবে ভালবাসার অভাব ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভাব থেকে যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তা দূর করবার জন্য স্নেহশীলা শিক্ষিকাদের উদার মন নিয়ে শিশু-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

অপসঙ্গতি দূরীকরণের উপায়

শিশু-শিক্ষায় নির্দেশনা—এ দেশে প্রাক্-প্রাথমিক শিশু-শিক্ষা মাত্র কয়েক বৎসর হ'ল চালু হয়েছে। এরমধ্যে শিশুদের মধ্যে নানাপ্রকার অসামঞ্জস্য ও অপসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া শিশুদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণ শিশুর সংখ্যাও কম নয়। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ গলদ রয়েছে। এজন্য শিশু শিক্ষায় নির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন।

তিন প্রকারের নির্দেশনা ঃ—(১) শারীরিক বিকাশমূলক নির্দেশনা, (২) সামাজিক বিকাশমূলক নির্দেশনা, (৩) শিক্ষামূলক নির্দেশনা।

পরিমাণ মত ও সময় মত খাদ্য গ্রহণে শিশুরা যাতে অভ্যস্থ হয় শিক্ষিকাদের সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে হবে। কু-খাদ্য গ্রহণ, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ ও অসময়ে খাদ্য গ্রহণের অপকারিতার বিষয় গল্পচ্ছলে শিশুদের বুঝিয়ে দিতে হবে। নার্শারী স্কুলে এজন্য সময় মত স্নান, আহার, বিশ্রাম ও ঘুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অনেক সময় নষ্ট হয়। শিক্ষিকাকে শিশু-নির্দেশনা-কেন্দ্রের (Child Guidance Clinic) নির্দেশ মত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যত্নশীলা হ'তে হবে।

শারীরিক বিকাশ-মূলক নির্দেশনা

শিশু গৃহ পরিবেশের বাইরে এসে প্রথমে অপর শিশুর সাথে স্বাভাবিক ভাবে মিশতে পারে না। যারা খুব আদুরে তারা সঙ্গীদের কাছ থেকে বেশী আদর চায়; আবার যারা গৃহে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে তারা বিদ্যালয়ে এসে অন্যান্য শিশুদের নানা ভাবে পীড়ন করতে থাকে। কিভাবে দলবদ্ধ হয়ে চলতে হবে, খেলতে হবে, খেতে হবে এবং নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে শিশুরা সে সম্পর্কে বিদ্যালয়ে নির্দেশনা লাভ করবে। স্বাভাবিক ভাবে স্বেচ্ছায় শিশু

সামাজিক বিকাশ-মূলক নির্দেশনা

যাতে বিদ্যালয়ের সামুদায়িক জীবনে অংশ গ্রহণ করে আনন্দ পায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সেরূপ নির্দেশনা দেওয়া বাঞ্ছণীয়। অনেকে বলবেন ৩ থেকে ৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের আবার শিক্ষা নির্দেশনা কি? যারা এরূপ উক্তি করেন তারা জানেন না যে শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে শৈশবের পাঁচ বৎসরের গুরুত্ব কতটুকু। যাদের বুদ্ধি কম তারা এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শিক্ষায় পেছিয়ে পড়ে। এই সমস্ত শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে নির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ফ্রয়েবল ও মণ্টেসরী শিশুদের জন্য ইন্দ্রিয় চর্চা (Sense Training) ও বস্তুভিত্তিক পাঠের (Object lesson) ব্যবস্থা করেছেন। এই সময় দলবদ্ধ ভাবে নাচ, গান, ছড়া আবৃত্তি ইত্যাদিতে শিশুরা খুবই আনন্দ পায় আবার ব্যক্তিগত ভাবে নানা প্রকার শিক্ষা-উপকরণ নিয়ে আপন মনে অনেক কিছু গড়বার চেষ্টা করে। এই সময় শিক্ষিকাকে শিশুর কৌতুহলী মনের খোরাক দিতে হবে। শিশু-মনে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেনি অথচ ঈঙ্গিতে তার প্রকাশ হয়েছে, শিক্ষিকাকে তা স্পষ্ট করে দিতে হবে শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য দিয়ে।

শিক্ষা মূলক নির্দেশনা

এদেশের শিশু-শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা—এদেশে নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। শিল্প, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মায়েরা যখন যোগদান করতে থাকেন তখন শিশুদের রক্ষনাবেক্ষণ ও শিশু শিক্ষার জন্য নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে সহরে ও শিল্পাঞ্চলে। প্রথমে ইংলণ্ডের নার্শারী স্কুলের অনুকরণে এদেশে নার্শারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় কিন্তু পরে কিছু সংখ্যক মুনাফাশিকারী নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থার আশ্রয়ে ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে। মিশনারীরা এ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রণী কিন্তু সেখানে কোন ব্যবসাদায়ী মনোবৃত্তি নেই।

মিশনারী প্রচেষ্টা

১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ খৃঃ পর্যন্ত মণ্টেসরী ভারতে অবস্থান করে কয়েক শত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে যান। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে নার্শারী স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় উঠে যায়, কিছু ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে আর বাকী সব মণ্টেসরীর আদর্শ এখনও বহন করে চলেছে। ফ্রয়েবল প্রবর্তিত কিণ্ডারগার্টেন প্রথাও এদেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সেজন্য প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেকটি সহরে ও শিল্পাঞ্চলে এই জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠছে।

ভারতে ডাঃ মণ্টেসরী ও তাঁর প্রভাব

গান্ধীজীও তার বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মকেন্দ্রিক প্রাক্ বুনিয়াদী স্তরের কথা বলেছিলেন। বর্তমানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংলগ্ন বহু প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয় বেশ ভাল কাজ করছে। সরকার বা স্থানীয় পৌরসভা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার

দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। সরকার থেকে শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য মাত্র কয়েকটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, আর কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে কিছু অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছোটখাট গবেষণার কাজও হয়েছে। বহু সহরের উপকণ্ঠে কতকগুলি গ্রামাঞ্চলে সম্প্রতি নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে সেই অঞ্চলে চাকুরে মায়েদের সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুশিক্ষার জন্য। কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠানও নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপন করছেন কারখানার আবেষ্টনীর মধ্যে বা কারখানার সন্নিকটে যাতে কর্মরত মায়েরা শিশুদের এইসব প্রতিষ্ঠানে দিয়ে যেতে এবং কর্ম ত্যাগের সময় বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন।

অন্যান্য দেশের শিশু শিক্ষার সাথে এ দেশের শিশু শিক্ষার তুলনা মূলক আলোচনা—

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বহুদিন পূর্বেই শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে তাই ও দেশে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা এখন আপন মহিমায় ভাস্বর। ইউরোপের সব দেশেই প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কর্মক্ষেত্রে আজ আর নারী পুরুষের কোন প্রভেদ নেই তাই ৩ বৎসর বয়সেই শিশুদের প্রায় বাধ্যতামূলক ভাবে আসতে হচ্ছে নার্শারী স্কুলে। আমেরিকায় ও জাপানে নার্শারী শিক্ষা স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারের মধ্যে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার উপর বহু গবেষণা ওদেশে হয়েছে। নার্শারী শিক্ষা আবার অনেক দেশের জাতীয় গৌরব। এ জাতীয় শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে জাপান উন্নত পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছে। আমেরিকার নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলি বিশেষ বিশেষ পল্লীর গর্বের বস্তু। মায়ের সস্নেহ হস্ত যেমন শিশুকে সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত রাখে এবং মায়ের শিক্ষা যেমন শিশুকে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার বীজ বপন করে তেমনি আমেরিকার শিক্ষিকাদের অদম্য উৎসাহ ও সস্নেহ শিশু পরিচর্যা নার্শারী স্কুলগুলিকে শিশুদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রাশিয়ার নার্শারী স্কুলে সুঠাম দেহ গঠন ও সামাজিক মনোবৃত্তি সৃষ্টির পরিকল্পনা লক্ষ্য করবার বিষয়। ইংলণ্ডের নার্শারী স্কুলগুলি স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় ব্যবসায়ীদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা, খেলাধুলার প্রচুর ব্যবস্থা এবং শিশুদের প্রতি শিক্ষিকাদের মমত্ববোধ এদেশের নার্শারীর উল্লেখযোগ্য বিষয়।

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার উপর গবেষণা

মিশনারী পরিচালিত দু' চারটে প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি প্রাক্ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছাড়া এ জাতীয় আর সমস্ত বিদ্যালয় কম বেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীতিতে পরিচালিত। বিদ্যালয়ে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার উৎকর্ষ অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির বিষয় বিবেচনা

করতে গিয়ে ছাত্র বেতন হয়েছে সাধারণ মধ্যবিত্তের ক্ষমতার বাইরে আর শিক্ষা হয়েছে অন্তঃসারশূন্য। তুলনামূলক ভাবে এদেশের প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা অন্যান্য উন্নত দেশের ঐ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে অনেক অনুন্নত।

অনুশীলনী

১। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক আলোচনা কর।

২। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি? শিশুর জীবন বিকাশে শৈশবের গুরুত্ব কতটুকু?

৩। 'খেলাচ্ছলে শিক্ষা' বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। নার্শারী স্কুলের জনপ্রিয়তার কারণ কি?

৪। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিকার স্থান নির্ণয় কর।

৫। মণ্টেসরী ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা দু'টির তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। শৈশবের অসামঞ্জস্যতার কারণ কি? ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

University Questions

1. 'Nursery and Kindergarten Schools in some Western countries are called play schools where children learn 3 Rs. only incidentally without the help of any books. What are your views about such schools? Discuss the significance of the term 'Play' here'. [C. U. 1963]

2. "The pre-school stage is educationally more important in the life of a child." Discuss. [C. U. 1964]

3. "In recent years there has been a mushroom growth of so called kindergarten and nursery schools without any Specialist or trained teachers or the Staff." Critically examine the Statement. Can you justify their existence? Give reasons for your answer. [C. U. 1964]

4. What are the problems of nursery and infant education in the urban and rural areas of West Bengal? Offer suggestions for their solution. [C. U. 1965]

5. What tests and examinations would youd suggest for the promotion of education of children of the primary stage. [C. U. 1965]

6. What are essential and desirable qualifications of a nursery School or Kindergarten teacher,

7. Write an essay on 'Pre-School Education'. [C. U. 1966]

8. Discuss the problems of nursery education with special reference to rural & urban areas. [C. U. 1966]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক গুচ্ছ

প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার

প্রাথমিক শিক্ষার গতানুগতিক ধারণা—এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি ছিল মাতৃভাষার কাজ চলা মত জ্ঞান লাভ ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে কিছু পাটিগণিত ও শুভঙ্করীর চর্চ্চা। পরে ইহা প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত, ইতিহাস, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক তথ্যের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বাস্তব জীবনের সাথে এই পাঠক্রমের কোন যোগাযোগ ছিল না। শিক্ষক পাঠ দিতেন এবং শিশুরা বাড়ী থেকে তোতাপাখির মত সে পাঠ মুখস্থ করে পাঠশালায় এসে 'পড়া দিত'। বেত্র দণ্ডধারী পণ্ডিত মশায় বেতের সদ্ব্যবহার করে বা ঐ মূল্যবান শিক্ষা উপকরণটির ভয় দেখিয়ে 'পড়া আদায়' করতেন এবং দিবা-নিদ্রার অবকাশে ব্যাঘ্র ঝম্পনে বা বজ্র গম্ভীর স্বরে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। গুরুতর পরিস্থিতিতে প্রথমোক্ত শিক্ষা উপকরণটির ব্যবহার যুক্তি সম্মত ছিল। গ্রামের অভিভাবকেরা পণ্ডিত মশায়দের পুর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এ জাতীয় শিশু নির্যাতনের জন্যে। হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিভাগেব শিক্ষা ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, তবে হাইস্কুলে যারা ৭ম বা ৮ম শ্রেণীতে পড়াতেন তাঁরা প্রাথমিক বিভাগে এসে শিশুদের কিছু একটা লিখতে দিয়ে বিশ্রাম করতেন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু রাষ্ট্র ও পৌরসভাগুলির দ্বারা অবহেলিত নয় শিক্ষকদের দ্বারাও বিশেষ ভাবে নিগৃহীত।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিকদের মতে শিক্ষার সাথে সমাজ জীবনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বর্তমানে গণতন্ত্রী দেশ সমূহের প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শিশু-শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মুল্য খুব বেশী। কারণ যে শিক্ষায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ নেই সে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর পুর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর সুদূর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিকল্পিত হবে না, উহা শিশুকে বর্তমানের জন্য প্রস্তুত করবে।

আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা হবে ব্যাপক ভাবে গণতন্ত্রী দেশের নাগরিকদের স্বয়ং সম্পূর্ণ (Complete in itself) শিক্ষা। **গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নীতি (Principles of Social**

order) প্রতিষ্ঠা করে এবং ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিকাশকে সম্ভব করে তোলবার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পিত হয়েছে।

আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা—বহু দিন পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে বড়দের ছোট সংস্করণ বলে মনে করা হ'ত। সামাজিক প্রয়োজনে যে বিদ্যার প্রয়োজন সেই বিদ্যা শিক্ষক শিক্ষার্থীকে দান করতেন। শিক্ষার্থী ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক নানাবিধ কসরতের মধ্য দিয়ে উহা আয়ত্ব করতে বাধ্য ছিল। শিশু শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর যে একটি কার্যকরী শক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা আছে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের যে নিজস্ব পন্থা রয়েছে এ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ ছিলাম। দার্শনিক রুশো প্রথমে শিশুদের স্বাভাবিক প্রকৃতি বিকাশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিক্ষকদের মধ্যে পেসতালৎসী সর্ব প্রথম শিশুদের মনের স্বাভাবিক বিকাশের চাহিদা মত পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। আধুনিক শিশু শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিশু মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে মনোবিজ্ঞানী অনেক মূল্যবান তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন এবং করছেন। স্মৃতি, মনোযোগ, প্রেরণা, আগ্রহ, শিক্ষণ, বিস্মরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ নীতি আধুনিক শিক্ষায় প্রযুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া শিশুর মানসিক ক্ষমতা যেমন, বুদ্ধি, প্রক্ষোভ, প্রবণতা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ করা হয়ে থাকে অভীক্ষা প্রয়োগ করে। এই সমস্ত অভীক্ষা শিশুদের শিক্ষা লাভের ক্ষমতা, শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ এবং শিশুদের ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রস্তুত হয়। আধুনিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও খুব সুদৃঢ়। এখন শিশুর পরিবেশ চারি দেওয়ালের মধ্যে সীমিত নয় গৃহ থেকে বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, প্রেক্ষাগৃহ, রেডিও ইত্যাদি সবই শিশুর শিক্ষা-পরিবেশের অন্তর্গত।

শিশুরা কর্মচঞ্চল। কাজ করতে শিশুরা ভালবাসে, কাজের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করে। লক্ষ্য করা যায় যে আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিশু সুশৃঙ্খল-ভাবে ও মনোযোগ সহকারে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে। যে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিশেষ সহায়ক তা এই ভাবে সহজেই শিক্ষা প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা যায়। আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। গান্ধিজী প্রাথমিক শিক্ষার এই ব্যাপক অর্থকে গ্রহণ করে বুনিয়াদী শিক্ষাকে উন্নত নাগরিক শিক্ষার কাঠামো হিসেবে গড়ে তুলেছেন। অবশ্য বিগত ৪০ বৎসর ধরে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার অনুকরণে কয়েকটি শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ দেশে গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য মিশনারী ও কয়েকটি দেশীয় সংস্থার সক্রিয় প্রচেষ্টায়।

প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি—আধুনিক শিশু-শিক্ষা পদ্ধতি মূলতঃ শিশু কেন্দ্রিক এবং মনোবিজ্ঞানের গবেষণা জাত তথ্যের উপর নির্ভরশীল। কম বেশী সবগুলি পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন। শিক্ষার্থীর বয়স, বৌদ্ধিক ক্ষমতা, বিশেষ রুচি ও কর্ম প্রবণতা ইত্যাদির প্রতি নজর রেখে কয়েকটি পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন—

(১) বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি, (২) প্রজেক্ট মেথড (৩) ওয়ার্কসপ পদ্ধতি ও (৪) ভারতবর্ষের সনাতন পাঠশালা পদ্ধতি ইত্যাদি। প্রাথমিক স্তরে শ্রেণী নিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয় তবে শিক্ষিকা যাতে প্রত্যেকটি শিশুর প্রতি ব্যক্তিগত যত্ন নিতে পারেন তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম—এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা দু'টি ধারায় বর্তমানে প্রচলিত আছে যথা (১) গতানুগতিক প্রাথামক শিক্ষা এবং (২) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা। এখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিশু শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ কারণ ১৪ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্যে যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত হয়েছে তা এখনও এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বলে পরিচিত নয়। তাই পাঠক্রম রচনায় গতানুগতিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। এতে আছে :—

(১) মাতৃভাষা, (২) পাটিগনিত, (৩) পরিবেশ পরিচিতি—বিজ্ঞান, স্বাস্থ-বিজ্ঞান ও ভূগোল, (৪) ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান, (৫) ইংরেজী এবং (৬) একটি কারুশিল্প (ঐচ্ছিক)

এ ছাড়া খেলাধূলা, নৃত্যগীত, সমস্যা সমাধান মূলক কার্যবিধি ও সমবায় মূলক কাজ প্রাথমিক শিক্ষায় যুক্ত করা হয়েছে শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক ও প্রাণ প্রাচুর্যে পুর্ণ করবার জন্য। নিম্নবুনিয়াদী পাঠক্রম **বুনিয়াদী শিক্ষার** আলোচনায় যুক্ত হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা—বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করবার পর শিক্ষাবিদদের ভাবিয়ে তুলেছে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ইংরেজী ভাষা-শিক্ষাকে (learning English Language) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা? যদি ইংরেজী ভাষাকে পাঠক্রমে স্থান করে দিতে হয় তবে কি ভাবে এবং কতটুকু স্থান দেওয়া হবে?

গান্ধিজী বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থান রাখেন নি। তার মতে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি দৃঢ় করবার জন্য শিক্ষিত (ইংরেজী শিক্ষিত) ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে প্রাণের ঐক্য, ভাবের ঐক্য ও কার্যের ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। ইংরেজ প্রবর্তিত ভুয়া শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেছে এদেশে

ইংরেজী শিক্ষার প্রাধান্য দিয়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনীতি মূলক বক্তৃতা দেবার সময় বা গন আন্দোলনের মারফৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে চাষী মজুরকে ভাই বলে আহ্বান করেন কিন্তু মনে প্রাণে তাদের ভাই বলে গ্রহণ করতে পারেন না। ইংরেজী শিক্ষার অহমিকা তাকে এ পথে বাধা দেয়। তা ছাড়া শিক্ষা বিজ্ঞানের দিক থেকে মাতৃভাষার বুনিয়াদ ভাল করে গড়ে ওঠবার পুর্বে একটি অজ্ঞাত বিদেশী ভাষার বোঝা শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া মনোবিজ্ঞান সম্মত নয় বরং যুক্তিহীন। দেশের শতকরা ১০ জন মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে আর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা লাভকরে শতকরা একজন। গণতন্ত্রের দিক দিয়েও শতকরা ১১টি শিশুর সুবিধার জন্য শতকরা ৮৯টি শিশুর উপর এমন একটি ভাষা শিক্ষার গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া অযৌক্তিক কারণ এই ভাষার ব্যবহার জীবনে সে খুব কমই করতে পারবে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার বনিয়াদ ভাল ভাবে গড়ে উঠলে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষার্থী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করতে পারে। যারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করবার ক্ষমতা রাখে বা সুযোগ পাবে বলে আশা করে তাদেরই ইংরেজী ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে লওয়া উচিত। মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষকের তত্বাবধানে উন্নত পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলে তিন চার বৎসরে দ্বিতীয় ভাষা (second language) হিসেবে ইংরেজী ভাষা ভালরূপেই শিক্ষালাভ করতে পারে। ভাল ইংরেজী শেখার জন্য দীর্ঘ ৭।৮ বৎসরের কোন প্রয়োজন নেই।

তা ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম যখন আঞ্চলিক ভাষা (Regional language) তখন মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষায় সকল শিক্ষার্থীরই দক্ষতা লাভ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী ভাষা হওয়াতে মাধ্যমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাই যথেষ্ট কারণ প্রাক্ স্নাতক পরীক্ষায় ও কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভাষাকেই এখন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাক্ স্নাতক স্তরে ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রয়োজন অনুরূপ উন্নত শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, বাস্তু বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর পাঠ্য পুস্তক রচিত হবার সুযোগ আসবে শীঘ্রই যখন কোঠারী কমিশনের সুপারিশ ক্রমে ভারত সরকার আঞ্চলিক ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবেন।

যদিও মুদালিয়র কমিশন প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে ইংরেজী ভাষা পাঠক্রমে যুক্ত করার সুপারিশ করেছেন তবুও আমরা মনে করি বর্তমান পরি প্রেক্ষীতে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের শেষের দিকে ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষের দিকে ইংরেজী ভাষাকে পাঠক্রমে যুক্ত করা যেতে পারে সেই সব শিক্ষার্থীদের সুবিধার

জন্য যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে চায়। উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমের শেষের দিকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সুযোগ না থাকলে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করবে। তা ছাড়া যারা উচ্চ বুনিয়াদী স্তর থেকে বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তর থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য বৃত্তি অবলম্বন করছে তাদের যদি সামান্য ইংরেজীর জ্ঞান থাকে তাহলে পরে উহার চর্চা করে পৃথিবীর একটি প্রথম শ্রেণীর ভাষায় লিখিত পুঁথিপুস্তক পড়বার বা ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ে সাধারণ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ—সমাজে শিশুকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে তাই সামাজিক পরিবেশেই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে কার্যকরী করে তোলা বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে যে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়েছে তার সামাজিক ভিত্তি খুব সুদৃঢ়। কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষার পরিবেশ পরিবার, বিদ্যালয়; খেলার মাঠ ও বৃহত্তর সমাজ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। যৌথ কর্মের মধ্যে শিশুরা যেমন কর্মানন্দ লাভ করে তেমনি সহযোগিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি সামাজিক বৃত্তিগুলিও বিকশিত হয় কর্মভিত্তিক ও শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যদিয়ে। সময় নির্ঘণ্টে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে নানাবিধ সমস্যা সমাধানের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। খেলাধূলার চর্চা, বাস্তব ভিত্তিক পাঠক্রমের অনুসরণ ও সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশকে আরও ব্যাপক করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা-পরিবেশে শিক্ষকের স্থান—প্রাথমিক স্তরে শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত, পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই বয়সের শিশুদের আশা-আকাঙ্খা এবং সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে শিক্ষকদের পড়াশুনা থাকা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক হ'লেও শিশুরা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিকাদের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কার্য শুধু শ্রেণী কক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি খেলার মাঠে, যৌথকর্ম প্রচেষ্টায় ও গ্রন্থাগারে থাকবেন শিশুদের একান্ত আপনার জনের মত। শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যতই মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হবে কর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ততই সার্থক হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নৈতিক জীবন শিক্ষিকাদের আদর্শের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয় তাই শিক্ষিকাকে হ'তে হবে মায়ের মত স্নেহশীলা। শিশুদের কৌতূহল, জানবার আগ্রহ ও কর্ম প্রবণতাকে তৃপ্ত করবার জন্য সহৃদয় শিক্ষিকাকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান উন্নয়ন—পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এখনও শতকরা ৬০ জন প্রাথমিক শিক্ষক স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ শিক্ষকেরই কোনরূপ প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ হয় নি। যারা খেলাধুলা বা কারুশিল্পের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত তাদেরও অনেকের সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা বা প্রবণতা নেই। যে সব শিক্ষিকা স্কুলফাইন্যাল পাশ করে এসেছেন তাদের শতকরা ৯০ জনই তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ; ফলে এদের ভাষাজ্ঞান (Language ability) ত্রুটিপূর্ণ। মাতৃভাষা শিক্ষায় যে ত্রুটি প্রাথমিক স্তর থেকে আরম্ভ হয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নব-শিক্ষায় (New-Education) প্রশিক্ষণ নেবার মত বৌদ্ধিক ক্ষমতা শতকরা ৬০ জন শিক্ষিকার নেই তাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও শিক্ষার্থীদের নোট (Note) মুখস্থ করতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ প্রাথমিক শিক্ষকের বা শিক্ষিকার হাতের লেখা খুব খারাপ। বোর্ডে রেখাচিত্র (diagram) বা ফুল, ফল, পশুপক্ষীর চিত্র অঙ্কনের ক্ষমতা খুব কম শিক্ষিকার আছে অথচ প্রাথমিক শিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা না বাড়াতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন অসম্ভব।

কারুশিল্প শিক্ষিকার অভাব—এতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে পুঁথিগত শিক্ষা চালু থাকায় কারুশিল্পের শিক্ষিকাদের চাকুরী জুটতো না; তাছাড়া এ জাতীয় শিক্ষিকাদের সামাজিক মর্যাদাও খুব বেশী ছিল না; তাই হঠাৎ কার উদ্ভূত কারুশিল্প-শিক্ষিকা যোগানোর সমস্যা নব-শিক্ষা ব্যবস্থাকে (New Education) প্রায় অচল করে দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষিকাকে শিক্ষক-শিক্ষণ দিয়ে কারুশিল্প শিক্ষিকা হিসেবে গড়ে তোলা যায় না। কারণ এ জাতীয় প্রশিক্ষণ নিতে হ'লে শিল্প কার্যের জন্য বিশেষ মানসিক ক্ষমতা ('S'factor) এবং কারুশিল্প অনুসরণের ঝোক (aptitude) থাকা চাই। প্রশিক্ষণের সময় শিল্প কার্যের অনুশীলন এর একটা বড় অংশ। এজন্য প্রয়োজন মত কাঁচামাল চাই। অনেক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মত কাঁচামালের যোগান দিতে পারে না, তাছাড়া প্রশিক্ষণ দেবার মত যোগ্য ও অভিজ্ঞ অধ্যাপিকা পাওয়াও খুব শক্ত। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের সংখ্যা গত ২০ বৎসরে পাঁচগুণ বাড়লেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকার বেশ অভাব এখনও রয়ে গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিশাসন—প্রায় সবগুলি রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার মূল দায়িত্ব দেওয়া আছে স্থানীয় সংস্থা, পৌরসভা বা কর্পোরেশনের হাতে। সরকার পাঠক্রম প্রনয়ণ, বিদ্যালয় অনুমোদন ও পরিদর্শন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে নিজের দায়িত্ব শেষ করতে চান। এমন কি শিক্ষা কর (Education cess) ধার্য করবার ক্ষমতা দুর্বল স্থানীয় সংস্থার উপর দিয়ে

সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছেন গত ৪৫ বৎসর ধরে। কিন্তু জন সাধারণের আস্থা হারাবার ভয়ে পৌরসংস্থা কর্তৃক শিক্ষা কর ধার্য করা সম্ভব হয়নি। সরকারী সামান্য অর্থ সাহায্য ও স্থানীয় সংস্থার সাহায্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কোন রূপে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। একজন সাব্ ইন্সপেক্টরের এক্তিয়ারে ১০০টির বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকায় বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্য কাগজে কলমে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে হয় খুব কমই। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির গ্রাম্য রাজনীতির (village politics) প্রভাব এসে পড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিশাসন আরও ত্রুটিপূর্ণ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলন সার্থক না হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ সরকারী ঔদাসিন্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলির অক্ষমতা।

প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক দিক—বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের উৎস পাঁচটি। (১) সরকারী সাহায্য ৭৫% (২) স্থানীয় সংস্থা ২০% (৩) দেবোত্তর ১% (৪) ছাত্রবেতন ৩% এবং (৫) অন্যান্য ১% অংশ ব্যয়ভার বহন করে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের মারফৎ বিশেষ জাতীয় শিক্ষার জন্য (Special educational programme) অর্থ সাহায্য (grant-in-aid) দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকার স্থানীয় সংস্থাকে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য (grant-in-aid) করেন। এছাড়া রাজ্য সরকারের নিজস্ব অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে; সেগুলির ব্যয়ভার রাজ্য সরকারের। পল্লী অঞ্চলে যেখানে অবৈতনিক শিক্ষা চালু হয়েছে সেখানে ছাত্র বেতন আদায় করা বে-আইনী। কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কোন রূপ ছাত্র বেতন আদায় করে না। সহরে ও শিল্পাঞ্চলে নানা জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মাসিক ছাত্র বেতন কোথাও ১৲ টাকা আবার কোথাও ৫০৲ টাকার বেশী। দেবোত্তর খাতে (endowment) সাহায্যের পরিমান ক্রমেই কমে আসছে। স্থানীয় সংস্থার আর্থিক দানও আশাপ্রদ নয়। সরকারী সাহায্য সীমাবদ্ধ; তাই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ণের জন্য যে পরিমান অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে হবে শিক্ষা কর (Education cess) আদায়ের সাহায্যে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে অপচয় ও অনুন্নয়ন—প্রাথমিক শিক্ষার নানাবিধ ত্রুটির মধ্যে অপচয় ও অনুন্নয়ণ বিশেষ ভাবে শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি, উন্নয়ন, অপচয় ও অনুন্নয়ন একরূপ নয় তবে পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় অপচয়ের মাত্রা শতকরা ৩৩% জন এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে অপচয়ের মাত্রা ৫০% আর উপরের দিকে অপেক্ষাকৃত কম। অনুন্নয় অপচয়ের একটি কারণ

হলেও পৃথক ভাবে উহা আলোচিত হবে। অপচয়ের মানে শিক্ষাক্ষেত্রে সব কিছুর অপচয় নয়, যে সব শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে অনেকেই ১ম বা ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়নের পর বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় শতকরা ৪০ জন। বাকী ৬০ জনের মধ্যে অনেকে প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হন কিন্তু শতকরা ৩৩জন পুনরায় নিরক্ষর পর্যায় ভুক্ত হয়ে পড়েন। এদের জন্য নিয়োজিত অর্থ, শক্তি ও নানাবিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই অপচয়ের কারণগুলির মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ দায়ী দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এর জন্য দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি প্রয়োজন। জাতীয় আয় বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। এছাড়া অনুন্নয়ণ, বাল্যবিবাহ, অসম্পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত), গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি, একক শিক্ষক সমন্বিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধিক্য, পাঠক্রমের চাপ, পাঠক্রমের সাথে পারিবেশিক জীবনের সংযোগের অভাব, অর্দ্ধশিক্ষিত ও শিক্ষক-শিক্ষণ বিহীন শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য, অনাকর্ষণীয় বিদ্যালয় পরিবেশ, বিদ্যালয়ে অবস্থানের সময়ের দৈর্ঘ্যতা, সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ইত্যাদি কারণগুলি অপচয়ের জন্য দায়ী। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া অপর কারণগুলি দূর করবার চেষ্টা খুব কঠিন নয়। অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

অনুন্নয়ন—অনুন্নয়ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নৈরাশ্যের যবনিকা টেনে দিয়েছে। অনেকের ধারণা এদেশে অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার চেষ্টা ফলবতী হওয়া সম্ভব নয় কারণ এই স্তরে অনুন্নয়ণের পরিমাণ গড়ে শতকরা ৩৩ জন। অঞ্চল বিশেষে এর মাত্রা আরও বেশী। এর জন্য যতগুলি কারণ বর্তমান তার মধ্যে পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সর্ব প্রথম। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন। কোন্ ছাত্র কোন্ বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে তোতাপাখী-মুখস্থ প্রক্রিয়ায় সেটাই বড় কথা। নব শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ভেতর দিয়ে পারিবেশিক পরিচিতি করিয়ে দিলে এবং শিশুদের জন্য বাস্তবভিত্তিক পাঠের ব্যবস্থা করলে সকলেই কম বেশী বিষয়টি আয়ত্ব করতে সমর্থ হবে। পরীক্ষার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নয়; শিক্ষা ব্যবস্থা পরিমাপের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং এই পরিমাপের বা শিক্ষণীয় বিষয় বিচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিচারের মাপকাঠি নির্ণয় করতে হবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে জন শিক্ষার প্রসারকে ত্বরান্বিত করতে হ'লে পুঁথিগত শিক্ষার মানকে একটু নিচু করে নিতে হবে। তা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করে শিশু কেন্দ্রিকও কর্মভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব ভারতে প্রবর্তন করতে পারলে অনুন্নয়নের মাত্রা কমে আসবে। বিদ্যালয়ের

পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের ব্যক্তিগত তত্ত্বধানে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে অনুন্নয়নের মাত্রা সহজেই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা ব্যবস্থা—পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষায় অপরিহার্য কিনা এ নিয়ে তর্ক আছে। বর্তমান অবস্থায় এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ রূপে পরীক্ষার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করা যাবে না। তবে এই স্তরে পরীক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্যায়ে বহিরনুষ্ঠিত পরীক্ষার বিলোপ সাধন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর বুনিয়াদী, মিডলস্কুল বা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞানকে (certificate) শিক্ষার্থীর যোগ্যতার প্রমাণ পত্র হিসেবে দাখিল করতে পারে। এই ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের সাক্ষ্য বহন করবে। অবশ্য ধারাবাহিক পরিমাপপত্র (Cumulative record card) প্রস্তুতের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই কৌশলটির ব্যবহারিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরীতে নিয়োগের পক্ষে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে। শ্রেণী উন্নয়নের সময় এই পরিমাপ পত্রের যথেষ্ঠ মূল্য দিতে হবে। তবে পরীক্ষায় পাশের যে মান (Marks) এখন নির্ধারিত আছে সমাজের প্রয়োজনে তার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। শতকরা ৩০ নম্বর পাশের মান রক্ষা করলেও শিশুর সামগ্রিক বিকাশের মান রক্ষা করতে হ'লে পাশের শতকরা নম্বর ৮০ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুর বিকাশোন্মুখ জীবনের প্রতিটি পরিবর্তনকে শিক্ষিকার লক্ষ্য করতে হবে। বর্তমানে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা নামে যে সমস্ত অভ্যন্তরীন পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলির পরিবর্তে শিক্ষার্থীর বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বড় করে দেখতে হবে। অবশ্য ভাষা শিক্ষা, গণিতের জ্ঞান, সাহিত্য পাঠের আনন্দ, এবং অন্যান্য বিষয়ের অভিজ্ঞতা মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে হবে প্রয়োজন মত। এজন্য ঘটা করে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি পর্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র প্রধান শিক্ষিকা ও বিষয় শিক্ষিকার সাথে পরামর্শ করে শ্রেণী শিক্ষিকাকে প্রস্তুত করতে হবে এবং এরই প্রয়োজনে ঐরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষায় নির্দেশনা—নির্দেশনা দু'প্রকারের—(১) শিক্ষা নির্দেশনা ও (২) বৃত্তিনির্দেশনা। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তিনির্দেশনার কথা ওঠে না। তবে ভারতবর্ষে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের শতকরা

৬০।৬৫ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। সেদিক থেকে বৃত্তি-নির্দেশনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাস্তর বা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দেবার পর কৃষি কার্যে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে জীবিকা সংগ্রহের জন্য অনিপুণ শ্রমিক (Unskilled labour) হিসেবে যোগদান করা ছাড়া অনেকেরই গত্যন্তর থাকে না। এদের মধ্যে প্রতিভাশালী বালক ছোটখাট ব্যবসা আরম্ভ করতে পারে। শিক্ষিকা শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীদের কর্মপ্রবণতা ও বুদ্ধি ক্ষমতা দেখে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি নির্দেশনায় সাহায্য করতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জন্য শিক্ষা নির্দেশনার অবকাশ কম। তবে পেছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জন্য এবং যে সব বালক বালিকার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিচ্ছে তাদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা-নির্দেশনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খুব প্রতিভাশালী শিক্ষার্থীর জন্যও শিক্ষা নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতি ও তার প্রতিকার— শিশুর জীবনে নানা কারণে অপসঙ্গতি ঘটতে পারে। এই অপসঙ্গতির দু'টি স্তর ; প্রথম স্তরে উহার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, আর দ্বিতীয় স্তরে উহা মানসিক রোগের আকার ধারণ করে। অপসঙ্গতির কারণগুলির মধ্যে অপরাধের অনুভূতি, নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। দিবাস্বপ্ন, অলীকচিন্তা, অযথা ভীতি ইত্যাদি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভের নমুনা। এ গুলির বাহিক প্রকাশ হয় অন্যায় ক্রোধ, দুর্নীতিপরায়ণ মনোভাব এবং অশ্লীল কথন ও লেখনের মধ্যে।

দেশের শিল্প বানিজ্যের অগ্রগতির সাথে নূতন নূতন সহর গড়ে উঠছে। শিল্পাঞ্চলে চাকুরীর সুবিধা আছে। স্বামী স্ত্রী যেখানে উভয়েই চাকুরী করেন সেখানে শিশুরা পিতামামাতার স্নেহ থেকে বেশীর ভাগ সময় বঞ্চিত থাকে। পিতামাতা উভয়েই যদি কর্মস্থলে চলে যান তবে শিশুদের মনে মায়ের বা বাবার কর্মস্থলের প্রতি ঘৃণা এবং মা-বাবার উপজীবিকার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাপ মায়ের অবর্তমানে ছোট ছোট ভাই বোনেরা মারামারি করে, বাড়ীর জিনিষপত্র ভাঙ্গে ও নষ্ট করে, মিথ্যা কথা শেখে অনেক সময় অপরের জিনিষ অকারণে চুরি করে। স্কুলে এসে সহপাঠিদের সাথে মারামারি করে ; অনেকে আবার হয় উল্টো ধরনের—কারও সাথে বড় একটা মেশে না, শ্রেণী কক্ষের এক কোণে বসে থাকে, সবাইকে কেমন ভয় করে, শিশুর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শিশুসুলভ স্বাভাবিক হাসি ও ক্রিয়া চাঞ্চল্য এদের মধ্যে দেখা যায় না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শিশুদের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সেখানে যদি সামঞ্জস্যের অভাব থাকে তাহলে শিশুরাও সহজে পারিবারিক জীবনে খাপ খাওয়াতে পারে না। সহরে ও শিল্পাঞ্চলে গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা বস্তির আবহাওয়ার মধ্যে বেড়ে উঠে। সামাজিক অপরাধ এই সমস্ত পরিবেশকে সব সময়ই কলুষিত করে রাখে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিশু চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারে না তাই বিদ্যালয় বহির্ভূত অপরাধপ্রবণ এবং অসামাজিক পরিবেশের আপাতমধুর আনন্দ উপভোগের দ্বারা বালক বালিকারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে অপসঙ্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে। দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক সমাজে বালকবালিকারা বিভিন্ন ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পুর্বে মনে করা হ'ত অপরাধ প্রবণতার পেছনে রয়েছে শিশু-মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কিন্তু বর্তমানে নানা প্রকার গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে অপরাধ প্রবণতার পেছনে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণগুলি কম বেগবতী নয়।

বালক বালিকাদের জীবনে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য বা অপসঙ্গতি দেখা যায় তার মূল কারণ শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদার অতৃপ্তি। যে মৌলিক চাহিদার অভাবে অপসঙ্গতির উদ্ভব হয়েছে সেই চাহিদা তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে পারলে অপসঙ্গতির নিরাময় সম্ভব। সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও ইন্দ্রিয়মূলক কার্যের উৎকর্ষের দিকে নজর দিলে অপসঙ্গতির সংখ্যা ও পরিমাণ বেশ কম হবে। গৃহে ও বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদের জানার আগ্রহ ও কৌতূহল নিবৃত্তির স্বাভাবিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে এদের জীবনে প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধান সব চাইতে বড় সমস্যা। তাই কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদের বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক চাহিদার তৃপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভালবাসার অভাব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব থেকেই মূলতঃ অপসঙ্গতির জন্ম হয় বলে শিশু-শিক্ষায় সৃজনমূলক কাজ ও আত্মপ্রত্যয়মূলক কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। স্বল্পবুদ্ধি বালকের অপসঙ্গতি বিচার করে দেখা গেছে যে শিশুর বুদ্ধির সীমানার বাইরে বেশী কিছু তার কাছে জোর করে আদায় করতে চেষ্টা করলে তার মধ্যে অধ্যয়ণের প্রতি ভীতি ও বিরূপতা দেখা দেয়। পরে শিশু স্কুল পালাতে আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে মিথ্যা কথন, চৌর্য্যবৃত্তি ও কুসঙ্গের আসক্তি শিশুর জীবনে দেখা দিতে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে সহানুভূতির সাথে শিশুদের অপসঙ্গতি দূর করবার চেষ্টা করতে হবে শিক্ষিকাদের।

অপরাধ প্রবণতা দূর করবার জন্য (১) প্রতিরোধমূলক (preventive) ও (২) নিবারণ-মূলক (curative) পন্থা অনুসরণ করা যায়। প্রারম্ভিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে ও গৃহে প্রতিরোধমূলক পন্থা অনুসরণ করতে হয়। এ ব্যবস্থা সম্ভব না হ'লে শিশুদের ঐ সমস্ত কলুষিত পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

অপসঙ্গতির মনোবিজ্ঞান সম্মত কারণ জানবার জন্য শিক্ষার্থীদের শিশু-সমীক্ষা কেন্দ্রে (child clinic centre) নিয়ে যেতে হবে। বিদ্যালয়ে সমাজধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং কর্মভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্তন করে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের অপসঙ্গতি দূর করবার চেষ্টা করা যায়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক—শিক্ষার ইতিহাস পাঠের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইংরেজেরা এদেশে এসেছিল বণিক রূপে। শাসনভার গ্রহণ করবার পরও কোম্পানী দেশের শিক্ষার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ পাশ্চাত্য মিশনারী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ এবং পল্লীগ্রামের পাঠশালা ও মক্তবের পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ্যাডামের রিপোর্টে গ্রাম্য পাঠশালার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধর্মীয় প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন ছিল এখানে মুখ্য, শিক্ষাদান বা শিক্ষার প্রচার ছিল গৌণ।

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে কোম্পানীর অনাগ্রহ

পর পর কয়েকটি শিক্ষা কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হয় এবং তা নিরোধ করবার বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় নি। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা তখন কেহ বড় একটা ভাবেন নি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তিত হয় নি। সেইজন্য কোম্পানীর রাজত্বকালে ভারতীয় প্রজাদের জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ইংরেজ সরকার ভাবতে পারেন নি। তাছাড়া কোম্পানী স্বল্প বেতনে ইংরেজী জানা কেরাণীর অভাব দূর করবার জন্য এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দিকে একটু বেশী নজর দিয়েছিলেন এবং শিক্ষাখাতে যে সামান্য অর্থ বরাদ্দ ছিল তা হাইস্কুল ও কলেজীয় শিক্ষায় ব্যয় হয়ে যেত। প্রাথমিক শিক্ষাকে অগত্যা সকলের দয়া ভিক্ষা করে চলতে হ'ত। বিগত ১৫০ বৎসর ধরে বিদেশী সরকার, দেশীয় জন সাধারণ ও রাজন্যবর্গ সমভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা করেছেন।

সর্ব প্রথম এডাম সাহেবের রিপোর্ট (১৮৩৮ খৃঃ) থেকে দেখা যায় যে তিনি এদেশীয় পাঠশালা শিক্ষার উন্নয়ন করে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করতে সুপারিশ করেন। তৎকালে এদেশে প্রতি ৪০০ বালক বালিকার জন্য একটি পাঠশালার ব্যবস্থা ছিল। কাজেই সে সময় সরকার পক্ষ থেকে একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে দেশের শিক্ষার ইতিহাস হ'ত সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু দুর্ভাগ্য

ভারতবাসীর! দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক না করে সরকার ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনে প্রয়াসী হ'লেন। দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হ'ল। নব্য ভারতীয় সমাজ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে ইংরেজী সমাজের অনুকরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে ব্রতী হয়। আর দেশের শতকরা ৯৫ জন অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়ে রইল প্রায় দেড়শত বৎসর ধরে। বোম্বাই অঞ্চলে সর্বপ্রথম ক্যাপটেন উইংগেট নামে একজন ইংরেজ অফিসার কৃষিজীবিদের করভারে পীড়িত করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করাতে ইংরেজ সরকার উহার বিরোধিতা করেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে এদেশের ধর্মের উপর হাত দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, আদিবাসীও হরিজনদের সমাজে গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনের উপর হাত না দিলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। মুসলমানদের মধ্যে পর্দাপ্রথা ও ধর্মের গোড়ামীও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধী। গুজরাট অঞ্চলের ইংরেজ শিক্ষা-পরিদর্শক টি. সি. হোপ আঞ্চলিক সংস্থাকে শিক্ষাকর আদায়ের ক্ষমতা দিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব দেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। বোম্বাই প্রদেশের জনশিক্ষা আধিকারিক এতে সম্মত হ'লেও সরকার পক্ষের বিরোধিতায় উহা কার্যকরী হয় নি।

১৮৮৫ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর জন শিক্ষা প্রসারের জন্য কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অনুরোধ করেন। স্বায়ত্ব শাসন লাভই তখন কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। অশিক্ষিত দেশবাসীদের নিয়ে কোন প্রকার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আন্দোলন সার্থক হবে না বলে ভারতীয় নেতারা বৃটিশ ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলন আরম্ভ করেন বিভিন্ন প্রদেশে। এদের মধ্যে **স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, চিমনলাল শীতলাবাদ** ও **মহামতি গোখেলের** নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলনকে সার্থক করে তোলেন বরোদা রাজ্যের দেশীয় রাজা **সয়াজীরাও গাইকোয়াড়।** ১৯০৬ খৃঃ পরীক্ষামূলক ভাবে তিনি স্বীয় রাজ্যের **আম্রলি তালুকে সর্ব প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা** প্রবর্তন করে বেশ সুফল লাভ করেন। এই প্রচেষ্টায় সার্থকতা লাভ করে তিনি সমগ্র বরোদা রাজ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে এদেশে এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের পথ প্রদর্শকের কার্য করেন।

১৯১০ এবং ১৯১২ খৃঃ দু'বার মহামতি গোখেল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করেন।

এই ঐতিহাসিক বিলটি কাউন্সিলে গৃহীত হয় না। তবে ১৯১২ সালে ইংরেজ সরকার তার শিক্ষা নীতিতে ঘোষণা করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সরকারের অন্যতম কর্তব্য। এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সরকার জড়িয়ে পড়েন এবং সমস্ত শিক্ষা পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। যুদ্ধশেষে ১৯২১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল সরকারের সহযোগিতায় প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হয়। শিক্ষা বিভাগটি আসে হস্তান্তরিত অংশে। ফলে দেশীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এসে পড়ে শিক্ষা বিভাগ।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে গোখেলের বিল ও তার প্রভাব

দেশীয় মন্ত্রীগণ দেশ গড়ার আদর্শ নিয়ে শিক্ষা বিভাগের কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। জনগণের মধ্যে মুক্তি-সংগ্রামের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে এই আদর্শ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির জন্য মন্ত্রীগণ বদ্ধপরিকর হন। প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রবর্তিত হয় বিভিন্ন প্রদেশে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই। বাংলাদেশে ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। নীতি গত ভাবে ইহা বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন। এই আইনে শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলেও যাতে এই আইন চালু হ'তে পারে তার জন্য বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন সংশোধিত হয়। খুবই দুঃখের বিষয় আমলাতান্ত্রিক সরকারী আওতায় ১৯১৯এর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইনটি কার্যকরী হ'তে পারে নি। অন্যান্য প্রদেশের রিপোর্টও আশাপ্রদ নয় বরং আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষের যে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি ও আদর্শনিষ্ঠা থাকা দরকার তার কিছুই ছিল না।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন সমূহ

মহামতি গোখেলই সর্ব প্রথম ভারতীয় জনমতকে গড়ে তোলেন বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলনের সম্মুখীন হ'তে। আইন ছাড়া এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সম্ভব নয় কারণ ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় এত কম এবং শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ও কৃষি-ব্যবস্থা এমন সেকেলে যে শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত হলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন খুব কম সংখ্যক ভারতবাসী। জনমতের দাবীতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে প্রায় সবগুলি প্রদেশেই নীতিগত ভাবে আবশ্যিক প্রাথমিক ব্যবস্থার প্রবর্তন সরকারী সমর্থন লাভ করে কিন্তু শুধু আইন পাশ করলেই যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায় না বাংলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস আর বরোদা রাজ্যের বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তা বুঝতে পারা যায়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা পরিশাসন ব্যবস্থা খুব

উন্নত হওয়া প্রয়োজন। তবে একথাও সত্য যে জনসাধারণ ও বিভিন্ন সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সরকারী শিক্ষা দপ্তরের পক্ষে এই বিরাট দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। তা ছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আলোচ্য বিষয়গুলির উপর জোর দিতে হবে।

(১) উন্নত ধরণের সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, (২) শিক্ষা কর আদায়ের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার হাতে না রেখে সরকারের নিজের হাতে নিয়ে আসা, (৩) স্বল্পকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার (দৈনিক ৩ ঘণ্টা) প্রবর্তন যাতে কৃষক ও শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা উৎপাদকাত্মক কার্য বা গৃহ কার্যে পিতামাতাকে সাহায্য করতে পারে ; (৪) মেয়েদের জন্য সকালে বা বিকেলে পালাক্রমে (by shifts) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, (৫) শিক্ষাকে অবৈতনিক করা এবং পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে দেওয়া, (৬) আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র ভর্তির বয়স উর্দ্ধপক্ষে ৬ বৎসরের জায়গায় ৭ বৎসর করা, (৭) প্রাথমিক শিক্ষাকে জীবন কেন্দ্রিক করে আঞ্চলিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করা এবং (৮) বিদ্যালয় গৃহ, আসবাবপত্র ইত্যাদির খরচ কমিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন ধারণের উপযোগী বেতন দিয়ে দু'বার পালাক্রমে (two shifts) শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন আমরা লক্ষ্য করেছি যে বৃটিশ আমলে প্রাথমিক শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৬.৫ জন। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত হবার পর উহা দাঁড়ায় শতকরা ৯ জনে। বাস্তব পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাবই এর মূল কারণ।

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হলেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার প্রতি পদে বিঘ্নিত হতে থাকে। ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে যে হক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে হক সাহেব খুব আগ্রহী ছিলেন। এই মন্ত্রী সভা বিদেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার আলোকে আধুনিক কর্ম কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন। তারপর আসে বিশ্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাসমর। বিদেশী সরকারের যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করবার জন্য শিক্ষাখাত থেকে প্রচুর অর্থ যুদ্ধ খাতে চলে যায়। অর্থাভাবে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষারূপে গৃহীত হবার পর নিম্নবুনিয়াদী বা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকার বহন করতে স্বীকৃত হন কিন্তু নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নি। বাংলাদেশে বেসরকারী প্রচেষ্টায় ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে বলরামপুরে একটি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু হয় এবং এখান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকেরা সমাজ সেবক কর্মী হিসেবে বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু সংখ্যক বুনিয়াদী

বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ প্রসার হয়। কিন্তু গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। বাংলাদেশে স্পেশাল ক্যাডারের কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগের ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার কিছু প্রসার হয়। সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে পৌর অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু যে দেশে শিক্ষা দানে শিক্ষকের প্রাণ নেই, শিক্ষা প্রসারে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজন অনুরূপ অর্থের যোগান নেই, প্রাথমিক শিক্ষা আইন ত্রুটিপূর্ণ ; স্থানীয় সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পালনে অক্ষম, অভিভাবকেরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নির্বিকার আর শিক্ষার্থীর পাঠে আগ্রহ নেই, মন্ত্রীদের আছে গালভরা বক্তৃতা সে দেশের আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার যে প্রতি পদে বিঘ্নিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ?

প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও তার প্রয়োগ—১৯১৯ সাল থেকে দেশীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এসে পড়ে শিক্ষাবিভাগ। ১৯১৭ খ্রীঃ বোম্বাই প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি পাশ হয়। বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী এই প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রত্যেকটি প্রদেশ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নূতন কর্মোদ্যমের পরিচয় দেন। ইহারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯১৯ খৃঃ পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তিত হয়। দুই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন সমূহ

		বিল আনিত হয়	আইন পাশ হয়
(১)	বোম্বাই প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রযুক্ত)	১৯১৭	১৯১৭
(২)	বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯১৭	১৯১৯
(৩)	বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক প্রাথমিক আইন	১৯১৮	১৯১৯
(৪)	পাঞ্জাব প্রাদেশিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন	১৯১৮	১৯১৯
(৫)	যুক্ত প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯১৮	১৯১৯
(৬)	মধ্যপ্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯১৯	১৯২০
(৭)	মাদ্রাজ প্রাদেশিক শিশু শিক্ষা আইন	১৯২০	১৯২০
(৮)	বোম্বাই সহরাঞ্চলিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯২০	১৯২০
(৯)	বোম্বাই প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অঞ্চলে প্রযুক্ত)	১৯২২	১৯২২
(১০)	আসাম প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯২২	২৯২৬
(১১)	যুক্ত প্রাদেশিক ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯২৫	১৯২৬
(১২)	বঙ্গীয় (পল্লী) প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯৩০	১৯৩০
(১৩)	পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন	১৯৬৩	১৯৬৩

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাংলাদেশে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয় ১৯১৯ সালে সহরাঞ্চলের জন্য। ১৯২১ সালে ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলেও যাতে এই আইন চালু হ'তে পারে তার জন্য বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন সংশোধিত হয়। এই আইনে বলা হয়েছে যে আইনটি চালু হবার এক বছরের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণকে সরকারের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগটিকে নিজ নিজ মিউনিসিপ্যালিটির প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় জানাতে হবে। সরকারের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ যথাসম্ভব সত্বর সেই বিষয়গুলি বিচার করবেন। মিউনিসিপ্যালিটির আথিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। মিউনিসিপ্যালিটির তদন্তের রিপোর্টে থাকবে ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের সংখ্যা, তাদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে পড়ে তাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির রেকর্ড, শিক্ষাকর কিরূপ আদায় হয় ও ভবিষ্যতে কিরূপ আদায় হতে পারে, এবং নূতন ব্যবস্থা চালু করতে কি পরিমাণ সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হবে। কাগজে কলমে প্রাথমিক শিক্ষার জয়যাত্রা সুরু হ'ল, কিন্তু এ বিষয়টির গোড়ায় গলদ রয়েছে। বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটির আথিক দুর্গতি ও কমিশনারদের নিষ্ক্রিয় প্রচেষ্টা সর্বজন বিদিত। এ অবস্থায় অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত দায়িত্ব অপদার্থ মিউনিপ্যালিটির হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকার নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। ফলে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না।' এই নীতি বহুদিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে।

১৯১৯-এর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইনের বলে আইনগত ভাবে ৬ হতে ১০ বছরের বালকবালিকাদের অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব পড়ে মিউনিসিপ্যালিটির হাতে। মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী সাহায্য পাবেন এবং প্রয়োজন স্থলে সরকারের অনুমতি নিয়ে শিক্ষাকর ধার্য করতে পারবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহা তেমন ভাবে প্রযুক্ত হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা খুবই সমস্যাসঙ্কুল। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ সরকারী স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের নির্দেশ লাভের পর ৬ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটির আবেদন মঞ্জুর করবার পুর্বে সরকার দেখবেন, আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার অর্থ মিউনিসিপ্যালিটির আছে কিনা। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আথিক অবস্থা স্বচ্ছল না হ'লে শিক্ষাকর ধার্যের অধিকার দেওয়া হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করতে হ'লে সরকারের কাছে

প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা সমস্যাসঙ্কুল

অনুমতি নিতে হবে। সরকার তার মঞ্জুর করার অধিকার নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার নিজ দায়িত্ব সর্বত্রই এড়িয়ে গেছেন। তৎকালীন সরকারী নীতির মধ্যে দেশবাসীর কল্যাণ হয় এমন কোন আদর্শ ছিল না। আমলাতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কাছে এর চাইতে বেশী কিছু আশা করা অযৌক্তিক।

এই আইনে বলা হয়েছে যে সকল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হবে সেই যে অঞ্চলে একটি করে স্কুল কমিটি স্থাপিত হবে। সে অঞ্চলের প্রত্যেক অভিভাবকের সমস্ত কর্তব্য হবে তার ছেলেদের (৬ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত) বিদ্যালয়ে পাঠান। প্রয়োজন স্থলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিভাবককে ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য করতে পারবেন। যেখানে নূতন শিক্ষাকর ধার্য হবে সেখানে আদায়ীকৃত সমুদয় অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। খুবই দুঃখের বিষয় আমলাতান্ত্রিক সরকারী আওতায় ১৯১৯-এর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা-আইনটি কার্যকরী হতে পারে নি। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য কর্তৃপক্ষের যে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি ও আদর্শনিষ্ঠা থাকা দরকার তার কিছুই ছিল না। ১৯৩০ খৃঃ বঙ্গদেশের জনপ্রিয় লীগ মন্ত্রীসভা বঙ্গীয় প্রাদেশিক পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার পূর্ণদায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক না হলেও পল্লী অঞ্চলে উহাকে অবৈতনিক করা হয়।

১৯১৯-এর শিক্ষা আইন কার্যকরী করা যায় নি কেন?

১৯৬৩ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। এই আইনটির আওতায় আসে পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যাল এলাকাগুলি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে এই আইনটি শুধু সহরের জন্য প্রবর্তিত হওয়াতে পল্লীগ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন বিলম্বিত হয়ে গেল। শিক্ষা-করের হার কম হওয়াতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিঘ্নিত হয়েছে। তাছাড়া দুর্বল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে এই বিরাট দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে রাজ্য সরকার বৃটিশ সরকারের মতই নিজের দায়িত্ব অনেকটা এড়িয়ে গেছেন। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা ১১ বৎসর পর্যন্ত সীমিত হওয়ায় এতদঞ্চলের জনসাধারণের শিক্ষার মান খুবই নীচে থাকবে।

এই আইনটিকে কার্যকরী করতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যালিটির ১১+ছেলেমেয়ের সংখ্যা, বর্তমান স্কুলগুলিতে আসন সংখ্যা, কতজন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, কতকগুলি নূতনবিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন, বিদ্যালয় স্থাপনের উপায়, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক খরচ, এইখাতে বর্তমান আয়, শিক্ষাকর সহ কত অর্থ

এই খাতে পাওয়া যেতে পারে ইত্যাদি বিবরণ রাজ্যসরকারকে দিতে হবে। এই বিবরণীটি বিচার বিশ্লেষণ করে রাজ্য সরকার উক্ত পৌরসংস্থার কতটুকু এলাকায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করা সম্ভব তা স্থির করবেন। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত অঞ্চলে শিশু শ্রমিক (১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত) দণ্ডণীয় অপরাধ। স্কুলে বাধ্যতামূলক যোগদানের আইন প্রনয়ন করবেন পৌরসংস্থা। এই খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্য-সরকারের অনুমতি নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি সেই অঞ্চলের শহরের সম্পত্তির উপর অন্যূন ২% ভাগ শিক্ষা কর ধার্য করতে পারে। এই সমস্ত বিদ্যালয় রাজ্যসকারের পরিদর্শকেরা পরিদর্শন করবেন।

বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সর্বভারতে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ও অবৈতনিক করা সম্ভব হয়নি যদিও তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র নির্মানের সময় স্থিরীকৃত হয় যে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ১১+শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করা হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের ২০ বৎসর পরও ১১+শিশুদের শিক্ষার হার ৭৬'৪ জনের বেশী হয়নি। শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন প্রায় ৪৫ বৎসর পুর্বে। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে বিদ্যালয় গমনের উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের (৬ থেকে ১১+) মধ্যে মাত্র ৪২% জন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। গত ২০ বৎসরের চেষ্টায় উহা হয়েছে ৭৬% জন। আরও ১০।১৫ বৎসর পর হয়ত ১০০% ছেলেমেয়েকে (৬ থেকে ১১+) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাবে তবে সেই সঙ্গে এদেশের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কথাও মনে রাখতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি

গত ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে **সার্বজনীন, আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অসুবিধাগুলি** নিয়ে লিপিবদ্ধ হলো।

(১) সহরে ও পৌরসভা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন কিন্তু পল্লীর কৃষকদের শতকরা ৫০ জনেরও বেশী বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে চান না। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। যে সমস্ত অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে সে সমস্ত অঞ্চলে শাস্তির ভয় না দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করা যাচ্ছে না।

(২) পল্লীর মেয়েরা বিশেষ করে অনগ্রসর জাতির মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসতে চায় না।

(৩) মাত্র অল্প কয়েকদিনের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে বলে অনুশীলনের অভাবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা উহা ভুলে যায় পরিণত বয়সে।

(৪) জীবন যাত্রার মান অত্যন্ত নীচু বলে এবং সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত নয় বলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশবাসীরা বুঝতে পারেন না।

(৫) পল্লীগ্রামে মহিলা শিক্ষক বেশী পাওয়া যায় না বলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েরা তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে আছেন।

(৬) অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের মত ভারতের জনসংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সেই অনুপাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে এদেশে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে পারছে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্য এখনও সুদূরপরাহত।

(৭) বহু পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। আদিবাসী অঞ্চলে ও পার্বত্য অঞ্চলে এখনও বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম।

(৮) প্রাথমিক শিক্ষা আইন ত্রুটিপূর্ণ।

(৯) বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের অর্থ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তেমন পাওয়া যাচ্ছে না।

(১০) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এখনও বহুত্রুটিপূর্ণ। পুঁথিগত বিদ্যার বদলে কর্ম ভিত্তিক পাঠক্রম প্রবর্তনের চেষ্টা হলেও উহার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। এখনও শতকরা ৫ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও বুনিয়াদী ধাচে পরিবর্তিত করা যায়নি।

(১১) প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা এত কম যে কেহ বড় একটা স্বেচ্ছায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হ'তে চান না। গায়ের ছেলে স্কুলফাইনাল পাশ করে অন্য যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে আগ্রহী কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে কেহ সহজে এগিয়ে আসে না। তাছাড়া বুনিয়াদী ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ। তাই প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জনের বেশী শিক্ষক এখনও প্রশিক্ষনের কোন সুযোগ পাননি।

(১২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সস্তায় উন্নত ধরণের পাঠ্য পুস্তক প্রনয়ন করা এখনও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

(১৩) কৃষক, শ্রমিক ও গরীবের সন্তানদের অনেকেই পেটের দায়ে অল্প বয়সে ভৃত্য বা পরিচারিকার কার্যে যোগদান করতে বাধ্য হয়। শ্রমিক আইন দ্বারাও এই জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রথা রদ করা যাচ্ছেনা।

(১৪) বৃটিশ আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমান শিক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগের বেশী হয় নি।

(১৫) গণতন্ত্রী দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু এদেশে এই দায়িত্ব সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি ও জন সাধারণের মধ্যে এমন ভাবে বণ্টন করা আছে যাতে প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি বিশেষ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

(১৬) সর্বোপরি প্রয়োজন অনুরূপ অর্থের যোগান না থাকাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য—বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন গণতন্ত্রী সরকারের অবশ্য করণীয়। শিক্ষায় অনগ্রসর ভারতবর্ষে সরকারী চেষ্টায় এখনও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সরকারী তহবিলের বেশ মোটা অঙ্ক এই খ্যাতে ব্যয় করতে হবে। নানা কারণে সরকারের বরাদ্দ অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ অপচয় হয়ে থাকে। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় টাকার অঙ্ক হিসেব করতে একথাটি মনে রাখতে হবে। শুধু বাড়ী, ঘর, সাজ-সরঞ্জামের খ্যাতে সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করলে হবে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষ করে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দান করতে হ'লে উপযুক্ত বেতনে শিক্ষক নিয়োগ এবং সেই সমস্ত শিক্ষকের শিক্ষণ-শিক্ষা ব্যবস্থা ও রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা সরকারকে অবশ্যই করতে হবে। এই খাতে যে অর্থ খরচ করা দরকার হবে, তার ব্যবস্থা যতদিন সরকার করতে না পারেন ততদিন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী দপ্তরের ফাইলে চাপা পড়ে থাকবে। অনগ্রসর ও আর্থিক সামর্থ্যহীন মিউনীসিপ্যালিটির উপর এই গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে জাতীয় সরকার যদি বৃটিশ নীতি অনুসরণ করেন তবে জন সাধারণকে নিরাশ হ'তে হবে। এবার আমরা আলোচনা করব প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি ও জনসাধারণের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করা হয়েছে এবং কিভাবে এই দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তুতি পর্ব

কেন্দ্রীয় সরকার—বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হ'লেও বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়োজন অনুরূপ অর্থের একটা মোটা অংশের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া অনগ্রসর রাজ্য ও অঞ্চলগুলির প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব আরও বেশী করে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করবেন। বুনিয়াদী শিক্ষার সর্বভারতীয় রূপদানের দায়িত্ব থাকবে ভারত সরকারের। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ, পাঠ্যক্রম সংস্কার, শিক্ষক শিক্ষণের উন্নতি এবং বুনিয়াদী শিক্ষার উপর বিস্তৃত গবেষণার দায়িত্ব ভারত সরকারকে নিতে হবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নানা প্রকার সম্মেলন সংগঠনের দায়িত্ব মূলতঃ থাকবে ভারত সরকারের।

রাজ্য সরকার—বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব বহন, শিক্ষা কর স্থাপন, পাঠ্যক্রম রচনা ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে রাজ্য সরকারের। এছাড়া স্বল্পমূল্যে পাঠ্য পুস্তক রচনা, শিক্ষার সাজ্ সরঞ্জাম প্রস্তুত, বিদ্যালয়ের জন্য জমি ও বাড়ী সংগ্রহ, উপযুক্ত শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত ইত্যাদি কার্যে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকার উপরোক্ত দায়িত্বগুলি জন সাধারণ ও পৌরসভাগুলির উপর দিয়ে যখন খবরদারী করতে চান, তখনই সমস্যাগুলি জটিল আকার ধারণ করে। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য যে পরিমান প্রচারকার্য করা দরকার, এবং প্রয়োজন স্থলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন তাও সরকারকে হাতে নিতে হবে। এই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য শিক্ষা দপ্তরে উপযুক্ত কর্মদক্ষ, অভিজ্ঞ ও শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দ্বারা চালিত শিক্ষা দপ্তরের কর্মচারীদের দ্বারা এরূপ গুরুদায়িত্ব বহন করা অসম্ভব। শুধু এই মনোভাব দূর না হওয়াতে এবং বিভিন্ন খাতে প্রচুর অর্থের অপব্যয় হওয়াতে মুল বাজেটের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ অর্থ ব্যয় করেও দেশের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হয় নি বরং দিনের পর দিন প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

অবাস্তব পরিকল্পনা

সরকারী পরিকল্পনাগুলি যে কত অবাস্তব একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে প্রচুর অর্থ পাবার সম্ভাবনায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাকে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এখন অনেক রাজ্য সরকার এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে দেশের সর্বত্র আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করা বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে সম্ভব নয়। তা ছাড়া সরকারী শিক্ষা বিভাগের অকর্মণ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের একটা মোটা অংশ রাজ্যসরকার কর্তৃক শিক্ষা বিস্তারে ব্যবহার করতে না পারার মধ্যে। এ সম্বন্ধে শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের নজর দিতে হবে। যেখানে অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার

সরকারী শিক্ষা বিভাগের অকর্মণ্যতা ও তার প্রতিকার

দ্রুত প্রসার সম্ভব হচ্ছে না সেখানে প্রতিবৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ফেরৎ পাঠানো বা সরকারী অর্থের অপচয় খুবই মর্মান্তিক। এ বিষয়ে জনমত গঠিত হ'লে সরকারকে তৎপর হতে হবে। কাজেই আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা সুচিন্তিত, বাস্তব ও সুসংবদ্ধ হওয়া চাই

এবং সেই পরিকল্পনাগুলিকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে উপযুক্ত সরকারী কর্মচারীর কর্মদক্ষতা ও জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

পৌরসভা—এতাবৎকাল সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মূল দায়িত্ব অক্ষম পৌরসভাগুলির উপর দিয়ে খবরদারী করে বেড়িয়েছেন। তাই প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে সর্ব-প্রথম বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশের পর এতাবৎকাল পর্যন্ত ইহার প্রসারের শম্বুক গতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে; শুধু যে সমস্ত পৌরসভাকে সরকার এই গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য বলে মনে করেন, তার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দিতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম রচনা, বিদ্যালয় পরিদর্শন, বিদ্যালয় অনুমোদন ও শেষ প্রাথমিক পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের হাতে থাকবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় আইনভঙ্গকারীদের শাস্তিবিধান ও সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

স্থানীয় জন সাধারণ—প্রাথমিক বিদ্যালয় সংগঠন, বিদ্যালয়ের জমি সংগ্রহ ও বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় জন সাধারণের নির্বাচিত বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির হাতে থাকে। সরকার নির্বাচিত শিক্ষকের তালিকা থেকে বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি শিক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন।

আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে স্বল্প-বেতনে কেহ শিক্ষকতা করতে চান না। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও সময় মত বেতন প্রাপ্তি সম্বন্ধে সকলেই সন্দিহান, তাছাড়া চাকুরীর সর্তাবলী মোটেই আকর্ষণীয় নয়। 'শুধু মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না'; বিশেষ করে দেশ যখন শিল্প ও কৃষিতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, জীবনযাত্রার মান ক্রমেই উন্নত হচ্ছে এবং নিত্য ব্যবহার্য পণ্যমূল্য আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে তখন সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবনধারণের উপযোগী বেতন দিতে হবে; তাদের চাকুরীর সর্ত আকর্ষণীয় করতে হবে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান নিম্নগামী হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে এর কুফল লক্ষ্য করা যাবে। কাজেই সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় দ্রুত উন্নত ধরণের আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ সমস্যা

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল সমস্যা ও তার প্রতিকার—প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যার সাথে সার্বজনীন আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলির অনেকটা মিল থাকলেও সমস্যার প্রকৃতি ও গুরুত্বের মধ্যে

বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এবার আমরা **বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল সমস্যাগুলি** নিয়ে বিশদ আলোচনা করছি এবং সেই সঙ্গে সমস্যা সমাধানের পথের নির্দেশ দিতে চাই।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন—আজ থেকে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তনের জন্য। তারপর ১২টি প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছে কিন্তু কোন আইন সরকারকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়িত্ব অর্পণ করে নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেবার পর শিক্ষামন্ত্রী গালভরা বক্তৃতা দিয়েই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ছোটবেলায় শুনেছিলাম 'দাদার ঘাড়ে বন্দুক রেখে বাঘ শিকারের' গল্প এখন দেখছি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই গল্প সত্য হ'তে চলেছে। স্বাধীন ভারতে গৃহীত ১৯৬৩ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গ সহরাঞ্চল প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উহা বহু ত্রুটিপূর্ণ। শিক্ষাকর ধার্য করবার ক্ষমতা পৌরসভাকে দেবার অর্থ 'সাত মন তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না'। **প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হ'লে যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেভাবে কোন বিশেষ কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সেইভাবে সরকার, শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক, বিশ্ববিত্যালয়ের ছাত্র ও জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে একযোগে কাজ করবার জন্য।** শিক্ষা দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে যে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব রয়েছে তাকে দূর করতে হবে। তাদের আপিসের গদী থেকে টেনে এনে নামাতে হবে প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে। প্রাথমিক শিক্ষা আইনে প্রয়োজন অনুরূপ সংশোধন আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, নতুবা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা পরিকল্পনার শেষে ৬ বৎসর থেকে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষাকে কিছুতেই বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা সম্ভব হবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার দ্রুত প্রসার—বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভারতের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করাতে গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলি দূর করবার একটা কার্যকরী পন্থা গৃহীত হয়েছে। এই শিক্ষা গ্রামীণ ভারতবর্ষের জন সাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন যাতে পায় তার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার উপর গবেষণা, বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, একই শিক্ষণ শিক্ষা-মহাবিত্যালয়ে পালাক্রমে দিনে দু'বার (two shifts) দু'দল শিক্ষিকার-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মহাবিত্যালয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজন অনুরূপ শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত ও গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া দীর্ঘ অবসর কালে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য স্বল্প-মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ও পুণর্শিক্ষণ (refresher course) ব্যবস্থা সত্বরই চালু করতে হবে। অবশ্য শিক্ষক-শিক্ষণের সম্পূর্ণ ব্যয় সরকারের।

অর্থের যোগান—ভারতবর্ষের মত গরীব দেশের অর্থের অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে। এ দেশে যে ভাল শিক্ষক নেই, শিক্ষার উপকরণ নেই, পাঠ্য পুস্তক নেই বা শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ নেই তা নয়; সরকার ও জন সাধারণের সদিচ্ছার অভাবই সর্ব প্রকার শিক্ষার অনগ্রসরতার মূল কারণ। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য গত ২০ বৎসর ধরে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু দেশের অজ্ঞ, মূর্খ, কৃষক ও শ্রমিক সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত করা হয় নি। গণতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ (যারা সকলেই শিক্ষিত, বিত্তশালী ও সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন) দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কোন রূপ অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করেন নি। শ্রমিক ও কৃষকেরা যদি বলেন যে দেশের শাসক ও নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছার অভাবেই আজও দেশের শতকরা ৭০টি শিশু নিরক্ষর তবে মিথ্যা বলবেন না। গান্ধিজী সরকারের (দেশী সরকার হউক আর বিদেশী সরকারী হউক) এই অকর্মন্যতার কথা ভাল করেই জানতেন। সরকারী দপ্তরখানায় পদাধিকার বলে যে সমস্ত অযোগ্য লোক (স্বজন পোষন নীতির ফলে) বসে আছেন তাদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে না নিলে তারা গদীতে বসে শুধু হুকুম চালাতেই অভ্যস্থ হবে। সরকারী শিক্ষা পরিশাসন ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থের অপব্যয় হয় অথচ প্রকৃত শিক্ষা কার্যে অর্থের যোগান নেই। সরকারকে অর্থের যোগান দিতে হবে সরকারী তহবিল থেকে। প্রয়োজন হ'লে সরকারকেই শিক্ষা কর ধার্য, কর আদায় এবং প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ঐ অর্থ যাতে ব্যয় হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা কর গ্রামপঞ্চায়েত বা স্থানীয় সংস্থা ধার্য করতে পারেন। তবে উহা আদায়ের ব্যাপারে সর্ব ক্ষেত্রেই গ্রামপঞ্চায়েতের বা স্থানীয় সংস্থার সহযোগিতা প্রয়োজন। অর্থের অভাবে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বন্ধ রাখা চলবে না। বুনিয়াদী প্রথায় বা গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষা প্রবর্তন করে কিছু আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভারের কিছু অংশ শিল্প-সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কৃষক সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামবাসীদের ভূমিদান, শ্রমদান ও বস্তুদানে উৎসাহিত করতে হবে। সকলের সমবেত চেষ্টায় অর্থের অভাব অনেকটা দূর করা সম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ—আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন এত অল্প ও সামাজিক মর্যাদার অভাব এত বেশী যে সমাজে যারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি বা যারা ভাল বৃত্তি সন্ধানী (যতদিন ভাল চাকুরী না জুটছে ততদিন) তারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

শিক্ষকতা করে থাকেন। গতানুগতিক বিদ্যালয়ে অকর্মণ্য বৃদ্ধ শিক্ষকদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা আছেন কোন রূপে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষিকাদের বিশেষ প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষণ না নিয়ে কারও পক্ষে ভাল বুনিয়াদী শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাধারণ ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য যে পরিমাণ অর্থের (fair wage) প্রয়োজন তার ব্যবস্থা সরকারকে অবশ্যই করতে হবে। শিক্ষকদের দু'বার পালাক্রমে শিক্ষাকার্যে নিয়োগ করা যেতে পারে। এতে দু'জন শিক্ষকের কাজ একজনকে দিয়ে হবে উপরন্তু দু'বার কাজ করবার জন্য মূল বেতনের (Basic pay) উপর প্রয়োজন অনুরূপ ভাতা (Allowance) দেওয়া যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী শিশুদের রাখতে গেলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করার পথে নানা প্রকার বিঘ্ন দেখা দেয়। বাধ্যতামূলক উপস্থিতির জন্য শিক্ষিকাকে যত্ন নিতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বিদ্যালয়-সমিতি বাধ্যতামূলক উপস্থিতিকে সার্থক করে তুলবেন। ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে না পাঠালে অভিভাবকদের জরিমানা করা সহজ কিন্তু যে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণে অভিভাবকেরা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না তার প্রতিবিধান করা সহজ নয়। সরকারকে সহানুভূতি সহকারে সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। উপস্থিত-কারনিককে (attendance officer) আইন প্রয়োগের নীতি অনুসরণ না করে মানবতার নীতিকে অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধামত বিদ্যালয়ে অবস্থানের সময় নির্দ্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন স্থলে জরিমানা করা যেতে পারে তবে একবার জরিমানা করা হলে উহা অবশ্যই আদায় করতে হবে নচেৎ আইনের প্রতি জন সাধারণের অনাস্থা দেখা দিতে পারে। সকালে ৩।৪ ঘণ্টা ও বৈকালে ৩।৪ ঘণ্টা বিদ্যালয় বসতে পারে। শিক্ষিকারাও দিবাভাগে গৃহকর্ম করার সুবিধা পেতে পারেন। প্রাথমিক স্তরে যত বেশী শিক্ষিকা নিয়োগ করা যাবে ততই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বেশী হবে। শিল্প-শিক্ষিকার যোগ্যতা স্কুল ফাইন্যাল পাশ না হ'লেও চলবে। প্রয়োজন স্থলে অন্যান্য বর্ষিয়সী শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হ্রাস করা যেতে পারে ; তবে তাঁদের শিল্পভিত্তিক শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী প্রয়োগ করার কৌশল ভাল করে আয়ত্ব করতে হবে। শিল্প কেন্দ্র কারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের মত প্রাথমিক শিক্ষিকাদের বেতন দেওয়া সম্ভব নয় বলে শিক্ষিকাদের বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, বিনা খরচায় চিকিৎসার ও শিক্ষিকাদের ছেলেমেয়েদের জন্য সর্ব প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন অনুরূপ জলপানির (scholarship) ব্যবস্থা জনসাধারণের সহযোগিতায় সরকারকেই করতে হবে। শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিক্ষাকার্য ছাড়া আর কিছু যাতে করতে বাধ্য না হন সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিক্ষকতা পেশায় যাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন সেরূপ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ ছাড়া ছোটবড় যে সমস্ত সমস্যা আছে সেগুলি মুল সমস্যাগুলির সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত। অবশ্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে। দেশের প্রতিটি কুটিরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বালতে হ'লে একটি সুপরিকল্পনা হাতে নিয়ে এই মহৎ কার্যে ব্রতী হতে হবে। গণশিক্ষা আন্দোলন ও সামগ্রিক সামাজিক শিক্ষার প্রসার এই আন্দোলনের সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত। শুধু সরকারের পক্ষে এই বিরাট দায়িত্বের গুরুভার বহন করা সম্ভব নয়। সর্ব প্রথম দেশবাসীর অন্তরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন বোধ জাগাতে হবে। এজন্য শিক্ষক, ছাত্র, জননেতা, অভিভাবক ও সরকারের পুর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিক্ষার প্রয়োজনবোধ ও শিক্ষার ফলশ্রুতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে হবে নানাপ্রকার প্রচারমূলক কার্যের সাহায্যে। প্রতি তিন বৎসর পর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির পর্যালোচনা করে উহার ফলশ্রুতির মুল্যায়ন করতে হবে। স্থানীয় সংস্থাগুলিকেই সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল কার্যক্রম সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা—ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমানে অবস্থার সাথে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির প্রাথমিক শিক্ষার তুলনা করলে খুবই হতাশ হয়ে পড়তে হয় কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, রাশিয়া বা জাপানের মত ভারতের স্বাধীনতা বহুদিনের নয়, তাছাড়া ইংরেজ ভারত ত্যাগের পুর্বে দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করে গেছেন এখনও সেগুলির স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় নি। ইংরেজ শাসনের পৌনে দু'শত বৎসর পুর্বে এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে অবস্থা ছিল ইংরেজদের ভারত ত্যাগের পুর্বে (১৯৪৭ খৃঃ) ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা তার চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। ১৯৪৭ সালে আমরা দেখেছি সারা ভারতে গতানুগতি প্রাথমিক শিক্ষাই চালু আছে। বিদ্যালয়ের অবস্থা, শিক্ষক ও শিক্ষা-উপকরণের অবস্থা মোটেই উন্নত নয়। বিদ্যালয়ে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের ২০ বৎসর পর প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে তিনগুণ কিন্তু এ জাতীয় শিক্ষার পরিবেশ (শিক্ষিকা সহ), পদ্ধতি ও শিক্ষা-উপকরণের নবায়ণ মোটেই আশাপ্রদ নয়। বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসেবে সরকার গ্রহণ করলেও শতকরা পাঁচটি বিদ্যালয়ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় নয়। তাছাড়া গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী প্যাটার্নে

পরিবর্তিত করে দেশে আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা একেবারে শম্বুক-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। শাসনতন্ত্রে স্বাধীনতা লাভের ১০ বৎসরের মধ্যে দেশে আবশ্যিক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নির্দেশ ছিল। সরকার তা পালন করতে পারেন নি। শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী কমিশন) মতে আগামী ১৯৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬ থেকে ১১ বৎসরের শিশুদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তম করতেই হবে। তাহ'লে ১৯৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১১—১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হ'তে পারে। ভারতবর্ষে আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ও জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাথে তুলনা করতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতবর্ষ কতদূর অনগ্রসর। ভারতবর্ষ খুব গরীব দেশ তাই গান্ধীজী এদেশে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন তা খুবই অভিনব। জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া ও গণিতের জ্ঞান দেওয়া হয় কাজের মাধ্যমে। আমেরিকায় চালু আছে প্রজেক্ট মেডথ বা কর্মভিত্তিক শিক্ষা কিন্তু উহা উৎপাদনাত্মক নয়। ইংলণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধূলা সঙ্গীত, নৃত্য, প্রকৃতি বীক্ষণ ও হাতের কাজের উপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মভিত্তিক তবে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আদর্শ বিদ্যালয় সমাজ থেকেই শিশুরা লাভ করে থাকে। উপরোক্ত দেশগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা শুধু আবশ্যিক ও অবৈতনিক নয় শিক্ষার আনুসঙ্গিক বিষয় যথা বিদ্যালয়ের পোষাক (school uniform) বিদ্যালয়ে গমনাগমনের যানবাহন (School bus), বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন (Mid-day meal) এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন বা বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীন শিশু স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলি (Child welfare clinic) সবই বিনা পয়সায় শিশুদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সেবা কার্যে রত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বালমন্দির হিসেবে গড়ে তোলার আদর্শ নিয়ে সরকার আইন প্রণয়ন করেছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া আছে। **জাতি গঠনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশী তা উন্নত দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা না দেখলে বুঝতে পারা যায় না।**

এ দেশে সরকারী ও পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক আর বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বেতন আদায় করে থাকে। ইংলণ্ডে এল. ই. এ. পরিচালিত কাউন্টিস্কুলগুলি এদেশের পৌর প্রতিষ্ঠানের স্কুলের মত আর বে-সরকারী ভলাণ্টারী স্কুলগুলি এদেশের বে-সরকারী বিদ্যালয়ের মত। তবে ১৯৪৪ সালের পর ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে মাধ্যমিক

শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে লওয়া হয়েছে, কিন্তু এদেশের উন্নত পর্যায়ের বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এখনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত আছে। আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা পরিচলিত। রাষ্ট্রই প্রাথমিক শিক্ষা ও তার আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যয় বহন করে থাকে। ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় নীতিগত ভাবে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা স্বীকৃত হলেও কার্যকালে শতকরা ৯০টি বিদ্যালয়ে ছেলেরা ও মেয়েরা পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে কিন্তু ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ায় প্রায় সব কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। ঐ সমস্ত দেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষিকার যোগ্যতা ও শিক্ষা উপকরণ এত উন্নত যে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে তার তুলনা করা চলেনা। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় মাথা পিছু একটাকা আর উন্নত দেশে কম পক্ষে ১০০ টাকা। এবার বিষয়টি ভেবে দেখুন!

অনুশীলনী

১। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ?

২। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথামক শিক্ষা পরিশাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

৩। এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলি কিরূপে সংশোধন করা সম্ভব ?

৪। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের অপসঙ্গতি ও তার প্রতিকারের বিষয় আলোচনা কর।

৫। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক দিকের গুরুত্বপূর্ণ অংশের পর্যালোচনা কর।

৬। আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি ?

৭। সার্বজনীন, আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

University Questions

1. Give an outline of the historical development of primary education in your State from the begining of this century. [C. U. '1966]

2. What are the causes of maladjustment of children in primary schools ? How would you deal with them ? [C. U. 1.66]

3. If you had a free hand with unlimited resources what kind of primary education would you like to introduce in your state ? [C U. 1966]

4. The wastage and stagnation in the field of primary education are still appalling". Elucidate. [C U. 1964]

5. Trace the growth of the idea of introducing compulsory primary education in pre-independent and independent India. What are your suggestions for the introduction of free and compulsory primary education in India. [C. U. '1968]

6. Set forth your views about an ideal curriculum for primary education. [C. U. '1968]

দ্বিতীয় অধ্যায়

খ গুচ্ছ

বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার

গান্ধিজীর দৃষ্টিতে প্রাথমিক শিক্ষার স্বরূপ—অনেকে প্রশ্ন করেন গান্ধিজী রাজনীতিবিদ, শিক্ষার সাথে তাঁর সম্পর্ক খুব কম, তিনি কি করে শিক্ষার নীতি নির্দ্ধারণ করবেন? তিনি শিক্ষাবিদ্ বা দার্শনিক নন কাজেই ভারতবর্ষের নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে গান্ধিজীর বক্তব্য যে বৈজ্ঞানিক হবে তার ভিত্তি কোথায়? প্রকৃত পক্ষে গান্ধিজী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন নি। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি জাতীয় সর্ববিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাথে শিক্ষা এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে গান্ধিজী শিক্ষার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে না ভেবে পারেন নি। তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ভেবে ছলেন এই সময় কতকগুলি সমস্যা একসঙ্গে এসে গান্ধিজীকে ভাবিয়ে তোলে। এ দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো বিদেশী শাসক ভেঙ্গে দিয়েছে এবং তার প্রয়োজনে ধীরে ধীরে এ দেশবাসীকে পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছে। জাতির মনে আত্মবিশ্বাস নেই, কর্মে নিষ্ঠা নেই, নানা বাধানিষেধে সমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন। ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীর কৌলিন্য দেশবাসীর মধ্যে একটা অসহায় ভাব এনে দিয়েছে। এখন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন না করলে জন সাধারণের পক্ষে চাঁদা আদায় করে জাতীয় শিক্ষাকে উন্নত করা সম্ভব নয়। সরকারী অর্থ সীমাবদ্ধ, কাজেই সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম স্তর হিসেবে গান্ধীজীকে ভাবিয়ে তোলে।

এই সময় ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন বিশেষ করে পল্লী জীবনকে সমুন্নত করবার জন্য আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন অথচ অর্থের অভাবে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

আক্ষরিক জ্ঞান লাভ প্রকৃত শিক্ষা নয় তাই প্রাথমিক স্তরে চাই বুনিয়াদী শিক্ষা

জাতির এই চরম সঙ্কটের দিনে গান্ধিজী তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষা পরিকল্পনা 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। গতানুগতিক নিষ্ক্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গান্ধিজী কোটি কোটি টাকা ব্যয়কে জাতীয় সম্পদের অপচয় বলে মনে করেন। আক্ষরিক জ্ঞান লাভ এবং সামান্য হিসাব করতে পারা ছাড়া গতানুগতিক পাঠশালায় আর বিশেষ কিছুই শেখান হ'ত না। গান্ধিজীর মতে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া চাই।

এই শিক্ষা ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত চলবে। ইংরেজী বাদে ম্যাট্রিকুলেশনে যে সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয় সেই পরিমাণ শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক ভাবে দিতে হবে। এই টুকু শিক্ষা না পেলে দেশবাসী মনুষ্যত্বের মর্যাদা বুঝতে পারবে না এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। ১৪ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত ৮ বৎসর ধরে আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষা দিতে গেলে যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা সরকারের নেই এবং ঐ পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের কোন পন্থা নেই।

অর্থের জন্য জন-শিক্ষা বন্ধ থাকবে গান্ধিজী একথা স্বীকার করতে রাজী নন। শিক্ষায় স্বাবলম্বন এই মূলনীতিকে গ্রহণ করে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দিলেন। শিল্প কেন্দ্রিক এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রেরা যে শিল্প-সামগ্রী উৎপন্ন করবে তাতেই বিদ্যালয়ের চলতি খরচ চলে যাবে। সরকারকে শিক্ষার সরঞ্জাম, বিদ্যালয় গৃহ ও জমি ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং শিল্পোৎপাদিত মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের উপযোগিতা কি কি ?

১৯৩৭ সালে হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘ এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য জাকির হুসেন কমিটির কাছে এর বিচার বিশ্লেষণের ভার দেন। জাকির হুসেন কমিটি গান্ধিজীর মূল পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।

এই শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু শিশুকেন্দ্রিক হবে না। শিশুর কর্ম চঞ্চল জীবনে যে সৃজনী মনোভাব আছে তাকে সুষ্ঠু রূপদানের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে করা হয়েছে শিল্পকেন্দ্রিক। শিল্পটি হবে প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই শিল্পটি নির্ধারিত হবে। শিল্পটিকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতিকে করা হবে হৃদয়গ্রাহী, কৌতূহল-বর্ধক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম ও পাঠ প্রণালী প্রস্তুত করতে হবে।

মানসিক পরিশ্রম ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য রাখলে জাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ দেখা দিবে। **গান্ধীজী যে শাসন ও শোষণ-মুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হবে তারই প্রারম্ভিক পর্ব।**

বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষা-জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করেছে। এর কারণ আধুনিক শিক্ষা শাস্ত্রের পরিপূরক হিসেবে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রগুলি যে তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবেশন করেছে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রয়োজন স্থলে সে সব তত্ত্ব প্রয়োগ করেছে। কেহ

প্রবর্তন করেছেন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, কেহ বা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা, কেহ বা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। গান্ধিজী আরও একটু এগিয়ে গেছেন। শিশু কাজ করিতে ভালবাসে, শিল্পকর্মের মধ্যে শিশুর সৃজনী শক্তি বিকশিত হয়। শিল্পের উপর জাতির উপজীবিকা নির্ভর করে। শিল্পের মাধ্যমে সংস্কৃতি রক্ষিত হয়। কুটির শিল্পের আওতায় এসে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে শিশুরা অবহিত হয়। শিল্পকে কেন্দ্র করে এবং পরিবেশের অনেক বিষয়ের সাথে অনুবন্ধ প্রণালী প্রয়োগের দ্বারা শিশুরা জীবনের প্রকৃত সত্য লাভ করতে পারে। গান্ধিজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নিয়ে শিশু স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। রাষ্ট্রনিরপেক্ষ, শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজনে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবার জন্য গান্ধিজী দেশবাসীর নিকট তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে উপস্থিত করেছেন।

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট—১৯৩৭ খৃঃ ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধিজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার উপর আলোচনা শেষে ডঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে বুনিয়াদী শিক্ষার পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির পর্যালোচনা করে কমিটি এই শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষা পদ্ধতি, পরিশাসন, শিক্ষক শিক্ষণ, পাঠক্রম ইত্যাদির উপর আলোকসম্পাত করেন। কমিটির মতে (১) একটি মূল শিল্পকে আশ্রয় করে শিশুকে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে সমাজ বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল শরীর-বিজ্ঞান ইত্যাদির সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে অনুবন্ধ প্রণালীতে। নিম্নতম শ্রেণী থেকেই একটি উৎপাদনাত্মক কারুশিল্পের ব্যবহারিক দিকের শিক্ষাও দিতে হবে (২) এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে এবং ধীরে ধীরে শিক্ষা ব্যবস্থাও স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। (৩) সামাজিক পরিবেশে সামুদায়িক জীবনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনের সুযোগ দিতে হবে। (৪) সমাজ থেকে বুদ্ধিজীবিদের ও ধনীলোকদের শোষণের পথ বন্ধ করবার জন্য নাগরিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে দৈহিক শ্রমের প্রতি মর্যাদা বোধ ও সমবায় ভিত্তিতে সমাজসেবার আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করিয়ে দিতে হবে। (৫) ৭ বৎসর বয়ঃক্রম থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করবার জন্য সুপারিশ করা হয়। মাতৃভাষা ভাষা ও একটি কারুশিল্পসহ ৮টি বিষয়কে বুনিয়াদী পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা রূপে স্বীকৃতি দান—স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার ১৯৪৯ খৃঃ বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গ্রামে ভরা ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাণ সঞ্চার করবার জন্য সুপরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকায় যে কোন রাজ্য প্রয়োজন বোধে পাঠক্রমের সামান্য রদ বদল করতে পারেন। শিক্ষা পদ্ধতি রাজ্যের সুবিধা মত কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাপেক্ষ তবে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ, পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন কোন রাজ্যই করতে পারবেন না।

জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি—বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে জাতীয় জীবনের আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে এদিক থেকে বিচার করলে জাতীয় শিক্ষা বলা যায়। গান্ধিজীর মতে জাতির শক্তি নিহিত আছে জন সাধারণের শিক্ষা, কর্মশক্তি ও মনোবলের উপর। জাতীয় শিক্ষা বলতে তিনি দেশবাসীর প্রয়োজনীয় শিক্ষার কথা বুঝিয়েছেন। ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে নূতন এক শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা তিনি জাতির সম্মুখে উপস্থিত করেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈপ্লবিক দিক—গান্ধিজী ছিলেন বিপ্লবী তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা থাকবেই। অ্যারিষ্টটল থেকে ডিউই পর্যন্ত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদেরা শিশুর মন, সমাজের প্রয়োজন, জাতীয় জীবনে শিশু-শিক্ষার স্থান ইত্যাদি ভেবে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সুনিয়ন্ত্রণ ছিল এই সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য, কিন্তু গান্ধিজী অহিংসার পথে যে স্বরাজ আনতে চেয়েছিলেন এবং যে সর্বোদয় সমাজের পত্তন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তা প্রচলিত দেশী বা বিদেশী কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা "হুজুর মজুর" সমাজ সৃষ্টিকারী শিক্ষা। রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যেখানে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সাফল্যের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত কিন্তু হিংসার ভাব ও শ্রেণী দ্বন্দ্বের বীজ তার মধ্যে রয়ে গেছে। গান্ধিজী নব-ভারতের যে রূপ কল্পনা করেছেন, সেই শ্রেণীহীন শাসন ও শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে হ'লে বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তারে আমাদের অগ্রণী হ'তে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক—গান্ধিজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ নিয়ে শিশুর স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক

হিসেবে গড়ে ওঠা। গান্ধিজী রাষ্ট্রনিরপেক্ষ শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রয়োজনে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই নূতন সমাজ শিশুরাই গড়ে তুলবে তাদের আত্ম-প্রত্যয় ও সৃজনমূলক কর্মের দ্বারা। এখানে প্রত্যেক শিশু তার সামগ্রিক বিকাশের সুযোগ পাবে। স্বাস্থ্যপ্রদ, পরিচ্ছন্ন, সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সুন্দর পরিবেশে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষায়। এই আদর্শকে পূর্ণ রূপ দেবার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা ও কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার সাথে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাকে সুন্দর ভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক—পরাধীন ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা গান্ধিজীকে ভাবিয়ে তুলেছিল। দু'টি অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১ খৃঃ ও ১৯২৯ খৃঃ) ডাকে দেশবাসী যে ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তাতে গান্ধিজী অভিভূত হন। তিনি দেখলেন অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে আসতে না পারলে কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক কোন আন্দোলনের স্থায়ী ফল আশা করা যায় না। গান্ধিজীর ডাকে যাঁরা স্কুল, কলেজ, আইন, আদালত ইত্যাদি ইংরেজের গোলামখানা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সত্যকার জাতীয় শিক্ষার কথা চিন্তা করতে থাকেন।

সত্যকার জাতীয় শিক্ষার সন্ধানে

গান্ধিজী তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষা পরিকল্পনা ধারাবাহিক ভাবে হরিজন পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন। গতানুগতিক নিষ্ক্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গান্ধিজী কোটি কোটি টাকা ব্যয়কে জাতীয় সম্পদের অপচয় বলে মনে করেন। তাঁর মতে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া চাই। শিশুর ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত ৮ বৎসর ধরে আবশ্যিক ও অবৈতনিক শিক্ষা দিতে হবে। এতে যে অর্থের প্রয়োজন তা সরকারের নেই এবং ঐ পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের কোন পন্থা নেই। সেজন্য **শিক্ষায় স্বাবলম্বন এই নীতি গ্রহণ করে তিনি কারু-শিল্পকেন্দ্রিক এক অভিনব বুনিয়াদী শিক্ষা** প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন।

গান্ধিজীর বৈপ্লবিক শিক্ষা-পরিকল্পনা

১৯৩৯ খ্রীঃ হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘ এই শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য জাকির হুসেন কমিটির কাছে এর বিচার-বিশ্লেষণের ভার দেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৭ খ্রীঃ ওয়ার্দ্ধায় যে শিক্ষা সম্মেলন আহূত হয়েছিল তাতে গান্ধিজীর শিক্ষা পরিকল্পনার কাঠামো আলোচিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীঃ হরিপুরা কংগ্রেসে উক্ত শিক্ষা সম্মেলনের খসড়া রিপোর্ট আলোচিত হবার পর ইহাকে স্বাধীন ভারতের

জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৯ খ্রীঃ ওয়ার্দ্ধার এই জাতীয় শিক্ষা সংসদ (All India National Education Board) গঠিত হয় এবং সে বৎসর থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়।

কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সক্রিয় চেষ্টার কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ স্থাপিত হয়। অনুন্নত অঞ্চলে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করে অনেক সুফল পাওয়া গেল। কিন্তু ১৯৪২ খ্রীঃ আন্দোলনে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতনে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়।

কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষার প্রবর্তন

কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে গান্ধিজী **বুনিয়াদী শিক্ষার একটি সামগ্রিক রূপ** দান করেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ সেবাগ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে মানব-জীবনের চারিটি স্তরের সাথে বুনিয়াদী শিক্ষার চারিটি পর্যায়ের যোগসূত্র স্থাপন করে **গান্ধিজী বলতে চান যে বুনিয়াদী শিক্ষা মানুষের জীবনের সর্ব স্তরেই বিস্তৃত হবে।** এই চারিটি স্তরের শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য আলাদা।

বুনিয়াদী শিক্ষার চারটি স্তর

(১) পূর্ব-বুনিয়াদী স্তর—৬।৭ বৎসরের নীচের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ খেলার মাধ্যমে শারীর শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশের সুযোগ থাকবে এই শিক্ষা ব্যবস্থায়।

(২) বুনিয়াদী (নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী) স্তর—সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা জাকির হুসেন কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়।

(৩) উত্তর বুনিয়াদী স্তর—শিল্পের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা। পাঠক্রমের বিস্তৃতির উপর শিক্ষাকাল নির্ভর করে।

(৪) বয়স্ক শিক্ষা স্তর—উপরোক্ত শিক্ষা সমাপ্তির পর জীবনের সর্ব স্তরের জন্য সংস্কৃতিমূলক ও সমস্যামূলক বিষয় নির্বাচন করে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বয়স্ক শিক্ষা দেওয়া হবে।

জাকির হুসেন কমিটির রিপোর্ট বেসরকারী ভাবে প্রকাশিত হয়। এর পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা বিচার করে দেখবার জন্য খের কমিটির হাতে দায়িত্ব দেন। এই কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষাকে উদ্দেশ্য মূলক, সৃজনশীল ও কর্মকেন্দ্রিক সর্ব ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ

করলেও এরূপ মন্তব্য করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রথমে গ্রামাঞ্চলে প্রবর্তন করতে হবে। গ্রামের প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই এই শিক্ষার পাঠক্রম নির্ণীত হবে। এর পর বুনিয়াদী শিক্ষার সাথে দেশের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গতি বিধানের সূত্র নির্ণয় করবার জন্য **খের কমিশন** নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশনের সুপারিশ-ক্রমে আট বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষাকে দু'টি স্তরে বিভক্ত করা হয়। পাঁচ বৎসর ব্যাপী নিম্ন বুনিয়াদী স্তর এবং পরবর্তী তিন বৎসর ব্যাপী উচ্চ বুনিয়াদী স্তর। নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের পর প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীরা অন্য কোন প্রকার বিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারবে বা উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে অধ্যয়ন করতে পারবে। উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে, আর মেধাবী শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারবে। প্রথমে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরেজীর কোন স্থান ছিল না; পরে উচ্চতর শিক্ষার সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ষষ্ঠশ্রেণী থেকে ইংরেজীকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়।

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার স্থান

১৯৪৪ খ্রীঃ সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়। তবে ছাত্রদের উৎপাদিত শিল্প দ্রব্যের মূল্যের দ্বারা বিদ্যালয়ের চলতি খরচ চলতে পারবে বলে এই পরিকল্পনায় স্বীকার করা হয় নি। সার্জেন্ট স্কীমে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি ৮ বৎসর ধরা হয়েছে। গান্ধিজী অন্যূন ৭ বৎসরের কথা বলেছিলেন। নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষাকাল এক বৎসর বাড়িয়ে আট বৎসর করা হয়।

স্বাধীন ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন

১৯৪৭ খ্রীঃ স্বাধীনতা লাভের পর সর্ব ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছে নির্দেশনামা প্রেরণ করেন। অবশ্য প্রত্যেক রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বীয় প্রয়োজনে সামান্য পরিবর্তন সাধন করবার স্বাধীনতা লাভ করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিতে স্বীকৃত হন। পরে **১৯৪৯ খ্রীঃ বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক রূপে গ্রহণ করা হয়।**

১৯৪৯ খ্রীঃ বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এই সমিতির সুপারিশ ক্রমে রাজ্যে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয় স্থাপন, বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ভাবী শিক্ষকদের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্যায়ন সমিতির (**Assessment Committee**) **মন্তব্য**—বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবার ৬ বৎসর পর জি, রামচন্দ্রমের সভাপতিত্বে যে মূল্যায়ন সমিতি গঠিত হয়েছিল তার মন্তব্য সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়। এই মন্তব্যগুলি থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা কোথায় তা সহজে বুঝতে পারা যায়। গান্ধীজি আদর্শ-বাদী দেশ নায়ক ছিলেন তাই তার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ ছিল খুবই উন্নত। এর আদর্শ পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে জন সাধারণকে অবহিত করাবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। শিক্ষা দপ্তরের সাধারণ সরকারী কর্মচারীদের হাতে পরে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের কার্যক্রম নানা ত্রুটিপুর্ণ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া জন সাধারণের কাছে এই নব শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ঠিক মত আবেদন পৌছায়নি। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন পরিকল্পনা ও তাকে কার্যে পরিণত করার প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক গলদ রয়েছে। এখন পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষা দপ্তরে এক কোণে কোণ ঠাসা হয়ে আছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সব চাইতে অযোগ্য ও দায়িত্বহীন অফিসারের হাতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার গুরুদায়িত্ব দেওয়া আছে ; ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রশাসনিক দিক নানা ত্রুটিপুর্ণ। শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম নির্ণয়, পদ্ধতির রদবদল, বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন ও বিদ্যালয় পরিদর্শন সব কিছুই সরকারী আওতায় পরিচালিত হওয়ায় বুনিয়াদী শিক্ষা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি খুব সুদৃঢ় হওয়া দরকার কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমাজ জীবনে কৃত্রিম একটি প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে **বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি হচ্ছে গরীব ও অসহায় শিশুদের অনাথ আশ্রমের সমতুল্য।** মূল্যায়ন সমিতির সুপারিশগুলি কার্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ খৃঃ দিল্লীতে National Institute of Basic Education প্রতিষ্ঠিত হয়।

১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষা—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায় হিসেবে গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার করে বুনিয়াদী ধরনে (pattern) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়। নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবশ্যই বুনিয়াদী বিদ্যালয় হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রসার শহরে সীমাবদ্ধ থাকলেও গ্রাম দেশে ইহার বেশ প্রসার হয়।

২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয় কারণ গতানুগতিক

বিদ্যালয়ের সংস্কার করে দেখা গেছে যে শিক্ষক মহাশয়েরা বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেও আবার সেই পুরনো পদ্ধতিতেই পাঠশালা পরিচালনা করতে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবার সময় উহাকে অবশ্যই বুনিয়াদী বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলতে হবে।

৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত রাজ্যেই যথাসম্ভব সত্বর প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদী প্যাটার্ণে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে রাজ্য বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করবে সে রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সাহায্য পাবে। বর্তমানে সহরাঞ্চলে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা চলছে। নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য এই পরিকল্পনায় অবৈতনিক ও বৃত্তি-যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সমস্যা—ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬০ সালের মধ্যে সর্ব-ভারতে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা আজও সম্ভব হয়নি। সাধারণ হিসেবে কোন দেশের প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মোটামুটি শতকরা ১৫ জন১০+বয়ঃক্রম পর্যন্ত এবং শতকরা ১২ জন ১৪+বয়ঃক্রম পর্যন্ত। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় এদেশে সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টার সমবেত ফল স্বরূপ শতকরা মাত্র ৩০ জন (প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার যোগ্য) প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। বাকী **শতকরা ৭০ জন এখনও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না।** এদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে মেয়েদের সংখ্যা বেশী হবে। আবার গ্রাম ও সহরের কথা বিবেচনা করলে এই বঞ্চিত ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৯০ জনই হবে পল্লীর বাকী ১০ জন সহরের ও শিল্পাঞ্চলের বস্তিবাসীদের দুর্ভাগা সন্তানেরা। কাজেই সমস্যাটি সমাধানের পূর্বে বিষয়টি তলিয়ে দেখতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত দুর্ভাগা ভারতসন্তান

বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় শতকরা ৫টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে খুব কম রাজ্যেই। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও কম। এর কারণ নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনে সমস্ত রাজ্যের এক প্রকার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার এই

খাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের যেমন অভাব তেমনি সাজ সরঞ্জাম সহ একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করাও ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উত্তর জীবনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ও অধ্যয়নের সময় বিশেষ অসুবিধা বোধ করে। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোন সামঞ্জস্য বিধান এখনও করা হয়নি। পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা যে একেবারে করা হয়নি তা নয়। তবে এদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশ আলাদা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও আলাদা। যেমন পল্লী অঞ্চলের লোকেরা ভাবে তাদের ছেলেরা ত আর জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার হবে না, তাদেরই মত চাষবাস বা অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করে তাদের পেশাই গ্রহণ করবে। আবার সহরের বা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি মিল ফ্যাক্টরীতে ঢুকিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন ও গতানুগতিক বিদ্যালয়কে নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা এই দুই পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চলতে থাকে।

গতানুগতিক পাঠশালাকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের পর্যায়টি বেশ গুরুত্ব পূর্ণ। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থার কোন মিল নেই বললেই চলে। আপাত দৃষ্টিতে পাঠ্য বিষয় এক হ'লে তা পরিবেশনের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। পাঠশালার শিক্ষককে একটি রিফ্রেসার কোর্সে যোগদানের সুযোগ দিলেই তিনি বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনা করতে সমর্থন হন না বা পাঠশালায় কিছু শিল্পকার্য বিচ্ছিন্ন ভাবে করালেই কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় গড়ে উঠে না। শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের অর্থাৎ শিশুর ব্যক্তি সত্তার সামগ্রিক বিকাশের যে যে আদর্শ ও পদ্ধতি বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকল্পিত হয়েছে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে জন সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা চাই, প্রয়োজন মত সরকারী সাহায্যও চাই এবং উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত সুশিক্ষক চাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিকে সত্বর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে এবং এই রূপান্তরীকরণের সমস্যাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। সব কিছু সরকারের হাতে ছেড়ে দিলে হবে না। অর্থের দায়িত্ব, পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকবে সরকারের। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালনা এবং দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা থাকবে জন সাধারণের দ্বারা গঠিত বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির। যেখানে মিউনিসি-

গতানুগতিক পাঠশালাকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রয়োজন

প্যালিটির হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব আছে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিকে সরকারের মত বিবিধ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য সরকার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক বিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে জন সাধারণের সহযোগিতায়। প্রয়োজন বোধে শাসন বিভাগের সহায়তা নিতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা—আধুনিক শিক্ষায় দার্শনিক ভিত্তি, মনো-বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও সামাজিক ভিত্তি, বিশেষ ভাবে বিচার করতে হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা ও সমাজ বিপ্লব

বুনিয়াদী শিক্ষার এই তিনটি ভিত্তি খুব সুদৃঢ়। সর্বোদয় সমাজ প্রবর্তনের জন্য গান্ধিজী যে নূতন জীবনের পরিকল্পনা করেছেন তার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন এবং এর সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ বিপ্লবের এক অভিনব দিক।

সভ্যতার আদিযুগে শিক্ষা ছিল কর্মকেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক। পরবর্তী যুগে কাগজ ও ছাপাখানা প্রবর্তনের পর শিক্ষা ক্রমেই ভাষাভিত্তিক ও পুঁথিসর্বস্ব হয়ে ওঠে। এই জাতীয় পুঁথিগত বিদ্যায় শিশুদের বুদ্ধির বিকাশে মুখস্থ ক্ষমতার উপর খুব জোর দেওয়া হয়। ফলে গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা

দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। শিশুর মধ্যে যে ব্যক্তিসত্তা অঙ্কুর অবস্থায় থাকে তারা পূর্ণ পরিণতির জন্য শিক্ষায় সক্রিয়তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিশুরা কাজ করতে ভালবাসে, কাজের মধ্যে সে খেলার আনন্দ পায়। ফ্রয়েবলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি, ডিউই ও কিলপ্যাট্রিকের প্রজেক্ট মেথড এবং গান্ধিজীর শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা সবই কর্মকেন্দ্রিক। গান্ধিজীর নির্বাচিত কর্ম হবে উৎপাদনাত্মক। উৎপাদনের মধ্যে শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রেরণা থাকলে উহার মধ্যেই তার সৃজনী শক্তির বিকাশ ঘটবে।

শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয় বলে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় কর্মের একটা বড় স্থান আছে। নৈতালিম শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমগ্র জীবনের সহিত যুক্ত করে দেখা হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর জীবনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। শিশু তার জীবনযাত্রা নির্বাহের

[illegible]কেন্দ্রিক শিক্ষা

জন্য একটি বৃত্তি নির্বাচন করেতার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারে। ব্যাপকতর অর্থে জ্ঞান অর্জন, কৌশল আয়ত্তকরণ এবং অভিজ্ঞতা অর্জনকে শিক্ষা বলা যায়। **প্রকৃত শিক্ষা জীবনব্যাপী ছেদহীন প্রক্রিয়া।** বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন সমস্ত পর্যায়ের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে শিশু কর্মঠ, সচেষ্ট ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। এই সুস্থ ও স্বাবলম্বী শিশু সহজেই সমাজে নিজের স্থান করে নেয়।

অনেকে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সাথে এক করে ফেলেন। প্রকৃত পক্ষে শিল্প শিক্ষা এক জাতীয় কর্ম হ'লেও সৃজনাত্মক কর্মে যে নিছক আনন্দবোধ থাকে শিল্পকর্মে তদ্রূপ থাকে না। এখানে অনেকে প্রশ্ন করবেন তাহলে গান্ধিজী কিরূপে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সাথে যুক্ত করছেন? উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, কর্মের মধ্যেই তার আত্মপ্রকাশ সম্ভব হ'তে দেখা যায়।

কারুশিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা

আমাদের মত গরীব দেশে সর্ব সাধারণের জন্য প্রজেক্ট মেথড চালু করা অসম্ভব। তাছাড়া গান্ধিজীর মতে শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে শিশু যেমন তার সৃজনী ক্ষমতা পরিস্ফুট করবার সুযোগ পায় তেমনি তার সৃষ্ট শিল্পকর্মের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ থেকে তার গভীর আত্মপ্রত্যয় জন্মে। **শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এই আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে।**

গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শ বিপ্লবাত্মক—বর্তমানে স্বাধীন ভারতবর্ষেও ইংরেজ শাসকদের দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষাই একটু রদবদল করে চালু আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্রম ও পদ্ধতির সামান্য কিছু পরিবর্তন হ'লেও এই শিক্ষা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও আমলা-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকূলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমাজনৈতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজতে হ'লে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে অচল। হুজুর ও মজুর তৈরী এই শিক্ষার মূল নীতি। শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্কও এতে খুব কম। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্ব হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োগ সম্ভব হ'লে সমাজ বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। গান্ধিজীর মতে বালক বালিকাদের সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য যতদূর সম্ভব সমগ্র শিক্ষা কোন না কোন শিল্পের মাধ্যমে দেওয়া উচিত। এর ফলে ছাত্রেরা অধ্যয়ন কালে কিছু না কিছু উপার্জন করতে পারবে। আর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার ভেতর দিয়ে বালকবালিকা সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হবার গুণ ও শক্তি অর্জন করবে। আমাদের মত গরীব দেশে অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হ'লে এছাড়া অন্য উপায় নেই। সরকারী সাহায্য নিয়ে ১০০ বৎসরের মধ্যেও উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে না। আর হ'লেও সরকারী প্রভাব তাতে খুব বেশী থেকে যাবে। গান্ধিজী যে সর্বোদয় সমাজের পরিকল্পনা করেছেন তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হ'লে শিল্পকেন্দ্রিক, সমাজভিত্তিক ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সম্মত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাপকতর ভাবে প্রবর্তন করতে হবে।

সমাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা

শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন শিশুর মন সৃষ্টিধর্মী। সে খেলার মধ্য দিয়ে সৃজনের আনন্দ লাভ করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে শিশুকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষায় সমাজ জীবনের প্রয়োজনকেই বেশী মূল্য দিতে হবে। শিশু সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে। শিশু নেতৃত্ব করতে চায়; অবসর সময় নিজের রুচি মত কিছু করতে চায়। শিশু-শিক্ষায় এই সুযোগগুলি তাকে দিতে হবে। অনেকে বলবেন শিল্প-শিক্ষার উপর জোর দিলে মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে বাদ দিতে হয়, বিশেষ করে শিল্পদ্রব্যের বাজার দর পেতে গেলে শিল্প-কর্মের উৎপাদন, উৎপাদকতা ও মালের উৎকর্ষতার প্রতি নজর রাখতে হবে। এতে শিশুর সৃজনী প্রতিভা অনেকটা নষ্ট হবে। ফলে শিশু হয়ে উঠবে ক্ষুদে কারিগর। শিশুর সামগ্রিক জীবনের বিকাশ ব্যাহত হবে ও কারিগরী বৃত্তির দিকে তার ঝোঁক চলে যাবে। **গান্ধিজী বলেন যে, যে কাজের সামাজিক মূল্য তথা বাজার মূল্য নেই সেই শিল্পকর্মের দ্বারা শিশুর আত্মপ্রত্যয় জন্মে না। শিশুর সৃজনশীল মনের বিকাশের জন্য আত্ম-প্রত্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন।** বাস্তব জীবনে এই আত্ম-প্রত্যয়ের মূল্য সৃজনশীল মনের চাইতে কম নয়। যাঁরা বলতে চান শিশু খেয়ালখুসী মত যা করে তার মধ্যেই শুধু তার সৃজনী প্রতিভার বিকাশ হয় এবং যাঁরা বলেন শিক্ষক-নিয়ন্ত্রিত শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ হয় না, শুধু কারিগরী মনোভাব গড়ে তোলা হয়, তাঁরা উভয়েই ভ্রান্ত। বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে এদেশে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে চরখায় সুতো কেটে, তাঁত বুনেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রচুর চারুশিল্পী গড়ে উঠেছে। জীবনের পরিকল্পনায়, সামাজিক জীবন উন্নয়নে তারা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের ছেলেমেয়েদের পেছনে পড়ে নেই। প্রকৃত পক্ষে কারুশিল্প চারুশিল্পের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত।

কারু শিল্প ও চারু শিল্পের সমন্বয়

আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষা যে শিশুকেন্দ্রিক হবে একথা গান্ধিজী বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের যে বিস্তৃত পটভূমিকা লওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডিউই, মণ্টেসরী, ফ্রয়েবল, পেস্‌তালৎসী ও রুশো এদের প্রত্যেকের নিজস্ব মতবাদের জায়গা আছে। গান্ধিজী শুধু ভাব ও ভাষার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। শিল্পকর্মের মুক্তধারায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। কর্মের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিধৃত, তাই কর্মের মধ্য দিয়ে গান্ধিজী শিশুজীবনকে স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত করতে চান।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে কোন একটি মূলশিল্পের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। শিল্পকর্মের মাধ্যমে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব না হ'লে সমাজ ও পরিবেশের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। এই শিক্ষা-

ব্যবস্থা পাঠ্য পুস্তকের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করবে না। শিক্ষকের অবদান এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। উপযুক্ত চিন্তাশীল, কর্মঠ ও সমাজসেবী শিক্ষক না হ'লে বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থাটি শিশুকেন্দ্রিক, তথাপি শিক্ষক ঘড়ির মেইন স্প্রিংএর মত সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেন। জীবনের সাথে যে সমস্ত বিষয় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেগুলির ব্যবহারিক দিকটার একটা সম্পূর্ণ পরিচয় পাবে শিশুরা এই শিক্ষা ব্যবস্থায়। পরে বড় হ'লে যেদিকে শিশুর ঝোক সেই দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বমূলক বা টেক্‌নোলজিতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করতে পাবে। মনে রাখতে হবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় ট্রেড স্কুল, কারিগরী বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল্ স্কুল নয়। সুন্দর পরিবেশে শিশু স্বভাবতঃ সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে ভালবাসে। গান্ধিজী বলেছেন, "শিশুদের শুধু হস্তশিল্প শেখালেই হবে না। সুন্দর সামাজিক পরিবেশে তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।"

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি—গান্ধিজী যখন রাজনৈতিক সংগ্রামের শেষ সীমায় এসে সমাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে বেশী জোর দিয়েছেন তখনই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। বর্তমান সমাজের সহস্র রকম ত্রুটির মধ্যে বড় ত্রুটি শ্রেণীবিভেদ এবং ক্ষমতাশালী শাসক ও বণিকবৃন্দের অত্যাচার। সমাজের মধ্যে এই যে বৈষম্য ও প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান একে সমূলে উৎপাটন করে সঙ্ঘশক্তি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কায়িক ও মানসিক শ্রমে গড়ে তুলতে হবে নূতন সর্বোদয় সমাজ। গান্ধিজীর পরিকল্পিত সর্বোদয় সমাজ শ্রমের উপর গড়ে উঠবে।

সর্বোদয় সমাজ গঠন ও বুনিয়াদী শিক্ষা

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় দার্শনিক মতবাদের দ্বারা। গান্ধিজী মূলতঃ ভাববাদী। তাঁর জীবনাদর্শের সাথে বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তির মিল আছে। গান্ধিজীর কাছে মানুষের আত্মার বিশেষ মূল্য আছে। শিশুর মধ্যে এই আত্মা পূর্ণ অবস্থায় অঙ্কুর হিসেবে থাকে, তাকে উপযুক্ত পরিবেশে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

কোন বিষয় ছাপার বই পড়ে আয়ত্ত করা আর হাতে কলমে সেই জিনিষটি করা এর মধ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি উন্নততর। দুইয়ের মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরণের সুযোগ রয়েছে, ছেলেমেয়েদের হাতের কাজের আনন্দ, মনোযোগ ও আগ্রহ সব কিছুই আছে, কারণ তাদের সৃজনের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। শিশুর জীবনের সহিত কাজ ঘনিষ্ঠ ভাবে

জড়িত, তাই শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মপ্রবাহ শিশুকে মুগ্ধ করে, শিশুর মনে নূতন জীবন জিজ্ঞাসা এনে দেয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সৃজনমূলক কারুশিল্পের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যমান থেকে শিশুর আত্মপ্রত্যয় জন্মে। ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরম সহায়ক।

বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

স্বাধীন ভারতবর্ষে অহিংসার পথে সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠা ছিল গান্ধিজীর লক্ষ্য। এই সমাজতান্ত্রিক সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থা হবে শ্রেণীহীন এবং শাসন ও শোষণমুক্ত। বর্তমান সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে হ'লে ভবিষ্যৎ নাগরিকের জীবনে সেই অহিংস সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজকে চরম মূল্য দিতে হবে। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের উপর সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটা নির্ভর করে। দেশে কৃষ্টি ও সভ্যতা বেঁচে আছে শিল্পীদের চারুশিল্প ও কারুশিল্পের উৎকর্ষের উপর। সমাজের প্রয়োজনেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, আজও তাই নূতন সমাজের পরিকল্পনা নিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংসদ নীতিগত ভাবে প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক ভিত্তি তাঁরা মেনে নিতে পারেন নি। বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক ব্যয়, যেমন—বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ ইত্যাদি ছাত্রদের শিল্প কার্যের আয় থেকে সম্ভব নয়। গান্ধিজী বলেন "বিদ্যালয়ের চলতি খরচ শিল্পোৎপাদিত মালের বিক্রয় মূল্য থেকে হওয়া উচিত।" গবেষণা থেকে ও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োগ থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালিত হ'লে চলতি খরচ শিল্পোৎপাদিত মাল থেকে হ'তে পারে। **গান্ধিজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে নচেৎ উহা কোন শিক্ষাই নয়।**

বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক ভিত্তি

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম—জাকির হোসেন কমিটি কর্তৃক নিদ্ধারিত পাঠক্রমের পর আরও কয়েকবার পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হয়েছে। তা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার কল্পে রাজ্যের প্রয়োজন মত বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির সামান্য রদ বদলের নির্দেশ দেবার পর পুনরায় বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমের সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জাকির হোসেন কমিটির মতে বুনিয়াদী পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যুক্ত হবে।

(১) যে কোন একটি উৎপাদনাত্মক শিল্প

[(ক) খাদি ও বয়ন শিল্প (খ) কাষ্ঠশিল্প (গ) ফল ও সব্জীর চাষ (ঘ) কৃষিকার্য (ঙ) চর্মশিল্প (চ) স্থানীয় যে কোন শিল্প]

(২) মাতৃভাষা (৩) গণিত (৪) সুতাকাটা ও পশম বোনার নিম্নতম জ্ঞান (৫) সাধারণ বিজ্ঞান (৬) সঙ্গীত ও চারুকলা (৭) পারিবেশিক সমাজ-বিজ্ঞান—ইতিহাস ও ভৌগোলিক জ্ঞান

বুনিয়াদী পাঠক্রমের বর্তমান রূপ—

(১) ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন যাপনের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ধারণা লাভ এবং সু-অভ্যাস গঠন ও কৌশল সমূহ আয়ত্ব করা—

(২) নাগরিকশিক্ষা—গৃহপরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের ব্যবহারিক ও তত্ত্বমূলক প্রাথমিক ধারণা। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এর সাথে যুক্ত হবে।

(৩) **যে কোন একটি** উৎপাদকাত্মক বুনিয়াদী শিল্প (Basic Craft) [(ক) কৃষিকার্য, (খ) উদ্যান বিজ্ঞান, (গ) সুতাকাটা ও বয়নশিল্প, (ঘ) কাষ্ঠ শিল্প ও (ঙ) গৃহ নির্মান ও গৃহ সংস্কার এগুলির মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে।]

(৪) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত

(৫) নৃত্য, গীত ও চারুকলা—

প্রথমে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে ইংরেজীর কোন স্থান ছিল না। খের কমিটির নির্দেশে ইংরেজী ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপরোক্ত পাঠক্রম বুনিয়াদী (উচ্চ বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী) স্তরের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। পূর্ব-বুনিয়াদী স্তরে স্বাস্থ্য রক্ষা, খেলাধূলা, নৃত্যগীত, মাতৃভাষা ও গুনতে শেখা এবং একটি বুনিয়াদী শিল্পের প্রারম্ভিক পর্যায়ের ধারণা লাভে শিশুকে সাহায্য করবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। উত্তর বুনিয়াদী স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমের বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হবে শিল্পের মাধ্যমে। এই স্তরে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন করে নেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে।

(১) কৃষিবিদ্যা, (২) ভেষজবিদ্যা (৩) গার্হাস্থ্য বিজ্ঞান (৪) ধাতুবিদ্যা (৫) উদ্যোগ শিল্প (৬) শিক্ষকতা (৭) যন্ত্রবিদ্যা (৮) কারিগরীবিদ্যা (৯) বৈদ্যুতিক কাজ (১০) যান্ত্রিকশিল্প (১১) বাণিজ্য (১২) সাংবাদিকতা (১৩) মুদ্রন ও (১৪) ললিতকলা। গ্রামীন ও নাগরিক পরিবেশে উপরোক্ত চৌদ্দটি বিষয়ের যে কোন একটিকে ভাল করে শিখলে শিক্ষার্থীরা উহাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে হাইস্কুলের শিখার্থীদের মত তাদের শিক্ষিত বেকারের তালিকায় নাম পঞ্জীয়ণের প্রয়োজন হবে না। রাধাকিষণ কমিশনের সুপারিশক্রমে হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘ কর্তৃক

নিযুক্ত উচ্চ শিক্ষা কমিটি **গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য** নিম্নলিখিত সাতটি বিষয়কে নির্বাচিত করেন :—

(১) গ্রামীন জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি (২) গ্রামীন শিক্ষা (৩) কৃষিবিদ্যা ও উদ্যান-বিদ্যা (৪) গ্রামীন যন্ত্রবিদ্যা (৫) পশু পালন ও আভীরী কর্ম (৬) গ্রামীন উদ্যোগ শিল্প (৭) গ্রামীন শিল্প বিজ্ঞান।

বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি—গতানুগতিক পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যম ভাষা। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার তাত্ত্বিক দিক ভাষার মাধ্যমে বক্তৃতা পদ্ধতিতে আর ব্যবহারিক জ্ঞান ও কৌশল শিক্ষা হাতে কলমে দেবার রীতি এত দিন প্রচলিত ছিল। **গান্ধিজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম ভাষা নয়, শিল্পকার্য।** একটি উৎপাদনাত্মক শিল্প কার্যের শিক্ষা প্রসঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে (Correlation Method) শিশুর পারিবেশিক জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে! শিশুর শারীরিক, মানসিক সামাজিক ও নৈতিক বিকাশকে বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কর্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। শিশুরা কর্ম প্রবণ, তাই শিল্পকর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর আগ্রহ ও উদ্দীপনার যথেষ্ট স্থান রয়েছে। শিশুর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্য স্বাধীন ভাবে শিল্প কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার কথা আছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নির্দেশকের কাজ করবেন এবং অনুবন্ধ প্রণালীর অনুশীলনে শিশুদের সর্ব প্রকারে সাহায্য করবেন। শিল্পকার্যের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কাজ ও বিষয়গুলির প্রতি স্বাভাবিক ভাবে শিশুর আগ্রহ দেখা দিলে শিক্ষক উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জ্ঞান দান করবেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের নির্দেশ দেবেন। কার্যের পরিকল্পনা শিশুরাই প্রস্তুত করবে; কার্য সমাধার বিস্তারিত বিবরণও প্রস্তুত করতে হবে শিক্ষার্থীদের।

অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কৌশলটি, শিক্ষকের ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষকের অভাব হেতু বুনিয়াদী পদ্ধতির তাত্ত্বিক দিক বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও এর প্রয়োগমূলক দিকটি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অনুবন্ধ পদ্ধতির যান্ত্রিক প্রয়োগ বুনিয়াদী শিক্ষা প্রসারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণে অসুবিধা—এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশের প্রয়োজনে যে কোন মূল শিল্পকে কেন্দ্রীয় শিল্প রূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে শুধু শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীতে পরিবেশের সব কিছুর বাস্তব পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁদের অধিকাংশের কষ্টকল্পিত অনুবন্ধ প্রণালী বুনিয়াদী শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। চিন্তাশীল, কর্মঠ ও সমাজসেবী শিক্ষক না হ'লে খাঁটি বুনিয়াদী পদ্ধতি অনুসরণ

করা সম্ভব নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বর্তমানে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করেন, তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক শিক্ষকই কারু শিল্প জানেন। কারণ কারু শিল্প শেখার প্রতিষ্ঠানের অভাব, সর্বোপরি বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই সীমাবদ্ধ। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালগুলিকে বুনিয়াদী ছাঁচে পরিবর্তিত করলেও শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরে উক্ত শিল্পকে অনেক ক্ষেত্রেই উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে না। যারা গ্রামে থাকে, শিল্পের অভিজ্ঞতা তাদের অনেক সময় কাজে লাগে। কিন্তু যারা সহরে নানাবিধ বৃত্তি অবলম্বন করে বা মিল ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগদান করে, স্কুলের শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা তাদের তেমন কোন কাজে লাগে না।

পশ্চিমবাংলায় বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতির অভাব—ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার অভিনবত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গান্ধিজী গ্রামকেন্দ্রিক পরাধীন ভারতের উপযোগী একটি সম্পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষার উপর কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ১৯৩৯ খ্রীঃ কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে তখন মুসলিম লীগের আমল। এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা গতানুগতিক ভাবে থেকে যায়।

তবে স্বাধীনতা লাভের পুর্বে ডঃ ঘোষের পরিচালনায় বলরামপুরে বে-সরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষকদের একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলা হয় এবং সেখানে সমাজ-সেবকের মনোবৃত্তি নিয়ে যে কয়জন শিক্ষক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৩০% শিক্ষক শিক্ষক-শিক্ষণ লাভের পর নিজেদের চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলির মধ্যে হোটরে বিজয়বাবুর স্কুল ও কলানবগ্রামের প্রতিষ্ঠান যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেছে। সরকারী প্রচেষ্টা না থাকাতে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত এই প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার নাম শুনেছে হয়ত শতকরা ২।১ জন লোক। জন সাধারণের কাছে এ শিক্ষার স্বরূপ এখনও ব্যক্ত হয়নি। ১৯৪৮ সালের পর বাণীপুরে বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে বৎসরে জুনিয়র, সিনিয়র ও স্নাতোকোত্তর বিভাগ থেকে গড়ে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষক শিক্ষণ-শিক্ষা পাচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০ জনও শিক্ষকতা বৃত্তি বা শিক্ষা পরিদর্শকের বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। আর যারা এখনও আছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭৫% জন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ করছেন। অবশ্য জুনিয়র ও সিনিয়র ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিকাদের অনেকে অর্থ নৈতিক চাপে শিক্ষকতা বৃত্তি

গ্রহণ করছেন। উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি না হওয়াতে বুনিয়াদী শিক্ষকেরা প্রকৃত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারছেন না। গতানুগতিক পাঠশালাগুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের রূপান্তরিত করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। সরকার বা স্থানীয় অধিবাসীরা সে ব্যয়ভার বহনে প্রস্তুত নন।

নিম্নলিখিত **দোষগুলির জন্য** বাংলাদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার মোটেই সন্তোষজনক নয়।

(১) দু' একটি ছাড়া কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেনি, বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে ২।১ জন ছাড়া শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নেই।

(২) পশ্চিমবঙ্গ শিল্প প্রধান রাজ্য। ছাত্রেরা বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর খোঁজ করে, অথচ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে যারা পাশ করে আসে ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনে তাদের খুব অসুবিধা হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয় থেকে পাশ করবার পর ইংরেজীসহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করা বেশ শক্ত এবং অসুবিধাজনক। এখনও Matriculation বা School leaving Certificate-এর মূল্য চাকুরীর বাজারে বেশী।

(৩) একটিমাত্র শিল্পের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বল্প বেতনে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নয়। সত্যকার অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে গিয়ে শুধু মাত্র শিল্পকর্মের মাধ্যমে অনুবন্ধ সৃষ্টি করা অসুবিধা জনক বলে এই রাজ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেজন্যে পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু শিল্পকেন্দ্রিক না হয়ে কর্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

(৪) কলিকাতার ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সরকারী চাকুরে বাংলা সমাজের প্রতিভূ স্বরূপ। এ রাজ্যে ইংরেজী কৃষ্টি এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে ইংরেজী-শিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি সকলেরই একটা ঝোঁক রয়ে গেছে। তাছাড়া আজও বড় বড় চাকুরী প্রাপ্তি বা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হ'তে হবে। তাই এ রাজ্যে যারা বুনিয়াদী শিক্ষার পরিচালক ও শিক্ষক তাদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত মিশনারী স্কুলে বা ঐ জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। বুনিয়াদী শিক্ষায় খুব কম অভিভাবকেরই আস্থা আছে। তবে আশার কথা এই যে জাতীয় শিক্ষা হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করার পর গত কয়েক বৎসরে এ রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার আশানুরূপ না হ'লেও একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি—বুনিয়াদী শিক্ষা কর্মমুখর। এতে শিক্ষার্থীর সৃজন-শীল ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখানে শিল্পকেন্দ্রিক এবং অনুবন্ধ

প্রণালীসম্বলিত শিক্ষা প্রচলিত পুঁথি সর্বস্ব শিক্ষার চেয়ে অনেক উন্নত হ'লেও এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেকগুলি ত্রুটি আছে :—(১) শিক্ষার্থীর কর্মপ্রচেষ্টার সুযোগ থাকলেও এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের প্রাধান্য রয়েছে খুব বেশী। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক না হ'লে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় অচল অবস্থা দেখা দিবে। (২) একটি মাত্র শিল্পকে কেন্দ্রীয় শিল্প হিসেবে গ্রহণ করায় শিক্ষার্থীর সহজ কর্ম তৎপরতার খোরাক এতে তেমন থাকে না। তাই বর্তমানে পরিবেশের প্রয়োজন অনুসারে যে কোন গ্রামীণ মূল-শিল্পকে শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূলশিল্পরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি কেন্দ্রীয় শিল্পটি গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ; সহরের ও শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজনে বিভিন্ন যান্ত্রিক শিল্পকেও কেন্দ্রীয় শিল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষাকে অভিজ্ঞতা সঞ্জাত করে তোলা। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার্থী জীবনের সত্যকার রূপের সাথে পরিচিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া সহজ নহে এবং প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যাঁরা শিক্ষকতা করে থাকেন তাঁরা প্রায়ই অনুবন্ধ প্রণালীর সার্থক প্রয়োগ করতে সমর্থ হ'ন না, ফলে অনুবন্ধ প্রণালীর মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তা ছাড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন শিক্ষকও এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ পান নি।

(৪) বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার আর্থিক স্বনির্ভরতার বিষয়টি নিয়ে গত ২০ বৎসরে বহু তর্কজাল বিস্তৃত হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে শিল্পোৎপাদিত মালের গুণগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখলে এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে শিল্পকে ব্যবহার করলে আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রশ্নটির বেশী গুরুত্ব দেওয়া চলে না। অপর পক্ষে শিল্পের উৎপাদকতার দিকে গুরুত্ব দিলে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং বিদ্যালয় ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরীতে পরিণত হ'তে পারে।

এ ছাড়া দেশের উচ্চ-কোটি লোকদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য পাব্লিক স্কুল বা নামকরা সরকারী বিদ্যালয়ে ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখে উচ্চ-রাজকর্মচারী ইত্যাদির যোগ্যতার আলাদা মাপকাঠি রাখলে কেহই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তি করাবেন না। বিশেষ করে উচ্চ বুনিয়াদী-স্তরের পর যারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তারা যথারীতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-রত ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশী অসুবিধা ভোগ করে। উচ্চ বুনিয়াদীর পর কোন বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়েও বিশেষ কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। বুনিয়াদী শিক্ষা অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেমেয়ে বা অনাথ বালক-বালিকাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে এর উন্নতি সুদূরপরাহত। সরকারকে সুদৃঢ় মনোভাব নিয়ে বুনিয়াদী

শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা রূপে গ্রহণ করতে হবে সমাজের সর্ব স্তরের শিশুদের জন্য।

(৬) বুনিয়াদী শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের গতানুগতিক নিয়ন্ত্রণে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি সমাজে কৃত্রিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত হয়েছে। আবার সরকারী নিয়ন্ত্রণে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে হার্বার্টের পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষিকাদের; তাই কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পেয়েও শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সমর্থ হচ্ছেন না। অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত অনুবন্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে খুব কম শিক্ষকই ব্যবহার করতে সমর্থ।

(৭) বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে সমাজে মানুষের নূতন মূল্যবোধের পরিচয় দেবার জন্য, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে একটি কারুশিল্পের সাধারণ জ্ঞান যুক্ত করে দিয়েই সরকারী শিক্ষা দপ্তর আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। এতে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল নীতি থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি।

(৮) বুনিয়াদী শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক করে অনেক রাজ্যে সামাজিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অনুবন্ধ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই অনুবন্ধ হয় খুবই কৃত্রিম। গান্ধীজী শিল্পকর্মে শিক্ষার্থীর দক্ষতা লাভের মধ্যে যে প্রত্যয়ের কথা বলেছেন তার অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার মূলশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা—বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য নিজরাজ্যের প্রয়োজনে বুনিয়াদী শিক্ষাকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয় তার কারণ গতানুগতিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে বুনিয়াদী শিক্ষার বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ভারত সরকার 'গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী প্যাটার্নে রূপান্তরিত করবার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারগুলি সেই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কার্যক্ষেত্রে নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক রাজ্য সরকারের মতে গতানুগতিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী প্যাটার্নে রূপান্তরিত করা অপেক্ষা নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা সহজ। দু'হাজার বছর ধরে যে পাঠশালা ও মক্তবের শিক্ষা এদেশে চালু আছে একটা বিরাট সামাজিক পরিবর্তন না হ'লে সর্ব ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন সম্ভব কিনা তা তর্কের বিষয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ—বিগত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করেও এদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শতকরা পাঁচটি

বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা এর জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী কারণ এখনও ভারতবাসীর শতকরা ৬০ জন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে না, আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা জীবন সংগ্রামে ব্রতী হবার জন্য গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শ্রেয় বলে মনে করে। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার ভাল রূপ সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নি। বুনিয়াদী শিক্ষার কৌলীন্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে; সর্ব ভারতে প্রাথমিক স্তরে সাধারণ বিদ্যালয় (Common School) স্থাপন করতে হবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সাধারণ বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক ভাবে ভর্তি করাতে হবে। উচ্চকোটির সন্তানদের জন্য ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত উন্নত ধরনের প্রাথমিক বে-সরকারী বিদ্যালয়, মধ্যবিত্তদের জন্য হাইস্কুলসংলগ্ন প্রাথমিক বিভাগ এবং গরীব সন্তানদের জন্য অবৈতনিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করলে জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকেই শ্রেণী বিভাগ আরম্ভ হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা কখনও জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না কারণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে জন সাধারণ অনাথ আশ্রম হিসেবে অবজ্ঞার চোখে দেখবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যেরূপ যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরীর সর্তে সেরূপ শিক্ষক পাওয়া যায় না ফলে শিল্পের মাধ্যমে পরিচালিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি গতানুগতিক পুঁথিসর্বস্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমগোত্রীয় হবে। কোথাও বা শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করে শিক্ষার্থীদের ক্ষুদে কর্মীর মত খাটিয়ে লওয়া হবে।

সরকার যদি বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিকশিক্ষার মর্যাদা দিতে চান এবং আগামী পঞ্চম পরিকল্পনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে (৬বৎ—১৪বৎ) আবশ্যিক ও অবৈতনিক করতে চান তবে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার যে সমপর্যায়ভুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে এর প্রযোগ বিধি, সরকারী নীতি ও জন সাধারণের অজ্ঞতার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার এখনও আশাপ্রদ হয় নি। সর্ব প্রকার চেষ্টা থাকলে ভবিষ্যতে সে আশা সফল হ'তে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—গান্ধীজীর বৈপ্লবিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার পর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়—

(১) **উদ্দেশ্য**—বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রথম পর্যায় হিসেবে। প্রচলিত শিক্ষায় হুজুর-

মজুর তৈরী হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সমাজ-ব্যবস্থায় শাসন ও শোষণের ভিত্তি দৃঢ় হয়, কিন্তু গান্ধীজী চেয়েছিলেন অহিংস পন্থায় এদেশে শাসন ও শোষণ-মুক্ত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে। বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে পূর্ণ স্বরাজের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত নাগরিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে। পল্লীসংস্কৃতির উন্নয়ন ও গ্রাম-পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যও রয়েছে এই শিক্ষা ব্যবস্থায়।

(২) **পাঠক্রম**—বুনিয়াদী পাঠক্রম প্রস্তুত হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য। পাঠক্রমের সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি খুব সুদৃঢ় গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য গ্রামীণ অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, গ্রাম্য-পরিবেশ, পল্লী-সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি পল্লী মানবের জীবনধর্মকে পাঠক্রমে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় ও সমাজ বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংযুক্ত হয়েছে।

পরিবেশ—শিক্ষার পরিবেশ গৃহ থেকে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় থেকে সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই শিক্ষা এখানে সম্পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়।

শিক্ষা-উপকরণ—শিল্পকার্য এবং পল্লী পরিবেশ শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াতে শিক্ষা-প্রক্রিয়া প্রাণবন্ত হয়ে উঠে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে। সামাজিক উৎসব, মেলা, সামুদায়িক জীবন যাপন ইত্যাদি জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার পরিচায়ক।

আর্থিক দিক—সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্য নিয়ে আমাদের মত গরীব দেশে এক শত বৎসরের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-প্রবর্তন সম্ভব নয়, কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হতে হবে। এই আর্থিক দিকে চিন্তা থেকেই জন্ম হয় এই অভিনব বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে পূর্ব-বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাকে জোর করে স্বনির্ভর করা ঠিক হবে না, তবে উচ্চ বুনিয়াদী এবং উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হওয়ার পথে কোন বাধা নেই। এমনকি পূর্ব-বুনিয়াদী স্তর থেকে উত্তর-বুনিয়াদী স্তর পর্যন্ত শিক্ষার আর্থিক দিক একত্র বিচার করলে বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বনির্ভর করা চলে। তবে প্রস্তাব মত চলতি খরচ ছাড়া বাকী টাকার সরকারকে দিতে হবে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার চলতি খরচ যদি শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম থেকে এসে যায় তাহলে অতিক্রান্ত বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার সম্ভব।

প্রশাসন—পল্লী-সমাজ যাতে বুনিয়াদী শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে সেভাবে শিক্ষার প্রশাসনিক দিক পরিকল্পিত হয়েছে, কিন্তু কার্যকালে বুনিয়াদী

শিক্ষায় অনভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারীর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায়-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক-নিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এর ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় পর্বত প্রমাণ ত্রুটি জমা হয়েছে। এখন এই ত্রুটির ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে বুনিয়াদী শিক্ষা নানাবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ জনপ্রিয় হ'তে পারেনি।

শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষার মাধ্যম—অনুবন্ধ প্রণালী শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন নয়, তবে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের মাধ্যমে তার প্রয়োগ অভিনব; এবিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষা-পদ্ধতিতে ভাষার মাধ্যম একটি বড় স্থান অধিকার করে। বুনিয়াদী শিক্ষায় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে না নিয়ে শিল্পকার্যের বিবিধ প্রক্রিয়াকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা বক্তৃতার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়, এতে শিক্ষার্থী থাকে নিষ্ক্রিয় কিন্তু সক্রিয় বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধিতিতে শিল্পকার্য করতে করতে শিশুমনে নানা বিষয়ের প্রশ্ন জাগে। শিক্ষক অনুবন্ধ প্রণালীতে সেই বিষয়টিকে সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের সাথে যুক্ত করে শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সুদৃঢ় করে তোলেন।

অনুশীলনী

১। গান্ধিজীর দৃষ্টিতে বুনিয়াদী শিক্ষার স্বরূপ কি?

২। বুনিয়াদী-শিক্ষার ঐতিহাসিক দিক আলোচনা কর।

২। 'গান্ধিজীর শিক্ষাদর্শ বিপ্লবাত্মক'—যুক্তিসহ বুঝিয়ে দাও।

৪। বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করার স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৫। বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির অভিনবত্ব কোথায়? প্রজেক্ট মেথডের সাথে ও ওয়ার্দ্ধা মেথডের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারে বাধা কি কি? কিরূপে এই বাধাগুলি অপসারিত করা সম্ভব?

University Questions

1. What are the aims of Basic Education? How far are they realised through the present type of Basic Schools? [C. U. '66]

2. Give an account of the recent developments in the field of Basic Education in India. What difficulties do you find in its aims & practices. [C. U. '68]

3. What is your idea of about the immediate conversion of all the traditional primary Schools into Basic patterns? [C. U. '64]

তৃতীয় অধ্যায়

মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার দ্রুত পরিবর্তন—প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বলে এ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পাশের যোগ্যতা অর্জন করা। কোম্পানী আমলে শিক্ষার সরকারী উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প বেতনে সরকারী আপিসে বা বিদেশী সদাগরী আপিসে ইংরেজী-জানা কেরানী যোগান দেওয়া। কোন বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য শিশুকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হ'ত না। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার অন্যতম বিষয় ছিল। এরপর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়া হয়। ছাত্রাবাস নির্মাণ, গ্রন্থাগার-স্থাপন, শরীর শিক্ষার প্রচলন ও সহপাঠ্য বিষয়ের (Co-curricular activties) প্রবর্তন করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনেকটা উন্নত করা হয়। স্যাডলার কমিশনের সুপারিশক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা ও ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক পর্ষৎ অনেক প্রদেশে গঠিত হ'ল কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক, ইণ্টারমিডিয়েট ও কলেজী শিক্ষা—সর্ব প্রকার শিক্ষাকেই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে ও তাকে কার্যকরী করতে বিলম্ব হয়।

১৯১৯ খ্রীঃ প্রাদেশিক সরকারের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার আসে কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় একরূপই থেকে যায়। শুধু মাতৃভাষা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার বাহন-রূপে গৃহীত হয়। স্ত্রী-শিক্ষা দ্রুত প্রসারের ফলে মেয়েদের পৃথক পাঠ্য-তালিকার কথা চিন্তা করা হয়। ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিটি মাধ্যমিক স্তরে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্য হওয়ার কারণ স্বরূপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একমুখিতা ও শুধু ভাষা শিক্ষার উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই কমিটি সর্ব প্রথম মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী পাঠ্যসূচী সুপারিশ করেন।

দেশব্যাপী বেকার-সমস্যার কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে সাপ্রু কমিটি লক্ষ্য করেন যে, একমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রীলাভের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াতেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর জীবনে তারা কে কি বৃত্তি নির্বাচন করবে, কোন্ কাজের প্রতি তার ঝোঁক আছে, কোন্ কাজে তার আনন্দ আছে, কোন্ কাজে তার আগ্রহ আছে, কোন্ কাজে তার যোগ্যতা আছে সে বিষয় শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনার সাহায্যে মাধ্যমিক স্তরে স্থির করতে হবে। এজন্য পাঠ্যক্রম বহুমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার স্থান নির্ণয় করে দিয়েছিল উড-এবট্ রিপোর্ট। মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ্যসূচী গ্রহণ করার জন্য পলিটেক্‌নিক নামক কারিগরী স্কুলের পত্তন হয়। অবশ্য সমাজের চাহিদার তুলনায় এগুলির সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই অভাব পুরণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কিছু কারিগরী, বৃত্তিবিষয়ক ও পেশাবিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু এতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট রিপোর্টে নিম্ন-বুনিয়াদী, উচ্চ-বুনিয়াদী শিক্ষার সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্বয়সাধন করে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য মাধ্যমিক স্তরের শেষের তিন শ্রেণীতে একাডেমিক ও টেক্‌নিক্যাল—এই দুইরকম পাঠক্রমের সুপারিশ করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থীকে কোন-না-কোন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করতে হয়। অতএব মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাকাল, ছাত্রদের বয়স, পাঠ্যবিষয়, শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি ছাত্রদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনের উপযোগী হওয়া চাই। মাধ্যমিক শিক্ষা শুধু উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশপত্র যোগাড় করতে সাহায্য করবে না। **মাধ্যমিক শিক্ষাকে বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা বলা যেতে পারে।** কিন্তু এটা শুধু বয়ঃসন্ধি কালের শিক্ষা নয়, জীবনের এক চরম সন্ধিকালের শিক্ষা। এই শিক্ষার সাফল্য এবং এই শিক্ষার বিষয় নির্বাচনের উপর জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে। সমাজেব চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রুচির মানুষ বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে। অবশ্য অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতা এই বৃত্তি-নির্বাচন ব্যাপারটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা

মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমরা দেখেছি, বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর মধ্যে যে সমস্ত সৃজনাত্মক সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, ধীরে ধীরে এই সময় সেগুলি জীবনজিজ্ঞাসা রূপে দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী করতে হবে বহুমুখী। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করতে পারলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনের জন্য তাদের মন ও কর্মপ্রবণতাকে উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করবার সুয়োগ পাবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য—মাধ্যমিক শিক্ষা এদেশের শিক্ষার কাঠামোর মেরুদণ্ডস্বরূপ। জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য নির্ণীত হয় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করে তবুও জাতীয় শিক্ষায় মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বর্তমানে শিক্ষার ধারণা খুবই ব্যাপক। বিজ্ঞানীদের নিত্য নূতন আবিষ্কার এবং শিল্প, বাণিজ্য,

যানবাহন ও কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ একদিকে যেমন ভোগ্য বস্তু উৎপাদন, যানবাহন ও সংবাদ আদানপ্রদানের সুবিধা এনেছে প্রচুর, অপরদিকে ইহা তেমনি রাষ্ট্রনীতি, শিল্প, বাণিজ্য ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে এনেছে নানাবিধ সমস্যা। গণতন্ত্রী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নবরূপায়ণের কার্যে হস্তক্ষেপ করেছে। **মাধ্যমিক শিক্ষাই দেশের অধিকাংশ নাগরিকের শিক্ষার সীমারেখা তাই মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ** এবং এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হবে :—(১) স্বাধীন ও গণতন্ত্রী দেশের নাগরিকদের উন্নত জীবনযাত্রার উপযোগী করে নাগরিকদের গড়ে তোলা ; (২) নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের পুর্ণ-বিকাশ সাধন ও নৈতিক চরিত্র-গঠন ; (৩) বৃত্তি ও পেশা গ্রহণের জন্য নাগরিকদের দৈহিক ও মানসিক সংগঠন ; (৪) কর্মপ্রবণ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগরিক জীবন গড়ে তোলা এবং (৫) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মধ্যবর্তী নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা এনে দেওয়া।

ভারতবর্ষ আজ জাতি গঠন রূপ মহাযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেছে। এতে শ্রমিক, কৃষক, পরিচালক, সমাজসেবক ও সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেকের নিজস্ব অংশ রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করবার পর শতকরা ৯৫ জন শিক্ষার্থী শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, যানবাহন, শিক্ষা ও সমাজ-সেবাকেন্দ্র এবং সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি অথবা দেশরক্ষা বিভাগের চাকুরি গ্রহণ করে থাকেন। এরা প্রায়ই মধ্যবর্তী নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকেন। দেশ গঠনের জন্য বর্তমানে উন্নত ধরণের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরেই প্রয়োজন। উন্নতিকামী দেশগুলির ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে জাতি গঠনে মধ্যবর্তী নেতৃত্বের মুল্যমান খুব বেশী।

ভারতবর্ষের শিক্ষিত বেকার জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিক্ষা সমাপ্তির পর এদেশে শিক্ষার অপচয়ের মাত্রা খুবই বেশী। এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার বিশেষ ত্রুটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মানবশক্তি নিয়োগ-ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রের কার্যের সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ বিভাগের প্রস্তাবিত কর্মী সংখ্যার সংযোগ রাখলেই হবে না। মানব শক্তির উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তব রূপের সাথে মানব শক্তি প্রয়োগ ক্ষেত্রের স্বাভাবিক সংযোগ রাখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম শিক্ষার্থীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ মর্যাদা দেবার জন্য হবে বহুমুখী এবং এর কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক। মাধ্যমিক শিক্ষা বৃহত্তর জনসাধারণের শিক্ষা বলে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের উপর হবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম—মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলে এর পাঠক্রম নির্ণয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে বিবেচ্য—

(১) প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করবার জন্য এই তিন প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রমের মধ্যে স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

(২) দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষালাভ মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে সীমিত বলে এবং এই স্তরের পর শিক্ষার্থী যাতে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা গণতন্ত্রী দেশের নাগরিকদের শিক্ষাব্যবস্থা বলে এতে সাধারণ শিক্ষার জন্যে থাকবে কতকগুলি মূল বিষয় (Core Subjects)।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা রূপে গৃহীত হবার পর শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বিশেষ শিক্ষাধারা (Elective Subjects) বেছে নেবার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে।

(৫) মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম নির্ণয়ে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার কথাও বিবেচনা করতে হবে।

(৬) কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ ও সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে কতব্য নির্ধারণ ও নীতি নির্ধারণের জন্য বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় মাধ্যমিক পাঠক্রম নির্ণয় করতে হবে। পাঠক্রমে পুঁথিগত বিষয় যুক্ত হবে কর্মময় জীবনের নির্দেশনার জন্য। কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের খেলাভিত্তিক (Play way) অংশ গৃহীত হবে প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের জন্য; কার্য সম্পাদন (Projects) অংশ প্রাথমিক স্তরে এবং সৃজনমূলক ও উৎপাদনাত্মক কার্য যুক্ত হবে মাধ্যমিক পাঠক্রমে। উৎপাদনাত্মক কার্যের মধ্যে শিক্ষার্থী তার নিজের সত্তাকে খুঁজে পাবে এবং কর্মের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে চিন্তাশীল, কর্মঠ, সেবাপরায়ণ, স্বাবলম্বী-ও আত্মবিশ্বাসী হয়, তার জন্য কর্মের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ থাকবে পাঠক্রমে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পাঠক্রমকে কর্ম মুখর ও আনন্দদায়ক করে তুলবে।

(৭) শিক্ষার্থীর বর্তমানের চাহিদা মেটাবার জন্যে পাঠক্রমকে পরিবর্তনশীল ও প্রগতিপন্থী করা বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম অবশ্যপাঠ্য বিষয় (গণিত, আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজী ভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান), নির্বাচনযোগ্য বিষয় (যে কোন একটি শিক্ষাধারা), কারুশিল্প, শারীর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে ভারাক্রান্ত। আমরা বিষয়গুলি কমিয়ে দিতে বলছি না, পাঠ্য বিষয়গুলি যাতে কর্মের মাধ্যমে এবং অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্যে সহজে বিকাশোন্মুখ জীবনের সাথে যুক্ত হ'তে

পারে সেরূপ ভাবে পাঠক্রমকে রূপ দিতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে নিজে অধ্যয়ন করতে সমর্থ হয় এবং কর্মের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রস্তুত হ'তে পারে, সেরূপ সুযোগ ও পাঠক্রমে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারা পাঠক্রম ও দৈনিক কার্যতালিকা (Daily Routine) এবং শিক্ষা পদ্ধতি এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যে মাধ্যমিক স্তরে নূতন পাঠক্রম নির্ণয় করা সত্বেও নানা পাকচক্রে পাঠক্রম নির্ণয় তথা মাধ্যমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের সাথে পরীক্ষা-ব্যবস্থার আমূল প্রয়োজন বাঞ্ছনীয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে নাগরিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক কাজের দক্ষতালাভের ও সৃজনমূলক কাজের সুযোগ, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চারুকলার চর্চা, অবসর বিনোদনের শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক চেতনালাভের ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে সমস্ত বিষয়গুলি পরীক্ষার আওতায় যাবে না। শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সর্ব প্রকার সুযোগ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতি—প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণ আবশ্যিক করা প্রয়োজন; কারণ এই দু'টি স্তরে শিক্ষা-পদ্ধতির উপর শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপক এবং জটিলতর, তাই এই স্তরে শুধু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ না করে গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতি (Dynamic Method) প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। এই স্তরের সমস্ত বিষয়গুলি একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে যে কোন বিষয়ের জন্য পাঠটিকে আগ্রহভিত্তিক করে তুলতে হবে। শ্রেণীগঠন ছাড়া এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্ভব নয়; অথচ শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ে সমান আগ্রহ থাকে না। এমনকি ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী কোন বিশেষ শিক্ষাধারা বেছে নেবার পর সেই ধারার সমস্ত বিষয়ের প্রতি সব দিন সমান আগ্রহ থাকে না, সেজন্য শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শ্রেণীকক্ষে প্রস্তাবিত পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা। শিক্ষা-পদ্ধতি একটি ফলিত কলা (Practical Art) এবং সময় ও সুযোগ মত শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, গ্রন্থাগারে বা পরীক্ষণাগারে প্রয়োজনীয় অনুরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।

সক্রিয়তা শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাণস্বরূপ। কোন প্রজেক্ট সম্পাদন বা কোন রূপ কর্মানুষ্ঠানের সহায়তায় শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগ দিতে হবে। নানা প্রকার কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে স্বীয় কার্যে কৃতিত্বের জন্য

আত্মোপলব্ধির সুযোগ পাবে। নানা প্রকার প্রজেক্টের মধ্যে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা সুসম্পন্ন হবে।

তাছাড়া কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, স্বাধীন চিন্তার অবকাশ, সমস্যা সমাধান, বিচারকরণ ও নীতি-নির্ধারণ ইত্যাদি জটিল মানসিক কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়ে থাকে। কর্মের দক্ষতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং কৌশল প্রয়োগের ক্ষমতা গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যেই সম্ভব। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার জন্য উপরের শ্রেণীতে সম্মেলন-পদ্ধতি ও বিশেষ তথ্য পরিবেশনের জন্য বক্তৃতা-পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণীতে সর্ব বিষয়ের জন্য হার্বার্টের পঞ্চসোপান-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হবে না। দুঃখের বিষয় এদেশের শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে হার্বার্টের-পদ্ধতির উপর অযথা জোর দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা মাধ্যমিক স্তরে গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে একঘেয়ে হার্বার্ট পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেন। অনেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষার পরিবেশের অভাবে হার্বার্ট-পদ্ধতি অনুসরণ করাই সম্ভব হয় না। মাধ্যমিক স্তরে উন্নত শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের মূল সমস্যার উদ্ভব হয় কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা, শিক্ষকদের উপর গুরুভার শ্রেণী-শিক্ষার চাপ, শ্রেণীকক্ষে অধিকসংখ্যক ছাত্রের সমাবেশ, শিক্ষা-উপকরণের অভাব এবং সর্বোপরি শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যে আগ্রহের একান্ত অভাব থেকে। এগুলি দূর করতে না পারলে মাধ্যমিক স্তরে গতিশীল শিক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—আজ মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবমুখীতা বিচার করতে গিয়ে একে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ উহা জন সাধারণের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে মূলতঃ অভিভাবকদের। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা (৮ বৎসর ব্যাপী শিক্ষা) আবশ্যিক ও অবৈতনিক না হচ্ছে ততদিন মাধ্যমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হ'তে পারে না। তবে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বৃত্তির (scholarship) ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা না হ'লে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বলা যাবে না। অবশ্য সরকার যদি মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে সমর্থ হন তবে গণতান্ত্রিক দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হ'তে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের বৃহত্তর জনমণ্ডলীর জন্য। সমাজে বাঁচবার জন্য প্রত্যেককে কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার শিক্ষাকাল, ছাত্রদের বয়স, পাঠ্য-বিষয়, শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি ছাত্রের ভবিষ্যৎ

বৃত্তি-নির্বাচনের উপযোগী হওয়া চাই। মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শতকরা ৯০% জন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর নিজ নিজ বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন করে বৃহত্তর সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ করবে। মাধ্যমিক শিক্ষা শুধু উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্র যোগাড় করতে সাহায্য করবে না। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই যে নূতন দৃষ্টিকোণ, একেই মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের অভিনব পরিকল্পনা বলা যেতে পারে।

এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার গলদগুলি দূর করবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বহুমুখী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে প্রতিনিয়তই বাধা দিচ্ছে। নিম্নলিখিত **বাধাগুলি** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা রাজনৈতিক পাকচক্রে পড়ে বিশেষ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৩০%টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন হয়েছে রাজনৈতিক চাপে পড়ে। এমন সব জায়গায় কতকগুলি বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে যেখানে আগামী ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়গুলির গড়ে ওঠা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় আছে।

(২) শহরে বহুমুখী বিদ্যালয়ের জন্য ডিগ্রীধারী শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু পল্লীগ্রামে এম. এ. বা এম. এস-সি. পাস শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষক প্রায়ই পাওয়া যায় না।

(৩) কলেজের ১৫০৲ টাকা বেতনের চাকুরি অনেকে গ্রহণ করেন স্কুলের ২৩৭৲ টাকা বেতনের চাকুরির পরিবর্তে। কারণ কলেজে চাকুরির সামান্য একটু মর্যাদা এখনও নাকি আছে!

(৪) ৯ম শ্রেণীতে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে আসে তাদের মান খুব নীচু, তাই উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অভাবে শিক্ষার মানকে উন্নত করা যায় না।

(৫) অর্থকৌলীন্য ও সামাজিক কৌলীন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ-নির্বাচনে বাধার সৃষ্টি করে। নির্দেশক-শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক যুক্তির কোন মূল্য থাকে না ধনী ও ক্ষমতাশালী অভিভাবকদের স্বার্থবুদ্ধির কাছে।

(৬) বহুমুখী বিদ্যালয়ে এখন উপযুক্ত গ্রন্থাগার, পরীক্ষণাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সরকারী অর্থ-সাহায্য না পেলে বহুমুখী বিদ্যালয় পরিচালনা একরূপ অসম্ভব।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্রুত নিম্নগামিতা—এদেশে এখনও পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি আমাদের একটা মোহ আছে। মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় ও কারিগরী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে অনেক, কিন্তু প্রয়োজনের

তুলনায় ঐগুলির সংখ্যা অল্প হওয়াতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর এখনও গতানুগতিক হাইস্কুলে অধ্যয়ন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ ফলাফলের শতকরা পাসের হার দেশবাসীকে চিন্তিত করে তুলেছে। গত ১০।১২ বৎসর ধরে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় শতকরা ৪০ থেকে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয়েছে। অনেকে ৫।৬ বার একই পরীক্ষায় বসেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, ছাত্রদের অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী কে? অনেক শিক্ষক সহজেই উত্তর দেবেন, ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন নেই, শুধু খেলার মাঠ, সিনেমা, পাড়ার ক্লাবে আড্ডা, রোয়াকে বসে আড্ডা, অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা, প্রমোশনের জন্য অভিভাবকদের আব্দার, বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতার অভাব ইত্যাদি ছাত্রদের অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী। আবার অভিভাবক উত্তর দেবেন, পাঠ্যপুস্তকের চাপ, বিদ্যালয়ে ১২ মাসে ৭ মাস ছুটি, পরীক্ষা গ্রহণের গলদ, শিক্ষা-কার্যে শিক্ষকদের অনাসক্তি ইত্যাদি, শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী। সরকারপক্ষকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন, অধিকাংশ স্কুল সরকারী আওতায় না যাওয়াতে স্কুল-পরিচালকবর্গের স্বেচ্ছাচার, অনুপযুক্ত শিক্ষকনিয়োগ, আত্মীয়পোষণ-নীতি ছাত্রদের শিক্ষালাভে ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, যে শিক্ষা গ্রহণ করবার তার যোগ্যতা নেই বা যে শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ নেই, তাকে দিয়ে জোর করে সে বিষয় পড়িয়ে লওয়া হচ্ছে। তাছাড়া পরীক্ষা-পাসের পূর্বে বা পরে তাদের জীবনের কোন পরিবর্তন তারা দেখতে পাচ্ছে না, তাই তাদের পাঠে আগ্রহ নেই। শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকার প্রত্যেকের চাপ এসে পড়েছে ছাত্রের উপর। ওদিকে বাড়ীতে পড়বার ঘর নেই, পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই (কারণ বিদ্যালয়ে পড়া জিজ্ঞেস করা হয়, পাঠ দেওয়া হয় না।, পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের ক্ষমতা নেই, পেটে ভাত নেই, এবং বাড়ীর দশ রকম কাজের ঝামেলা মিটিয়ে শিক্ষার্থীকে পড়া তৈরী করতে হয়। পড়বে কি? অকুল সমুদ্র! **পাঠ্য-বিষয়ের সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক খুবই কম।** এই সমস্ত কারণগুলি একত্র করলে যা দাঁড়ায় তার সমাধানের কথঞ্চিৎ বিধান দেওয়া আছে মুদালিয়র কমিশনে। কিন্তু কমিশনের বিধান কবে যে সমগ্র দেশে প্রযুক্ত হবে কে জানে?

পাঠের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি বিরাট সমস্যা। মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য যোগ্য, উচ্চশিক্ষিত ও শিক্ষণশিক্ষা-প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষকের হাতেই নূতন মাধ্যমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হবে। বর্তমানে পাঠ্য-পুস্তক ও উহাদের সহায়িকা পড়ে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় পাস করতে পারে কিন্তু উপজীবিকা নির্বাচনের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি হিসাবে এরূপ

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব

মুখস্থ-করা বিদ্যা ও সংক্ষেপে বাজীমাৎ প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকরী হবে না। সরকারের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষণ-ব্যবস্থার আশানুরূপ প্রসার হয়নি। নিম্নের তালিকা থেকে বিষয়টি বুঝতে পারা যাবে।

বিদ্যালয়ের পর্যায়	'৪৮-৪৯,	'৫০-৫১	'৫৫-'৫৬	'৬০-'৬১	'৬৫-'৬৬
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	৫০%	৫৩.৩%	৫৮.৫%	৬৫%	৬৮%
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	৪০%	৫৩.৮%	৫৯.৭%	৬৮%	৭৫%

বাকী সমস্ত শিক্ষক আধুনিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তা ছাড়া যাঁরা শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁরাও স্কুলের আর্থিক অনটনে ও অন্যান্য কারণে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ও আধুনিক শিক্ষা-উপকরণের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারেন না। আবার এই শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষিকাদের ধরা হয়েছে। মোটামুটি হিসাবে ২০% শিক্ষক ও ৮০% শিক্ষিকা শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত। কাজেই ছেলেদের স্কুলে শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা সেই হারে কমবে।

এছাড়া প্রথম শ্রেণীতে দূরের কথা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকেরা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষক তা করতে আসন খুব কমই। তাই শিক্ষকদের বিষয়ের জ্ঞান (Subject Knowledge) সীমাবদ্ধ। শিক্ষকদের বেতন এত কম এবং নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য এত বেশী যে উপশিক্ষকতা শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক উপজীবিকা। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য শিক্ষাদানে শিক্ষকেরা সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারেন না। এতেও মাধ্যমিক শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে।

শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতি ও উপ-শিক্ষকতা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একমুখীতা দূর করবার জন্য বহুসাধক বিদ্যালয় ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে মুদালিয়র কমিশন সুপারিশ করেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞান, কৃষি, চারুকলা, টেকনিক্যাল, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি শাখা (stream)-যুক্ত বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বেশী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এগুলির সংখ্যাই তুলনামূলক ভাবে কম। গত ১০ বৎসরের হিসেব থেকে দেখা যায়, মানবাদি-বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার ৬৫%, বিজ্ঞানের ২৫% ও অন্যান্য ১০%; অতএব দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আগামী ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেও বিদ্যালয় থেকে বৃত্তি নির্বাচনের প্রারম্ভিক শিক্ষার তেমন সুযোগ পাবে না। পূর্ববর্তী ছাত্রদের মত বেকার জীবনের গ্লানি তাদেরও ভোগ করতে হবে।

বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার ব্যর্থতা

এখনও উচ্চশিক্ষালাভের দিকে ছেলেমেয়েদের ঝোঁক রয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বৃত্তিনির্বাচনের ঝোঁক কম দেখা

যাচ্ছে। ১০ বৎসর পূর্বে বি. এ. এম. এ. পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল, এখন টেক্‌নিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষার দিকে ঝোঁক হয়েছে। ডিগ্রি একটা চাই, তারপর অন্য কথা। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, চারুকলা, সমাজসেবা, সৈনিক-বৃত্তি ইত্যাদির দিকে এখনও তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজে অধ্যয়নের পর ডিগ্রি লাভ করে বা ডিগ্রি শেষ পর্যন্ত না পেয়ে চাকুরি খোঁজ করতে হয়। জীবিকা-অর্জনের জন্য কর্মবিনিয়োগ-সংস্থার নির্দেশমত "হাতের কাছে যা পান তাই নিয়ে নিন" এই নির্দেশই পালন করতে বাধ্য হয়। তারপর সারা-জীবন ধরে চলে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ। **মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বৃত্তি-নির্বাচন ও বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ দান করা যায় কিনা একথা আজ বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।**

চাকুরীর মোহ

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, হাই স্কুল, মিড্‌ল স্কুল, সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই পাঁচ প্রকার বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠক্রম অন্যান্য বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে করা হয়েছে। এই স্তর পর্যন্ত সমস্যা এই যে, উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য নিযুক্ত করা যায় না বা শিক্ষক-শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না। হাই স্কুলে বা সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের উপর এদের শিক্ষার ভার থাকে। মিডল স্কুলে বা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক এখনও পাওয়া যায় না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নীচের শ্রেণীগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষাদানের সমস্যা

এই পাঁচ রকম বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা যখন সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে আসে তখন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশ কম থাকে এবং তাদের নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে বেশ বেগ পেতে হয়। প্রয়োজনের তুলনায় সর্বার্থসাধক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম, কাজেই এইসব বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করানো অভিভাবকদের পক্ষে বড়ই সমস্যার বিষয়। অর্থকৌলীন্য বা অন্যান্য ভাবে প্রভাব-সৃষ্টির সুযোগে অনেক অযোগ্য ছেলেমেয়ে এই সব বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমস্যাকে অনেক বাড়িয়ে তোলে।

বহুমুখী বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি সমস্যা

শিক্ষা-উপকরণ প্রস্তুত বা উহা সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। অথচ নব-শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায়। উপরোক্ত সমস্যাগুলি মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্নগামিতার জন্য কম দায়ী নয়। এছাড়া ছাত্র আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আন্দোলনের দরুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থাকতে শিক্ষার মান হয়েছে নিম্নগামী।

প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

১। সরকার-পরিচালিত বিদ্যালয় (Government Schools)

২। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় (Goverment Aided Schools)

৩। স্বাধীন সংস্থা-পরিচালিত বিদ্যালয় (Private Schools)

এছাড়া সর্বভারতে ১৪।১৫টি পাব্লিক স্কুল (Public School), সৈনিক স্কুল ইত্যাদি আছে। এদের কতকগুলি সরকারী সাহায্য পায়, আর কতকগুলি রাজা-মহারাজাদের দানে বা ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থে পরিচালিত হয়।

সরকার-পরিচালিত বিদ্যালয়—ব্রিটিশ আমল থেকে এই বিদ্যালয়গুলি সাধারণের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির আদর্শ হিসেবে কাজ করে আসছে। প্রত্যেক জেলায় একটি করে এবং বিশেষ বিশেষ মহকুমায় বা মিউনিসিপ্যাল শহর সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারী শিক্ষানীতি এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভেতর দিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকারের। বিদ্যালয়গুলি সরকারের শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত।

সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়—সাধারণ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করবার পর সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করতে পারে। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকগণ সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে সুপারিশ করলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ সেই সমস্ত আবেদন-পত্রগুলি বিচার করে সাহায্য দানের নীতি অনুসারে হিসেব করে অর্থ সাহায্যের পরিমাণ নির্ণয় করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এই খাতে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন। বিদ্যালয়ের চলতি খরচের ঘাটতি অংশ সরকার সাহায্য হিসেবে দিয়ে থাকেন। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের (specialist teachers) বেতন বাবদ সরকার অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন। এছাড়া আসবাবপত্র তৈয়ারীর জন্য, শিক্ষার সাজসরঞ্জাম কেনবার জন্য, বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, গ্রন্থাগার-স্থাপন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন খাতে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। অবশ্য সমস্ত বিদ্যালয়ই যে এই সব খাতে প্রতি বৎসর অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে এমন নয়। বিদ্যালয়-পরিচালক-সমিতিতে সরকার একজন সদস্যকে মনোনীত করেন এবং সরকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক বিদ্যালয়ের-কার্যক্রম পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।

বে-সরকারী বিদ্যালয়—স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দান, বা কোন সংস্থার অর্থ-সাহায্যে বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়। মিউনিসিপ্যাল শহরে এমন অনেক বড় বড় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে যে সেগুলি ছাত্র বেতনের উপর নির্ভর করে চলে ; এমন কি বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত আয় থেকে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বোনাস

(Bonus) পর্যন্ত দেওয়া হয়ে থাকে। আবার পল্লীর যে সমস্ত বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পায় না, সেগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে।

সরকারী বিদ্যালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ক্ষমতা সরকারের। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের কোন পরিচালক সমিতি (Governing Body) নেই। এখানে প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া আছে। শিক্ষক-নিয়োগ, বরখাস্ত, বদলী ও শিক্ষকের পদোন্নতি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের একটি পরিচালক সমিতি থাকে। এই সমিতিতে এক বা একাধিক সরকারের মনোনীত সদস্য থাকেন। শিক্ষকদের নিয়োগ করা বা বরখাস্ত করা পরিচালক সমিতির এক্তিয়ারের মধ্যে, তবে চাকুরির স্থায়িত্বজ্ঞাপক পত্র (confirmation letter) দেবার সময় সরকারী অনুমোদন নিতে হয়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব রেজিস্টার্ড হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া চাই, নতুবা সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। বিদ্যালয়-পরিদর্শক নোটিশ দিয়ে বা বিনা নোটিশে বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ পরীক্ষা করতে পারেন। পরিদর্শকের রিপোর্টের উপর সরকারী সাহায্য অনেকটা নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালন-ব্যবস্থা পরিচালক-সমিতির হাতে থাকে। বিদ্যালয়-পরিচালনায় কোন কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি ভেঙে দিয়ে একজন এ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়-পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এ্যাডমিনিস্ট্রেটারের। অবশ্য এই ব্যবস্থা সাময়িক। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হ'লেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালক সমিতি গঠন করা হয়। বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি বিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থার দায়িত্ব বহন করেন। এই সমিতির সিদ্ধান্তই চরম বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষকদের নিয়োগ, বরখাস্ত, বা পদোন্নতির ব্যবস্থা করার ক্ষমতা এই সমিতির হাতে ন্যস্ত আছে। বিদ্যালয়গুলি বোর্ডের অনুমোদন লাভ করবার জন্য শুধু স্কুল কোড (School Code) মেনে চলে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতনের কোন নির্দিষ্ট হার নেই।

এদেশে বহুদিন যাবৎ মাধ্যমিক শিক্ষা হাইস্কুলের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিরাট দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব যে বিদেশী সরকার গ্রহণ করতে পারবেন না তা শাসকবর্গ জানতেন, তাই এদেশের কেরানী তৈয়ারীর কারখানা রূপে আদর্শ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হওয়াতে সরকার প্রত্যেক জেলায় এবং বিশিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি করে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আজও সেই সব হাইস্কুলকে সরকারী শিক্ষাদপ্তরের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে। কারণ সরকারী শিক্ষানীতিকে দেশে চালু করতে হ'লে

এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এখানে বিনা বাধায় সরকারী আদেশ জারী করা সম্ভব হবে এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দেখে বে-সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে নূতন শিক্ষাধারা চালু হবে। তা-ছাড়া সরকারী শিক্ষা বিভাগের অনেক উর্ধ্বতন কর্মচারী এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। একটি সর্বার্থসাধক সরকারী বিদ্যালয়ের জন্য বাৎসরিক চলতি খরচের দ্বারা ৫.৬টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যেখানে সরকার গ্রহণ করেন নি, সেখানে মাত্র কয়েকটি সরকারী বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষাখাতের প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কোন যুক্তি নেই বা কোন সার্থকতা নেই। স্বাধীনতা লাভের পর জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল কর্তব্য জন সাধারণের শিক্ষার সর্ববিধ উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। প্রত্যেক নাগরিক যাতে সরকারী শিক্ষা-খাতের ব্যয়িত অর্থের সমান অংশীদার হ'তে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর দিয়ে সরকার পক্ষ থেকে যদি ঐগুলির নিয়ন্ত্রণ ও প্রসারের ব্যবস্থা করা হয় তবে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার দ্রুত উন্নতি সম্ভব। সরকারী বিদ্যালয়গুলির ফলাফল অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় থেকে মোটেই উন্নত নয়। পুঁথিগত বিদ্যায় ২।৪টি ছেলে ভাল ফল করলেও প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি থেকেই উন্নত চরিত্র ছেলেমেয়েদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায় এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিবেশ অনেকটা উন্নত বলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সম্ভব। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা প্রাণ দিয়ে বিদ্যালয়গুলিকে গড়ে তোলেন, অপর পক্ষে, সরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাজার রকম ত্রুটি শিক্ষার সত্যকার রূপটিকে ম্লান করে দেয়। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষকমণ্ডলীর শুধু নেতা নন তিনি কার্যতঃ শিক্ষকদের প্রভু হয়ে বসেন। ছাত্র ভর্তি থেকে আরম্ভ করে শেষ পরীক্ষা-প্রস্তুতির নানা স্তরে স্বজন-পোষণ নীতির কুফল লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে খানিকটা ম্লান হয়ে আসে।

গণতন্ত্রীদেশে পৃথক-ভাবে সরকারী বিদ্যালয় রাখা অযৌক্তিক

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে জন সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সেই অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে ও উন্নয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। জন-সাধারণ জমি, অর্থ ও আসবাবপত্র দান করেন। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া গিয়েছে জনসাধারণের কাছ থেকে, মাত্র শতকরা ২০ ভাগ

অর্থের যোগান দিয়ে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণভার পেয়েছেন। আর এই শতকরা ২০ ভাগ অর্থের মধ্যে শতকরা ১১ ভাগ ব্যয় হয়েছে সরকারী বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সরকারী শিক্ষা দপ্তরের কাজে। বাকী শতকরা ৯ ভাগ অর্থের দ্বারা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি প্রভূত উপকৃত। আমাদের মত গরীব দেশে পরিশাসন-ব্যবস্থার দিক থেকে এক জাতীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকা বাঞ্ছনীয়। সরকারী বিদ্যালয়গুলিকে জন সাধারণের পরিচালনাধীনে রূপান্তরিত করে এবং আইন করে বে-সরকারী সমস্ত বিদ্যালয় এবং পাব্লিক স্কুলগুলিকে (Public School) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে (Grant in-aid School) পরিণত করা উচিত। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব মেনে লওয়া মানে সমাজের ধনী ও উচ্চকোটির সন্তানসন্ততিদের জন্য মাধ্যমিক তথা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ কতকগুলি সুযোগ দেওয়া। এই সুযোগ যতদিন দেওয়া হবে ততদিন এদেশে শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের স্বপ্ন অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পরিণত করা উচিত

পশ্চিম বাংলার সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের অবস্থা—বাংলাদেশের অধিকাংশ সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে মানবাদি বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং সাধারণ বিজ্ঞান— এই তিনটি শাখা আছে। শিক্ষকের অভাবে সমাজের আগ্রহ ও উপযোগিতা থাকা সত্বেও কারিগরী, চারুকলা, বা গৃহবিজ্ঞান শাখা (Stream)-যুক্ত সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। ২।৩ বৎসর যাবৎ ছেলেদের স্কুলে বাণিজ্য এবং মেয়েদের স্কুলে গৃহবিজ্ঞান শাখা খোলবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। ছোটবড় শহরে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত না হ'লেও সরকারী চাহিদা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে। তবে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা পড়াবার শিক্ষকের খুবই অভাব। পল্লীগ্রামে সরকারী প্রচেষ্টায় অল্প সংখ্যক সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় টিম্ টিম্ করে চলছে। কারণ বাংলার পল্লীতে যে সমস্ত হাই স্কুল ছিল তার ৮০%টি বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্বাধীনতা লাভের পর ৫৫%টি বিদ্যালয় সরকারী সাহায্য পাচ্ছে। এইসব বিদ্যালয়কে সরকার থেকে প্রচুর অর্থসাহায্য করতে হয় ঘাটতি অর্থ সাহায্য (Deficit Grant) দিতে গিয়ে। সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের জন্য তার ৪।৫ গুণ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশক্রমে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের জন্য যে সমস্ত সাজসরঞ্জাম, বিদ্যালয়গৃহ, খেলার মাঠ প্রভৃতি দরকার তা যোগাড় করা বেশ শক্ত। ২।৪ মাস চেষ্টার পর ২।৩ জন যোগ্য শিক্ষক পেলেও সুযোগ পেলেই তারা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসেন। তাছাড়া

সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা

সরকারী সাহায্য প্রতি মাসে পাওয়া যায় না এবং গরীব গ্রামবাসী বা শহরের নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকদের পক্ষে উচ্চ বেতন দিয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সরকারী বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকদের সবচেয়ে বড়সমস্যা ছাত্রবেতন আদায় করা, সরকারী সাহায্যের বিল (Bill) পাস করান এবং সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন মাসে মাসে দিয়ে যাওয়া। এখনও বাংলাদেশের ৫০%টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মাসে মাসে সম্পূর্ণ বেতন পান না। কিস্তিবন্দী ভাবে বেতন দেওয়া হয়। এর সুদূরপ্রসারী ফলে দেখা দেয় উপশিক্ষকতার প্রতি শিক্ষকদের অত্যধিক আগ্রহ। বহু সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে মূলতঃ উপ-শিক্ষকতার উপর নির্ভর করতে হয়। এঁদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যের প্রতি কোন আগ্রহ থাকে না।

শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদার অভাব হেতু সুযোগ শিক্ষক পাওয়া যায় না

সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেও শিক্ষকদের বেতন এত কম ছিল যে ৩।৪ বৎসর ভাল শিক্ষক এইসব বিদ্যালয়ের জন্য পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানের শিক্ষক, চারুকলার শিক্ষক, কারিগরী-বিদ্যার শিক্ষক (Craft teacher) প্রায় পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বলে কিছু এখন নেই, সরকারী আপিসে যে মাহিয়ানাতে সে কেরানীর কাজ করবে, সে মাহিনায় বা তার চেয়ে বেশী মাহিয়ানাতে স্কুলে কাজ করতে অনেকেই নারাজ। বর্তমানে কলেজ-শিক্ষকের বেতন ১৫০৲ আর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এম. এ., এম. এস.-সি. পাস শিক্ষকদের বেতন ২৪০৲; তবুও স্কুলের চাকুরি অপেক্ষা শিক্ষকেরা কলেজের চাকুরি করতে চান। সমাজ ব্যবস্থার এই দুষ্ট ক্ষতটির চিকিৎসা করা খুবই দরকার। শিক্ষায় যদি শিক্ষকের মন না থাকে এবং শিক্ষকতা-বৃত্তির প্রতি সমাজের যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় পরিচালনা করা অসম্ভব হবে।

সে কমিশনের সুপারিশ

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এই শিক্ষার উন্নতির জন্য সুপারিশ করতে ১৯৫৫ খ্রীঃ সে কমিশন নিযুক্ত করা হয়। এই কমিশনের মতে, পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার মান শোচনীয়ভাবে নিম্নগামী হয়েছে। দেশ বিভাগের পর ৫০ লক্ষের বেশী উদ্বাস্তু এই রাজ্যে আগমন করে। শিক্ষাই এদের একমাত্র পাথেয়, তাই দ্রুতগতিতে এদেশে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সরকার থেকে গ্রান্ট্-ইন্-এড ব্যবস্থায় মুক্তহস্তে অর্থের যোগান দেওয়া হয়। সে কমিশনের মতে পশ্চিমবঙ্গে অনুপযুক্ত স্কুলভবন, ছাত্রবহুল বর্গ, অল্পবেতনভোগী অনুপযুক্ত ও অল্পশিক্ষিত শিক্ষক এবং শিক্ষা-উপকরণের অভাব মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে

নিম্নগামী করে তুলেছে। হাইস্কুলগুলির যখন এরূপ অবস্থা তখন এক-একটি বিদ্যালয়কে এক লক্ষ করে টাকা দিয়ে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় গড়বার চেষ্টা হয়েছে। তাতে ইটকাঠের উপর পয়সার অপব্যয় হয়েছে কিন্তু প্রকৃত সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয় খুব কমই গড়ে উঠেছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা—(১) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়—সরকারী বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে। এই সব বিদ্যালয়ে অর্থের বিশেষ অভাব অনুভূত হয় না।

(২) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের আয়ের উৎস ছাত্র-বেতন, বদান্য ব্যক্তিদের দান ও দান-সম্পত্তি (Endowment) থেকে আয় এবং সরকারী সাহায্য উল্লেখযোগ্য। গত ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ ঘাটতি অর্থ সাহায্য (Defecit grant-in aid) প্রথা চালু থাকায় বিদ্যালয়গুলির আর্থিক অনটন অনেকটা কম; কিন্তু সরকারী সাহায্য সময়মত ও ঠিকমত না পাওয়াতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বিদ্যালয়-পরিচালনা-সংসদকে (Managing Committee)।

(৩) বিশেষ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য সংশিষ্ট সংস্থা-সভ্যদের নিকট থেকে ও বদান্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ-সাহায্য আদায় করে। ছাত্র-বেতন থেকেও বিদ্যালয়ের অর্থাগম হয়। এইসব বিদ্যালয়ে ছাত্র-বেতনের হার বেশী। তাছাড়া সম্ভবস্থলে সরকারী সাহায্যও পাওয়া যায়।

(৪) বেসরকারী মাধ্যমিক যেসব বেসরকারী বিদ্যালয় শুধু জন সাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত, সেগুলি ছাত্রবেতনের আয়ের উপর নির্ভর করে। বদান্য জন সাধারণের নিকট থেকে সামান্য অর্থ এই সমস্ত বিদ্যালয় পেয়ে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের বদান্য জন সাধারণের নিকট তেমন অর্থ আর পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই ছাত্র-বেতনের উপরই বিদ্যালয়গুলিকে নির্ভর করতে হচ্ছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়, তাই শিক্ষকদের এরা ভাল বেতন দিতে পারেন না। আর্থিক অনটনের জন্য এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অবস্থা বড় শোচনীয়।

অন্যান্য সমস্যা—উপরোক্ত চারি শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উপযুক্ত পাঠাগার, পরীক্ষণাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি বড় একটা নেই। ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে পাঠাগার, পরীক্ষণাগার ইত্যাদি এত ছোট যে, সকলে এগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। প্রয়োজন অনুরূপ বইপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অর্থও বিদ্যালয়গুলির নেই। পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না অর্থের অভাবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সাত প্রকার অর্থ সাহায্য (Grant-in-aid) দেওয়া যেতে পারে।

(১) চলতি সাহায্য (recurring grant), (২) গৃহ নির্মানের জন্য এককালীন সাহায্য (Non-recurring Building Grant), (৩) আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য এককালীন সাহায্য (Non-recurring Furniture etc. grant), (৪) গ্রন্থাগার, পরীক্ষণাগার ইত্যাদির জন্য বার্ষিক সাহায্য (Annual grant for Libray, Laboratory etc.), (৫) টিফিন বা মধ্যাহ্নকালীন খাবারের জন্য মাসিক সাহায্য (Monthly Grant for tiffin or mid-day meal), (৬) সহ-পাঠক্রমিক কার্যবলীর অন্য বার্ষিক সাহায্য (Annual Grant for Co-curricular activities), এবং (৭) শিক্ষকদের ও ছাত্রদের কল্যাণজনক কার্যের অন্য বাৎসরিক সাহায্য Annual Grant for Teachers & Students Welfare)

সরকারী চলতি সাহায্য বৎসরে তিনবার বিল (Bill) করে দিলে বিদ্যালয় পরিচালনার সুবিধা হয় কারণ ছাত্র-বেতন থেকে যে অর্থ আসে তাতে শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী দেওয়া যায় না। এই সাহায্য শুধু বিদ্যালয়ের আয়ের ঘাটতির উপর বিচার করলে চলবে না, বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রতিও নজর দিতে হবে সাহায্য দানের সময়। ছাত্র বেতন আদায় ও চলতি সাহায্যের মধ্যে রাশিগত মান ঠিক রাখতে হবে। এই রাশিগত মান নির্ণয় করবার সময় সহর, পল্লী ও বিদ্যালয় পরিবেশের আথিক সঙ্গতির কথা বিচার করা উচিত। গৃহ নির্মানের ব্যয় বাবদ সাহায্যের সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আদায়ীকৃত অর্থের সাথে উক্ত সাহায্যের একটি রাশিতগত মান ঠিক রাখতে হবে এবং কতকগুলি সর্তের উপর কিস্তিতে কিস্তিতে সাহায্য দিতে হবে। এই অর্থের পরিমাণ ৫ বৎসরের-চলতি সাহায্যের অতিরিক্ত যেন না হয়।

বিভিন্ন প্রকার সরকারী সাহায্য দেবার সর্তাবলী

অন্যান্য সাহায্য উপযুক্ত সর্তের উপর ভিত্তি করে দিতে হবে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে যে বাবদ সরকারী অর্থ দেওয়া হবে সেই অর্থ যাতে সেই বাবদ যেন খরচ হয় এবং তার রিপোর্ট টাকা খরচ হবার ৬ মাসের মধ্যে সরকারকে দেবার জন্য বিদ্যালয়কে নির্দেশ দিতে হবে। টিফিন অথবা মধ্যাহ্নকালীন খাবারের জন্য সরকারী অর্থ সাহাব্য প্রতি মাসের গোড়ার দিকে যাতে বিদ্যালয় পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারী হিসাব পরীক্ষককে দিয়ে হিসাব পরীক্ষিত না হ'লে ও রিপোর্ট সন্তোষজনক না হ'লে অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না। এবিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্ক—জাতীয় শিক্ষার

ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হ'লে মাধ্যমিক শিক্ষাকে একাধারে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপন করতে হবে অপর পক্ষে উচ্চ শিক্ষার সাথেও সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। নবশিক্ষা প্রবর্তনের পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে তুলতো মধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য, আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা। কিন্তু বর্তমানে তিনটি স্তরের শিক্ষা একাধারে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে তেমনি তিনটি স্তরের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগও থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হবে। প্রকৃতপক্ষে উহা এদেশে সমস্ত নাগরিকের শিক্ষা ব্যবস্থা। শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থী এখানে জীবনের শিক্ষা সমাপ্ত করবে কাজেই ভাষা শিক্ষা, গণিত শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, নাগরিক শিক্ষা ও কারুশিল্প শিক্ষাই হবে এই স্তরের পাঠক্রম। এই স্তরে কর্মভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ এবং শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশকে সম্ভব করে তোলাই হবে শিক্ষকের কর্তব্য। শতকরা যে ১০ জন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে তাদের ভাষা জ্ঞান, গণিতের ধারণা, সামাজিক চেতনা, নাগরিক চেতনা ও সাধারণ বিজ্ঞানের ধারণা যাতে স্পষ্ট হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। নতুবা ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষার মান নিম্নগামী হবে। শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এনে দেওয়া ও শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অভ্যস্থ করে তোলা প্রাথমিক স্তরের কাজ। কিন্তু জীবনের বৃহত্তর পরিবেশের জন্য প্রস্তুতি পর্ব হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এখান থেকেই যোগ্য শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে উচ্চ শিক্ষার সংযোগ—বিগত ১০০ বৎসর ধরে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। পুঁথিসর্বস্ব পাঠক্রমে শিক্ষাথীর আগ্রহ বা কর্মপ্রবণতার কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এখনও শেষ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শতকরা ১৫ জন উচ্চ শিক্ষার জন্য অকারণ মহাবিদ্যালয়ের দরজায় ভিড় করে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কারিগরী ও বৃত্তিমুখী করে গড়ে তুলতে পারলে এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্য, যানবাহন, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজসেবামূলক কার্যের প্রসার হ'লে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শতকরা ৫ জনের বেশী উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য অযথা চেষ্টা করবে না। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে উচ্চ শিক্ষার যোগাযোগের জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়ে যে সাতটি শিক্ষাধারার প্রবর্তন করা হয়েছে সেগুলির পাঠক্রমের সাথে মহাবিদ্যালয়ের পাঠক্রমের স্বাভাবিক সংযোগ সাধন করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষাকে উন্নত করতে হবে যাতে মহাবিদ্যালয় গিয়ে ভাষা শিক্ষার জন্য সময় নষ্ট না

করতে হয় এবং ভাষার ক্রটির জন্ত উচ্চ শিক্ষার মান নিম্নগামী না হয়। তা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষাই যেখানে অধিকাংশ নাগরিকের শিক্ষার সীমারেখা, সেখানে এই স্তরের শিক্ষাকে সর্ব প্রকারে স্বয়ংসম্পুর্ণ করে তুলতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার সম্পর্ক—পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষায় যারা বিশেষ সুবিধে করতে পারতো না, তারাই কারিগরী বিভালয়ে বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হ'ত। বর্তমানে দেশ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও যানবাহনে অনেক উন্নত হয়েছে তাই কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার মর্যাদা বেড়েছে এবং যারা এজাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের কর্মসংস্থান সহজতর হয়। শিক্ষিত বেকার দেশের এক বিরাট অভিশাপ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অপচয় দূর করবার জন্ত নিম্নমাধ্যমিক স্তরের পর নিম্ন কারিগরী বিভালয় বা বৃত্তিশিক্ষাকেন্দ্রে যোগদানের সুযোগ দিতে হবে; আর উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের পর পলিটেক্নিক ও উচ্চতর কারুশিল্পকেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে পেশামূলক শিক্ষার সম্পর্ক—শ্রমিক, কৃষক ও নানা প্রকার স্বনিয়োজিত (Self employed) পেশায় উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর থেকেই অনেকে জীবনযাত্রা আরম্ভ করতে পারে। এদের উপযুক্ত নাগরিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা থাকা চাই। মাধ্যমিক স্তরে এদের জন্ত উক্ত বিষয়গুলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর সরকারী ও বে-সরকারী চাকুরি গ্রহণ অথবা শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সমাজ-সেবাকেন্দ্রে অনেকে কর্মগ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করবেন। তাই পেশা-শিক্ষার প্রশিক্ষণের ভিত্তি হিসেবে ভাষাজ্ঞান, গণিতের ধারণা, সামাজিক শিক্ষা, নাগরিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা এদের ক্ষেত্রে বেশ উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক বিভালয় ও উচ্চতর মাধ্যমিক বা বহুমুখী বিভালয়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সংগঠনের সুযোগ দিতে হবে পেশা শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুতের জন্য।

মাধ্যমিক শিক্ষার মূল সমস্তা—মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যালোচনায় এ জাতীয় শিক্ষার পাঁচটি সমস্তা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

(১) মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের সমগ্র শিক্ষা-কাঠামোর মেরুদণ্ডস্বরূপ বলে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাস্তরের সাথে এর সুষ্ঠু সংযোগ সাধন এক বড় রকম সমস্তা। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশকে, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ও শিক্ষায় স্বাবলম্বী করে তোলার কার্যকরী পরিকল্পনা নিয়ে এ বিষয়টি সমাধানের সূত্র নির্ধারণ করতে হবে।

(২) স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন খুবই সমস্তা-সঙ্কুল। শিক্ষাকে জীবনের সাথে যুক্ত করতে হলে এছাড়া অন্ত পথ নেই।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ এই কর্মসূচীকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রয়োজনভিত্তিক করতে পারলে এই স্তরে **অনুন্নয়ন ও অপচয়ের মাত্রা** সহজেই কমিয়ে আনা যাবে। অবশ্য একার্যে সাহায্য করবার জন্ত পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের আশু প্রয়োজন রয়েছে।

(৪) এই স্তরে **গতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি** প্রবর্তন করা খুবই শক্ত অথচ গতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করেও কোন সুফল আশা করা যায় না।

(৫) **মাধ্যমিক শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা নির্ণয় ও মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে দেশের কর্মসংস্থানের সুষ্ঠু সংযোগ সাধন** অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সাথে এবিষয় দু'টি বিশেষ ভাবে যুক্ত। **গণতান্ত্রিক দেশে মধ্যবর্তী নেতৃত্বের প্রস্তুতি পর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার অবদান** খুবই বেশী। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সব দিক থেকে বাস্তবমুখী করে তুলতে পারলে এ ক্ষেত্রে সমস্যার সূত্র নির্ণয় সহজতর হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা—এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। শতকরা ৭০টি বিদ্যালয়ে এখনও গতানুগতিক পদ্ধতিতে 'পড়া দেওয়া' এবং 'পড়া আদায় করা' হয়। সরকারের নির্দেশে দশম শ্রেণীযুক্ত এবং একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তিত হ'লেও অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মূল লক্ষ্য রয়েছে মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের চেষ্টা করা এবং সুযোগ পেলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ। শিক্ষাকে এদেশে এখনও জীবনের সাথে যুক্ত করে তুলতে পারা যায় নি। মাধ্যমিক স্তরে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাব সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এর কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সামনে চাকুরি লাভের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুর আগ্রহ নেই; কোন কিছু সৃষ্টির আগ্রহ নেই বললেই হয়। একটি পদের জন্ত এক হাজার স্নাতক চাকুরি প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও কারিগরী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা পেশামূলক শিক্ষার দিকে না গিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা-লাভের জন্তই গড্ডালিকা প্রবাহের মত এগিয়ে চলেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ—মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা রূপে গড়ে তোলবার জন্ত সরকার ও শিক্ষাবিদেরা আগ্রহী কিন্তু দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য যানবাহন, শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক কাজে অংশ-গ্রহণের জন্ত দেশের অধিকাংশ যুবকযুবতীরা সুযোগ না পেলে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের মোহভঙ্গ হওয়া দুষ্কর এবং শিক্ষা ও কর্মনিয়োগ ক্ষেত্রে একটি

সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি সুদূর পরাহত। মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুধু বৃত্তিমুখী, বহুমুখী বা পেশাভিত্তিক করে তুললেই হবে না, মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত (নিম্নমাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক) নাগরিকদের উপযুক্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ রাষ্ট্র ও সমাজকে করে দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষার মিথ্যা অহমিকা শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টির পথে এক বিরাট বাধা, এজন্য কোঠারী কমিশন মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক সমাজসেবার যে প্রস্তাব করেছেন তা খুবই সময়-উপযোগী হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ একাধারে যেমন অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল, তেমনি অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক পরিবর্তন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষার মূল্যায়ন ও উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের উপরও অনেকটা নির্ভরশীল।

এদেশীয় মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে বিদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা—ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষা বিগত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নবরূপ লাভ করতে চলেছে। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশের পূর্বেই এদেশীয় মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করবার সুপারিশ করা হয়েছিল। অবশেষে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে গিয়ে এদেশে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নত দেশসমূহে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। গবেষণা লব্ধ তত্ত্বকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের বহুমুখী প্রচেষ্টার অনেক নিদর্শণ রয়েছে। তত্ত্বকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক মৌলিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ইংলণ্ড—ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিরাট বিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও দ্রুত পরিবর্তনশীল ভাবধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে পার্থক্য এই যে ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে অনেকটা প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা রূপে গড়ে উঠেছে কিন্তু ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমান সমাজের প্রয়োজন উপযোগী হয়ে উঠতে পারে নি ; তাছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার ধারণা (Concept) সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ; এবং শিক্ষা পরিশাসকদের বিশেষ মতানৈক্য রয়েছে। মুদালিয়র কমিশন যে একাদশ শ্রেণী সমন্বিত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের কথা বলেছিলেন কোঠারী কমিশন সে মত সর্বৈব সমর্থন করেন না। প্রকৃত পক্ষে নবম শ্রেণীর গোড়ার দিকে (১৪+) বয়ঃক্রমকালে শিক্ষাধারাগুলি থেকে বিশেষ ধারা নির্বাচন করা কতদূর সম্ভব, এদেশে শিক্ষা নির্দেশনা কতদূর কার্যকরী হয়েছে এবং দেশের বর্তমান প্রয়োজনে সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষা কোন্ স্তরে কতটুকু দেওয়া

উচিত এবং কতটুকু দেওয়া সম্ভব সে বিষয়ে ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে দু'প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল—(১) পুরাতন গ্রামার স্কুল এবং (২) L. E. A. দ্বারা পরিচালিত নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক মানসিক ও নৈতিক এই তিন ধরনের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার চাইতে উন্নত ও ব্যাপকতর ছিল; তবে কারিগরী বা বৃত্তিশিক্ষার কোন ব্যবস্থা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা ধীরে ধীরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে চলে আসে। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়াতে উন্নত শিক্ষার জন্য ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি করতে হয়, ফলে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বহুমুখী বিদ্যালয় ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের অনেকে ছাত্র-বেতন দিতে অসমর্থ হওয়াতে মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গবেষণার ফলস্বরূপ ডাল্টন প্ল্যান, প্রজেক্ট মেথড, শিশুকেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ও অনুবন্ধ-প্রণালীর উদ্ভব হয় এবং অনেক বিদ্যালয় এই নূতন পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে বেশ সুফল পেতে থাকে। যুদ্ধের পর ১৯১৮ খ্রীঃ **ফিসার আইন পাস** হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন বাধ্যতামূলক হয়। ভারতবর্ষেও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশের পর পরোক্ষ ভাবে শিক্ষক-শিক্ষণ বাধ্যতামূলক হয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯২৬ খ্রীঃ **হ্যাডো রিপোর্ট মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাপ্তযৌবনের শিক্ষারূপে বর্ণনা করে।** এই রিপোর্ট অনুযায়ী তিন প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। (১) **গ্রামার স্কুল**—এই সমস্ত জ্ঞানধর্মী বিদ্যালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান বা তত্ত্ব-সম্বলিত পাঠক্রম গৃহীত হয়। (২) **মডার্ণ স্কুল**—এই বিদ্যালয়গুলির বাস্তবমুখিতা প্রণিধানযোগ্য। ১১+ থেকে ১৫+ ছেলেমেয়েরা এই সমস্ত বিদ্যালয়ে বাণিজ্যমূলক ও শিল্পমূলক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করত। (৩) শিশুর চাহিদা অনুযায়ী কারিগরী ও শিল্পবিষয়ক প্রয়োগ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য নূতন ধরনের **জুনিয়ার টেকনিক্যাল ও সিনিয়র টেকনিক্যাল** বিদ্যালয় স্থাপিত হ'তে থাকে।

হ্যাডো কমিটির মতে প্রাপ্তযৌবনদের শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী না হ'লে শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অপচয় দেখা দেয়। ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষাকে বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষারূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অষ্টম শ্রেণীর পর বিভিন্নমুখী শিক্ষাধারার জন্য শিক্ষার্থীদের বাছাই করার জন্য সাধারণ পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, ও বিভিন্ন

প্রকার অভীক্ষার প্রয়োগ করা হচ্ছে। শিক্ষা নির্দেশনা ও বৃত্তি নির্দেশনার কাজও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৪১ সালে প্রকাশিত নরউড রিপোর্টে সাধারণ ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তিন শ্রেণীতে ভাগ করে তিন জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা হয়। মোটামুটি, গ্রামারস্কুলের উপযুক্ত ছাত্র হচ্ছে তত্ত্বপ্রিয় ও জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী। যারা বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি প্রয়োগমূলক পদ্ধতিতে আগ্রহী তারা টেকনিক্যাল স্কুলে এবং যারা মূর্তবস্তুতে দক্ষ তারা মডার্ন স্কুলে ভর্তি হ'লে বিশেষ উপকৃত হবে। ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুলের পাঠক্রম এদেশের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে মানবাদি বিজ্ঞান (Humanity) ও বিজ্ঞান (Science) শাখায় পড়ান হয়; মডার্ণ স্কুলে শিল্প ও বাণিজ্য (Commerce) শাখার বিষয়গুলি এবং টেকনিক্যাল স্কুল কারিগরী (Technical) বিষয়গুলি পড়ান হয়ে থাকে। কৃষি-বিজ্ঞান (Agriculture), গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান (Home Science) ও চারুকলা (Fine Arts) শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পৃথক বিদ্যালয় আছে।

ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় বর্তমানে কিছুসংখ্যক বহুমুখী বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ চলছে পরীক্ষামূলক ভাবে। এই বিদ্যালয়গুলিকে সর্বব্যাপক বিদ্যালয়, (Comprehensive School) বলা হয়ে থাকে। ভারতের বহুমুখী বিদ্যালয়ের সাথে এই বিদ্যালয়গুলির মূলগত পার্থক্য এই যে একটি শিক্ষাধারা বেছে নেবার পর অসুবিধা বোধ করলে শিক্ষার্থীকে এখানে অন্য কোন ধারা বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয় অবশ্য সেই ধারার শিক্ষাক্রম অনুসরণ করবার ক্ষমতা শিক্ষার্থীর থাকা চাই। ভারতবর্ষে সেরূপ সুযোগের বিশেষ অভাব রয়েছে।

ভারতবর্ষের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শতকরা ৯০ ভাগই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত কিন্তু ইংলণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয় L. E. A. দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত; সেইজন্য এগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা অনেক উন্নত। অপর দিকে ঘাটতি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল বলে এদেশে অধিকাংশ বিদ্যালয় পরিচালনা বিশেষ সমস্যাসঙ্কুল। তাছাড়া ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষাই শুধু অবৈতনিক নয়। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা, চিকিৎসা, মধ্যাহ্নকালীন আহার ও দুগ্ধ সরবরাহ, পরিবহণ ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়। আর ভারতে অর্থাভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা নানা প্রকার পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ। এদেশে নব-শিক্ষা প্রবর্তনের

পূর্বে এক বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নব-শিক্ষার উপযোগিতা ও উহার উৎকর্ষের বিচার সম্ভব হয়েছে।

১৯৩০ খ্রীঃ প্রগ্রেসিব এডুকেশন এসোসিয়েশন (Progressive Education Association) নব-মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োগশীলতা বিচার করবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেন। আলোচ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পুঁথিগত পাঠক্রমের পরিবর্তে কর্মভিত্তিক ও পরিবর্তনশীল পাঠক্রম গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাকে জীবনের সাথে যুক্ত করে দেবার জন্য নানাবিধ কর্ম-বিধির অনুসরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। তোতাপাখী-বুলির পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম থেকে নিজেদের রুচি মত বিষয় নির্বাচন করে ঐ বিষয়টি জানবার নানাবিধ সুযোগ দেওয়া হয়। এজন্য শিক্ষা-ভ্রমণ, গ্রন্থাগার ব্যবহার, সমবায় পদ্ধতিতে নানাবিধ কার্য সম্পাদন ইত্যাদির সুযোগ দেওয়া হয়। প্রয়োজন স্থলে সর্ব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ২০০০ হাজার শিক্ষার্থীকে সর্ব প্রকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বাছাই করে এই নিরীক্ষা চালান হয়। এদের বয়ঃসীমা ছিল ১৪+ থেকে ১৮+ ; দীর্ঘ ৪ বৎসর ধরে পরীক্ষা (Experiment) চালাবার পর দেখা যায় যে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় এইসব শিক্ষার্থীদের—(১) কোন বিষয় দ্রুত পড়ে উহা অনুধাবন করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী ; (২) স্বাধীন ভাবে কাজকরবার ক্ষমতা ও নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবার ক্ষমতাও বেশী, তা ছাড়া (৩) নূতন অবস্থায় এরা সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত এবং (৪) নূতন কর্ম সম্পাদনে বিশেষ করে সমস্যা সঙ্কুল অবস্থার মধ্যেও কৃতিত্বের সাথে কর্ম সম্পাদনে এরা তুলনামূলক ভাবে অনেকটা উন্নত। উচ্চ শিক্ষা লাভের সর্ব প্রকার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও এদের শতকরা ৫জনের বেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে নি। আমেরিকায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ যুগান্তর এসেছে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে। ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি জাতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ড হিসেবে বিচার করতে হয়, তবে শুধু কমিটি ও কমিশনের সুপারিশগুলিকে কার্যকরী করে তুললে হবে না, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিপীক্ষা চালাতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা রূপে গড়ে তোলবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বহু গবেষণা হয়েছে এবং সার্থক প্রচেষ্টা গড়ে উঠেছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কাল কোন রাজ্যে ৬ বৎসর, আবার কোন রাজ্যে ৪ বৎসর। তবে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংযোগ রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ১২ বৎসর ব্যাপী বিদ্যালয়-শিক্ষা চালু আছে। কোথাও প্রাথমিক শিক্ষা ৮ বৎসর+মাধ্যমিক শিক্ষা ৪ বৎসর ; আবার কোন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ৬ বৎসর+মাধ্যমিক শিক্ষা (৩+৩)=৬ বৎসর। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বহুমুখী। বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষকদের

যোগ্যতা, বিদ্যালয়ের অবস্থান কাল, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকার বৃত্তিমুখী শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ধারা রাজ্য (State) ভেদে ও অঞ্চলভেদে পৃথক হয়ে থাকে। মোটকথা আঞ্চলিক জনসাধারণকে মাধ্যমিক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ দেবার জন্যেই সেই অঞ্চলের শিক্ষা-পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

আমেরিকায় ইংলণ্ডের মত মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার জনসাধারণের নয়, সরকারের, এবং উহা বাধ্যতামূলক। ১৬ বৎসর পর্যন্ত ইংলণ্ডে মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কিন্তু অবৈতনিক নয়। গরীব শিক্ষার্থীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। দুঃখের বিষয় এই যে ভারতবর্ষে পাঁচ বৎসর ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে এখনও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা যায় নি। আমাদের বহুমুখী বিদ্যালয়ের আদর্শ যুক্তরাজ্যের পাব্লিক স্কুল (বহুমুখী বিদ্যালয়) থেকে লওয়া হলেও পাঠক্রম যুক্তরাজ্যের মত ব্যাপক নয়। ব্যক্তি-বৈষম্য-নীতির উপর মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু শিক্ষার্থী একটি শিক্ষাধারা বেছে নেবার পর অন্য শিক্ষাধারায় সহজে যেতে পারে না। আমেরিকার মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম পরিবর্তনশীল (Flexible) এবং সেখানকার শিক্ষার্থীরা আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের অনেক বেশী সুযোগ পায়।

আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল এর সার্বজনীন গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীভবনের নীতি। ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রাজ্য-সরকারের হলেও শিক্ষার মূলনীতি, মান নির্ণয় ও শিক্ষার কাঠামো প্রস্তুতে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শিক্ষার সর্ব স্তরেই একটা সর্ব ভারতীয় কাঠামো পরিকল্পিত হয়েছে তবে রাজ্য সরকার প্রয়োজন-মত এর সামান্য রদবদল করে নিতে পারেন।

রাশিয়া—রাশিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক। মাধ্যমিক শিক্ষাকে গত ২০।২৫ বৎসর হ'ল স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। এদেশে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কিরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়, এ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এদেশে। গবেষণার প্রয়োগমূলক দিক বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। গোর্কী কলোনীতে এ বিষয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছিল তা থেকে দেখা যায় কারুশিল্প ও সৃজন মূলক কর্মকে কেন্দ্র করে মূল শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীরা সামুদায়িক জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনা লাভ করবে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, সমাজকল্যাণ-কেন্দ্র, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, খেয়ালী সঙ্ঘ, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। এক সময় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল; আজ রাশিয়ার মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষায় পরিণত হয়েছে।

রাশিয়ায় যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে তাতে যোগদানের জন্য প্রাপ্ত-যৌবন কালেই শিক্ষার্থীর মন আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনা কার্য এখানে খুবই উন্নত তাই মাধ্যমিক শিক্ষার অপচয় নেই বললেই হয়।

এ ছাড়া জাপান, সুইডেন, ফ্রান্স, মিশর ইত্যাদি দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসীর শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধনে, বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনেও শিক্ষা নির্দেশনার প্রতি বিশেষ জোর দিতে উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলি বিশেষ আগ্রহান্বিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয় বিচার করে **কোঠারী কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা রূপে গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করেন।** শিক্ষার অর্থকরী দিকটা এদেশে এত প্রবল যে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিচার না করে বিত্তশালী ও প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা নিজেদের সন্তানদের বিজ্ঞান ও কারিগরী শাখায় ঢুকিয়ে দেবার জন্যে প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকেন। ভাল ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান ও কারিগরী শাখায় প্রবেশ করে। মানবাদি বিজ্ঞান শাখায় ভাল ছেলেমেয়েরা যেতে চায় না কারণ বি.এ., এম.এ. পাস করে ভাল চাকুরির সংস্থান হয় না। এর ফলে তত্ত্বপ্রিয় ও জ্ঞানলিপ্সু শিক্ষার্থীর সংখ্যা এ বিভাগে আর পাওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞান ও কারিগরী ছাড়া শিক্ষার অন্য বিভাগে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। ১০।১৫ বৎসর পর শাসন-বিভাগ, আইন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ এবং শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগে প্রথম শ্রেণীর পরিচালক পাওয়া দুষ্কর হবে। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের সর্বত্র যাতে সমান সুযোগ পান সেরূপ ব্যবস্থা করলে বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-নির্দেশনা সার্থক হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক শিক্ষার ধারনা বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তিত হবার কারণ কি?

২। প্রগতিশীল মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম কিরূপ হওয়া উচিত?

৩। মুদালিয়র কমিশন মাধ্যমিক স্তরে গতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন কেন? এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের বাধা কি কি?

৪। পশ্চিমবাংলার বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি কোন কোন সমস্যার-সম্মুখীন হয়েছে? কিরূপে সেগুলির প্রতিকার করা যায়।

৫। মাধ্যমিক-শিক্ষার মূল সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

৬। বিদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার তুলনা কর।

University Questions

1. Give an account of the new pattern of secondary schools in India as outlined by Secondary education commission, 1952, 58. Do you think that Multipurpose Schools will be able to improve secondary education in our country ? Give reasons for your answer. [C. U, 1968]

2. Discuss the problems conected with the recruitment, selection and training of teaching personnel for our Secondary Schools. [C. U. '64]

3. What according to you, should the aims of secondary education ? How far are these aims being realised in our system of secondary education. [C. U. '64]

4. "Secondary Education for all".- Do you suggest the view regarding education in our country ? Has anything been done in this respect in Great Britain ? [C. U. 1965]

5. If you were a dictator in Education, what would be the pattern of secondary education in the country ? [C. U. 1965]

6. The concept of secondary education in India is fast changing"— Critically examine the Statement with reference to the recognised pattern of of secondary education in you State. [C. U. 1968]

7. Write short notes on :—(any two).

(a) Control of secondary education.

(b) Need for Guidance in secondary education.

(c) In-service training of teachers. [C. U. 1968]

8. Offer your own suggestions for the recruitment of competent teaching personnel for Higher Secondary (Multipurpose) Schools in West Bengal Under the present condition. [C. U. 1968]

9. What are different needs of adolescence ? How far are they provided in our Secondary Schools ? [C. U. 1966]

10. What are the language problems of secondary education ? Discuss with special reference to school in your State. [C. U. 1966]

চতুর্থ অধ্যায়

কারিগরী, বৃত্তিমুখী ও পেশা-শিক্ষার সমস্যা এবং তার প্রতিকার

কারিগরী শিক্ষার লক্ষ্য—বৃত্তিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে কারিগরী শিক্ষা বলা হয়। কারিগরী শিক্ষার সাথে বৃত্তিশিক্ষা ও পেশামূলক শিক্ষার স্বভাবগত পার্থক্য খুব কম তবে এই তিন জাতীয় শিক্ষার পরিধি, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু এক নয়।

কারিগরী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন-সংস্থায় কর্মরত সর্ব প্রকার কর্মীর হাতেকলমে শিক্ষা (practical training) দেওয়া এবং প্রগতিশীল কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন-সংস্থার পরিকল্পনা ও তার রূপদান (Planning and execution) ; এছাড়া কৃষি, শিল্প বাণিজ্য ও যানবাহনের উন্নয়নের জন্য গবেষণাকার্য চালান এই শিক্ষা ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার এই ব্যাপক উদ্দেশ্যকে রূপদান করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া কারিগরী শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষা (General Education) এর অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে। শ্রমিকদের কারিগরী শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, অবসরবিনোদনের শিক্ষা এবং সর্বোপরি তাদের শ্রমিকসংস্থা গঠন ও তার কার্য-পরিচালন শিক্ষাকেও ব্যাপক কারিগরী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

দেশোন্নয়নে কারিগরী শিক্ষা অপরিহার্য

কারিগরী শিক্ষার পর্যায় ও সেগুলির উদ্দেশ্য :—

১। **ট্রেড-স্কুল ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণকেন্দ্র** (Trade School & Craft Centres)—এই সব প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা (Vocational Education) দেওয়া হয়। সংক্ষেপে এই শিক্ষাকে Operative Training বা বৃত্তি প্রশিক্ষণ বলা যায়। এই শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষা, অবসরযাপনের শিক্ষা ও শ্রমিকসংস্থার সংগঠনী-শিক্ষা যুক্ত হ'লে শ্রমিকদের সামগ্রিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এছাড়া দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য **নিম্ন টেকনিক্যাল স্কুল ও কারুশিল্পের উচ্চতর প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে** Junior Technical Schools and Senior Craft Schools)—উন্নত পর্যায়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে সামান্য পুঁথিগত শিক্ষা (Theoretical Approach) যে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত না করা হয় তা নয়, তবে এই স্তরে কর্মদক্ষতার প্রশিক্ষণের উপরই জোর দেওয়া হয়ে থাকে। সুদক্ষ কর্মী (Skilled labour) হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলাই এই সব শিক্ষা-

প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষা, অবসর-বিনোদনের শিক্ষা এবং শ্রমিক-সংস্থা সংগঠনের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২। **টেকনিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও পলিটেক্‌নিক্‌** (Technical Schools, Engineering Schools and Polytechnics)—এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষা ব্যাপকতা লাভ করে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভাল করে শেখান হয়। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন প্রতিষ্ঠানে এদের কর্মদক্ষতা এবং কার্যপরিচালনার ক্ষমতা বিশেষভাবে আদরণীয়। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষা যুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

৩। **ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়** (Engineerjng Colleges and Universities)—এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা এই শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিচালনা প্রশিক্ষণ (Management Training) ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সাথে যুক্ত না হ'লে কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে এদেশে প্রথম শ্রেণীর পরিচালক (Director) পাওয়া শক্ত হবে।

৪। **টেকনোলজিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট** (Technological Institute)—স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে পাঁচটি Institute of Technology প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উচ্চমানের (High standard) কারিগরী শিক্ষা ও স্নাতকোত্তর কারিগরী শিক্ষা দেবার জন্য। পূর্বে এই জাতীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের উন্নত দেশসমূহে প্রেরণ করা হতো। বর্তমানে এইসব উচ্চমানের কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কারিগরী শিক্ষার উপর বহুবিধ গবেষণা-কার্য চালান হচ্ছে। এই সমস্ত গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন-সংস্থা বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

ব্যাপক কারিগরী শিক্ষা

কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য নিম্নতম প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতম প্রতিষ্ঠানে সর্বাধুনিক পদ্ধতি ও নীতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষার ব্যাপ্তির জন্য এদেশে স্বল্প সময়ের জন্য কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (Part time In-service Training) চালু হয়েছে এবং প্রয়োজন স্থলে পুণশিক্ষণব্যবস্থা (Refresher Course) প্রবর্তন করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা-সমাপ্তিতে কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বা যানবাহন-সংস্থায় যোগদান করবার পর আর আধুনিকতম পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ থাকে না। তাই কারিগরী শিক্ষায় বিদ্যালয়-উত্তর শিক্ষাব্যবস্থার (After-School Education) সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া মিল, ফ্যাক্টরী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণের (Apprentice

Ship Training) ব্যবস্থা করা হয়েছে দক্ষ শিল্পী এবং কর্মী তৈয়ার করবার জন্য।

সাধারণ শিক্ষার (General Education) সাথে কারিগরী শিক্ষার সম্পর্ক—এদেশে কারিগরী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এদেশে এই জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত ছিল। বি. এ., এম. এ. পাস করে এদেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে। তারপর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর আরম্ভ হয় বৃত্তিশিক্ষা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষার দ্বারা চাকুরীক্ষেত্রে পদোন্নতির (Promotion) মাপকাঠি ঠিক করা হয়। অবশ্য স্বাধীনতা লাভের পর দেশী সাহেবদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা একটা গতানুগতিক ব্যাপার। পদোন্নতি এমন কি অফিসার গ্রেডের চাকুরী হয় আত্মীয় প্রতিপালন নীতির দ্বারা। ফলে প্রতিটি সংস্থায় বিশেষ করে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংস্থায় কর্মদক্ষতার দ্রুত অবনতি দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এরূপ দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত নয়, তাই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে-ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেশী এবং সংস্থা-পরিচালন-ব্যয় অত্যধিক। কারিগরী শিক্ষার উন্নতি না হ'লে আত্মীয়পোষণ-নীতি পরিত্যক্ত হ'লেও অদূর ভবিষ্যতে দেশে দ্রুত কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের উন্নতি আশা করা যায় না। কারণ এদেশে কারিগরী শিক্ষার সাথে সাধারণ শিক্ষার কোনরূপ সমন্বয় নেই। একজন ইঞ্জিনীয়ার (Engineer), কস্ট একাউণ্ট্যাণ্ট (Cost Accountant), ডাক্তার (Doctor) বা মেরিন ইঞ্জিনীয়ারের (Marine Engineer) সাধারণ শিক্ষা ইণ্টারমিডিয়েট বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত। কারিগরী শিক্ষায় খুব দক্ষতা লাভ করলেও এদেশের শিল্পসম্পদ উৎপাদন, পরিচালন ও বণ্টনের ভার যাঁদের হাতে আছে তাঁরা প্রথম শ্রেণীর শাসকের পর্যায়ভুক্ত কার্যাদি ভালরূপে সম্পাদন করতে পারেন না।

পরিচালক প্রশিক্ষণ ও কারিগরী শিক্ষা

গণতন্ত্রী দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদি বিভাগে যারা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তাঁরা সেই সমস্ত ক্ষেত্রের নেতৃত্ব করবেন। এদেশে পরিচালন প্রশিক্ষণকে (Management Training) কারিগরী শিক্ষা (Technical Education থেকে আলাদা করে দেখা হয়েছে, এর ফলে উৎপাদনের পরিকল্পনা, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদিত মালের সুষ্ঠু বণ্টন বিষয়গুলি উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যাঁরা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করছেন তাঁদের সাধারণ শিক্ষা (General Education) এবং প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ (Administrative Training) থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই তিন জাতীয় শিক্ষাকে সুসংহত করে কারিগরী শিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

প্রথম স্তরের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তারাই যারা নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাস করে বৃত্তি শিক্ষা-গ্রহণ করতে চায়। উচ্চ বুনিয়াদী ও মিডল স্কুল থেকে পাশ করে-বৃত্তি শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই স্তরের উপরের দিকে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাঠক্রমের সাধারণ শিক্ষার অংশটুকু এই সব বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করবার সুযোগ পায় সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই বিষয়গুলিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে। স্কুল ফাইন্যাল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে পাস করে শিক্ষার্থীরা কারিগরী শিক্ষার জন্য আসে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলিতে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কলেজী শিক্ষার সমগোত্রীয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। স্নাতক পর্যায়ে যেটুকু সাধারণ শিক্ষা এদের গ্রহণ করা সম্ভব তা এই পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে হবে। মাতৃভাষা, ইংরেজী, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সাধারণ-বিজ্ঞান এই পর্যায়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে বিষয়-গুলিকে ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয় রূপে গণ্য করা হবে। এরাই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মধ্যস্তরের পরিচালকের কাজ (Middle management) করে থাকেন। এদের উপর দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক পরিকল্পনার অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করে। এরাই প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রের নিয়ামক হবে। সাধারণ শিক্ষা (General Education) না থাকলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা এরা দিতে পারেন না, তাই কারিগরী শিক্ষার সাথে বাধ্যতামূলক ভাবে সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রম যুক্ত করতে হবে। তৃতীয় স্তরের শিক্ষার্থীরা দেশের কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদির উৎপাদনের (Production) নেতৃস্থানীয়। কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ শিল্প-বাণিজ্যের নীতি নির্ধারণ করেন আর মধ্যপরিচালক (Executive or Middle Management), উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning) উৎপাদিত মালের বণ্টন (Distribution), ক্রয়বিক্রয় (Marketing), কারখানা পরিচালনা (Factory Management) ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে থাকেন। পরবর্তী জীবনে এঁদের অনেকে পরিচালক (Director) পদে উন্নীত হয়ে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা পরিচালনা করে থাকেন। এই সমস্ত কারণে এই স্তরের

সাধারণ শিক্ষা কারিগরী শিক্ষার পরিপূর্বক

কারীগরী শিক্ষার সর্ব স্তরেই কমবেশী সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থাক বাঞ্ছনীয়

শিক্ষার্থীদের ভালরূপ সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন। স্নাতকশ্রেণীর সম-মানের (Graduate Standard) সাধারণ শিক্ষা এই পর্যায়ে পরিবেশন করতে হবে। চতুর্থ স্তরের শিক্ষার্থীরা কারিগরী শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ। কারিগরী শিক্ষার উপর এঁরা গবেষণা করে থাকেন। ভালরূপ সাধারণ শিক্ষা এঁদেরও থাকা বাঞ্ছনীয়। স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষার বিষয়বস্তু সংযোজিত না করলে ও চলবে।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে সর্বজনীন, আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষারূপে এদেশে চালু করতে পারলে কর্মে প্রীতি, শ্রমের মর্যাদাবোধ ও বৃত্তিশিক্ষার আগ্রহ সহজেই শিক্ষার্থীকে কারিগরী শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করবে।

কারিগরী শিক্ষায় বুনিয়াদী শিক্ষার পরোক্ষ দান

কারিগরী শিক্ষার প্রশাসনিক দিক—কারিগরী শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বৃটিশ যুগে কারিগরী শিক্ষা শিক্ষিত সমাজে অনেকটা অপাংক্তেয় ছিল। স্বদেশীযুগে দেশের নেতৃবৃন্দ সরকারকে চাপ দেন কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তন করবার জন্য। সরকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপের কর্মীদের শিক্ষানবিসির জন্য সর্বপ্রথম এদেশে কারিগরী-শিক্ষার প্রবর্তন করেন রেলবিভাগ ও টেলিগ্রাফ বিভাগের তত্ত্বাবধানে। রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে উচ্চতর কারিগরীশিক্ষা হিসেবে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার প্রবর্তন হয়। পরে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাঙ্গালোরে উচ্চতর কারিগরী-শিক্ষা চালু হয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে। প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রাদেশিক সরকার প্রত্যেক প্রদেশে ২।৪টি করে পলিটেক্‌নিক্ (Polytechnic) স্থাপন করে ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন করেন। এছাড়া সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় কিছু কৃষি-বিদ্যালয়, ট্রেড্‌স্কুল এবং কারু ও চারুশিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু নিম্নতম পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির সুপরিচালনার জন্য সরকার কোন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সংস্থা গড়ে তোলেন নি।

১৯৫৮ সালে কারিগরী-শিক্ষা পরিচালনা এসেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। এর পূর্বে কারিগরী-শিক্ষা পরিচালনা করতেন পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ বিভাগ। অনেক ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা পরিচালনায় দ্বৈত ব্যবস্থা চালু ছিল; কিছু দায়িত্ব ছিল শিক্ষা দপ্তরের হাতে, আর কিছু ছিল শিল্প দপ্তরের হাতে। কোন রাজ্যে আবার পূর্ত বিভাগের হাতে ছিল কারিগরী শিক্ষার ভার। কোথাও আবার রাজ্য সরকারের দু'তিন বিভাগ থেকে বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করা হ'ত।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর থেকে দু'টি দপ্তরের উদ্ভব হয়েছে, একটি শিক্ষা-

দপ্তর, অপরটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কার্যবিষয়ক দপ্তর। কারিগরী-শিক্ষা এসেছে দ্বিতীয় দপ্তরে। নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা-সংসদের সুপারিশ-ক্রমে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে কারিগরী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের কারিগরী শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Technical Education) ঐ রাজ্যের কারিগরী শিক্ষার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী। এ ছাড়া রাজ্য-সরকারকে কারিগরী-শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে রাজ্য-কারিগরী শিক্ষা-বোর্ড (State Boardof Technical Education) গঠিত হয়েছে। শিল্প, বাণিজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বণিক-সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এই বোর্ডের সদস্য।

কারিগরী শিক্ষার সংগঠন, পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী ; তবে কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত, মাননির্ধারণ, বিভিন্ন রাজ্যের কারিগরী শিক্ষার কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন, ইহার উন্নয়ন, উচ্চতর টেকনোলজীর প্রতিষ্ঠা ও সর্ব ভারতীয় বিশেষ ধরনের কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংগঠন ইত্যাদি কার্য নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা-সংসদের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার করে থাকেন। এই সংসদ উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এর চারিটি আঞ্চলিক সমিতির মারফৎ সমগ্র দেশের কারিগরী শিক্ষার উপর দৃষ্টি রাখেন। আঞ্চলিক সমিতিতে সেই অঞ্চলের রাজ্য সরকার, শিল্প, বাণিজ্য, শ্রমিক-সংস্থা রাজ্য-কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সদস্য হিসেবে থেকে আঞ্চলিক কারিগরী শিক্ষার সংগঠন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ-কার্যে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সহযোগিতা করে থাকেন। **কারিগরী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রস্তুত, সংগঠন, উন্নয়ন, ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে নিখিল ভারত কারীগরী শিক্ষা-সংসদের ভুমিকা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।** এই সংসদের কো-অর্ডিনেটিং কমিটি (Co-ordinating Committee) চারটি আঞ্চলিক কমিটির কার্য, সাতটি বোর্ড অফ্ টেকনিক্যাল স্টাডির কার্য এবং বোর্ড অফ্ পোস্ট গ্রাজুয়েট্ স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ-এর কার্যের সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করে থাকে। এই সংসদ একাধারে রাজ্য সরকার ও অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে সংযোগ রক্ষা করে থাকে। কারিগরী শিক্ষা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই দপ্তরটি নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা-সংসদের মারফৎ কারিগরী-শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং কারিগরী, বৃত্তিমুখী ও পেশা-শিক্ষা ব্যবস্থা—স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবার জন্য শিক্ষার যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে কারিগরী,

বৃত্তিমুখী ও পেশা-শিক্ষার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহনে দ্রুত উন্নত করতে হ'লে এই সব বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সর্ব প্রকার কর্মীর প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এজাতীয় শিক্ষার যে বিপুল আয়োজন করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক স্তরে শিল্পকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা এবং মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানবাদি বিজ্ঞান শাখা ছাড়া আর সব কয়টি শিক্ষাধারা কারিগরী, বৃত্তিমুখী ও পেশা-শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ভেবেই পরিকল্পিত হয়েছে। অবশ্য প্রশাসন, পরিচালন বিজ্ঞান, আইন-ব্যবসা ও শিক্ষকতা পেশায় মানবাদি বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের কর্মপ্রবণতা, বৌদ্ধিক ক্ষমতা এবং জীবনের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করে শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষাকে জীবনে সার্থক রূপায়ণের জন্য কারিগরী, বৃত্তিমুখী ও পেশা-শিক্ষার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

মানবশক্তি সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা :—আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মনুষ্য-সম্পদের বিশেষ অভাব নেই। অভাব আছে আর্থিক সঙ্গতি, শিক্ষিত ও নিপুণ কর্মীর এবং প্রথম শ্রেণীর সংগঠক ও পরিচালকের। এক-কথায় এদেশের মানব-শক্তির সদ্ব্যবহার তেমন হচ্ছে না; এজন্য পরপর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানবশক্তি সদ্ব্যবহারের কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। এখনও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানব-শক্তির অভাব প্রতিপদেই অনুভূত হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা হ'লে নিম্নলিখিত পর্যায়ে দেশের জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। (১) বাস্তুবিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য কাজের জন্য নিপুণ ও দক্ষ কর্মী, (২) বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হবার যোগ্য নাগরিক (৩) কৃষি-বিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত কাজের জন্য নিপুণ ও অভিজ্ঞ কর্মী, (৪) শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সমবায় সমিতির কার্য, ও সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবার যোগ্য প্রার্থী এবং সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে কাজ করার যোগ্য প্রার্থী, সর্বোপরি শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিচালক।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানব-শক্তির উপযুক্ত কর্মে নিয়োগের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। প্রতি বৎসরই মানব-শক্তির প্রয়োজন, কর্মে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি বিষয় পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য প্রতি দু' তিন বৎসর পর এই বিষয়গুলির পুনর্বিবেচনা ও পর্যালোচনা বিশেষ প্রয়োজন। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে

বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষণের ও শিক্ষা-ব্যবস্থার অগ্রাধিকার নির্ধারণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেশের অগ্রগতিকে যে সমস্ত বিষয় বাধা দিচ্ছে সেগুলিকে দ্রুত অপসারিত করতে হবে। এ বিষয়ে কারিগরী, বৃত্তিমুখী ও পেশা শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কর্মনিয়োগ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রাখতে হবে; নতুবা শিক্ষা ও কর্মনিয়োগ ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিবে। প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন কিন্তু এর পরবর্তী স্তরের শিক্ষা হবে নাগরিকদের জীবিকা-নির্বাহের তাগিদে নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য গণতন্ত্রী দেশের যোগ্য ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের কর্মপ্রবণতা, ও বৌদ্ধিক ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোন বিভাগে উচ্চতম শিক্ষা লাভ ও কর্মনিয়োগের সুযোগ পায়, সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাজে ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, টেকনিসিয়ানের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি শিক্ষক, উকিল, কেরানী ব্যবসায়ীদেরও প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের শক্তি, বুদ্ধি ও শিক্ষার যাতে অপচয় না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের কার্য সম্পাদনের জন্য বহুবিধ কাজে লোক নিযুক্ত হয়ে থাকে। বেকার-সমস্যার জন্য হাতের কাছে যে কাজ পাওয়া যায় তাতেই লোককে নিযুক্ত করা হয়। ফলে উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত লোক প্রায়ই নিয়োগ করা যায় না। এর ফল বড় বিষময়। যে কাজের যোগ্যতা লোকটির নেই বা যে কাজের প্রতি লোকটির মোটেই আগ্রহ নেই, সেই কাজ সারাজীবন ধরে সে করতে বাধ্য হয় জীবিকা-অর্জনের জন্য। ফলে লোকটির উৎপাদকতা (Productivity) থেকে দেশ বঞ্চিত হয় এবং কর্মীদের সৃজনশীল মনের অপমৃত্যু হয়।

সে যুগে এদেশে চাকুরে লোকের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। তাছাড়া শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, যানবাহন, শিক্ষা ও সমাজসেবা সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। ইংরেজ আমলের পুলিসী রাষ্ট্রের মূল কর্তব্য আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেইজন্য কিছুসংখ্যক স্কুলের শিক্ষক, সরকারী অফিসের কেরানী ও সওদাগরী অফিসের কেরানীর চাকুরী ও মিল-ফ্যাক্টরীর শ্রমিকের কাজ ছাড়া কর্মসংস্থানের বিশেষ কোন সুযোগ ছিল না। স্বাধীনতা লাভের কিছুকাল পরেই এদেশে অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই অনুপাতে চাকুরীতে ও অন্যান্য উপায়ে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ দিতে না পারলে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। সেজন্য দেশের জনবলকে উপযুক্ত কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারত সরকার গত তিনটি পরিকল্পনায় শিক্ষা সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার ফলে সকল প্রকার শিক্ষার বিশেষ প্রসার ও উন্নতি হয়েছে।

কারিগরী শিক্ষার প্রসার ৫।৬ গুণ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০ গুণের বেশী হয়েছে। যে সমস্ত কারিগরী, বৃত্তিমূলক ও স্নাতকোত্তর-শিক্ষা এদেশে দে'ওয়া হ'ত না, সে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এ কয় বৎসরের মধ্যে এদেশে সুরু হয়েছে। বর্তমানে শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন, শিক্ষা, সামরিক বিভাগ, সমাজ-সেবা, গ্রামোন্নয়ন কার্য, চিকিৎসা ও ধাত্রী-বিদ্যা ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রেই নূতন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইংরেজ আমলে চৌকিদার, ডাকপিয়ন, ডাকহরকরা, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ইত্যাদি কয়েকজন মাত্র সরকারী কর্মচারী ছিল। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে গ্রামসেবক, গ্রামসেবিকা, হেলথ এ্যাসিস্টান্ট, পশুচিকিৎসক, চিকিৎসক, ধাত্রী, প্রাথমিক শিক্ষক, মৎস্যচাষ বিভাগের লোক, পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগের লোক ইত্যাদি নূতন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।

গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার

এ সমস্ত নূতন সরকারী ও বেসরকারী কাজের জন্য যাদের নিযুক্ত করা হয়, তাদের স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পেশামূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এতে সাধারণ শিক্ষার তুলনায় পেশামূলক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার হয়েছে অনেক বেশী। শহরে ও শিল্পাঞ্চলে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহনে নূতন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার সুবিধা দেবার জন্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় অনেক প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার ত্রুটি দূর করবার জন্য একদিকে যেমন বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নানাজাতীয় ট্রেড-স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, পলিটেক্‌নিক স্থাপিত হয়েছে। চিকিৎসা, ফলিতবিজ্ঞান, বাস্তুবিজ্ঞান ও কোম্পানী পরিচালনা বিজ্ঞান সম্পর্কে ছোটবড়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত বহু মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে উন্নততর কারিগরী শিক্ষা ও পেশামূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে।

কারিগরী শিক্ষার প্রসার

নানা বিষয়ে পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা হাতের কাজের মূল্য অনেক বেশী। ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার পর সহজেই কর্মসংস্থান সম্ভব। তাছাড়া ভারত সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বেকার-সমস্যার সমাধান করতে চাহেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাধারার প্রতিটি ধাপে কর্ম-সংস্থানের সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ শিক্ষাখাতে সামান্য হ'লেও প্রতি বৎসর ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে স্ত্রীশিক্ষার খুবই প্রসার হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক

অবস্থায় প্রত্যেকটি পরিবারের প্রয়োজনেই মেয়েদের কর্ম-সংস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সমগ্র দেশের সমর্থ লোকের কর্ম-সংস্থানের পরিকল্পনা অর্থনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক পরিকল্পনার এক প্রধান অঙ্গ। ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী, তাই এদেশের প্রত্যেকটি সক্ষম ব্যক্তি যাতে স্বীয় যোগ্যতা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ পায় এবং আত্মসম্মান বজায় রেখে স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও কর্তব্যনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় থাকা চাই।

কর্মসংস্থান-পরিকল্পনা

পাঁচটি বিষয়ে ভারত সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন এই দেশের জনবলকে প্রকৃত কর্মে নিয়োগের জন্য।

(১) বাস্তুবিদ্যা (Engineering); টেকনোলজী (Technology) ও ফলিত বিজ্ঞান (Applied Science)—এই তিনটি বিষয়ের সর্বপ্রকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবন্দোবস্ত করবার জন্য সরকার খুবই সচেষ্ট। উচ্চমানের টেকনোলজি ও বিজ্ঞানের গবেষণা ৬।৭ বৎসর হ'ল এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে এবং এদিকে যোগ্য শিক্ষার্থীদের ভীড় বেড়ে গেছে। নানা জাতীয় কর্ম-সংস্থানের জন্য টেকনোলজি, পলিটেকনিক ও ট্রেড-স্কুলে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাকুরীতে বহাল থাকাকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে। এছাড়া শিল্পে, বাণিজ্যে ও যানবাহনে শিক্ষানবিসি শিক্ষার প্রচলন হয়েছে ভারতসরকারের নির্দেশে। শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের শিক্ষার জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করেছেন।

দেশোন্নয়ন কার্যে কারিগরী শিক্ষায় ভারত সরকারের পঞ্চমুখী প্রচেষ্টা

(২) কৃষি ও মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে এবং বিভিন্নপ্রকার কর্মে কর্মী নিয়োগের পূর্বে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৩) দুগ্ধ-উৎপাদন ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি পালন বিষয়ে ভারত সরকার নূতন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং বহু ছেলেমেয়ে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে দেশের খাদ্য-উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করছে।

(৪) চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা এবং পশু-চিকিৎসার ক্ষেত্র খুবই প্রসারিত হয়েছে। এর সাথে সামাজিক শিক্ষা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ বিভাগ একযোগে কাজ করছে। এই বিভাগ গ্রামদেশে কাজ করবার মত বহু কর্মীর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

(৫) শিক্ষাবিভাগের কার্য খুবই প্রসারিত ও উন্নত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষাকার্যে বহু লোক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা, কারুশিল্প শিক্ষা, চারুকলা শিক্ষা, সমাজিক শিক্ষা, বিকলাঙ্গের শিক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ

শিক্ষায় বর্তমানে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, শিল্প ও বাণিজ্যমূলক শিক্ষায় নানাপ্রকার স্বল্পস্থায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হ'লে সেই কাজটি সম্পর্কে যেমন কর্মীর আগ্রহ থাকা দরকার, তেমনি তার কর্মোপযোগী প্রশিক্ষণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। এমন কি বর্তমানে বিদ্যালয়ে ও গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষার মহাবিদ্যালয়ে গৃহসজ্জা, ঘরকন্না, সন্তান প্রতিপালন, সুখাদ্য প্রস্তুত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অনেকে এইসব বিষয় শিক্ষা করে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ করে নিচ্ছেন। এ ছাড়া ভারত সরকার উন্নত দেশসমূহের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে উন্নত ধরনের কারিগরী শিক্ষায় দেশবাসীকে কর্মক্ষম করে শিল্পের উৎপাদকতা বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করতে সাহায্য করছেন।

পেশা-শিক্ষার ব্যাপকতা—অগাধ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া আর সকলকে যে কোন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করতে হয়। শুধু শিক্ষার জন্য শিক্ষা, বা নিজেকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করে তোলবার জন্য শিক্ষার যুগ শেষ হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যের কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। বস্তু-সভ্যতার যুগে যে-কোন বৃত্তি বা পেশা-গ্রহণের পূর্বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে; কারণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে স্বীয় মানসিক ক্ষমতা ও কর্মপ্রবণতা অনুযায়ী যে কোন নাগরিক স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে যে কোন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই বৃত্তি-শিক্ষা ও পেশা-শিক্ষার গোড়ায় রয়েছে কারিগরী শিক্ষা, আর শেষ পর্যায়ে রয়েছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ও পুনশিক্ষণ ব্যবস্থা।

কারিগরী-শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা—প্রাচীন কালে কারিগরী-শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুদক্ষ কারিগর ও শিল্পীদের কাছে গিয়ে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করত। তৎকালে প্রত্যেকটি গ্রামই ছিল শিল্পসম্ভার ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেকেই জাতিগত বৃত্তি ও ব্যবসায়কে উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হতেন। আজকালকার মত সে যুগে মাধ্যমিক শিক্ষা এমন কি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে বৃত্তি নির্বাচন ব্যাপারে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকেরা নিজের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বলে যে কোন বৃত্তিকে উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার সুযোগ পাচ্ছেন, কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারছেন খুব কম ভারতবাসী। এর কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে এবং কর্মবিনিয়োগ-

প্রাচীন কালের বৃত্তিশিক্ষা

ক্ষেত্রে বিত্তশালী ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন; জনসাধারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে সরকারী প্রচেষ্টায় কিছু শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়। অবশ্য স্বদেশীযুগে বেসরকারী প্রচেষ্টায় ছোট বড় কারখানা, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স ইত্যাদি দ্রুত প্রসার লাভ করে। এই সময় ভারতের জাতীয় জীবনে ভাব ও কর্মের জোয়ার আসে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এদেশের সাধারণ শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী-শিক্ষা, পেশা-শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান। প্রত্যেক প্রকার শিক্ষার একটি সুসংহত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ থাকা উচিত। তছাড়া প্রত্যেক-প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা সুপরিচালনার জন্য পৃথক এবং দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান থাকা বাঞ্ছনীয়।

স্বদেশী শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষা

বৃত্তিশিক্ষা—বর্তমানে দেশে উপযুক্ত বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে কৃষির উপর জনসংখ্যার বেশ চাপ পড়েছে। এদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন। গত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল্যাণে শতকরা ৮০ জনের ১৫।২০ জন শহরে ও শিল্পাঞ্চলে এসে কর্মের সংস্থান করতে পেরেছে। বাকী শতকরা ৬০।৬৫ জন চাষী মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। জমিতে সার ও জলসেচের অভাবে জমির উৎপাদকতা কমে গিয়েছে। সেজন্যে বৎসরে ৩।৪ মাসের বেশী চাষীদের কাজ জোটে না। এদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হ'লে সহ-উপজীবিকা হিসাবে কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

সহ-উপজীবিকার প্রয়োজন

কারিগরী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও এই দুই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক্রম ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। এর সর্ব ভারতীয় কাঠামো গঠন ও এই জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার সময় এ জাতীয় শিক্ষার বর্তমান সমস্যাগুলির বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন পরিচালনায় বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রয়োগ করে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন পরিচালনার উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করান আর বৃত্তিমূলক ও পেশামূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বিশেষ বৃত্তি বা পেশা সম্পর্কে জ্ঞান ও কৌশল অর্জন। বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠক্রম একটু ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন শ্রমিক একটি ট্রেডে বেশ ভাল করতে পারলেও অপর ট্রেড না জানায় অনেক সময় বেকার হয়ে পড়ে। একই জাতীয় ট্রেডের সাধারণ ধারণা দেওয়ার পর বিশেষ ট্রেড সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করার

কারিগরী শিক্ষা, পেশামূলক শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষা

সুযোগ দিলে কর্মীর বেকারত্বের ভয় কম থাকে এবং সহজেই সে সুদক্ষ কর্মী হয়ে ওঠে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) Trade School-এর শিক্ষা, (২) Senior Craft Training School-এর শিক্ষা, এবং (৩) Rural Universityতে Vocational Training.

বৃত্তিশিক্ষার তিনটি পর্যায়

ট্রেড-স্কুলগুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে শিল্পকেন্দ্রে ও মহকুমায় এমন কি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে সরকারের হাতে। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার পর অথবা উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা ট্রেড-স্কুলে ভর্তি হবে। গরীব ও ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির (Scholarship) ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষা দপ্তর থেকে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর অভিজ্ঞান দেওয়া হবে।

উচ্চতর কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা থাকবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন সংস্থার হাতে। সরকার থেকে হাতখরচ (stipend) দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের। পরীক্ষা গ্রহণ করবেন শিক্ষা দপ্তর। প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যাবার পর কোন কারখানায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ এক বৎসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবিসি করতে হবে। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীদের পুনর্শিক্ষণে প্রেরণ করবে। তারপর এদের যোগ্যতার পরিমাপ করে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। উচ্চ বুনিয়াদী বা মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষা দেবার পর শিক্ষার্থীরা এই সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হ'তে পারবে। উচ্চতর পেশা-শিক্ষা পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীন। এছাড়া উন্নত শ্রেণীর পেশা-শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, পেশা-সংস্থানসমূহ (Professional Institutes) ও পেশা-শিক্ষাদানের জাতীয় পেশা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের উপর।

বৃত্তিশিক্ষায় মহিলাদের ঝোঁক—স্বাধীনতা লাভের পর স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি খুব দ্রুত হয়। বর্তমানে মহিলারা পুরুষের সাথে সমান তালে বৃত্তিমূলক ও পেশামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছেন। বর্তমানে সরকারী দপ্তরের উচ্চপদেও মহিলারা নিযুক্ত হচ্ছেন। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার গৃহীত হবার পর গণতন্ত্রী ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের সমান রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এখন মহিলারা শুধু কুলবধূ নন, তাঁরা পুরুষের পাশে সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী।

ভারতে প্রগতিশীল নারী

বর্তমানে ভারতবর্ষে **মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য পাঁচ প্রকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে।** এইসব প্রতিষ্ঠানের কতকগুলিতে শুধু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আবার কতকগুলিতে প্রশিক্ষণের সাথে কাজেও লওয়া হয়।

এগুলি হচ্ছে :—

(১) মহিলা সমিতির দ্বারা পরিচালিত কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান বা সমবায় প্রথায় পরিচালিত কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও কর্ম-সংস্থান কেন্দ্র ; (২) শিক্ষা-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার নারীশিক্ষার শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ; (৩) মিল বা ফ্যাক্টরী-সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কল্যাণ-কেন্দ্রে মেয়েদের বৃত্তি-মূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কেন্দ্র ; (৪) শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন কেন্দ্রে চাকুরী লাভের পূর্বে typing, stenography, telephone operation ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার জন্য ছোট-বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এবং (৫) ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং কারিগরী, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষালাভের জন্য মেয়েদের পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা সহ-শিক্ষামূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

বিশেষ বৃত্তি-শিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্রে প্রশিক্ষণের অবস্থা—এদেশের বৃত্তিশিক্ষার ইতিহাস খুব গৌরবোজ্জ্বল নয়, কারণ ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে এদেশে কুটিরশিল্পগুলি বিদেশী সরকারের নীতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বৃত্তিগুলির ধ্বংসের পর বৃত্তিজীবিরা চাষ-আবাদ করে জীবিকা-নির্বাহ করতে থাকে।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের শিল্প-প্রচেষ্টা খুবই উন্নত হয় এবং গত ১৫ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ যুগের তুলনায় প্রায় ৪ গুণ শ্রমিক কারখানায় যোগদান করবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক কারখানায় বৃত্তি-শিক্ষায় পারদর্শী শ্রমিকের বিশেষ অভাব অনুভূত হয়। সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় **নিম্নলিখিত উপায়ে বৃত্তি-শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।**

(১) প্রত্যেক কারখানায় বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিসি শিক্ষার প্রবর্তন এবং শিক্ষানবিসদের বৃত্তিশিক্ষার জন্য সর্ববিধ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

(২) টেকনিক্যাল স্কুল ও পলিটেকনিকগুলিতে উন্নতশ্রেণীর বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৩) নানাপ্রকার কুটিরশিল্প ও গৃহশিল্প শিক্ষা দেবার জন্য সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও বে-সরকারী বহু প্রতিষ্ঠান দিনের পর দিন গড়ে উঠছে।

(৪) কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দুগ্ধসরবরাহ, যানবাহন ইত্যাদির বিষয়ে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত কর্মী (worker) তৈয়ার করবার জন্য অনেক জুনিয়ার টেক্নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে।

(৫) এছাড়া প্রত্যেক শিল্প বাণিজ্য কৃষি ও যানবাহন সংস্থায় নিজ নিজ শ্রমিকদের বৃত্তিশিক্ষার জন্য কারখানাতে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোম্পানীর নিজ তত্ত্বাবধানে এবং নিজের খরচায় অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বিভাগ (Training Dept.) স্থাপন করে থাকেন। কোম্পানীর সর্ব নিম্নস্তরের

ট্রেড ট্রেনিং সব কিছুই কোম্পানীর এই বিভাগ পরিচালনা করে থাকে। ভারত সরকার T. W. I. ট্রেনিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শ্রমিক-শিক্ষক ও তদারকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এই কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞেরা কোম্পানীর অনুরোধে কারখানায় গিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করে যারা দক্ষ শ্রমিক হতে চায় তারা ট্রেড-স্কুলে ভর্তি হতে পারে। ট্রেড-স্কুলগুলি সরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও বে-সরকারী পর্যায়ভুক্ত। অনেক ট্রেড-স্কুলে প্রশিক্ষণরত সরকার শিক্ষার্থীদের থেকে ভাতা দেওয়া হয়। শ্রমিক শিক্ষা কেন্দ্রে (Workers' Education Centre) শ্রমিকদের কারিগরী বা বৃত্তিশিক্ষা তেমন দেওয়া হয় না কিন্তু শ্রমিকসংহতি সম্পর্কে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ চলে। ভারত সরকারের নির্দেশে বড় বড় কারখানায় শিক্ষানবিশী শিক্ষা চালু হয়েছে। এখন উহা কারখানার পক্ষে বাধ্যতামুলক।

কারুশিল্পের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা—ইংরেজ সরকার নিজের দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য এদেশের কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করেছিল এক দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে। তাদের এই পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত হবার পর এদেশের কুটিরশিল্প সম্পর্কে শিক্ষা দেবার লোকের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। মিল ও ফ্যাক্টরীর প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেও কিছু কিছু উন্নত ধরনের শিল্প বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত কোনরূপে টিঁকে ছিল। গত দু'টি অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশীয় কুটিরশিল্প পুনর্জীবন লাভ করে। ইতিপুর্বে স্বদেশী যুগে কুটিরশিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সুরু হয়। কিন্তু গত ৬০ বৎসর ধরে পরাধীন ভারতে কুটিরশিল্পের পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা চলা সত্ত্বেও এদেশে উহা তেমন সার্থক হয়ে উঠেনি ; কারণ—

(১) শিল্পপতিরা কুটিরশিল্পে অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করতে চান না। (২) কুটিরশিল্পশিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিল্পী-শিক্ষকের নিতান্ত অভাব। (৩) কুটিরশিল্প পরিচালনা করবার নূতন টেক্‌নিক (Technique) সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার লোক নেই বললেই চলে। (৪) কুটিরশিল্পের বাজার খুব ভাল নয় তাই কুটিরশিল্পের উৎপাদিত মাল ১ম শ্রেণীর না হ'লে ঐগুলি বিক্রয় হতে চায় না। (৫) কুটিরশিল্পকে আধুনিক শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা যায়নি।

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস গান্ধীজী-প্রবর্তিত গ্রাম সংগঠনকার্য বেতনভুক্ কর্মীদের হাতে দিয়ে কংগ্রেসকর্মীরা আইনসভার সদস্য, মন্ত্রী ও অন্যান্য পদাধিকারের চেষ্টায় ব্যস্ত। বেতনভুক্ কর্মীরা তাদের কর্তব্যে বিশেষ শৈথিল্যের ভাব দেখাচ্ছেন এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে আশার কথা এই যে ভারত সরকার খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ড, হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট বোর্ড, ইত্যাদি গঠন করেছেন। কুটিরশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারও

দেশীয় কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য নানাপ্রকার রাজ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের শিক্ষার প্রসার হতে পারে কৃষক ও কৃষকপত্নীদের মধ্যে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে। কৃষক ও কৃষক-পত্নীদের মধ্যে একটা স্থূল জাতীয় হস্তশিল্পের শিক্ষার প্রসার হতে পারে আর সূক্ষ্ম হস্তশিল্প শিক্ষা করে মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মহিলারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। তারা হস্তশিল্প উৎপাদনকেন্দ্রে কাজ করতে পারেন অথবা বিদ্যালয়ে ক্রাফ্‌ট-শিক্ষিকার কাজ করবার যোগত্যা লাভ করতে পারেন।

কুটিরশিল্পের উন্নতিমূলক শিক্ষা

ক্রাফ্‌ট-শিক্ষকদের আধুনিকতম ক্রাফ্‌ট ট্রেনিং-এর সাথে পরিচিত করিয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এদেশে ক্রাফ্‌ট ট্রেনিং বিশেষ উন্নত নয়। দেশের কুটিরশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির—সুঠাম সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই শিক্ষাকে উন্নততর গবেষণার সাথে যুক্ত করতে হবে। আশার কথা এই যে, ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের বিদেশে বেশ চাহিদা আছে। এই শিল্পের সুব্যবস্থা ও কর্মীদের সুশিক্ষায় উন্নত করতে পারলে ভারত এই জাতীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয় করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আয় করতে পারে। শিল্পের প্রসার ও বিদেশ থেকে খাদ্য ও সার আমদানীর জন্য প্রচুর বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন। দেশের শিক্ষিত মহিলা ও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করতে পারেন সেজন্য সরকার ও শিল্পপতিদের দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সাথে উৎপাদনকেন্দ্রের সংযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কেন্দ্রে যারা শিক্ষা দেবেন তাদের সামাজিক মর্যাদা ও বেতন ভাল হওয়া চাই। ক্রাফ্‌ট শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয়-উত্তর শিক্ষা (Further education) ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই শিক্ষা রিফ্রেসার কোর্সের সমগোত্রীয় হবে। এখানে ক্রাফ্‌ট শিক্ষকেরা আধুনিকতম পদ্ধতি, টেক্‌নিক্‌, ক্ষুদ্র যন্ত্রের ব্যবহার, শক্তির (Power) ব্যবহার, মাল বিক্রয়ের কলাকৌশল, উৎপাদকতা (Productivity) ইত্যাদি সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মহিলারা নিজেদের রুচিমত হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে কিছু রোজগার করতে পারেন আবার অবসর সময় কোন প্রকার শিল্পকার্যে নিয়োগ করে অবসরের সদ্ব্যবহারও করতে পারেন। চারুশিল্প, নার্সিং, শিশুপালন, কারুশিল্প ও বাণিজ্যিক শিল্পে মহিলাদের একটা স্বাভাবিক রুচি আছে। শিক্ষিত মহিলাদের রুচিসম্মত কাজ ও রুচিসম্মত কার্যস্থলের (Work place) ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক উৎপাদনকেন্দ্রে ভদ্রঘরের মহিলারা

কুটিরশিল্প ও হস্ত-শিল্পের প্রশিক্ষণ

কার্যে যোগ দিতে পারেন। স্বল্পকালীন কর্মব্যবস্থা (Part time work) চালু করতে পারলে উৎপাদকতা বাড়বে, অপরদিকে পারিবারিক জীবনেও কোন প্রকার অশান্তি দেখা দেবে না।

শ্রমিক শিক্ষা ও শিল্পের উন্নয়ন—ভারতবর্ষ পৃথিবীর গণতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। গণতন্ত্রের শক্তি নির্ভর করে নাগরিকদের নাগরিকতা-বোধ, শিক্ষা, উপজীবিকা এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় নাগরিকদের দানের উপর। এদেশে শতকরা ৮০ জন কৃষক ও ১৫ জন শ্রমিক। শ্রমিক ও কৃষকদের নাগরিকতা শিক্ষা দেওয়া, নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা সরকারের অবশ্য করণীয়। এই কর্তব্য পালনের জন্য ভারত সরকার শ্রমিক-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে আঞ্চলিক শ্রমিক-শিক্ষাকেন্দ্র সমগ্র রাজ্যের শ্রমিক-শিক্ষণকে পরিচালিত করে থাকে।

শ্রমিক কল্যাণমূলক, উৎপাদন ও উৎপাদকতা বৃদ্ধির উপর এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবার-পরিকল্পনার উপর নির্মিত বহু চলচ্চিত্র এই সমস্ত কেন্দ্র থেকে দেখান হয় প্রতি কারখানায়। তা ছাড়া শ্রমিকদের সংঘ-সমিতি গড়ে তোলা, নেতৃত্ব বৃত্তির চর্চা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা ইত্যাদির উপরও এই সমস্ত প্রশিক্ষণকেন্দ্রে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এখন কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। দেশের শান্তি ও প্রগতি রক্ষার জন্য এবং শ্রমিক-আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত করবার জন্য শ্রমিক-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এদেশে এখনও সুষ্ঠু শ্রমিক-সংঘ আন্দোলন (Good Trade Union Movement) গড়ে উঠতে পারেনি কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপুরক হিসেবে কাজ করে আসছে। ভারত সরকার একটি শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চান। এই শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন উন্নত শ্রেণীর শ্রমিক সংস্থা (Trade Union) গড়ে তুলতে সমর্থ হবে। উন্নত শ্রমিক-সংস্থা দেশের উৎপাদন ও উৎপাদকতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণে সমর্থ হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে এগিয়ে আসবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান-বৃদ্ধির (Standard of Leving) কার্যে শ্রমিক-সংঘ সক্রিয় সহযোগিতা করতে সমর্থ হবে।

পরিচালক-প্রশিক্ষণ—পরিচালক-প্রশিক্ষণ (Management Training) কথাটি আমাদের দেশে নূতন। শুধু এদেশে কেন বিদেশেও পরিচালক প্রশিক্ষণ গত কয়েক বৎসর হ'ল আরম্ভ হয়েছে। পরিচালকদের আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—(ক) শাসনকার্য পরিচালক বা শাসনকর্তা (Administrator), (খ) বে-সরকারী শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালক

(Director),—এবং (গ) সরকারী শিল্পবাণিজ্য-সংস্থার পরিচালক (Director or Controller).

শাসনকর্তার কাজের সাথে শিল্প-ব্যবসায়ের পরিচালকের কাজের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি এক জাতীয় হ'লেও কার্য-পরিচালনা-পদ্ধতি অনেকটা আলাদা। আবার বে-সরকারী শিল্পবাণিজ্য-সংস্থার পরিচালক এবং সরকারী শিল্পবাণিজ্য-সংস্থার পরিচালকদের কাজের রীতি এক প্রকার হ'লেও দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরিচালন-পদ্ধতির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া সামরিক বিভাগের পরিচালকবর্গের (Commanders) দায়িত্ব, কর্তব্য ও পরিচালন-পদ্ধতি বে-সামরিক প্রতিষ্ঠানের চাইতে অনেকটা পৃথক। তবে যে-কোন অবস্থায় পরিচালকদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ চিন্তা করতে হয় এবং উপযুক্ত সময়ে পরিচালনা-পদ্ধতি নিয়মমত প্রয়োগ করতে হয়।

(১) কাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ (Responsibility & Sense of Duty). (২) পরিকল্পনা-গ্রহণ ও উহা কার্যে রূপায়ণ (Planning & Execution). (৩) কার্যবিভাগ ও দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া (Division of Work and Deligation of Power). (৪) কার্য-তদারক ও নিয়ন্ত্রণ (Supervision & Control). (৫) কর্তব্য-নির্ধারণ (Decision making). (৬) সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা (Co-ordination in a Company or Organisation).

প্রত্যেক পরিচালককে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। মেধাবী, কর্মঠ ও অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সুপরিচালক হওয়া কঠিন নয়, যদি যে কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ও ক্ষমতা থাকে। তবে অন্যান্য কাজের মত পরিচালকের কাজও শিক্ষণ-সাপেক্ষ।

শিল্পবাণিজ্য পরিচালনায় জটিলতা বৃদ্ধি

পূর্বে রাজার ছেলে যেমন রাজার সিংহাসন লাভ করত, তেমনি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ছেলেরা পৈতৃক প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক হতে পারতেন। এখন মালিকানা পুত্র কন্যা-দেরই আছে, তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য এত জটিল আকার ধারণ করেছে যে বিশেষ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া সেই বিভাগ পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্য বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার পরিচালক শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এরা হচ্ছেন—(১) কারিগরী পরিচালক (Technical Director), (২) সাধারণ পরিচালক (General Manager), (৩) ব্যক্তি পরিচালক (Personnel Manager), (৪) মালপত্র পরিচালক (Material Manager), (৫) হিসাব নিয়ামক (Controller

of Accounts), (৬) অর্থ নিয়ামক (Financial Controller), এবং (৭) শিক্ষণ পরিচালক (Training Manager), ইত্যাদি।

এইসব পরিচালকদের সাধারণ পরিচালনা (General Administration) সম্বন্ধে শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না। বিশেষ বিষয় পরিচালনা করবার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরিচালকের থাকা চাই। মালিকের পুত্র-কন্যাদের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষণ ছাড়া পরিচালক হওয়ার বিশেষ বাধা আছে। আর বিশেষ বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্র এত ব্যাপক ও জটিল যে, একজনের পক্ষে সব দিক সামলিয়ে চলা অসম্ভব। মুখ্য পরিচালক (Managing Director) বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিভাগের পরিচালনায় অভিজ্ঞব্যক্তিদের ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিবেচনা করে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদিগকে পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করেন। এঁদের পরামর্শমত তিনি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকেন। এতেও অনেক ত্রুটি আছে। পরামর্শ-দাতাগণ নিজেরা পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না বলে বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকদের মত তাঁরা কৃতিত্ব দেখাতে পারেন না, আবার একটা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি রক্ষার জন্য মুখ্য পরিচালকের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। তাই একজন মুখ্য পরিচালকের নেতৃত্বে বিভাগীয় পরিচালকগণ স্বাধীনভাবে যদি নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনা করতে পারেন, তবে পরিচালন-কার্যটি খুবই সুন্দর ও কার্যকরী (effective) হয়। উপযুক্ত শিক্ষণ ছাড়া ইহা সম্ভব নয়। তবে পরিচালন-শিক্ষণ বিষয়টির শিক্ষণ-পদ্ধতি হবে সম্মেলন-পদ্ধতি, (Conference method) কেসস্টাডি পদ্ধতি (Case study method) ও ওয়ার্কসপ্ পদ্ধতি (Workshop method)। এছাড়া এজাতীয় **শিক্ষণে পুঁথিগত শিক্ষার চাইতে হাতেকলমে শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।**

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

পরিচালকদের তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা—(১) সিনিয়র ম্যানেজার (Senior Managers), (২) জুনিয়র ম্যানেজার (Junior Managers or Executives) এবং, (৩) কার্যতদারককারী (Supervisors).

১ম শ্রেণীর পরিচালকগণ মুখ্য পরিচালকের নিকট থেকে বিশেষ বিষয় পরিচালনার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা তিনি স্বাধীনভাবে করে যেতে পারেন, শুধু বিশেষ বিষয়ে পরামর্শের জন্য তিনি পরিচালকদের সম্মেলনে যোগদান করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকেরা প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশেষ কার্য পরিচালনা করে যান। তাঁরা তাঁদের কাজের জন্য ১ম শ্রেণীর পরিচালকদের কাছে দায়ী। তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালক প্রকৃতপক্ষে পরিচালক-পর্যায়ভুক্ত নহেন, তবে শ্রমিকদের সাথে এদের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। এঁদের মারফত পরিচালকবর্গ কোম্পানীর নীতি ও নির্দেশ শ্রমিকদের নিকট পৌঁছে দেন।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কার্যত[illegible]দের ভূমিকা

এই তৃতীয় পর্যায়ের পরিচালকদের উপর কোম্পানীর উন্নতি বা অবনতি অনেকটা নির্ভর করে। কোন কোম্পানীর উৎপাদকতা বৃদ্ধির জন্য পরিচালদের মূলতঃ নির্ভর করতে হয় কার্যতদারককারীদের (Supervisors) উপর। কোম্পানীর বা সরকারের যে কোন কাজ এদের সাহায্য ছাড়া হওয়া অসম্ভব। নিজেদের কর্মক্ষেত্রে এরা নেতার ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রমিকদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা, শ্রমিককল্যাণ-কার্য, শ্রমিকদের উৎপাদকতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যে সুপারভাইজারগণ পরিচালকদের পরিপূরক হিসেবে কার্য করে থাকেন।

পরিচালন-শিক্ষণ ও উৎপাদকতা—দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন, শিক্ষা এবং সমাজসেবামূলক যে কোন কার্যের উৎকর্ষতা নির্ভর করে কার্যটির উৎপাদকতার উপর। শিল্পের উৎপাদকতা বৃদ্ধির উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল বলে ভারতসরকার জাতীয় উৎপাদকতা পরিষদ (National Productivity Council) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারখানায় ও কৃষিখামারে উৎপাদকতা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদকতামূলক সার্ভে ও উহার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদকতার কৌশলগুলি প্রয়োগের ব্যবস্থা এই পরিষদ করে থাকেন। উন্নত স্তরের কারিগরী শিক্ষার পরিচালন বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ এবং আধুনিকতম টেকনোলজির প্রয়োগের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ে ভারতবর্ষকে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে বলে উৎপাদকতার বিষয়ে গবেষণার উপর জাতীয় সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রম—কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রম গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পাঠক্রম নির্মাণকারীরা কয়েকটি মূল নীতিকে অনুসরণ করেছেন দেশের বর্তমান চাহিদা মেটাবার জন্য। এদেশে দক্ষ শ্রমিক ও কুশলী কারিগরের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। কারিগরী শিক্ষার প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলা এর জন্য বিশেষ দায়ী। ক্ষেতমজুর জমির অভাবে সহরে ও শিল্পাঞ্চলে এসে শিল্প-শ্রমিক হয়েছে শতকরা ৯০ জন, আর বাকী শতকরা ১০ জন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে অথবা বেকার জীবনের অবসান করবার জন্য শিল্প-শ্রমিক পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। তাই শ্রমিকদের সাধারণ শিক্ষার মান খুবই কম। যে-সমস্ত সম্প্রদায়ের অবদানে এদেশে কুটিরশিল্প চরম উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল বিদেশী বণিক-সরকারের শিল্পনীতি ও শ্রমনীতির ফলে তাদের বংশগত কৃতিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছে। সেজন্য কারিগরী শিক্ষাকে সমুন্নত করতে হ'লে এর পাঠক্রম নিম্নতমপর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিক করতে হবে এবং দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের চাহিদা অনুসারে পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে। তবে এক-একটি পর্যায়ের শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা চাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার শেষের দিকে শিক্ষাকে করে তুলতে হবে কারিগরীভিত্তিক, বৃত্তিমুখী বা পেশামুখী। বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং কারিগরী শিক্ষার স্নাতকপর্যায় পর্যন্ত মানবাদি বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অংশ কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রমভুক্ত হবে। চারিটি স্তরের পাঠক্রম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল।

১ম স্তর—নিম্ন কারিগরী বিদ্যালয়, বহুমুখী বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষাধারা ও ট্রেড-স্কুলে দক্ষ শ্রমিকের প্রশিক্ষণ—এই তিন জাতীয় শিক্ষার পাঠ্যসূচী একটু পৃথক হ'লেও মূল বিষয় একই আছে। পদার্থবিদ্যা, রাসায়নবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র, প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং ড্রইং ও ওয়ার্কশপে হাতেকলমে কিছু উৎপাদন করতে শেখা। ট্রেড-স্কুলে ও আই. টি. আই. (Industrial Training Institute) গুলিতে ৫০টির বেশী ট্রেড (Trade) শেখাবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্য দু'টি শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করা হয়।

২য় স্তর—পলিটেকনিকে ৩ বৎসরের ডিপ্লোমা-কোর্স। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের প্রকৃষ্ট ধারণা ও উহাদের ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের সুযোগ, প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং ড্রইং, ইঞ্জিনীয়ারিং-সার্ভে ও ওয়ার্কশপে হাতেকলমে উৎপাদনমূলক কাজশিক্ষা এই স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বৎসর সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য একজাতীয় পাঠ্যসূচী আর শেষের দু'বৎসর বিশেষ শিক্ষার জন্য বিষয় নির্বাচন করবার সুযোগ দেওয়া আছে। বর্তমানে এই স্তরে স্নাতক পর্যায়ের বিষয়গুলির সহজতর পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তাগিদে কারিগর তৈরীর জন্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে, তারই উন্নততর পাঠক্রম এই স্তরের শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করা উচিত ; কারণ কার্যক্ষেত্রে গিয়ে ডিপ্লোমাধারী তদারককারীগণ (Supervisors) শ্রমিকদের কার্য ভালরূপ তদারক করতে পারেন না। এতে একদিকে শ্রমিক ও অন্যদিকে উর্ধতন ফোরম্যান বা সেকশন-অফিসার উভয়েরই কৃপার পাত্র হয়ে পড়েন।

৩য় স্তর—স্নাতক পর্যায়ের জন্য ৫ বৎসর ব্যাপী পাঠক্রম নির্ধারিত হয়েছে। প্রথম দু'বৎসর সমস্ত বিভাগের শিক্ষার্থীরা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র মানবাদি-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ড্রইং ও ওয়ার্কশপে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার ব্যবহারিক দিকের শিক্ষা লাভ করে থাকে। তৃতীয় বৎসরে নির্বাচিত বিশেষ বিষয় শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। চতুর্থ বৎসরে ঐ বিষয়ের উৎপাদনের (Production) দিক, ডিজাইনের (Design) দিক বা গবেষণার (Resesach) দিক বেছে নিতে হয়। এই ভাবে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের সুযোগ দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচনের সুযোগ দিয়ে শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলা হয়। বর্তমানে

ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ক্ষেত্র খুবই প্রসারিত হয়েছে। দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনে নূতন নূতন বিষয় এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে।

৫ম স্তর—পূর্বে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টেকনোলজিতে শিক্ষা লাভ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু বর্তমানে পাঁচটি টেকনোলজি ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। এই স্তরের পাঠক্রম এখনও উন্নত দেশের সমমান-সমন্বিত হয়নি, তবে এই স্তরের দ্রুত উন্নয়নের পরিচয় কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে আশার বাণী বহন করে।

কারিগরী শিক্ষার উপর উন্নতধরনের গবেষণা একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষা বিজ্ঞানের এই শাখার উন্নয়ন, নবায়ন ও প্রসার খুবই বেশী, অথচ এদেশে এ বিষয়ে গবেষণা-কার্যের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সরকার, শিল্পপতি ও শিক্ষাবিদ্‌দের এবিষয়ে অগ্রণী হ'তে হবে।

কারীগরী শিক্ষার পদ্ধতি—কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজন অনুরূপ বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে। ট্রেড-স্কুল ও শিক্ষানবিসী পর্যায়ে বিশেষ ট্রেড ও বিশেষ রকম কাজের হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয় শিল্পকার্যে উৎপাদনে রত অন্যান্য কর্মীর সাথে। একটি বিশেষ ট্রেডে পারদর্শী করবার জন্য কর্মীদের উহা অনুসরণ করান হয় গভীর নিষ্ঠাসহকারে। প্রয়োজন-মত তত্ত্বমূলক বিষয় সহজে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কর্মীর নিরাপত্তা ও কর্মস্থলের নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তা ছাড়া কারখানার সাধারণ আইনকানুন ও শ্রমিকসংস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা শিক্ষার্থীদের দিয়ে দিতে হবে আলোচনার মাধ্যমে। এই সমস্ত শ্রমিকদের I. T. I.-তে কারিগরী শিক্ষার তত্ত্বমূলক বিষয় শ্রেণীগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষার্থীরা আসে উচ্চ বুনিয়াদী বা জুনিয়ার হাইস্কুল থেকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয় শ্রেণীগত শিক্ষা-পদ্ধতিতে, তবে বিদ্যালয় সংলগ্ন ওয়ার্কশপে বা কৃষি-খামারে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ করে কাজটি শিখে নেবার জন্যে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। উচ্চতর কারিগরী বিদ্যালয় ও উচ্চতর শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তত্ত্বমূলক বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, তাছাড়া শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কোন কার্যক্রম (Programme of Work or Project) হাতে নিয়ে উহা সম্পন্ন করবার পর রিপোর্ট পেশ করে থাকে। এই স্তরে প্রজেক্টের বিষয় আলোচনা করবার সময় ওয়ার্কশপ-পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। পলিটেকনিকের পাঠক্রম ৩ বৎসর ব্যাপী। এই দীর্ঘ সময়ের শতকরা ৬০% ভাগ হাতেকলমে শিক্ষা ও ৪০%ভাগ শ্রেণীগত শিক্ষায় ব্যয়িত হওয়া উচিত-কিন্তু এদেশে শতকরা ৭৫% ভাগ তত্ত্বমূলক আলোচনায় ও ২৫% ভাগ

হাতেকলমে শিক্ষায় ব্যয়িত হয়। প্রজেক্টের আলোচনা অনেক সময় ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। তবে শিল্পসংস্থার পরিচালন, শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং কারখানায় ও খামারে শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়গুলি সম্মেলন-পদ্ধতিতে আলোচিত হয়। পলিটেকনিকের ওয়ার্কশপ ছাড়া নিকটবর্তী শিল্পসংস্থায় শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণের কিছু ব্যবস্থাও করা হয়। বিদেশে এই জাতীয় প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও ডিপ্লোমা দেবার পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে ৬ মাস ঐ জাতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা শিক্ষার্থীরা কর্মস্থলে গিয়ে ৬ মাস বা এক বৎসর কারখানার উৎপাদনাত্মক কাজে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হয় না। ৬ মাস বা ১ বৎসর প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের ভাতা শিল্পসংস্থা ও সরকার যুক্তভাবে দিতে পারেন। এর পরবর্তী পর্যায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিতবিজ্ঞান-শাখা এবং টেকনোলজির শিক্ষা-ব্যবস্থা। এদেশে এইসব প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বমূলক বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। তাছাড়া সারাবৎসর ধরে নানাপ্রকার পরীক্ষার চাপে ও বাড়ীর কাজের চাপে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত থাকে। বর্তমানে কারিগরী বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানে ভাল সুযোগ থাকায় বিত্তশালী ও সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির ছেলেরা এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহী। এদের শতকরা ৩০জনের এজাতীয় শিক্ষার যোগ্যতা নেই, ফলে পাস-করা ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে অনেকেই বৃত্তিমূলক যোগ্যতার অধিকারী হতে পারেন না। এদের পাস করাতে গিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার মান বেশ নেমে গিয়েছে। দেশ অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহনের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। সেজন্য উন্নতিশীল দেশগুলিকে কারিগরী শিক্ষায় বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজিতে উন্নততর ও আধুনিকতম শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

কারিগরী শিক্ষার প্রসারে বাধা—এদেশে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় পাশ্চাত্য আদর্শে উচ্চশিক্ষার কাঠামো; তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করে। কারিগরী শিক্ষা-ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে সবার পর। তাছাড়া কারিগরী শিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা এদেশবাসী উপলব্ধি করেছে গত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সময়। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে শিল্পের প্রসার হওয়াতে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষার প্রসার এই উন্নয়নের পথে বিশেষ সহায়ক। সত্যকথা বলতে কি ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় কারিগরী শিক্ষার প্রসার হয়েছে অভাবিত। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে কারিগরী শিক্ষা-প্রসারের নিম্নলিখিত বাধা এখনও রয়ে গিয়েছে—

(১) কারিগরী শিক্ষার পাঠ্যসূচী এখনও উন্নত দেশগুলির সমমানযুক্ত হয়নি।

(২) কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বেতন দেওয়া হয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান তার চেয়ে অনেক বেশী বেতন দিয়ে থাকেন। তাছাড়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে চাকুরির শর্ত খুব ভাল নয়।

কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এখন শতকরা ৫০টি শিক্ষকের পদ খালি আছে। তবে সম্প্রতি শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি করে এবং কলিকাতা, করাচী, খড়গপুর, মাদ্রাজ ও পুনায় কারিগরী শিক্ষক ও অধ্যাপকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কিছুসংখ্যক শিক্ষক পাওয়া গিয়েছে।

এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবার মত উপযুক্ত লোকের অভাব রয়েছে। কারণ সকলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে মোটা মাইনের চাকুরি সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন। কারিগরী শিক্ষা লাভ করে, বিশেষতঃ ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় পাস করে কেহ শিক্ষকতা করতে আগ্রহী হবেন এ যেন একটা অসম্ভব কথা। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদির সামগ্রিক উন্নয়ণের জন্য উচ্চশ্রেণীর কারিগরী শিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক-সম্প্রদায়ই যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল নিয়ামক। তাই কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য হাজার হাজার ইঞ্জিনীয়ারকে কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষক, অধ্যাপক ও অনুদেশকারী (Instructor) যাতে স্বাভাবিকভাবে প্রশিক্ষণকার্যে আগ্রহী হন তার জন্য সর্ব স্তরের কারিগরী শিক্ষকদের বেতন, ভাতা ও চাকুরি অন্যান্য শর্ত তুলনামূক ভাবে আকর্ষণীয় করতে হবে। সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কর্মচারীরা যেরূপ বেতন ও ভাতা পাচ্ছেন, এদেরও সেরূপ সুযোগ দিতে হবে। এ ছাড়া বাসগৃহ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকলে স্বভাবতই ইঞ্জিনীয়ারগণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছেড়ে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা সরকারী শিল্প-সংস্থায় যোগদান করতে উৎসাহিত হবেন। যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের একাগ্রতা, কর্মপ্রবণতা ও সৃজনশীল কর্মতৎপরতার বিশেষ প্রয়োজন। সর্ব স্তরের কারিগরী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হবে কারিগরী শিক্ষায় গভীর জ্ঞানের অনুশীলন, হাতেকলমে কাজের উৎকর্ষতা লাভ এবং শিল্পসংস্থায় উৎপাদনমূলক কাজে সক্রিয় অংশ-গ্রহণ। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাদর্শন ইত্যাদিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীরা পলিটেকনিকে ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাঠ দিতে অভ্যস্ত হবেন। প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ারদের শিল্প প্রধান দেশসমূহে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনতে হবে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, পলিটেকনিক ও দক্ষকর্মী-প্রশিক্ষণকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন-অতিরিক্ত কিছু বেশী

সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া উচিত। এই ব্যবস্থা চালু হ'লে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষকের অভাব অনেকটা দূর হবে।

(৩) কারিগরী শিক্ষার মাধ্যম এখনও ইংরেজী, কিন্তু জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল বা ট্রেড-স্কুলের ছেলেরা মাতৃভাষা ছাড়া কোন জিনিস ভালভাবে বুঝতে পারে না। অথচ সরকার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে না। নিম্ন-পর্যায়ের কারিগরী শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কারিগরী বিদ্যালয়ের সাথে ভাল ওয়ার্কশপ (workshop) নেই। এর ফলে কারিগরী বিদ্যার ব্যবহারিক দিকটা ছাত্রদের ভাল করে জানা থাকে না। কার্যক্ষেত্রে এসে আবার প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করে কারিগরী শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উন্নয়ন করা যেতে পারে।

(৪) পুর্বে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পুর্ণ সহযোগিতা ছিল না। বর্তমানে এর প্রশাসনিক দিক খানিকটা উন্নত হয়েছে।

কারিগরী শিক্ষার বড় ত্রুটি এই যে এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাধারণ-জ্ঞান বেশ কম থাকে। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলির মত কারিগরী শিক্ষার সাথে সাধারণ জ্ঞানের অনুশীলন ও মানবাদি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বাস্তুকার ও তত্ত্বাবধায়কগণ যাতে উপযুক্ত নেতৃত্ব নিয়ে দেশের শিল্প প্রচেষ্টাকে সমুন্নত করতে পারে সেরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। **কারিগরী শিক্ষার উন্নয়ণের জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।**

(১) বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চবুনিয়াদী শিক্ষার কাঠামোর সাথে কারিগরী শিক্ষাকে সুসংহতরূপে স্থাপন করতে হবে। ৮ম শ্রেণীর পর যাতে ট্রেড-স্কুল বা জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলে ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা রাখতে হবে। সুদক্ষ কর্মী গড়ে তোলাই হবে এইসব প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে যাতে পলিটেক্‌নিকে অথবা ফ্যাক্টরীতে শিক্ষানবিস হিসেবে প্রবেশ করা যায়, সরকারকে সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব প্রতিষ্ঠানে হাতেকলমে কাজ শিক্ষার উপর যেমন জোর দেওয়া হবে তেমনি শ্রমিক পরিচালনা, কারখানা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হবে।

(৩) উচ্চতর টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপনাকে বাস্তবমুখী করতে হবে এবং শ্রম, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকার্য চালাতে হবে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সমস্যা—স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের উন্নয়নমূলক

অনেক কাজের মধ্যে হাত দিয়েছেন। প্রাকৃতিক সম্পদ ও মনুষ্য-সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা এবং দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এই পরিকল্পনাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল।

পরিকল্পনা গ্রহণের পর দুটি বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এইদু'টি সমস্যার সমাধান মানেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মূল পরীক্ষায় (Acid test) উত্তীর্ণ হওয়া। **সমস্যা দু'টি** সর্বজন পরিচিত এবং ভারতের প্রতিটি পরিবারই এ সমস্যায় জর্জরিত। এদের **একটি হ'লো বেকার সমস্যা** আর অপরটি **হ'লো উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সেই প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত কার্যে নিয়োগ।** আমরা জানি সমস্যা দুইটি মূলতঃ একই সমস্যার দু'টি দিক।

বেকার-সমস্যার তিনটি ধাপ: (১) সম্পূর্ণ বেকার—যারা কাজের যোগ্যতা না থাকাতে কোন প্রকার কার্যে নিযুক্ত হননি বা হ'তে পারেননি। (২) শিক্ষিত বেকার—যাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেও কোন প্রকার উপযুক্ত কাজ পাচ্ছেন না। (৩) যাঁরা সারা বৎসর কাজ পাচ্ছেন না—বৎসরের কয়েকমাস কাজ আর বাকী সময় বেকার হয়ে বসে থাকছেন। অথবা যোগ্যতার তুলনায় কম বেতনের কাজে নিযুক্ত আছেন।

এই তিন জাতীয় বেকারের কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তবে কোন প্রকার প্রশিক্ষণ দিয়ে কোন কাজের যোগ্য করে তোলবার পূর্বে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তির সঠিক পরিসংখ্যান নিতে হবে। কোন্ বিষয়ে কোন্ কাজে কতদিনের জন্য কত লোকের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে পরিসংখ্যান নেই বলে যেদিকে সহজে কাজ জুটে যায় বা বেশী বেতন পাওয়া যায় সেই জাতীয় শিক্ষার দিকেই ছেলেমেয়েদের ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ শেষ হবার পরে অনেক সময় সে জাতীয় কাজের জন্য লোকের চাহিদা আর থাকে না। কোন ট্রেড বা কোন কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা করে বা প্রশিক্ষণ নিয়ে সেরূপ কার্যে নিয়োজিত হ'তে না পারলে সেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়; অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপচয় হয়।

বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা

শিক্ষা বিভাগ ও প্রশিক্ষণ-সংস্থার সাথে কর্মবিনিয়োগ-কেন্দ্রের Employment Exchange ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। উপযুক্ত লোকের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান করতে হলে Employment Market Research এবং Vocational Counselling & Guidance বিভাগ খুলতে

হবে Ministry of Employment and Training-এর পরিচালনায়। প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে Educational & Vocational Guidance কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। Employment Bureau এবং প্রত্যেক Technical Institute-এ Apprentice-ship Bureau স্থাপন করতে হবে। ভারত সরকার কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য যে Apprenticeship Scheme প্রবর্তন করেছেন তা কার্যে পরিণত হ'লে ট্রেনিং ও কর্মসংস্থানের মধ্যে দৃঢ়যোগ-সূত্র স্থাপিত হবে। এইরূপ Apprenticeship Scheme বাণিজ্য শিক্ষা, যানবাহন ইত্যাদি Ministry-এর কর্ম-নির্দেশে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। চাকুরিতে বহাল হবার পর আরও বেশী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিল্প, বাণিজ্য, যানবাহন, পুলিস বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ (In-service Training) প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। স্কুল-কলেজের বিদ্যার অনেক অংশ কার্যক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োগ করা যায় না। বিশেষ কাজের জন্য যেরূপ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) বিশেষ কর্মের নিম্নতম যোগ্যতা ও সেই কর্মকে জীবিকা হিসেবে নেবার প্রবণতা (aptitude) ও মনোভাব (attitude) থাকা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ প্রশিক্ষণ নিতে হবে কর্মে নিযুক্ত হবার পূর্বে। (২) কর্মে বিশেষ সাফল্য ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিষয়টি ভাল করে জানতে হবে, করতে হবে ও বুঝতে হবে। এজন্য In-service Training ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। এগুলি বর্তমানে প্রচলিত বিভাগীয় (Departmental) পরীক্ষার মত হ'লে চলবে না; এ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ যাতে কর্মীর যোগ্যতা বৃদ্ধি করে, সেভাবে পরিচালিত করতে হবে।

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন

যারা বৎসরের কিছু সময় কাজ পায় না অথচ অল্প সময়ের জন্য স্থান ত্যাগ করতে পারে না তাদের জন্য সহ-পেশার (Co-profession)-প্রশিক্ষণ দিতে হবে। চাষীকে কুটিরশিল্প শিক্ষা দিলে চাষী under-employment-এর হাত থেকে মুক্তি পাবে। শিক্ষকেরা Journalism, Fine Art, বই লেখা ইত্যাদি কাজ শিক্ষা করলে ও ঐ সমস্ত কাজ সংগ্রহ করতে পারলে তাঁদের under-employment-জনিত কষ্টের খানিকটা লাঘব হবে। যারা unskilled শ্রমিক তাদের skilled worker তৈরী করবার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের যে শ্রেণীর কর্মে লোক নিয়োগের সম্ভাবনা বেশী, ছেলেমেয়েদের সেই দিকে নির্দেশ দিতে হবে।

কারিগরী শিক্ষার উন্নতির পথে যে বাধা আছে তাকে চারটি দিক থেকে আলোচনা করা যায়—

(১) **কারিগরী শিক্ষা পরিশাসন।** [পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে]

(২) কারিগরী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অভাব।

(৩) ছাত্রনির্বাচন, চাকুরীসংস্থান ও চাকুরীতে থাকাকালীন শিক্ষা।

(৪) কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রম শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পদ্ধতি। (পৃথকভাবে আলোচিত),

কারিগরী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অভাব—শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়—(১) পরিচালক (Directors or Departmental Heads) (২) পরিদর্শক (Supervisors, Foremen Inspectors etc.) (৩) শ্রমিক (Skilled and Unskilled Labour).

প্রথম শ্রেণীর লোকেরা টেক্‌নিক্যাল কলেজ বা ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অফ্‌ টেক্‌নলজি থেকে ডিগ্রী লাভ করে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পুর্বে এসব মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের পলিটেকনিক থেকে পাস করে বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসি করে যোগ্যতা অর্জন করে। প্রয়োজনের তুলনায় পলিটেকনিকের সংখ্যা খুবই অল্প। তা ছাড়া শিক্ষানবিসি করতে ভদ্রঘরের ছেলেরা প্রায়ই যেত না। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা শিল্পে নিযুক্ত হবার পর কারখানায় প্রশিক্ষণ পেত। এদের জন্য কোন ট্রেড-স্কুল বা জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রায় ছিল না বললেই হয়। বর্তমানে কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা পুর্বের তুলনায় ৪ গুণের বেশী হয়েছে এবং প্রত্যেক মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রদের আসন-সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। পলিটেকনিকের সংখ্যা প্রয়োজন অনুপাতে তেমন বাড়েনি। ট্রেড-স্কুল ও জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সংখ্যা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় এখনও অনেক কম।

ছাত্র-নির্বাচন ও চাকুরি-সংস্থান ইত্যাদি—পুর্বে টেকনিক্যাল লাইনে কেউ বড় একটা আসতে চাইতো না, কাজেই অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রশ্ন উঠতো না, কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল্যাণে কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সহজেই চাকুরি-সংস্থান হয় বলে এবং অন্যান্য উপজীবিকা থেকে বেশী রোজগার হয় বলে ভাল ছেলেরা, অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা পর্যন্ত, কারিগরী মহাবিদ্যালয়ে, পলিটেকনিকে এমনকি ট্রেড-স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন করে। এত বেশী আবেদনপত্র পাওয়া যায় যে শিক্ষার্থী বাছাই করা রীতিমত শক্ত ব্যাপার। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলের উপর নির্ভর না করে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তিমূলক পরীক্ষা (Admission Test) ও নির্বাচনী সাক্ষাৎকারের (Interview) ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বৃত্তি নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করবার জন্য শিক্ষাসম্পর্কিত নির্দেশনা কেন্দ্র (Educational and Vocational Guidance Centre) খুলেছেন, এদেশে মনোবিজ্ঞানসম্মত অভীক্ষা (Psychological Test) প্রবর্তিত হয়েছে এবং ছাত্র নির্বাচনে এগুলি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

কারিগরী বিভার দিকে ঝোঁক (Mechanical aptitude) দেখে দক্ষ শ্রমিকের প্রশিক্ষণে ভর্তি করান যায় কিন্তু স্নাতকপর্যায়ে বাস্তুবিজ্ঞানের শ্রেণীতে ভর্তি করবার সময় উচ্চশ্রেণীর মানসিক ক্ষমতার কথা বিবেচনা করতে হয়।

কারিগরী শিক্ষার আর্থিক দিক—শিক্ষার আর্থিক দিক আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে এদেশে সরকারপক্ষ থেকে মাথাপিছু কত সামান্য অর্থ শিক্ষার জন্যে ব্যয় করা হয়। কারিগরী শিক্ষা খরচবহুল। ইংরেজ আমলে কারিগরী শিক্ষাখাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী প্রচেষ্টায় এজাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১৬ কোটি, ৪০ কোটি ও ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে। রাজ্য সরকারগুলি খরচ করেছে এর প্রায় অর্ধেক টাকা আর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান করেছে এর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থ। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারসমূহ ও বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি কিছু অর্থ ব্যয় করেন কারিগরী শিক্ষার উপর গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কারিগরী শিক্ষার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কারিগরী শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু মূল সমস্যা এই যে সর্ব স্তরের কারিগরী শিক্ষার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গৃহ, পরীক্ষণাগার, ওয়ার্কশপ, গ্রন্থাগার ইত্যাদির নির্মাণ এবং শিক্ষা-উপকরণ ও ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও গ্রন্থাগারের জন্য দামী বিদেশী গ্রন্থ ক্রয় করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যন্ত্রপাতির শতকরা ৩০ ভাগ এখনও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়; তার উপর ঐগুলির দর গত কয়েক বৎসরে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশী মুদ্রার অভাবে পুস্তক ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বিশেষ সমস্যার বিষয়।

এছাড়া গবেষক, পরিচালক, (Director) অধ্যাপক, শিক্ষক ও অনুদেশকারীদের (Instructors) বর্ধিত হারে বেতন দিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের ভাতা (Allowance), জলপানি (Scholarship) ও হাতখরচ (Stipend) বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ও শিক্ষকদের গৃহনির্মাণের জন্যও অর্থ চাই। আবার প্রয়োজন-অনুরূপ অর্থব্যয় করতে না পারলে কারিগরী শিক্ষার উন্নয়ন অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে কথা উল্লেখ না করলে ত্রুটি থেকে যাবে। ভারতের উন্নত কারিগরী শিক্ষার জন্য শতকরা ২০ ভাগ অর্থ এসেছে বিদেশী সাহায্য হিসেবে। ঐ সমস্ত দেশ শিক্ষক, পুঁথি পুস্তক, যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন আর এক হাজারে বেশী শিক্ষার্থীর

প্রশিক্ষণ ব্যয় বহন করে কারিগরী শিক্ষার ব্যয়ের বড় একটি অংশের দায়িত্ব নিয়েছেন।

কারিগরী শিক্ষায় অনুন্নয়ন ও অপচয়—কারিগরী শিক্ষার মত ব্যয়বহুল শিক্ষায় অপচয়ের পরিমাণ দেশবাসীকে ভাবিয়ে তোলে। শতকরা ২০ জন শিক্ষার্থী ৮ বৎসরের পূর্বে স্নাতক-পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করতে সমর্থ হয় না, এর কারণ এই সব প্রতিষ্ঠানে নানা পাকচক্রে অযোগ্য শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পায়। বেতন কম বলে এবং ইঞ্জিনীয়ার-শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির আশা সীমাবদ্ধ বলে সর্ব স্তরের কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষকের বিশেষ অভাব রয়েছে, ফলে শিক্ষার মান উন্নয়ন করিতে গিয়ে শিক্ষায় অনুন্নয়নের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শতকরা ১০/১৫ জন শিক্ষার্থী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। ফলে অনুন্নয়নের সাথে অপচয়ের মাত্রাও বেড়ে যায়। এছাড়া এদেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সীমাবদ্ধ হওয়াতে যে কাজ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা করতে পারে পাস করা ইঞ্জিনীয়ারগণ বেকার জীবনের অবসান ঘটার জন্য সেই কাজে নিযুক্ত আছেন। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত মানবশক্তির প্রকৃত অপচয় হচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ শেষ করে অনেক শিক্ষার্থী ৩।৪ বৎসর বেকার হয়ে বসে আছে। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে কারিগরী শিক্ষায় অনুন্নয়ন ও আচয়ের মাত্রা কমাবার চেষ্টা করতে হবে।

কৃষিবৃত্তি শিক্ষা (Agricultural education)—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। সিন্ধুগাঙ্গেয় উপত্যকায় নদীমাতৃক সভ্যতার দান ভারতবর্ষের দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। উর্বর ভারতভূমিতে খাদ্যশস্য ও অর্থবিনিময়যোগ্য কৃষিজাত সম্পদ প্রচুর উৎপন্ন হ'ত। কিন্তু গত কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষিজাত সম্পদ তেমন উৎপন্ন হয়নি, তার উপর অনিয়মিত লোকসংখ্যাবৃদ্ধিতে ও মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় দেশে খাদ্যাভাব ও অন্যান্য কৃষিজাত সম্পদের অভাব জাতীয় অর্থনীতিকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর ততটা দেওয়া হয়নি; বিশেষতঃ **কৃষিবৃত্তিশিক্ষা ও কৃষির উপর গবেষণায় মোটেই নজর দেওয়া হয়নি** পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালে কৃষি কলেজের সংখ্যা ছিল ১৭, ১৯৬৪-৬৫ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৬, স্নাতকের সংখ্যা ১০০০ থেকে ৪৫০০ হয়েছে। স্নাতক পর্যায়ের পশুচিকিৎসক ছিলেন ২২০, এদের সংখ্যা এখন হাজারের উপর। এ ছাড়া দুগ্ধ-প্রতিষ্ঠান, বনবিভাগ ও সমবায় বিভাগে নানাপ্রকার প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করা হয়েছে পল্লী-অঞ্চলে বহু

কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে কৃষিকর্মরত চাষীদের প্রশিক্ষণের জন্য। আকাশবাণীর কৃষিকথার আসর কৃষিশিক্ষায় বিশেষ অংশগ্রহণ করছে। মাধ্যমিক স্তরে নবম শ্রেণীর পর শিক্ষার্থীরা কৃষিশাখা (Stream on Agriculture) বেছে নিয়ে কৃষিশিক্ষা লাভ করতে পারে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় কৃষি-বিদ্যালয় ও কৃষিশাখা সমন্বিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, পূর্বপাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কৃষিবৃত্তি শিক্ষায় প্রশিক্ষণের জন্য আরও ৩০০ প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে গ্রামসেবক, পঞ্চায়েত-কর্মী ও সমবায় কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান গবেষণা-কেন্দ্রের (The Indian Council of Agricultural Research) পুনর্গঠনের পর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ, কৃষিকার্যের জমি-উন্নয়ন, দেশের জল-সম্পদের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, সার-উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রে সারের প্রয়োগ, শঙ্কর-শস্যের উপর গবেষণা, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদকতা বৃদ্ধি ও কৃষিজাতপণ্যের বহির্বাণিজ্য বিষয়ে নানাপ্রকার গবেষণাকার্য আরম্ভ হয়েছে। কৃষির উপর পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং সমবায়-পদ্ধতিতে চাষের প্রবর্তন ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাস্তুবিজ্ঞান বৃত্তিশিক্ষা (Engineering education)—ইঞ্জিনীয়ারদের পেশামূলক শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার প্রসার অন্যান্য স্তরের তুলনায় বেশী হয়েছে কারণ সরকারী পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করা এবং বে-সরকারী ও সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য বহু ইঞ্জিনীয়ার কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-বিজ্ঞান বিভাগে এরা শিক্ষা লাভের ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন। ইন্‌স্টিটিউশন্ অফ্ ইঞ্জিনীয়ারস্ (Institution of Engineers) এবং এই জাতীয় অনেকগুলি সংস্থা ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য পেশামুলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। যারা ছাত্রজীবনে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সুযোগ পান নি. তারা এই সমস্ত পেশা মূলক প্রতিষ্ঠানের সভ্য-তালিকাভুক্ত হয়ে পেশামূলক যোগ্যতা লাভ করতে পারেন। স্নাতক-পর্যায়ের বাস্তুকারের তুলনায় প্রাক্‌স্নাতক-পর্যায়ের বাস্তুকারদের প্রয়োজন বেশী। তাই অনেক ক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ারদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে হচ্ছে শিক্ষনবিসি ইঞ্জিনীয়ার অথবা তদারককারী হিসেবে। বাস্তুকার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চাহিদাভিত্তিক করে তুলতে হবে এবং চাকুরিতে যোগদানের পর স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ও কর্মরত অবস্থায় শিল্পকেন্দ্রেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে পেশার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্যে। শ্রমিক শিক্ষাকে উন্নত ও কুশলীকর্মী শিক্ষাকে প্রশিক্ষণযুক্ত করতে হবে।

কুশলী কর্মীদের শিক্ষার জন্য ৬১-৬২ সালে ৩৫৭টি শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র ছিল, ১৯৬৫-৬৬ সালে এগুলির সংখ্যা হয়েছে ৪৭০টি। চতুর্থ পরিকল্পনায় এগুলির সংখ্যা কিছু বাড়ানো হবে এবং পুরাতন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজন অনুরূপ আসন-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। এইসব কুশলী কর্মীদের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সাতটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে সেগুলিতে আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। শিক্ষানবিসি পরিকল্পনায় এখন ২৬০০০ শিক্ষার্থী সুযোগ পাচ্ছে চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে ৮০,০০০ কর্মীকে এই সুযোগ দেবার কথা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে যাতে দ্বিগুণ হয় এবং সরকারী ও বে-সরকারী শিল্পসংস্থা যাতে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন, ডিজাইন ও পরিচালন-ব্যবস্থার উপর গবেষণা কার্য চালিয়ে কারিগরী শিক্ষার উন্নয়ণের পথ নির্দেশ দেন সেরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিদেশে যে সব ভারতীয় কুশলীকর্মী (Skiled waker), ইঞ্জিনীয়ার ও শিল্পপরিচালক আছেন তাদের স্বদেশে নিয়ে এসে উপযুক্তভাবে শিল্প সংস্থায় ও গবেষণা কার্যে নিয়োগ করতে হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান বৃত্তিশিক্ষা (Medical education)—প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশেষ উন্নত ছিল। ভেষজবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসা উভয় বিষয় এদেশ থেকে বিদেশে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ইংরেজরা এদেশে নিয়ে এসেছেন। গত ১০০ বৎসরের মধ্যে এই বিজ্ঞানের প্রভূত প্রসার ও উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ বিশেষ উন্নত। কিন্তু এই গরীব দেশের রোগীর সংখ্যা যেমন বেশী, উন্নত দেশগুলির সাথে তুলনামুলকভাবে চিকিৎসক, ধাত্রী, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ইত্যাদির সংখ্যাও তেমনি কম। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালে পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ছিল ৩০ এবং প্রতি ৫৮০০ জন অধিবাসীর জন্য মাত্র একজন ডাক্তার ছিলেন। ১৯৭৫-৭৬ সালে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৮৭ এবং ৩৫০০ জন অধিবাসীর জন্য একজন ডাক্তারের সেবা যাতে পাওয়া যায় সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া জনস্বাস্থ্য বিভাগের সম্প্রসারণ, ধাত্রীবিদ্যার জন্য ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন; স্বাস্থ্য-পরিদর্শক, কম্পাউণ্ডার ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মীদের জন্য স্বল্পকালীন ও চাকুরিতে থাকাকালীন নানাপ্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়ন ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন এজাতীয় শিক্ষার আলোচনায় উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভেষজ বিজ্ঞানের উপর মৌলিক গবেষণা এবং শল্য চিকিৎসার নানাপ্রকার উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ

এদেশের রোগীদের কাছে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের আশা বহন করে নিয়ে আসছে।

আইনবৃত্তি শিক্ষা—(Legal Education)—ইংরেজরাজত্বের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হবার পর এদেশে আইনশিক্ষা বিশেষ উন্নত হয়। দেশের প্রতিভাবান ছেলেরা সেযুগে আইন পড়তে আগ্রহী হ'তেন সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সচ্ছলতা লাভের জন্য। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, টেক্‌নিশিয়ান এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আর্থিক সাচ্ছল্য ও সামাজিক মর্যাদা আইনজীবীদের চেয়ে বেশী ; তাই প্রথমশ্রেণী ছেলেমেয়েরা আর আইনব্যবসার প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু দেশের আইনশিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন এই মনোভাবের দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও ব্যাহত হয় নি। শ্রমিক আইন, আয়কর আইন, বিক্রয়কর আইন, বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ইত্যাদি বিষয়ে যাঁরা পারদর্শিতা লাভ করেছেন, তাঁদের আর্থিক প্রাচুর্য আছে। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সাথে এ্যাটর্নীদের কাজের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

শিক্ষকতা পেশা-শিক্ষা (Educations)—এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায় ও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে শিক্ষকতা পেশার প্রশিক্ষণের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

চারু ও কারুকলা বৃত্তিশিক্ষা (Art & Craft Education)—প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চারু ও কারুশিল্পের জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল কিন্তু ইংরেজ সরকারের বণিক-নীতির ফলে এদেশের শিল্প-শিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হয়েছে স্বদেশী যুগ থেকে। গান্ধীজীর শ্রীনিকেতনে ভারতীয় কারুশিল্প ও শান্তিনিকেতনে চারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তনে চারু ও কারুশিল্পের সাধনা নূতন করে আরম্ভ হয়। প্রত্যেক রাজ্যেই এক বা একাধিক স্নাতক পর্যায়ের চারুশিল্প মহাবিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত আর্ট-স্কুল, ক্রাফ্‌ট্‌-স্কুল, আর্ট-কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে চারু ও কারুশিল্পের চর্চা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রভারতী ও বিশ্বভারতীতে নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। বহুমুখী বিদ্যালয়ে চারুকলা (Fine Art) শাখার প্রবর্তন করে এ জাতীয় শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রাফ্‌ট্‌ ট্রেনিং সেণ্টারে (Craft Training Centre) কারুশিল্প-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ-বোর্ড গ্রামের শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

পশুপক্ষীপালন শিক্ষা—হাঁসমুরগীর চাষ, গরু, ছাগল ও মহিষ ইত্যাদির প্রতিপালন ভারতীয় চাষীদের সহ-উপজীবিকা। বর্তমানে সরকারী ও

বে-সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পশুপক্ষীপালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মাছের চাষ, মৌমাছির চাষ ইত্যাদির প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। এবিষয়ে সরকারের ও জনসাধারণের আরও নজর দেওয়া উচিত।

অন্যান্য বৃত্তি-শিক্ষা—পল্লীগ্রামে পিতার পেশা পুত্র অনেক ক্ষেত্রেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু সহরে ক্ষৌরকার, ধোপা, মুচি, মেথর ইত্যাদির কাজের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই কাজগুলি সম্পন্ন করবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

চতুর্থ পঞ্চাশিকী পরিকল্পনায়—কারিগরী শিক্ষা, পেশা-শিক্ষা ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকারের মূল নীতি স্বীকৃত হ'লেও পরিকল্পনার বিস্তৃত কাঠামো এখনও গৃহীত হয়নি।

অনুশীলনী

১। কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশের প্রয়োজন অনুরূপ হয় নি কেন?

২। মানব-শক্তির সদ্ব্যবহারের সাথে কারীগরী শিক্ষার সম্পর্ক কি?

৩। বর্তমানে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রতি ভারতীয় মহিলাদের আগ্রহ বেশী কেন?

৪। শ্রমিক শিক্ষার সাথে বৃত্তিমুখী শিক্ষার সংযোগ থাকার প্রয়োজন আছে কি?

৫। কারিগরী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের পথে বাধা কি?

৬। কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত কেন?

৭। কৃষি, বাস্তুকার ও চিকিৎসা বিষয়ে পেশাশিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৮। কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রমে মানবাদি-বিজ্ঞান বিষয়টি যুক্ত করার যুক্তি প্রদর্শন কর।

৯। কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১০। কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক ধারণা কি? কিরূপে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব।

University Questions

1. What, according to you, is the aim of technical education? How does it differ from the aim of general education? Fully discuss the question. [C. U. 1968]

2. What according to you, should be the aims of technical education? How is it related to general education? [C. U. 1967]

3. How far are these aims being realised in the present day technical institutions? [C. U. 1965]

4. Give a brief account of technical education in West Bengal from the Junior Stage up to the University level. [C. U. 1965]

5. Give a history of technical education in this state with reference to different types of institutions. [C. U. 1966]

6. What are different types of agricultural institutions in the country? How do they cater this national need? [C. U. 1966]

7. At present there is a dearth of qualified teachers for technical institutions. Discuss how the position may be improved? [C. U. 1966]

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা-সমস্যা ও তার প্রতিকার

প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশু—জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থ ও কর্মক্ষম হ'লে এগুলি ব্যবহার উপযোগী হয়। মানসিক ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় বুদ্ধিদীপ্ত কাজে, প্রক্ষোভের সুপরিচালনায় ও ব্যক্তিত্বের সংগঠনে। কোন কারণে কোন শিশু যদি এই ক্ষমতার অধিকারী হ'তে না পারে অথবা ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তবে সে প্রতিবন্ধী শিশুর পর্যায়ে পড়ে। অঙ্গের বিকৃতি সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে অনেক শিশুকে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পথে বিশেষভাবে বাধা দেয়। এই সমস্ত শিশুদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

প্রতিবন্ধের কারণ – মানসিক ও দৈহিক কারণে পৃথকভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হ'তে পারে, আবার মানসিক ও দৈহিক কারণ যুগ্মভাবে বর্তমান থাকতে পারে। কারণগুলি আবার জন্মগত হ'তে পারে আবার উহা জন্মের পরও ঘটতে পারে। জন্মগত শারীরিক ত্রুটির মধ্যে দেখা যায় অন্ধ, বধির, বোবা ও বিকলাঙ্গ শিশুর জীবনে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা। ক্ষীণবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধি জন্মগত মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু। জন্মের পরও অনেকে অন্ধ, বধির ও বিকলাঙ্গ হ'তে পারে কোন দুর্ঘটনা থেকে। প্রক্ষোভমূলক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় জন্মের পর বিভিন্ন পরিবেশ থেকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা—প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা এতদিন রাষ্ট্র ও সমাজকে ভাবতে হয়নি, কারণ এদের শিক্ষার দাবী এসেছে জনকল্যাণমূলক কাজের নবরূপায়ণ থেকে। সেবার আদর্শ নিয়ে এই সমস্ত প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর সব দেশেই গড়ে উঠেছে এবং এখনও উহা চালু আছে। আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব আধুনিক গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের। প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য কোন প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। তাছাড়া এই সব শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসন একটি সামাজিক সমস্যা। উপযুক্ত শিক্ষা ও পুনর্বাসনের অভাবে এইসব শিশুদের অনেকে হয় ভিক্ষুক আবার অনেকে হয় অপরাধপ্রবণ শিশু। চোর, ডাকাত, পকেটমার, গুণ্ডা, বদমায়েস, প্রবঞ্চক ইত্যাদি।

পরিসংখ্যাণ থেকে দেখা যায় এদের শতকরা ৭০ জন প্রতিবন্ধী শিশু। অতএব জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠনে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের—গণতান্ত্রী দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব মূলতঃ সরকারের। সরকারের অর্থদপ্তর যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ নয়, সে দায়িত্ব নীতিগতভাবে স্বীকার করলেও সরকার উহা গ্রহণ করতে পারে না। তবে শিক্ষা-সম্পর্কিত ন্যূনতম দায়িত্বের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ও পরিচালন অন্যতম। এর পরই আসে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব। পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসমাজ থেকে। এদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারলে এরা এক বিরাট ভিক্ষুক-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে সমাজের ও সরকারের ঘাড়ে বসে খাবে। বর্তমানে মানবসেবাকে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে। অন্নদান, বস্ত্রদান, বিদ্যাদান ধর্মকার্য হিসাবে গণ্য হলেও সমাজে কোন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট সমাজসেবা। সমাজে কেহ যাতে পরের উপর নির্ভরশীল না হয় সরকারকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এজন্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে কর্মবিনিয়োগ-পদ্ধতির সম্পূর্ণ সহযোগিতা রাখতে হবে। দেশবাসীকে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়ে শিক্ষিত বেকার করে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলে লাভ কি? অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুরা এক জাতীয় ব্যবসায়ীর কবলে গিয়ে পড়ে। তারা এদের রাজপথে বসিয়ে রেখে যায়। দিনান্তে যা ভিক্ষালব্ধ অর্থ সঞ্চিত হয়, তা ওরা সংগ্রহ করে লয়, এর বিনিময়ে ভিক্ষুকদের ভরণপোষণের খানিকটা দায়িত্ব ওরা বহন করে ব্যবসার খাতিরে। এ জাতীয় ব্যবসার কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু এরা সুযোগ পায় কেন? সরকারের অব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী।

কর্ম-বিনিয়োগ

এই ভিক্ষুক-সমস্যার সাথে বিকলাঙ্গদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষভাবে জড়িত। এদেশের তীর্থস্থানগুলি যাঁরা পরিভ্রমণ করে এসেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে ভিক্ষুকতার জন্যে কারও কোন লজ্জা নেই। তাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যেন সমাজের। অনেক ভিক্ষাবৃত্তির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা নিরুপায় হয়ে ভিক্ষা-বৃত্তি গ্রহণ করেছে। সময় মত উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে এরা অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের মত সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারতো।

অনেকে প্রশ্ন করবেন যে দেশে স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অগণিত সে দেশে বিকলাঙ্গদের কর্মে নিয়োগ করবে কে? কথাটা খুবই সত্যি। তার

চাইতেও বড় সত্য হচ্ছে বিকলাঙ্গদের সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে সমাজের দুষ্টক্ষত এই ভিক্ষাবৃত্তিকে বন্ধ করতে পারা যাবে না। সরকারী প্রচেষ্টায় বিকলাঙ্গদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাদের কর্মে নিয়োগ পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে সম্ভব হয়েছে কাজেই ভারতবর্ষের মত উন্নতিকামী গণতন্ত্রী দেশেও তা সম্ভব হবে। এর জন্য সরকারকে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এখন প্রতিষ্ঠানগুলি চালাচ্ছে, সরকার সেই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করবেন এবং যাতে প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশু সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ পায় সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

বিকলাঙ্গদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের

পিছিয়ে-পড়া ও অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা—আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে পর্বতপ্রমাণ অনুন্নয়ন ও অপচয় পরিলক্ষিত হয় তার মূল কারণ এই যে এই সব ক্ষেত্রে শতকরা ৮০টি শিশুই পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ে। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শ্রেণীশিক্ষা চালু থাকায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক কম, তারা গড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে একসঙ্গে অধ্যয়ন করে পিছিয়ে পড়বেই। এছাড়া সাময়িক অসুস্থতা বা প্রক্ষোভিক প্রতিবন্ধের জন্য যারা শিক্ষায় অনগ্রসর, তাদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের সাথে পাঠ দিলে তারা ওদের সাথে এগিয়ে যেতে পারবে না। আবার অনেক শিশু বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কু-সঙ্গে পড়ে বা বিদ্যালয়ে তার বুদ্ধিক্ষমতা অনুযায়ী কাজের অভাব লক্ষ্য করে নানাবিধ সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় অথবা স্কুলপালাতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। এই সব অপরাধ-প্রবণ শিক্ষার্থী সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের সাথে পাঠাভ্যাসে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। অনগ্রসর শিশু পিছিয়ে-পড়া শিশুদের সগোত্র, তবে অনগ্রসরতা সাময়িক। শিক্ষার দ্বারা উহা দূর করা সম্ভব। পরে ওরা সাধারণ শিক্ষার্থীর সাথে অধ্যয়ন করতে পারে।

পল্লীগ্রামে যেখানে একটিমাত্র বিদ্যালয় সেখানে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব না হ'লে এদের জন্য সাধারণ শ্রেণীগত শিক্ষার সাথে বিশেষ শ্রেণীগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভব হ'লে এদের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ চার ধরনের পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায়—(১) **অনগ্রসর শিশু**—দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকায় বা প্রাক্ষোভিক অসামঞ্জস্যতার জন্য যেসব শিশু পাঠে মনোযোগ দিতে পারে না তারা অধ্যয়নে পিছিয়ে পড়ে। অনগ্রসরতা শিক্ষাগত সমস্যা। শিক্ষার্থী, শিক্ষার পরিবেশ ও পাঠক্রম এ তিনের সংযোগ হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসৃত পাঠ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এদের

শিক্ষা-সমস্যার বিশ্লেষণে মূল কারণটি ধরা পড়বে। প্রথমে দেখতে হবে গলদটির মূল কোথায়। তারপর উহা নিরসনের চেষ্টা করতে হবে।

(২) **নির্বোধ শিক্ষার্থী**—সব পিতামাতাই আপন সন্তানের সুশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিন্তু তারা ভেবে দেখেন না যে তাদের সন্তানের বুদ্ধ্যঙ্ক কত এবং বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু আছে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান নির্বোধ শিশুদের নিয়ে অনেক সমীক্ষা চালাবার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ে পৃথক পাঠক্রম ও পৃথক শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) **শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন শিক্ষার্থী**—মৃগীরোগী ও মানসিক রোগাক্রান্ত শিশু এবং মূক, বধির, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ শিশুদের বেশীর ভাগই পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থী। এদের জন্য পৃথক এবং বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। শিক্ষা-উপকরণ, শিক্ষা-পদ্ধতি ও পাঠক্রম এদের প্রয়োজন অনুরূপ হবে।

(৪) **বিশেষ বিষয়ে পিছিয়ে পড়া শিশু**—অনেক শিক্ষার্থীকে দেখা যায় ভাষা শিক্ষায় ভাল কিন্তু অঙ্কে খুবই কাঁচা। অনেক শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক বেশ ভাল কিন্তু মুখস্থ করবার ক্ষমতা খুব কম। এসব ক্ষেত্রে শিশুর অনগ্রসরতার কারণ নির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধানকারী অভীক্ষা (Diagnostic test) প্রয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতা দূর করবার জন্য বিশেষ শ্রেণীতে বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া **অপরাধপ্রবণ শিশুর শিক্ষার জন্য** পৃথক ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। এদের শতকরা ৮০ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক গড় বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে হ'লেও বাকী শতকরা ২০ জনের মধ্যে শতকরা ১০ জন উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন। **অপরাধ-প্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে চারিটি সূত্র পাওয়া যায় ; যথা—(১) বংশধারামূলক, (২) মানসিক, (৩) পারিবারিক (৪) সামাজিক।** লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে বংশধারামূলক কারণগুলি ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর পারিবেশিক কারণগুলি শিশুর গৃহ, বিদ্যালয় ও নিকটতম পরিবেশ থেকে জাত। পিতামাতার সম্পর্ক, পিতামাতার ভালবাসা ও পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতি এই কারণগুলির অন্যতম। অনুন্নত সামাজিক পরিবেশ থেকে ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে শিক্ষার্থীর জীবনে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে। মানসিক কারণগুলির মূলে আছে ব্যক্তিত্ব-সংগঠনের অভাব এবং তার ফলে মনোবিকলনের (Neurosis) সৃষ্টি। এই সমস্ত অপরাধপ্রবণ শিশুদের শিক্ষা আরম্ভ হয় অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত সাধারণ বিদ্যালয়ে, কিন্তু রোগের মাত্রা বেড়ে গেলে এদের আলাদা করে নিয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। উন্নতবুদ্ধি শিক্ষার্থীকে তার বুদ্ধির প্রাখর্য-প্রয়োগের সুযোগ দিতে হবে। এই সমস্ত শিশুর সাথে শিক্ষিকাদের স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার। এদের অপরাধকে বড় করে না দেখে অপরাধের কারণকে

বড় করে দেখে উহা নিরসনের সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। এদের পাঠক্রম, শিক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষা-উপকরণ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সাধারণ শিক্ষা থেকে পৃথক ধরনের হবে। অপরাধপ্রবণ শিশুদের মধ্যে অনেকে কারাগারে প্রেরিত হলেও এদের সেখানে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এদের প্রক্ষোভের চাহিদা মেটাতে না পারলে কোন শিক্ষাই কার্যকরী হবে না। সমাজে নাগরিক হিসেবে যাতে এরা আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেরূপ বৃত্তিমূলক ও পেশাযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। পাপ ঘৃণ্য, পাপী ঘৃণ্য নয়—এই নীতি অনুসারে তরুণ পাপীদের ও অপরাধপ্রবণ যুবক-যুবতীদের সংশোধনী শিক্ষার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা পেশামূলক শিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে এদের সামাজিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

স্বল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সমস্যা—বুদ্ধি-মাপক অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধি পরিমাপ করবার পর দেখা গিয়েছে যে, যে কোন জনসমষ্টিতে (population) বুদ্ধির বণ্টন প্রায় একই প্রকার। প্রকৃতি থেকে এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

জনসমাজে বুদ্ধির বণ্টন

শতকরা প্রায় ৬০ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০; ৯০-এর নিচে শতকরা ২০, অপরপক্ষে ১১০-এর বেশী শতকরা ২০ জন। শতকরা ১ জন জড়, আবার শতকরা ১ জন অতি-মানব। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শতকরা ৫ জন নির্বোধ, আর শতকরা ৫ জন প্রতিভাবান। এই বণ্টন নির্ভর করে বংশগতির উপর এবং এই বণ্টনের ফলাফলে যার ভাগ্যে যেটুকু বুদ্ধি পড়ে তার উপরই তার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকখানি নির্ভর করে।

বুদ্ধ্যঙ্কের হিসেবে যাদের বুদ্ধি ৯০-এর নীচে তারা ক্ষীণবুদ্ধির পর্যায়ে পড়ে। এদের মধ্যে শতকরা ১০ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৮০; খুব চেষ্টা করলে সাধারণ শিক্ষা নিয়ে এরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। তবে এদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি

একটু আলাদা রকমের করতে হয়। ভাষা ও সাহিত্য-মূলক শিক্ষা এবং বিমূর্ত তত্ত্ব নিয়ে কোন আলোচনায় এরা বিশেষ উপকৃত হবে না। এদের জন্য মূর্ত বিষয় নিয়ে হাতে কলমে শিক্ষার (Practical education) ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল ও ট্রেড স্কুলের প্রশিক্ষণে এরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ছাড়া জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সাধারণ শিক্ষা (General education) এদের দিতে হবে। সম্ভব হ'লে বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিলে এরা উপকৃত হয়। বুদ্ধিমান শিশুদের সাথে একসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকায় ক্ষীণবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে সব চাইতে বেশী। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৩০ থেকে ৫০ এর মধ্যে তারা নির্বোধ (imbecile)। তাদের জন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। লেখাপড়া করা বা

কোন কৌশল আয়ত্ত করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা এদের খুব সহজ হাতের কাজ শেখানো যায়। এর নীচের ধাপে শতকরা ১ জন জড় (Idiot) আছে। এরা একা একা চলাফেরা করতে পারে না। এদের কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ৮০ এর মধ্যে কোন সমাজে তাদের সংখ্যা শতকরা ১৪ জন। প্রত্যেক সমাজে এছাড়া শতকরা ৩০ জন লোক আছে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ থেকে ৯০ এর মধ্যে। এই ৩০ জনের মধ্যে ১৫।১৬ জন গড় বুদ্ধির নীচের পর্যায়ে। এরা প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শেষ বেঞ্চির ছাত্রছাত্রী (back benchers) এদের জন্য কোন শ্রেণীতে পাঠ দিতে গেলে পাঠের মান খানিকটা নীচে নামিয়ে পরিবেশন করতে হয়। ফলে গড় বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা মানসমন্বিত পাঠ (Standard lesson) থেকে বঞ্চিত হয়।

শিক্ষার মান নিম্নগামী কেন ?

পল্লীগ্রামে যেখানে ২।৩টি পাঠশালা ও একটি মাত্র হাইস্কুল সেখানে এই সমস্ত স্বল্পবুদ্ধি বালকবালিকা ও গড় বুদ্ধিস্তরের নীচের দিকের বালক-বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয়। এইসব বিদ্যালয়ে ভর্তিসূচক পরীক্ষা (Admission test) বড় একটা কার্যকরী হয় না। যে প্রত্যেক স্কুলেই যে কোন শ্রেণীতে ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮।১০ জন অনগ্রসর ছেলেমেয়ে ও স্বল্পবুদ্ধি ছেলেমেয়ে পাওয়া যাবে। আবার যে স্কুলে ছেলেদের পরীক্ষার ফলাফল ও বুদ্ধিশক্তি বিচার করে শ্রেণী-বিভাগ করা হয় সেখানে গ বর্গ (C Sec) বা ঘ বর্গ (D Secction)-এর শিক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই গড়বুদ্ধি শিক্ষার্থীদের নীচে। এদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে না পারলে শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। কারণ এর পরোক্ষ ফলাফল থেকে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পর্বত প্রমাণ অপচয় দৃষ্ট হয়।

অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক দিক—মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এদেশে অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়টি ১৮৯৯ খ্রীঃ স্থাপন করেন স্বর্গীয় লালবিহারী সাহা। ১৯০০ খ্রীঃ এনামিলার্ড নামক একজন আমেরিকান মহিলা বোম্বাই সহরে একটি অন্ধবিদ্যালয় স্থাপন করেন। অবশ্য দেরাদুনের অন্ধবিদ্যালয়টি সর্ব প্রাচীন। এ ছাড়া ভারতবর্ষে ছোট-বড় ১৩০টির বেশী অন্ধবিদ্যালয় আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রথমে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সেবার আদর্শ পরিবর্তিত হলে এদের জন্য কারিগরী শিক্ষা ও পেশা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৬০ খ্রীঃ পানসাতে (গুজরাট) কৃষিকার্যে প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইহা অন্ধদের জন্য টাটা কৃষিশিক্ষণকেন্দ্র নামে পরিচিত। কৃষিকার্যের সাথে নানাপ্রকার কুটির-শিল্পের প্রশিক্ষণও এখানে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পর নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে

এরা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে সমর্থ হয়। অন্ধদের শিক্ষার সাথে এদের পুনর্বাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্রেইলী-পদ্ধতিতে দেরাদুনে অন্ধদের নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করে উপজীবিকা গ্রহণের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৫০ খ্রীঃ বয়স্ক অন্ধদের জন্য দেরাদুনে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৫৭ খ্রীঃ নারী অন্ধদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়েছে। প্রশিক্ষণ-গ্রহণের জন্য বেকার অন্ধদের সাময়িক পুনর্বাসনের জন্য দেরাদুনে নিরাপদ আশ্রয়ে কারখানায় কাজের ব্যবস্থা আছে। অন্ধদের জন্য সঙ্গীত-সাধনা একটি উন্নত ধরনের উপজীবিকা অবশ্য সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ প্রবণতা যে অন্ধদের আছে তারাই সঙ্গীত শিক্ষা থেকে উপকৃত হ'তে পারে।

ব্রেইলী-পদ্ধতিতে অন্ধের উচ্চতম সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী বিষয়ক নানাপ্রকার প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। ব্রেইলীর জন্য যাতে বিদেশের উপর নির্ভর করতে না হয় সেজন্য ভারতসরকার ১৯৫১ খ্রীঃ দেরাদুনে ব্রেইলী ছাপাখানা স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজনে ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী, মারাটী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় ব্রেইল প্রস্তুত করে ছাপার কার্য আরম্ভ হয়েছে। অন্ধ-বিদ্যালয়ে ব্রেইলী গ্রন্থাগার একটি বড় সম্পদ। ব্রেইল ছাপাখানা স্থাপন অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচারের পথে একটি উল্লেখযোগ্য

অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থা—এদেশে অন্ধ শিশুর সংখ্যা হাজারে ১'৩ জন। এই বিরাট দেশের অন্ধ সম্প্রদায় প্রধানতঃ ভিক্ষা-বৃত্তির উপর বেঁচে আছে। ধনী ও মধ্যবিত্তের ঘরে হাজারে ১ জন বিকলাঙ্গ সন্তান আছে এবং এদের নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক না সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে যখন একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে তখন এ সমস্যাটি খুবই প্রকট হয়ে উঠছে। অন্ধদের পারিবারিক জীবন বড়ই দুর্বিবহ। এদের মধ্যে যাঁরা অন্ধস্কুলে পড়াশুনা করবার সুযোগ পেয়ে বৃত্তিজীবী হিসেবে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা ভাগ্যবান। অন্ধদের মধ্যে অনেক অধ্যাপক, গায়ক, উকিল আছেন। তবে এঁদের সংখ্যা খুবই সামান্য। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি দেশে অন্ধদের জন্য সাধারণ শিক্ষা এবং বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ শিক্ষা অবৈতনিক আর বৃত্তিশিক্ষা আবাসিক প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে দেওয়া হয়ে থাকে সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে। তবে ভাল ছাত্রছাত্রীর জন্য অনেক বৃত্তির (Scholar-ship) ব্যবস্থা আছে। এই সব দেশের সরকারী ধীরে ধীরে বিকলাঙ্গদের শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষে সাধারণশিক্ষা ১১ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত অবৈতনিক শীঘ্রই করা হবে। তখন অন্ধদের সাধারণ শিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন। অন্ধদের বৃত্তি-শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে শুধু গ্রহণ করলে চলবে না। বৃত্তিশিক্ষাপ্রাপ্ত

অন্ধদের সরকারী প্রচেষ্টায় কর্মে নিয়োগ করতে হবে। ব্রেইলী লেখতে অন্ধদের প্রায় সর্বপ্রকার শিক্ষা দেওয়া যায়। বৃত্তিশিক্ষা-প্রাপ্ত অন্ধ সাধারণ দক্ষ কারিগরের মত কাজ করতে পারে। এই কাজের বিনিময়ে অন্ধদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে।

যতদিন সরকারী প্রচেষ্টায় অন্ধবিত্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন বে-সরকারী প্রচেষ্টায় অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে হবে। এদের শিক্ষাদানের জন্ত বিশেষ ধরনের বিত্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্ধদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি পৃথক ধরনের। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া কেহ অন্ধদের শিক্ষা দিতে পারেন না। বিশেষ ধরনের শিক্ষা-উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারলে অন্ধবিত্যালয়ে কোনরূপ শিক্ষাদানকার্য সম্ভব নয়। শুধু অর্থ, জমি ও বাড়ী হলেই অন্ধবিত্যালয় পরিচালনা করা যায় না। অন্ধদের শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার্থীদের কাজের প্রবণতা ও বিশেষ ক্ষমতার কথা ভাল করে রাখতে হবে। অন্ধদের শিক্ষার যাতে কোনরূপ অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত অন্ধদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বাধুনিক পদ্ধতি এদেশে চালু করতে হবে। অন্ধদের শিক্ষাকে জাতীয় সমস্তা রূপে বিবেচনা করলে অন্ধদের শিক্ষার কোন সার্বজনীন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কারণ এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভাব খুব বেশী। অদম্য উৎসাহ নিয়ে যে সমস্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এদেশে অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন সেগুলি দেশের ও জাতির বড় রকম সেবা করে যাচ্ছেন। দেশের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে এই মহতী প্রচেষ্টায় সরকারের সাথে সহযোগিতা করবার জন্ত।

অন্ধদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

আংশিক অন্ধ-শিশুদের শিক্ষা—আংশিক অন্ধেরা বড় বড় জিনিস দেখতে পায় তাই এদের জন্ত ব্রেইল ব্যবহার না করে বড় বড় হরফে ছাপা বই ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ছাপান বই বা টাইপকরা বিষয় এরা যন্ত্রের মধ্যে রেখে বিবর্ধক কাচের (magifying glass) সাহায্যে পড়তে পারে। বৃত্তিশিক্ষা ব্যাপারে কলকারখানার কাজে এদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বধির এবং বোবাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা—বধির ও বোবা ব্যক্তির বাহ্যিক কোন প্রতিবন্ধন নেই, কিন্তু অন্ধ বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের চাইতে এদের জীবনে প্রতিবন্ধকতা খুবই বেশী। বোবা ও বধির ব্যক্তিরা নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করে। অপরপক্ষে পরিচিত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্য ছাড়া আমরা বোবা বা বধির ব্যক্তির সাথে সাধারণভাবে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারি না। শিক্ষাব্যবস্থার মূল বাহন হচ্ছে ভাষা। এদের ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগ অচল, তাই ভাষাসূচক চিহ্ন (Sign language) এবং বাচনভঙ্গী,

পঠন (Speech reading) রীতির সাহায্যে এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ নাগরিক শিক্ষার পর এদের জন্য বৃত্তিশিক্ষা অপরিহার্য। অফিসের কেরানীর কাজ, টাইপ করার কাজ, সূচীশিল্প, রাজমিস্ত্রী বা ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ এমন কি কারখানায় উৎপাদনমূলক অনেক কাজে এরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

মূক বধিরদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—এদেশে পঞ্চাশটির বেশী মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। সরকার বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এই সমস্ত বিদ্যালয়ে দরজীর কাজ, সূচীশিল্প, বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, রাজমিস্ত্রীর কাজ, ও ছুতোরমিস্ত্রীর কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে এইসব প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বসনের ব্যবস্থা করা হয়। ছবি তোলা ও ফ্যাক্টরীর কাজেও এদের নিয়োগ করবার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শ্রবণশক্তির সহায়ক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হবার পর আংশিক বধির ব্যক্তিদের জীবনে প্রতিবন্ধকতা অনেক কমে গিয়েছে।

বিকলাঙ্গ শিশুর শিক্ষা—বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ জন্মগত দৈহিক বা মানসিক ত্রুটি নিয়ে জন্মায় আবার অনেকে জন্মের পর কোন দুর্ঘটনায় বা অসুস্থতানিবন্ধন বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে। বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের দৈহিক প্রতিবন্ধন-জনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক। এদের মধ্যে হীনমন্যতা ও অপরাধপ্রবণতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। এদের বুদ্ধি গড়বুদ্ধির ব্যক্তিদের প্রায় সামান কিন্তু দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধনের জন্য পরিবার ও সমাজের উপেক্ষা ও কৃপা এদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে সমাজে পুনর্বাসনের সুযোগ দিতে পারলে আর দশজন সাধারণ মানুষের মত সমাজে থেকে এরা সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারে।

সাধারণ বিদ্যালয়ে বিকলাঙ্গ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পেশা-শিক্ষার জন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কাজের সহায়ক যন্ত্রপাতি, ও বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে। আপিসের কাজ, কারখানার কাজ বা শিল্পসৃষ্টির কাজ এদের বেছে নিতে হবে যা এদের দৈহিক ক্ষমতায় বা মানসিক শক্তিতে সম্ভব। এদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষানির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক সমস্যা—ক্ষীণবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধি শিশুর মনে নিজের অক্ষমতার জন্য হতাশা, ভয়, বিরক্তি, ক্রোধ আগ্রহের অভাব এমনকি মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ধৈর্য্য, কর্মপ্রেরণা ও উচ্চাশার অভাবে সব সময়ই এরা নানাবিধ প্রাক্ষোভিক অসামঞ্জস্যতার ক্রীড়নক হয়ে থাকে। যে সমস্ত শিশু পারিবেশিক অথবা সামাজিক অবস্থায় কুসঙ্গে পড়ে অপরাধ-প্রবণ শিশুর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে অসামাজিক কার্যে লিপ্ত হয় সমাজের প্রতি আক্রোশের বশে বা পরিবার পরিজনের নিপীড়নের

প্রতিশোধ নেবার মানেসে। উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন অপরাধপ্রবণ শিশুর সংখ্যা শতকরা ১০ জন এরা খুব উচ্চাভিলাষী তাই পরিবারে বা সমাজে সে সুযোগ না পেয়ে তারা অসামাজিক পথে পা বাড়ায়। এদের মধ্যে জিঘাংসার ভাব ও নেতৃত্বের ভাব সুপ্ত অবস্থায় থাকে। মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে আবার অনেক সময় এরা মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এদের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সুশিক্ষা ও পুনর্বাসনের সাহায্যেই এই সামাজিক দুষ্ট ক্ষতের প্রতিকার সম্ভব।

প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুর কর্মসংস্থানের সমস্যা—একজন সাধারণ শিশু তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে নিয়োজিত কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যে কাজ তার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার এক্তিয়ারের মধ্যে সেগুলি সে অনায়াসে করতে পারে। কিন্তু প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে। বাধাগুলির মধ্যে কর্ম ক্ষমতার অভাব, কর্ম সম্পাদনের ক্ষিপ্রতার অভাব, দক্ষতার অভাব, সামাজিক সংযোগের অভাব ও স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভাব, স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন খোঁড়া ব্যক্তি একজন সাধারণ ব্যক্তির মত চলাফেরা করতে বা ছুটতে অক্ষম; আবার দুর্ঘটনায় যার হাত কেটে গিয়েছে তার পক্ষে দু'হাত দিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। কানা, অন্ধ, বোবা, কালা ব্যক্তিরা সাধারণ লোকদের মত সব কাজ করতে সক্ষম নয়। ইন্দ্রিয়ত্রুটিজনিত বা বিকলাঙ্গ হবার ফলে কর্মক্ষমতা অনেক কম হয়। ক্ষীণবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি ক্ষিপ্রতার সাথে কোন কাজ করতে পারে না। সুশিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাবে এরা বিশেষ কাজে দক্ষ হবার সুযোগ খুব কম পায়। এছাড়া সামাজিক সংযোগের বিবিধ বাধা এদের মনে নানা-প্রকার বিরোধমূলক প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে নির্বিকারচিত্তে এরা প্রায়ই কোন কাজ করতে পারে না। শুধু যারা শিল্পী তারাই ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বিকারচিত্তে শিল্প-সাধনায় মগ্ন থাকে। উপযুক্ত সামাজিক সংযোগ এবং মানুষ হিসেবে সমাজে এদের পূর্ণ স্বীকৃতি না থাকাতে এদের আত্মবিশ্বাস খুবই কম। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সহজে নিজেদের প্রতিবন্ধের কথা প্রকাশ করতে চায় না। আবার সমাজ তাদের দুর্বল ও সঙ্গতিহীন বলে দয়া করছে মনে করে অনেকের মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় শিশুদের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের বুদ্ধ্যঙ্ক গড়বুদ্ধিসম্পন্ন আবার ২।১ জন সমাজে প্রতিবন্ধী প্রতিভাবান শিশুও আছে। প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুর শিক্ষা এবং পুনর্বাসনের সময় একথা মনে রাখতে হবে।

পুনর্বাসন—পুনর্বাসনের কয়েকটি মূল সমস্যা আছে। এদেশে লোকবল এত বেশী এবং বেকার-সমস্যা এত গুরুতর যে প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের

কর্মে নিয়োগ বাধ্যতামূলক বা আসন-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা না থাকলে কেহই এদের কর্মে নিয়োগ করতে রাজী হবেন না। সেজন্য পুনর্বাসনের কথা বিবেচনা করবার সময় দেখতে হবে চিকিৎসার দ্বারা প্রতিবন্ধন দূর করা সম্ভব কিনা, অথবা সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমুখী শিক্ষা দিয়ে শিশুকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারা যায় কিনা।

শিক্ষা ও পুনর্বাসন—প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে তার কর্মক্ষমতা ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তিনির্বাচন করতে হবে। বৃত্তিশিক্ষার সাথে সাধারণ নাগরিক শিক্ষাও শিশুকে দিতে হবে। শিশুর নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সুযোগও শিক্ষা-ব্যবস্থায় থাকবে। এদের উপজীবিকার কথাই এ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বড় কথা। অবশ্য শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলি যথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদার জন্য শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, চাহিদাকেন্দ্রিক শিক্ষা ইত্যাদি থেকে বিচ্যুত হ'লে চলবে না। বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ হ'লেও তাদের অসুবিধার কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। অপরাপর প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার সাথে শিক্ষা-নির্দেশনা ও বৃত্তি-নির্দেশনার কাজও যুক্ত করতে হবে। কারণ এ জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যদি নিজগৃহেই কর্মসম্পাদন করে জীবিকা অর্জন করতে পারেন তবে খুবই ভাল হয়, কিন্তু শিল্পী ও ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিদের চাকুরির উপর নির্ভর করতে হয়। অন্ধগায়ক, বোবা হস্তশিল্পী বা কালা চিত্রশিল্পী সমাজের বোঝা নহেন, বরং সমাজ এদের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। তবে চাকুরির কথা বিবেচনা করতে গেলে (১) সাধারণ চাকুরি-প্রার্থীদের সমপর্যায়ে চাকুরি, (২) নিরাপদ আশ্রয়ে কারখানায় চাকুরি এবং প্রতিবন্ধকতার জন্য বিশেষ সুবিধাসহ চাকুরির কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আসন-সংখ্যা সংরক্ষিত না হ'লে সাধারণ চাকুরি প্রার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবেন না। অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ আশ্রয়ে কারখানার কাজ প্রতিবন্ধী শিশুরা করতে পারে; কিন্তু এ জাতীয় কারখানা পরিচালনা লাভজনক ব্যবসায় নয় বলে ব্যবসায়ীরা এগুলি পরিচালনার ভার নিতে অনিচ্ছুক, সেজন্য সরকারকেই এ জাতীয় কারখানা স্থাপন ও পরিচালন করতে হবে। কোন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম যদি এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে খুবই ভাল হয়। তাছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের সীমিত ক্ষমতার কথা মনে রেখেই সরকার, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীকে এদের কর্মে নিয়োগ করতে হবে এবং এদের চাকুরির নিরাপত্তা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। অনাথ শিশু ও সমাজে পতিত মহিলাদের প্রতিবন্ধী হিসেবে বিচার করে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।

শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থার স্থান—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রচলিত বিদ্যালয়, আশ্রম, পুনর্বাসনকেন্দ্র ইত্যাদির জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার কিছু অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ জাতীয় শিক্ষার জন্য কয়েকটি ছোটখাট পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এগুলির মধ্যে—(১) ছবিতোলা প্রশিক্ষণের জন্য নিখিলভারত বধির-সঙ্ঘকে একটি বিদ্যালয়স্থাপনে অর্থসাহায্য করা, (২) দেরাদুনের ব্রেইল ছাপাখানার সম্প্রসারণ, (৩) বধিরদের শ্রবণশক্তির সহায়ক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য জাতীয় পদার্থবিদ্যা-গবেষণাগারে কর্মসূচী-গ্রহণ, (৪) বিকলাঙ্গদের জন্য সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি শিক্ষাপ্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের সাধারণ শিক্ষা যে বিশেষভাবে জড়িত, একথা বলাই বাহুল্য।

অনুশীলনী

১। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? এদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পেশা-শিক্ষা অপরিহার্য কেন?

২। 'প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গদের সর্ব প্রকার শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের'—যুক্তিসহ আলোচনা কর।

পিছিয়ে-পড়া শিশু ও অনগ্রসর শিশুর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার?

অপরাধ-প্রবণ শিশুর শিক্ষা ও তাদের পুনর্বাসনের বিষয় আলোচনা কর।

অন্ধদের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির পরিচয় দাও।

মূক ও বধিরদের শিক্ষার জন্য এদেশে কি ব্যবস্থা আছে?

প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুদের কর্মসংস্থানের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর।

University Questions

1. What are different types of handicapped children? Discuss the Psychological and educational problems relating to one such type. [C. U. 1964]

2. "The education of handicapped children is a State responsibility."—Discuss.
What has your State done in this respect? [C. U. 1964]

3. "Many of us are blind about the blind".—What is the significance of this statement? What arrangements exist at present in our country for the education of the visually handicapped? [C. U. 1964]

4. What are different categories of mentally handicapped children? Which of them may be taught in ordinary schools and which in special schools? [C. U. 1965]

5. Give a brief account of education of handicapped in some other educationally advanced country. [C. U. 1965]

6. What are the causes of antisocial behaviour of criminals? What is being done in this country for their social rehabilitation? [C. U. 1965]

7. Distinguish betwen dullness, back wordness and retardation. What remedial measures can be taken about them? [C. U. 1966]

8. What are the psychological problems of the blind? Discuss how would you proceed to deal with them? [C. U. 1966]

9. What method is followed for the education of deaf and mute children? Discuss the nature of their curriculum. [C. U. 1966]

শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত মূল গ্রন্থগুলি (Source Books) পাঠ করে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারেন।

1. Problem of Educational Reconstruction, by K. G. Saiyidain.
2. Education in India—Today and Tomorrow. by S. N. Mukherjee.
3. Education in New India—Humayun Kabir.
4. A Students History of Education in India. by Syed Nurullah and J. P. Naik.
5. History of Elementary Education in India by J. M. Sen.
6. Educution in Modern India by A. N. Basu.
7. The Development of Modern Indian Education by B. Dalyal.
8. Education in New era by J. L Kandel.
9. Education in Changing India by K. L. Srimali.
10. Educational Finance in India by Misra.
11. History of Education in Ancient India by N. N. Masumder.
12. Guide to Education in India Published by Ministry of Education Gov . of India.
13. 1st Five year Plan Published by Govt. of India.
14. 2nd Five year Plan Published by Govt. of India.
15. 3rd Five year Plan Published by Govt. of India.
16. Report of the Secondary Education commission Published by Govt. of India'
17. Report of the Education Commision (1964-66) Published by Govt. of India.
18. Dey Commission Report Published by Govt. of West Bengal.
19. School Committee Report Published by Govt. of West Bengal.
20. Administration of Education in India by S. N. Mukherjee.
21. The Dynamic University by Husain.
22. Thoughts on Basic Education by Salamatullah.
23. A Short History of English Education by H. Barnard.
24. Handicapped Children by John. D. Kershaw,
25. The causes and treatment of Back wardness by Cyril Burt.
26. Back wardness in Basic Subjects by F. J. Schonell.
27. Principles of Vacational Education by Keller.
28. Problems in the Education of Visually Handicapped by Merry.
29. Educational Guidance by Strong.
30. Problem Children by Udy Sarkar.
31. Educating the Subnormal Child by Frances Lloyd.
32. Technical education and its Development Published by Institute of Engineers (India).
33. Technical Education in India To-day by L. S. Chandra Kant.
34. Industrial Education, its problems methods and dangers by Leake Allert H.
35. Wardha Scheme-The Gardhian Plan of education for Rural India by K. L. Srimali.
36. The First Five Years of life by Gesell Arnold.
37. Primary Education in India by A. N. Basu.
38. Creative Arts & Crafts—a hand book for Teachers in Primary Schools by Pluck rose H.
39. Careers for the millions by B. B. Agar : al.

এই পুস্তকের দশটি বৈশিষ্ট্য :

১. পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রি-বর্ষ স্নাতক শ্রেণীর দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঠক্রম অনুসারে লিখিত।

২. এদেশের শিক্ষা সমস্যার বিশ্লেষণ ও তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ সমন্বিত।

৩. ভারতীয়-শিক্ষাসমস্যার বিভিন্ন দিকের উপর আলোচ্য বিষয়গুলি মৌলিক ও সুচিন্তাপ্রসূত।

৪. আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বড় হরফে দেওয়া হয়েছে।

৫. ধারাবাহিক আলোচনার বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য প্রান্তিক সারাংশ (Marginal notes) যুক্ত হয়েছে।

৬. প্রত্যেক খণ্ডের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়নের ফলশ্রুতি বিচারের জন্য অনুশীলনী যুক্ত হয়েছে।

৮. পরীক্ষা প্রস্তুতির সুবিধার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী সংযোজিত হয়েছে।

৯. ভাষা প্রাঞ্জল ও আলোচনা খুবই চিত্তাকর্ষক।

১০. শিক্ষাসম্পর্কিত সর্বাধুনিক তথ্য ও পরিসংখ্যানে পুস্তকটি সমৃদ্ধ।